চার্বাক ও হিউমের জ্ঞানবিদ্যা

একটি তুলনামূলক সমীক্ষা

কালী প্রসন্ন দাস

দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা
১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

চার্বাক ও হিউমের জ্ঞানবিদ্যা
একটি তুলনামূলক সমীক্ষা

এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

কালী প্রসন্ন দাস

Dhaka University Library
382746
382746

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
২৮/১২/৯২
ডঃ কাজী নুরুল ইসলাম
প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা
১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় বিন্যাস

ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যা ৬

১.১	মীমাংসা জ্ঞানবিদ্যা	৭
১.২	বেদান্ত জ্ঞানবিদ্যা	১১
১.৩	ন্যায় জ্ঞানবিদ্যা	১৪
১.৪	সাংখ্য জ্ঞানবিদ্যা	১৯
১.৫	যোগ জ্ঞানবিদ্যা	২১
১.৬	বৈশেষিক জ্ঞানবিদ্যা	২৩
১.৭	বৌদ্ধ জ্ঞানবিদ্যা	২৪
১.৮	জৈন জ্ঞানবিদ্যা	২৬
১.৯	নির্যাস	২৯
	তথ্যপঞ্জী	৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়

চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা ৩৮

২.১	প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ	৩৮
২.২	অনুমান প্রমাণের বৈধতা খণ্ডন	৪১
২.৩	বেদ বা শব্দ প্রমাণের বৈধতা খণ্ডন	৪৬
২.৪	চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা ও শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব খণ্ডন	৪৬
২.৫	চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা ও কার্যকারণতত্ত্ব খণ্ডন	৪৯
২.৬	চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা ও কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ খণ্ডন	৫১
২.৭	চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা ও চার্বাক নীতিবিদ্যা	৫২
২.৮	চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা ও অধিবিদ্যা সংক্রান্ত মতবাদ	৫৫
২.৯	চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা ও স্বভাববাদ	৫৭
২.১০	চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা ও আকস্মিকতাবাদ	৫৮
২.১১	ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যায় চার্বাকদের অবস্থান	৬২
	তথ্যপঞ্জী	৬৯

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ৭৬

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা

৩.১ প্রাচীন যুগ ৭৭
৩.১.১ সোফিস্ট জ্ঞানবিদ্যা ৭৭
৩.১.২ সক্রেটিসের জ্ঞানবিদ্যা ৭৮
৩.১.৩ প্লেটোর জ্ঞানবিদ্যা ৭৯
৩.১.৪ এরিস্টটলের জ্ঞানবিদ্যা ৮১
৩.১.৫ এরিস্টটল পরবর্তী জ্ঞানবিদ্যা ৮৩
৩.২ মধ্যযুগ ৮৬
৩.২.১ সেন্ট অগাস্টিনের জ্ঞানবিদ্যা ৮৬
৩.২.২ সেন্ট থমাস একুইনাসের জ্ঞানবিদ্যা ৮৬
৩.৩ আধুনিক যুগ ৮৮
৩.৩.১ বেকনের জ্ঞানবিদ্যা ৮৯
৩.৩.২ দেকার্তের জ্ঞানবিদ্যা ৯০
৩.৩.৩ লকের জ্ঞানবিদ্যা ৯২
৩.৩.৪ বার্কলের জ্ঞানবিদ্যা ৯৪
৩.৩.৫ নির্যাস ৯৬
তথ্যপঞ্জী ৯৯

চতুর্থ অধ্যায়

হিউমের জ্ঞানবিদ্যা ১০১

৪.১ ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণাতত্ত্ব ১১২
৪.২ ধারণার অনুসঙ্গ ১১৬
৪.৩ হিউমের জ্ঞানবিদ্যা ও শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব খণ্ডন ১২১
৪.৪ হিউমের জ্ঞানবিদ্যা ও কার্যকারণের আবশ্যিকতা খণ্ডন ১২৬
৪.৫ হিউমের জ্ঞানবিদ্যা ও সংশয়বাদ ১৩২
৪.৬ পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যায় হিউমের অবস্থান ১৩৫
তথ্যপঞ্জী

পঞ্চম অধ্যায়

চার্বাক ও হিউমের জ্ঞানবিদ্যার তুলনামূলক সমীক্ষা ১৪১

৫.১ প্রত্যক্ষ প্রমাণতত্ত্ব প্রসঙ্গে ১৪২
৫.২ অনুমান খণ্ডন প্রসঙ্গে ১৪৮
৫.৩ শাশ্বত আত্মার ধারণা খণ্ডন প্রসঙ্গে ১৫০
৫.৪ কার্যকারণের আবশ্যিকতা খণ্ডন প্রসঙ্গে ১৫৫
তথ্যপঞ্জী ১৬১

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার ১৬২
তথ্যপঞ্জী ১৭১

গ্রন্থপঞ্জী ১৭৩

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মানুষের চেতনার ক্রমবিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ, উল্লেখযোগ্য ও স্বীকৃত শাখা হিসেবে জ্ঞানবিদ্যার উদ্ভব। তাই দর্শনের ইতিহাসে জ্ঞানবিদ্যার পর্যালোচনার গুরুত্ব অপরিসীম। দর্শনের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে আদিযুগ থেকেই জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তাই বলা হয়ে থাকে যে, জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাস দর্শনের ইতিহাসের মতই প্রাচীন। ভারতীয় দর্শনের প্রচলিত নয়টি সম্প্রদায়ের সকলেই জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পাশ্চাত্য দর্শনে অবশ্য সকল দার্শনিক জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা করেন নি। বরং জ্ঞানবিদ্যাগত প্রশ্ন উথাপনের জন্য পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসকে প্রায় একশত বছর অর্থাৎ সোফিষ্টদের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা অনেকটা অপরিহার্য রূপলাভ করে এবং আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন সামগ্রিক অর্থেই জ্ঞানবিদ্যা কেন্দ্রিক হয়ে উঠে। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে প্রথাবিরুদ্ধ চার্বাক দার্শনিকগণ খ্রিষ্টপূর্ব একহাজার অব্দে যে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার সূত্রপাত ঘটান তা যেমন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত, বৌদ্ধ ও জৈন দার্শনিকদের দ্বারা আলোচিত ও সমালোচিত হয়েছে তেমনি এ আলোচনা পাশ্চাত্য দর্শনের সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের এই ক্রম আলোচনার মধ্যে যেমন দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রয়েছে তেমনি এর উপর রয়েছে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব। এ বিষয়টিই চার্বাক ও হিউমের জ্ঞানবিদ্যা নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, জ্ঞানের উৎপত্তি, বিকাশ, সীমা, সম্ভাবনা, বৈধতা ইত্যাদি নিয়ে যেসব মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে অভিজ্ঞতাবাদ একটি বিশেষ ধারা হিসাবে বিবেচিত। চার্বাক নামক ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের আলোচনার মধ্য দিয়েই এ অভিজ্ঞতাবাদী ধারার সূত্রপাত হয়েছে। পরবর্তীতে পাশ্চাত্য দর্শনে এ ধারার পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় দর্শনের উপরোক্ত নয়টি সম্প্রদায়ের মধ্যে চার্বাকগণই একমাত্র ব্যতিক্রম। বস্তুবাদী, বেদ-বিরোধী তথা প্রথাবিরুদ্ধ দার্শনিক হিসাবে চার্বাক দার্শনিকগণ এককভাবে অভিজ্ঞতাবাদের যে গুরুত্ব ও মর্যাদা দান করেছেন পাশ্চাত্য দর্শনে অবশ্য এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। কেননা, পাশ্চাত্য দর্শনে প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত অনেক দার্শনিকই অভিজ্ঞতাবাদী ধারার সমর্থন করে তাঁদের জ্ঞানবিদ্যাগত আলোচনা করেছেন। তবে, আধুনিক বৃটিশ দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন, জন লক ও জর্জ বার্কলের আলোচনায় অভিজ্ঞতাবাদের অধিকতর পূর্ণাঙ্গ, সুশৃঙ্খল ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। হিউমের দর্শন হল এ ধারার সঙ্গতিপূর্ণ, যৌক্তিক ও চূড়ান্ত পরিণতি।

সুতরাং দেখা যায়, প্রাচ্যে চার্বাক দর্শনের মধ্য দিয়ে যে অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যাগত ধারার সূত্রপাত পাশ্চাত্যে হিউমের দর্শনে যেন সে ধারারই ক্রমিক পরিণতি। এদিক থেকে বিচার করে জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে অভিজ্ঞতাবাদী ধারার দিক নির্দেশনা হিসাবে চার্বাক অভিজ্ঞতাবাদ এবং পরিণতির দিক থেকে হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ নতুন করে আলোচনার দাবী রাখে। তাই বর্তমান অভিসন্দর্ভ অভিজ্ঞতাবাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসের দু'টি মাইল ফলকের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার একটি উদ্যোগ। ইতিপূর্বে দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্রে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নতির প্রভাবকে অন্তর্ভুক্ত করে বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে সামগ্রিকভাবে এ দু'টি মতবাদের মধ্যে কোন তুলনামূলক আলোচনা হয়েছে বলে জানা যায় না। এ অভাব পূরণ করার লক্ষ্যেই **চার্বাক ও হিউমের জ্ঞানবিদ্যা : একটি তুলনামূলক সমীক্ষা** শীর্ষক বর্তমান অভিসন্দর্ভের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

এ অভিসন্দর্ভকে মোট ছ'টি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রধানত ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার গতি প্রকৃতি তথা ঐতিহাসিক ধারা নির্ণয় করার লক্ষ্যেই প্রথম অধ্যায়ে ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা এবং ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যায় চার্বাকদের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনাকে সামনে রেখেই পটভূমি হিসাবে প্রথম অধ্যায়ের

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা। ব্যাপক অর্থে ভারতীয় দর্শন বলতে উপমহাদেশের সকল দার্শনিক মতবাদকে বুঝায়। *সর্বদর্শন সংগ্রহ* গ্রন্থে মাধবাচার্য ষোলটি মতবাদের কথা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া, শৈব দর্শন এবং তন্ত্র দর্শনও ব্যাপক অর্থে ভারতীয় দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। শুধুমাত্র ভারতীয় দর্শনের প্রচলিত আটটি দার্শনিক সম্প্রদায় যথা মীমাংসা, বেদান্ত, ন্যায়, সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, বৌদ্ধ ও জৈন জ্ঞানবিদ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার জন্যই মীমাংসা জ্ঞানবিদ্যাকে প্রথমে সন্নিবেশিত করে অন্যান্য সম্প্রদায়কে উপরোক্ত ক্রমবিন্যাসে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

ভারতীয় দর্শনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কিত আলোচনার সর্বজনীনতা ও ব্যাপকতা। প্রচলিত নয়টি সম্প্রদায়ের সকলেই জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় গুরুত্ব আরোপ করেছেন, যা পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, এদের প্রায় সকলকে জ্ঞানের উৎপত্তি, সীমা, সম্ভাব্যতা, বৈধতা ইত্যাদি জ্ঞানবিদ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর উপর গভীরভাবে আলোকপাত করতে দেখা যায়। তাঁদের এ আলোচনার ব্যাপকতা এবং গভীরতার বিষয়টি বিবেচনা করে আমাদের আলোচনাকে শুধুমাত্র যথার্থ জ্ঞানোৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ, তথা প্রমাণতত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, উপরোক্ত আটটি ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়কে প্রমাণতত্ত্বের দিক থেকে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মত বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদী বা বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনা চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা প্রসঙ্গে। মূলত হিউমের জ্ঞানবিদ্যার সাথে তুলনামূলক আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নির্ধারণের লক্ষ্যেই এ অধ্যায়ের পরিকল্পনা। চার্বাক দর্শন জ্ঞানবিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। চার্বাকগণ শুধু অভিজ্ঞতাবাদী প্রমাণতত্ত্ব তথা প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা বলেই শেষ করেন নি বরং এর যৌক্তিকতা প্রদর্শনের লক্ষ্যে ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত অন্যসব প্রমাণকে সূক্ষ্ম যুক্তির সাহায্যে খণ্ডন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাই, দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনাকে চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এছাড়া, এ অধ্যায়ে ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যায় চার্বাকদের অবস্থান নির্ণয়েরও চেষ্টা করা হয়েছে। এ আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, চার্বাকগণ ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে একমাত্র সম্প্রদায় যারা বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতাবাদকে সমর্থন করেছেন। তাঁরাই মূলত দর্শনের ইতিহাসে অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানতাত্ত্বিক ধারার প্রবর্তক। শুধু অভিজ্ঞতাবাদী হিসাবেই নয়, বেদ-বিরোধী তথা অধ্যাত্মবাদ-বিরোধী দার্শনিক ধারা হিসাবেও চার্বাক দর্শন অন্য আটটি ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। চার্বাকদের এই অধ্যাত্মবাদ-বিরোধী বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যার সাথে প্রাচীন ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতির পারস্পরিক ঘনিষ্ট সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনা পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা প্রসঙ্গে। চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হিউমের জ্ঞানবিদ্যা এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যায় হিউমের অবস্থান নির্ণয়ের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তৃতীয় অধ্যায়ের পরিকল্পনা। তাই পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসের প্রাচীন যুগে সোফিষ্টদের জ্ঞানবিদ্যা থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের হিউম-পূর্ববর্তী দার্শনিক জর্জ বার্কলে পর্যন্ত জ্ঞানবিদ্যাগত ধারার আলোচনার মধ্যেই এ অধ্যায়টি সীমাবদ্ধ। কিন্তু এ সময়কালও দু'হাজার বছরের বেশী। তাই এর ব্যাপকতা ও গভীরতার কারণে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এ তিনটি ভাগে বিভক্ত করে বিভিন্ন যুগে যেসব দার্শনিক জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন শুধুমাত্র তাদের জ্ঞানোৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যেই এর সীমা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ, এ অধ্যায়ে দু'হাজার বছরের পাশ্চাত্য জ্ঞানোৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, এ সময়ে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ স্পষ্টত বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদী ও বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতাবাদী এ দু'টি পরস্পর বিরোধী স্বতন্ত্র ধারাকে লালন করেছেন।

ইতিপূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে, চার্বাকগণ প্রাচীন ভারতে জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাবাদী ধারার প্রবর্তন করেন। তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় এ ধারাটিকেই সোফিষ্ট থেকে বার্কলে পর্যন্ত প্রবাহিত হতে দেখা যায়। পরবর্তীতে (চতুর্থ অধ্যায়ে) হিউম এ ধারারই যৌক্তিক ও সঙ্গতিপূর্ণ পরিণতি দান করেন।

প্রধানত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির ফলে আধুনিক যুগে বিশ্বতাত্ত্বিক আলোচনা বিজ্ঞানের হাতে অর্পিত হয়। ফলে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনাই হয়ে পড়ে দর্শনের প্রধান বিষয়। সম্ভবত এ কারণেই আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনাকে প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসাবে দেখা যায়। আধুনিক বৃটিশ দর্শনে এ আলোচনা এক বিশেষ রূপ লাভ করে। বিজ্ঞানের প্রভাবে তখন

Dhaka University Institutional Repository

দর্শনে নির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্মাণের দিকে দার্শনিকদের ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। নিউটনীয় বিজ্ঞানের প্রভাবে ফ্রান্সিস বেকন দর্শনে আরোহাত্মক পদ্ধতির প্রচলন করেন, যার মূলভিত্তি হল পর্যবেক্ষণ। জন লক ও জর্জ বার্কলে ফ্রান্সিস বেকনের পথ ধরেই অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদ প্রদান করার সাথে সাথে আরোহাত্মক পদ্ধতির ভিত্তিতে সার্বিক ও অনিবার্য জ্ঞানকে সম্ভব বলে দাবী করেন। কিন্তু হিউমের দর্শনে এসে এ ধারার বিশেষ পরিণতি দেখা যায়। হিউম অভিজ্ঞতাকে যথার্থ জ্ঞানোৎপত্তির একমাত্র মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করলেও আরোহ পদ্ধতিকে গ্রহণ করেন নি। তিনি পর্যবেক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন। পর্যবেক্ষণকে নির্ভর করে আরোহাত্মক পদ্ধতিতে সার্বিক জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়াকে তিনি সম্ভাব্য বা আকস্মিক হিসাবে আখ্যায়িত করেন। এর ফলে, তাঁর দর্শনে অভিজ্ঞতাবাদ সঙ্গতিপূর্ণ রূপ লাভ করে এবং যৌক্তিক পরিণতি হিসাবে তা সংশয়বাদে পর্যবসিত হয়। এ বিষয়টি নিয়েই হিউমের জ্ঞানবিদ্যা শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচনা। এছাড়া, চার্বাকদের মত হিউমও তাঁর অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে অন্যান্য দার্শনিক মতবাদকে আলোচনা করেছেন। তাই এ অধ্যায়ে তাঁর আত্মা সম্পর্কিত ধারণা, কার্যকারণ সম্পর্কিত মতবাদ ইত্যাদি আলোচনাও সন্নিবেশিত হয়েছে। সর্বোপরি হিউম তাঁর জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদ প্রদান করে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যায় এক বিশেষ অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁকে শুধু অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদের সঙ্গতিপূর্ণ পরিণতি দানকারী হিসাবে মূল্যায়ন করলেই যথেষ্ট নয় বরং তিনি বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান থেকে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে স্পষ্টভাবে আলাদা করে, আরোহ পদ্ধতিকে সম্ভাব্য জ্ঞানের পদ্ধতি হিসাবে অভিহিত করে এবং সর্বোপরি জ্ঞানের ক্ষেত্রে সংশয়বাদের কথা বলে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় কিছু মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। পরবর্তীকালের প্রধান প্রধান দার্শনিক মতবাদগুলোর কোনটিই হিউমের উত্থাপিত প্রশ্নকে তথা তাঁর জ্ঞানবিদ্যাগত অবস্থানকে অবজ্ঞা করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি (যা উপসংহারে আলোচিত হয়েছে)। তাই চতুর্থ অধ্যায়ে হিউমের জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদ আলোচনার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে তাঁর অবস্থান নির্ণয়েরও চেষ্টা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে চার্বাক ও হিউমের জ্ঞানবিদ্যার তুলনামূলক সমীক্ষা করা হয়েছে। প্রধানত দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা এবং চতুর্থ অধ্যায়ের হিউমের জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার ভিত্তিতেই পঞ্চম অধ্যায়ের তুলনামূলক সমীক্ষা। এ আলোচনা করতে গিয়ে উল্লিখিত দুই জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। এ থেকে দেখা যায় যে, চার্বাক ও হিউমের জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদের মধ্যে কিছু মৌলিক ধারণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য এবং এসব ধারণার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বৈসাদৃশ্য রয়েছে। এতে যে বিষয়টি নির্দেশিত হয় তা হল, চার্বাক নামক ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় সম্ভবত খ্রিষ্টপূর্ব একহাজার অব্দে যে জ্ঞানবিদ্যাগত ধারণাগুলোর প্রবর্তন করেন আড়াই হাজার বছর পরবর্তী পাশ্চাত্য দার্শনিক হিউম যেন সে ধারণাগুলোরই যুগোপযোগী ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের ব্যাখ্যার পার্থক্যের ক্ষেত্রে মূলত তাঁদের দেশ কাল ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রভাব পড়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দার্শনিক সমস্যাবলীর আলোচনার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। সমসাময়িক দেশ-কাল, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি এ ইতিহাসের গতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে কাজ করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে সমগ্র আলোচনার উপসংহার-এ একথা বলা হয়েছে যে, চার্বাক উদ্ভাবিত জ্ঞানবিদ্যার ধারাটি কালিক, দৈশিক ও নৃতাত্ত্বিক গণ্ডী অতিক্রম করে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় প্রবাহিত হয়ে হিউমের দর্শনে এসে পৌছায়। কিন্তু এখানেই এর শেষ নয়। বরং হিউম পরবর্তী উল্লেখযোগ্য দার্শনিক মতবাদের মধ্যেও এ ধারাটির সুস্পষ্ট প্রভাব বিরাজমান। আধুনিক ও সমকালীন দর্শনের ইতিহাসে বিভিন্ন মতবাদ, যেমন বিচারবাদ, উপযোগবাদ, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ, প্রয়োগবাদ, রূপতত্ত্ব বা অবভাসবাদ এবং বিশ্লেষণী দর্শনের উপর চার্বাক প্রতিষ্ঠিত এবং হিউম অনুসারিত অভিজ্ঞতাবাদেরই সুদূর প্রসারী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ, জন্মসূত্রে কোন দার্শনিককে তাঁর জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভৌগলিক গণ্ডী বা দেশ-কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ ও চিহ্নিত করা গেলেও তাঁর মতবাদকে এসব গণ্ডীর দ্বারা চিহ্নিত করা বা সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। বরং দার্শনিক মতবাদের আবেদন দেশকালোত্তীর্ণ।

এ অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে যে সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করা সম্ভব হয় নি তা হল চার্বাকদের রচিত গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতা। চার্বাক দর্শন সম্পর্কিত যে কোন গবেষণার ক্ষেত্রে এটি একটি সাধারণ সীমাবদ্ধতা। এ ক্ষেত্রে প্রধানত চার্বাক দর্শন সম্পর্কিত প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদির উপরই নির্ভর করতে হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে যথাসম্ভব মূল গ্রন্থাদির সাহায্য নেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এ অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থের উৎস হিসাবে যে সব গ্রন্থাগারের সাহায্য নেয়া হয়েছে তার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা; গণগ্রন্থাগার, ঢাকা; অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য গ্রন্থাগার, জগন্নাথ হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা; বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী, ঢাকা; রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগার, ঢাকা; গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ধানমণ্ডি, ঢাকা; সাভার কলেজ গ্রন্থাগার, সাভার, ঢাকা; সেমিনার, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য। এ সব গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতার জন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

এম. ফিল.-এর সমস্ত কোর্স সমাপ্ত করতে গিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমি অনেকের সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি। যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে আমার তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রফেসর কাজী নূরুল ইসলাম অন্যতম। তিনি সানন্দে এ কাজটি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হয়েই আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেন প্রধানত তাঁর মত একজন অভিজ্ঞ, সুদক্ষ, আন্তরিক ও যত্নশীল তত্ত্বাবধায়কের জন্যই আমি পূর্বাপর গভীর আগ্রহ ও উৎফুল্লতা নিয়ে কাজটি করতে পেরেছি। একজন গবেষকের গবেষণা কর্মকে যান্ত্রিকভাবে গ্রহণ না করে বরং তাঁর সামগ্রিক জীবনের অঙ্গ হিসাবে দেখার যে মহৎ দৃষ্টিভঙ্গি তিনি লালন করেন তা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার জন্য বিশেষ উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আনন্দের উৎস হিসাবে কাজ করেছে। অকৃত্রিম আন্তরিকতা, সংবেদনশীলতা ও সহযোগিতার জন্য তাঁর কাছে আমার অপরিশোধ্য ঋণের কথা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. পাঠ্যসূচী অনুযায়ী প্রথম পর্বে আমাকে চারখানা টেক্সট বই পড়তে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমার তত্ত্বাবধায়ক ছাড়াও এগুলোর উপর ক্লাশ নিয়েছেন বিভাগীয় শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর আবদুল মতীন, প্রফেসর আমিনুল ইসলাম ও প্রফেসর নীরুকুমার চাকমা। এ তিনজন অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ, সুদক্ষ, প্রজ্ঞাবান ও সুপণ্ডিত শিক্ষক কঠিন টেক্সটগুলোর বিভিন্ন বিষয়কে অত্যন্ত সহজ ও সরল করে প্রাঞ্জল ভাষায় যত্ন সহকারে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ ছাড়া, অভিসন্দর্ভ রচনার সময় যে কোন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সস্নেহে তাঁরা আমাকে তাঁদের মূল্যবান সময় দিয়েছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমি প্রত্যক্ষভাবে ঋণী।

বর্তমান বিভাগীয় প্রধান এবং আমার শিক্ষয়িত্রী শ্রদ্ধেয়া প্রফেসর হাসনা বেগম সব সময় আমার খোঁজ খবর নিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, তাগিদ দিয়ে এবং তাঁর অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ ও সস্নেহ সুপরামর্শ দিয়ে আমাকে ঋণী করেছেন। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আমরা শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর আবদুল জলিল মিয়া, জনাব জহুরুল হক, মিসেস আয়েশা সুলতানা, ডঃ আনিসুজ্জামান, মিসেস হোসনে আরা আলম, মিসেস লতিফা বেগম, ডঃ আজিজুন্নাহার ইসলাম, ডঃ গালিব আহসান খান, মিসেস রাশেদা খানম, মিসেস রওশন আরা, ডঃ মোঃ শাজাহান মিয়া, জনাব মতিউর রহমান, জনাব, এ. কে. এম. হারুনর রশীদ, এবং জনাব আ. জ. ম. সালেহসহ বিভাগীয় সকল শিক্ষকের কাছে আমি আমার সকৃতজ্ঞ ঋণ স্বীকার করছি। তাঁরা সকলেই আমাকে উৎসাহিত করে, তাগিদ দিয়ে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আলোচনার জন্য সময় দিয়ে সহায়তা করেছেন। দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ প্রদীপ কুমার রায়ের সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। অভিসন্দর্ভ রচনার সময় আলোচনার জন্য তিনি আমাকে যে পরিমাণে সময় ও শ্রম দিয়েছেন তা এক বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। ব্যক্তিগতভাবে সার্বক্ষণিক উৎসাহ উদ্দীপনা এবং তাগিদ দিয়েও তিনি আমাকে অপরিশোধ্য ঋণপাশে আবদ্ধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে দর্শন বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক বাংলাদেশের বিশিষ্ট ও খ্যাতিমান দার্শনিক অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ এবং জনাব সাইয়েদ আবদুল হাই-এর কাছেও আমার সকৃতজ্ঞ ঋণ শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করি। বহুবিষয়ে বহুবার তাঁরা তাঁদের প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ তাত্ত্বিক আলোচনা ও অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ প্রায়োগিক পরামর্শ দিয়ে, সর্বোপরি সস্নেহ উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন।

সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে দক্ষতা না থাকায় সংস্কৃত মূল গ্রন্থগুলো আলোচনার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ দিলীপ ভট্টাচার্য যথেষ্ট সময় দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও যারা আমাকে আলোচনার জন্য তাঁদের মূল্যবান সময় দিয়ে এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রফেসর রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রফেসর এস. পি. ব্যানার্জি, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বস্তুবাদী দার্শনিক ও চার্বাক দর্শনের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ

Dhaka University Institutional Repository

চট্টোপাধ্যায়, কানাডার গুয়েলফ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রফেসর ডগলাস ওডেগার্ড এবং আমেরিকার সাউদার্ণ মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ রোনাল্ড বার উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য যে, অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের সাথে কলিকাতায় তাঁর নিজের বাড়ীতে, ডঃ বার-এর সাথে আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো-তে ও ঢাকায়, এ ছাড়া অন্যেরা ঢাকায় এলে তাঁদের সাথে আমার আলোচনা করার সুযোগ হয়। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের সহযোগিতার কথা স্বীকার করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালি বিভাগের প্রফেসর পরেশ চন্দ্র মণ্ডল, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস ও জনাব আবুল কাশেম ফজলুল হক, মার্কেটিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হরিপদ ভট্টাচার্য, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ আবদুস সালাম নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রভাষক জনাব জসীম উদ্দীনের অনুপ্রেরণার কথাও কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। জগন্নাথ কলেজের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর সৈয়দ আবদুর রাজ্জাক, বর্তমান বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর এম. এ. রশীদ, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন খণ্ডকালীন ও ইডেন গার্লস কলেজের প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক জনাব আবদুল বারী এবং রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের প্রভাষক জনাব শরীফ হারুন-এর কাছেও আমি ঋণী। তাঁরা সকলেই আমাকে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও তাগিদ দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। জনাব এম. এ. রশীদ ও জনাব শরীফ হারুন আলোচনার জন্য সময় দিয়েও আমাকে ঋণী করেছেন।

এ ছাড়াও আমি অনেকের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা পেয়েছি। পরিসরের স্বল্পতার কারণে তাঁদের সকলের নাম লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হল না। তথাপি যাদের নাম উল্লেখ না করলেই নয় তাঁদের মধ্যে সাভার কলেজের অধ্যক্ষ সাদ্ জগলুল ফারুক, প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগের প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক দীপক রায়, উপাধ্যক্ষ ইলিয়াস খান, দর্শন বিভাগের প্রধান ও সহকারী অধ্যাপক আজহারুল ইসলাম, প্রভাষক জনাব মঞ্জুর আলম খান, মিজানুল ইসলাম ও রেজাউল করিম সিদ্দীক, গ্রন্থাগারিক জনাব ইলিয়াস হোসেন, বন্ধু রূপকুমার ভৌমিক, মানিক বোস, অনুপকুমার অবস্তি, রজত গুপ্ত, ফরিজ আলী, ফয়জুল হক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগের অনুজপ্রতীম গবেষক আখতার সোবহান মাশরুর অন্যতম। আমার অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে, তাগিদ দিয়ে, নির্বিঘ্নে কাজের পরিবেশ সৃষ্টিতে বিভিন্ন দিক থেকে সাহায্য করে এরা সকলে আমাকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

আমার স্বর্গীয় পিতা কৃপাসিন্ধু দাস ও পিতৃতুল্য কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের বাংলা বিভাগের তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান ও প্রফেসর মরহুম কাজী নূরুল ইসলাম, যাঁদের প্রেরণা, তাগিদ ও ত্যাগ আমাকে এ কাজে যোগদান করতে অনেকটা বাধ্য করেছিল, তাঁরা দু'জনেই এর শেষ না দেখে মহাপ্রস্থানের পথে গমন করেছেন। তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ চিরকাল অপরিশোধ্য থাকবে। আমার মা তরঙ্গবালা দাস এবং একমাত্র অনুজ কৃষ্ণ প্রসন্ন দাসের ত্যাগ ও শুভাকাঙ্খার কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

আমার স্ত্রী, যার সার্বিক সহযোগিতা ও ত্যাগ এ কাজ সমাপ্ত করতে অশেষ সহায়তা করেছে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তাঁর অবদানকে খাটো করতে চাই না।

বিভাগীয় সহকারী গোলাম মোস্তফা, মোহাম্মদ সেলিম ও মুমিনুল ইসলাম বিভিন্ন কাজে আন্তরিক সহযোগিতা করায় তাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ অভিসন্দর্ভ সযত্নে খসড়া টাইপ করা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজে আমাকে আন্তরিকভাবে সহায়তা করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সহকারী পানু গোপাল পালের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। বাংলা একাডেমীর উৎপাদন কর্মকর্তা জনাব আফজল হোসেনের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। অভিসন্দর্ভটি অত্যন্ত অল্প সময়ে সংশোধন ও প্রিন্ট করে দেয়ার জন্য নীলা কম্পিউটার পয়েন্ট এর স্বত্বাধিকারী জনাব কামালউদ্দিন আহমদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(কালী প্রসন্ন দাস)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যা

দার্শনিক চিন্তার ব্যাপকতা ও গভীরতার জন্য প্রাচ্য দর্শনে ভারতীয় দর্শন একটি অনন্য স্থান দখল করে আছে। বিশেষত জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার ক্ষেত্রে ভারতীয় দার্শনিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ভারতীয় দর্শনের সবক'টি সম্প্রদায়ই জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার উপর অপরিহার্য-গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[১] এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই অধিবিদ্যার আলোচনা জ্ঞানবিদ্যার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ভারতীয় দার্শনিকদের আলোচনা রীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পূর্বপক্ষ, পূর্বপক্ষ-খণ্ডন ও উত্তর পক্ষ। এ বৈশিষ্ট্যের কারণে কোন কোন দার্শনিক সম্প্রদায় তাঁদের পূর্ববর্তী দার্শনিক সম্প্রদায়ের জ্ঞানবিদ্যা আংশিক বা পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন আবার কোন কোন সম্প্রদায় পূর্ববর্তী মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করে নিজস্ব মতবাদ প্রদান করেছেন। এভাবেই জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা ভারতীয় দার্শনিকদের অপরিহার্য আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার ধারা পর্যালোচনা করলে ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কারণ, সব পাশ্চাত্য দার্শনিকই ভারতীয় দার্শনিকদের মত জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার উপর অপরিহার্য-গুরুত্ব আরোপ করেন নি। এমন কি প্রাচীন যুগে প্লেটো-পূর্ব গ্রীক দার্শনিকগণ বিশ্বতত্ত্বের আলোচনাকে মুখ্য হিসাবে বিবেচনা করেছেন এবং তাঁদের অনেকেই জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা থেকে বিরত থেকেছেন। বস্তুত সোফিষ্টদের হাতেই পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানবিদ্যাগত প্রশ্নের সূচনা।[২] অর্থাৎ, দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসাবে মর্যাদা লাভের জন্য পাশ্চাত্যে জ্ঞানবিদ্যাকে এক হাজার বছরেরও বেশী সময় বা সোফিষ্টদের কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে যা ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে করতে হয় নি। তথাপিও একথা বলা যায় যে, ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার ধারাবাহিক আলোচনা পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ধারাবাহিক আলোচনার চেয়ে জটিলতর। ভারতীয় দার্শনের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের ব্যাখ্যায় এ জটিলতার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর মতে, যে ধরন অনুসারে ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস রচিত হয়েছে সে ধরন অনুসারে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস রচনা খুব কমই সম্ভব বলে মনে হয়।[৩] কেননা পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যে সুবিধাটি পাওয়া যায় ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস রচনায় সে সুবিধা অনুপস্থিত। দর্শনের ইতিহাসের প্রাথমিক কাল থেকেই ইউরোপে একের পর এক দার্শনিকের আবির্ভাব হয়েছে এবং তাঁরা তাঁদের মতবাদ প্রকাশ করেছেন। একজন আধুনিক ঐতিহাসিক সহজেই এসব মতবাদকে কালক্রম অনুসারে সাজিয়ে একটি গোষ্ঠীর মতবাদ অন্য গোষ্ঠীকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে অথবা দার্শনিক চিন্তার ধারায় এসব মতবাদ বিভিন্ন সময়ে সাধারণভাবে কি পরিবর্তন সাধন করেছিল তা পর্যালোচনা করতে পারেন। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে প্রধান দার্শনিক সম্প্রদায়গুলোর উৎপত্তিকাল সম্পর্কে পর্যাপ্ত কোন প্রামাণিক দলিল না থাকায় এদের উৎপত্তিকাল সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এমনকি এসব দার্শনিক সম্প্রদায় কিভাবে বা কিসের প্রভাবে গড়ে উঠেছে তাও সঠিকভাবে বলা কষ্টসাধ্য। এছাড়া সূত্রাকারে রচিত তাঁদের দার্শনিক মতবাদগুলোর স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া ছিল না। সেহেতু পরবর্তীকালে প্রায় সবক্ষেত্রেই এগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যার জন্য বিভিন্ন ভাষ্য রচিত হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই ভাষ্যকারগণ একই সূত্রের অর্থ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন, এমনকি কখনো কখনো পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন। এসব কারণে ভারতীয় দর্শনের সবক'টি সম্প্রদায় জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য দার্শনিকদের জ্ঞানবিদ্যার ধারাবাহিক আলোচনার ক্ষেত্রে যে সুবিধাটি পাওয়া যায় ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। তাই এখানে ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা-রীতি অনুসরণ না করে স্বতন্ত্র রীতি অনুসরণ করা হল।

ভারতীয় দর্শনের সকল সম্প্রদায়ই জ্ঞানের জন্য জ্ঞাতা, জ্ঞেয়বস্তু ও জ্ঞানের উৎসকে স্বীকার করেছেন। ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যায় জ্ঞাতাকে প্রমাতৃ, জ্ঞেয় বস্তুকে প্রমেয়, যথার্থ জ্ঞানকে প্রমা[৪] এবং যর্থার্থ জ্ঞানের উৎসকে প্রমাণ নামে অভিহিত করা হয়েছে। ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যা প্রধানত প্রমাণকেন্দ্রিক আলোচনা। তাই এখানে প্রধানত প্রমাণতত্ত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেই ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা করা হল। বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় বিভিন্ন প্রমাণের কথা বলেছেন। এর মধ্যে ভাট্ট-মীমাংসা ও বেদান্ত জ্ঞানবিদ্যায় সর্বাধিক সংখ্যক অর্থাৎ ছয়টি প্রমাণের কথা বলা হয়েছে। এগুলো হল, প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি। জৈন জ্ঞানবিদ্যাও ছয়টি প্রমাণকে স্বীকার করে। কিন্তু জৈন দার্শনিকগণ এসব প্রমাণের স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায় ভাট্ট-মীমাংসা ও বেদান্ত নির্দেশিত সবগুলো প্রমাণকে স্বীকার করেননি। তবে কোন কোন সম্প্রদায় এসব প্রমাণের কোন কোনটিকে হুবহু স্বীকার করে নিয়েছেন আবার কোন কোন সম্প্রদায় এগুলোর কোন কোনটিকে স্বীকার করে নিয়ে এদের নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু কোন সম্প্রদায়ই এর চেয়ে বেশী সংখ্যক প্রমাণের কথা বলেননি। তাই আলোচনার সুবিধার্থে এখানে প্রথমে মীমাংসা ও বেদান্ত প্রমাণতত্ত্ব আলোচনা করে তারপর অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রমাণতত্ত্ব আলোচনা করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

১.১ মীমাংসা জ্ঞানবিদ্যা

মীমাংসা দার্শনিক সম্প্রদায়ই ভারতীয় দর্শনে আস্তিক ধারার সবচেয়ে কট্টর প্রবক্তা। তাঁরা বৈদিক ভাবধারাকে চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈনদের বিরোধিতার প্রভাব থেকে পুনরুদ্ধার করে সুবিন্যস্ত ও যৌক্তিক রূপ দিয়ে ভারতীয় মননে এর পুনঃপ্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হন। এ দর্শন বেদের কর্মকাণ্ডে বর্ণিত ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে।[৫] মীমাংসা জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় প্রমা, প্রমাণ, সত্যতার মানদণ্ড, ভ্রমের লক্ষণ ইত্যাদি সমস্যাগুলো গুরুত্ব পেয়েছে। তবে এর মধ্যে প্রমাণতত্ত্বই প্রধান।

মীমাংসা দার্শনিকের মতে আত্মাই হল জ্ঞাতা। প্রত্যক্ষ এবং অনুমানসহ অন্য সকল প্রকার জ্ঞানই অনিবার্যভাবে আত্মার বা জ্ঞাতার মধ্যে সরাসরি উদ্ভূত হয়। যে জ্ঞান পূর্ব-অজ্ঞাত কোন বিষয় বা বস্তুর যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করে এবং তা এর কোন অংশের সাথে স্ববিরোধী নয় সে জ্ঞানকেই মীমাংসা দর্শনে যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা বলা হয়। যথার্থ জ্ঞানলাভের পদ্ধতি বা প্রমাণ সম্পর্কে মীমাংসা দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। মীমাংসা দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা জৈমিনির মতে প্রমাণ তিন প্রকার ঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। জৈমিনির *মীমাংসাসূত্র* গ্রন্থের প্রখ্যাত ভাষ্যকার কুমারিল ভট্টের মতে প্রমাণ ছয় প্রকার ঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি।[৬] কিন্তু কুমারিল ভট্টের শিষ্য, মীমাংসা দর্শনের অন্যতম ভাষ্যকার প্রভাকর মিশ্র কুমারিল ভট্ট নির্দেশিত অনুপলব্ধিকে প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করেননা। তাঁর মতে, প্রমাণ পাঁচ প্রকার ঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান এবং অর্থাপত্তি। এখানে মীমাংসা দর্শনের সবক'টি প্রমাণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কুমারিল ভট্ট প্রদত্ত অনুপলব্ধিসহ ছয় প্রকার প্রমাণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।[৭]

(১) **প্রত্যক্ষ ঃ** জৈমিনি অস্তিত্বশীল বস্তুর সাথে ইন্দ্রিয়ের[৮] সঠিক সংযোগের[৯] ফলে আত্মায় যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকেই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বলেছেন। বস্তুর সাথে ইন্দ্রিয়ের সঠিক সংযোগে বৈধ বা যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যখন সঠিক সংযোগ ঘটে না তখন যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। 'সঠিক সংযোগ' বলতে কুমারিল ভট্ট বস্তুর সাথে ইন্দ্রিয়ের ত্রুটিহীন সংযোগকেই বুঝিয়েছেন। ইন্দ্রিয়ের সাথে বস্তুর ত্রুটিপূর্ণ সংযোগই ভ্রান্তি বা অধ্যাসের জন্ম দেয়।[১০] জ্ঞান উৎপত্তির সময় আত্মা মন নামক অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ের সাথে সম্পর্কিত হয়। মন বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত হয় এবং বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাথে বাহ্য বস্তুর সঠিক সংযোগ ঘটে। এ মতানুসারে বর্তমানে যে বস্তু অস্তিত্বশীল এবং ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়াশীল সে বস্তুই প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন করতে পারে। অতীত বা ভবিষ্যতের কোন বস্তু, যা বর্তমানে অস্তিত্বশীল নয় তা ইন্দ্রিয়ের উপর কাজ করতে পারে না। তাই এগুলো প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন করতে অক্ষম। সুতরাং প্রত্যক্ষ দ্বারা কেবল বর্তমানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর জ্ঞান পাওয়া যায়, অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান পাওয়া যায়না।[১১]

প্রভাকর মিশ্র প্রত্যক্ষকে সাক্ষাৎ প্রতীতি অর্থাৎ সাক্ষাৎ জ্ঞান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাঁর মতে, প্রত্যক্ষ দ্বারা বস্তু, আত্মা ও জ্ঞানকে সংযুক্ত করা হয়। একটি বস্তুকে যখন প্রত্যক্ষ করা হয় তখন আত্মা, জ্ঞান এবং বস্তু এ তিনটি বিষয়ই প্রত্যক্ষিত হয়। একে প্রভাকরের ত্রি-প্রত্যক্ষণ নীতি বলে।[১২] ইন্দ্রিয় সংযোগের বিষয়বস্তু অনুসারে দ্রব্য, গুণ এবং সার্বিকেরও প্রত্যক্ষণ হতে পারে।[১৩] আত্মার সাথে সম্পর্কিত হয় বলে সব ধরনের জ্ঞানই প্রত্যক্ষের শ্রেণীভূক্ত বলে গণ্য হতে পারে।[১৪]

প্রত্যক্ষের শ্রেণী বিভাগ ঃ কুমারিল ভট্ট ও প্রভাকর মিশ্র উভয়ই প্রত্যক্ষের দু'টি স্তরকে স্বীকার করেন। এ দু'টি স্তর হল, নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের প্রকৃতির ভিন্নতার প্রেক্ষিতে এ বিভাগ করা হয়।

নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ ঃ বস্তুর সাথে ইন্দ্রিয়ের প্রথম সংযোগে যে প্রত্যক্ষ ঘটে তাকেই ঐ বস্তুর নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ বলে। কুমারিল ভট্ট নির্বিকল্প প্রত্যক্ষকে বস্তু সম্পর্কিত সরল অনুভূতি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন। এতে বস্তুর বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা জাতিগত বৈশিষ্ট্যের অনুভূতি জন্মে না। কেবলমাত্র স্বতন্ত্র বস্তুর অনুভূতি জন্মে।[১৫] প্রভাকর মিশ্র নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ বলতে বস্তুর প্রকৃতির অনুভূতিকে বুঝান।[১৬] তাঁর মতে, ইন্দ্রিয় ও বস্তুর সংযোগের ফলে বস্তুর অস্তিত্ব বহনকারী একটি দ্রব্য, একটি গুণ এবং একটি জাতি অনুভূত হয়। তবে এদের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তা অনুভূত হয় না। এছাড়া এতে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বহির্ভূত কোন কিছু প্রত্যক্ষিত হয় না। এক কথায়, নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে বিশেষ ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষিত হয় কি না এ সম্পর্কে কুমারিল ভট্ট ও প্রভাকর মিশ্রের মধ্যে মতদ্বৈততা থাকলেও উভয়েই এ বিষয়ে একমত যে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে বিশেষ ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য বলে চেনা যায় না। কারণ, বিশেষ ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য হিসাবে অনুভূত হওয়ার জন্য যে প্রত্যাভিজ্ঞা দরকার তা নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে অনুপস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

সবিকল্প প্রত্যক্ষ : কুমারিল ভট্ট কোন বস্তুর জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে জাতিগত এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ বা স্বতন্ত্র হিসাবে উপলব্ধি করাকে সবিকল্প প্রত্যক্ষ বলেন। সবিকল্প প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষিত বস্তুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ও সাদৃশ্যহীন উভয় প্রকার বস্তুর প্রত্যাভিজ্ঞাজাত উপাদানও ধারণ করে। এতে একটি বস্তু এবং এর জাতিগত ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে কর্তা ও কর্ম সম্পর্কে সম্পর্কিত করে উপলব্ধি করা হয়।[১৭] প্রভাকর মিশ্র সবিকল্প প্রত্যক্ষের যে প্রকৃতি বর্ণনা করেন তা কুমারিল ভট্ট বর্ণিত সবিকল্প প্রত্যক্ষের প্রকৃতির অনুরূপ। মীমাংসা ভাষ্যকার পার্থসারথী মিশ্রের মতে, নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ ছাড়া সবিকল্প প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। কুমারিল ও প্রভাকর নির্বিকল্প ও সবিকল্প উভয় প্রকার প্রত্যক্ষকে বৈধ হিসাবে স্বীকৃতি দেন। তাঁদের উভয়ের মতে, এদু'টো প্রত্যক্ষই স্বতপ্রামাণ্য।

(২) **অনুমান :** জৈমিনি সূত্রের খ্যাতনামা ভাষ্যকার শবরস্বামী অনুমানের সংজ্ঞা দিয়ে বলেন যে, প্রত্যক্ষিত কোন বস্তু থেকে এ বস্তুর সাথে স্থায়ী বা নিয়ত ঐক্য সম্পর্কের জ্ঞানের ভিত্তিতে অপ্রত্যক্ষিত কোন বস্তুর জ্ঞানকে অনুমান বলে।[১৮] স্থায়ী ঐক্য সম্পর্কের জ্ঞানই হল অনুমানে ভিত্তি। এ সম্পর্ককে ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যায় ব্যাপ্তি[১৯] বলে। কুমারিল ভট্ট শবরস্বামী প্রদত্ত অনুমানের সংজ্ঞাকে গ্রহণ করেন। শবরস্বামী প্রদত্ত সংজ্ঞার ভিত্তিতে কুমারিল ভট্ট এটা দেখাতে চেষ্ট করেন যে, যখন বহুসংখ্যক ঘটনার ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় বা বস্তু (যেমন,ধোঁয়া ও অগ্নি) একটি তৃতীয় বস্তুর মধ্যে (যেমন, পাকশালা) স্বাধীন সম্পর্কের মাধ্যমে বিদ্যমান থাকে শুধুমাত্র তখনই অনুমান সম্ভব হয়। "স্বাধীন সম্পর্ক" বলতে কুমারিল ভট্ট সে সম্পর্ককে বুঝান যে সম্পর্কের কারণে এদের একত্রে অবস্থান অন্য কোন শর্তের বা উপাদানের উপর নির্ভর করে না।

প্রভাকর শবরস্বামী প্রদত্ত অনুমানের সংজ্ঞার সাথে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি অনুমানকে একটি উদ্দেশ্যের মধ্যে এমন একটি বিধেয়ের জ্ঞান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন যার সাথে অন্য কোন জ্ঞানের বিরোধিতার সম্পর্ক নাই। উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যকার ঐক্য সম্পর্কের ভিত্তিতে কোন একটি চিহ্ন বা কারণ অর্থাৎ লিঙ্গকে প্রত্যক্ষ করাই হল এ জ্ঞানের ভিত্তি।[২০] অপরিবর্তনীয় সম্পর্কের উপরই অনুমান-প্রমাণ নির্ভর করে। এ অপরিবর্তনীয় সম্পর্ককে মানসিক প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায়। কুমারিল ভট্টের মত প্রভাকর মিশ্রও অনুমানের জন্য দু'টি বস্তুর বা বিষয়ের মধ্যে স্থায়ী ঐক্য সম্পর্কের কথা স্বীকার করেন। তবে এ দু'টি বিষয়ের সম্পর্ক যে একটি তৃতীয় বস্তুর সাথে সম্পর্কের মধ্যে অবস্থান করে এ বিষয়টির উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন নি।

অনুমানের শ্রেণী বিভাগ : মীমাংসা দর্শনে অনুমানকে ভিন্ন দু'টি দৃষ্টিকোন থেকে মোট চার ভাগে বিভক্ত করা হয়। অনুমানের বিষয়বস্তুর প্রকৃতির ভিন্নতার ভিত্তিতে মীমাংসা অনুমান দুই প্রকারঃ প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসম্বন্ধ এবং সামান্যতোদৃষ্টসম্বন্ধ। আবার অনুমান কর্তার উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে মীমাংসা অনুমান দুই প্রকারঃস্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান।

প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসম্বন্ধ এবং সামান্যতোদৃষ্টসম্বন্ধ অনুমান : অনুমানের বিষয়বস্তুর প্রকৃতির ভিন্নতার ভিত্তিতে শবরস্বামী দুই প্রকার অনুমানের কথা বলেন। যথা, প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসম্বন্ধ এবং সামান্যতোদৃষ্টসম্বন্ধ অনুমান। কুমারিল ভট্ট এ দুই প্রকার অনুমানকে যথাক্রমে দৃষ্টস্বলক্ষণবিষয় এবং অদৃষ্টস্বলক্ষণবিষয় বলে অভিহিত করেন। প্রভাকর মিশ্র আবার এগুলোকে যথাক্রমে দৃষ্টস্বলক্ষণ এবং অদৃষ্টস্বলক্ষণ অনুমান বলেন।[২১] প্রথম ক্ষেত্রে দু'টি মূর্ত বা প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুর মধ্যে নিয়ত সম্পর্কের ভিত্তিতে অনুমান করা হয়। যেমন, আগুন ও ধোঁয়ার মধ্যকার অনুমান। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার অনুমানের ক্ষেত্রে একটি প্রত্যক্ষযোগ্য এবং একটি অপ্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুর মধ্যে নিয়ত সম্পর্কের ভিত্তিতে অনুমান করা হয়। যেমন, আকাশে সূর্যের অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে সূর্যের গতির অনুমান । মূলত দ্বিতীয় প্রকার অনুমানে দু'টো মূর্ত বস্তুর মধ্যে নিয়ত সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় না বরং দু'টো সাধারণ ধারণার মধ্যে নিয়ত সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। কারণ অবস্থান পরিবর্তন ও গতির নিয়ত সম্পর্ক, মূলত দু'টি সাধারণ ধারণার মধ্যকার নিয়ত সম্পর্ক, মর্ত বস্তুর মধ্যকার সম্পর্ক নয়। প্রভাকর মিশ্র অবস্থান পরিবর্তনকে প্রত্যক্ষযোগ্য এবং গতিকে অপ্রত্যক্ষযোগ্য বলে মনে করেন।[২২]

স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান : অনুমান কর্তার উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে প্রভাকর মিশ্র অনুমানকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। জ্ঞাতা নিজের জন্য তত্ত্ব নিশ্চয়ার্থে যে অনুমান করেন তা স্বার্থানুমান এবং অপরকে বুঝাবার জন্য যে অনুমান করেন তা পরার্থানুমান। উভয় প্রকার অনুমানই প্রতিজ্ঞা হেতু ও উদাহরণ এ তিনটি বাক্য বা অবয়ব দ্বারা গঠিত। এতে তিনটি পদ থাকে। যথা, সাধ্য, পক্ষ ও হেতু বা মধ্য পদ।

(৩) **শব্দ :** কোন বাক্য যেসব শব্দ দ্বারা গঠিত হয় সেসব শব্দের অর্থ অনুধাবন করার ফলে ঐ বাক্য থেকে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাকে শব্দ-জ্ঞান বলে। কুমারিল ভট্ট অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞানকে শব্দ-জ্ঞান বলেন। বাক্য থেকে এ জ্ঞান পাওয়া যায়। বাক্য গঠনকারী শব্দ সমূহের অর্থ উপলব্ধির উপর এ জ্ঞান নির্ভর করে।[২৩] প্রভাকর মিশ্র শব্দ-জ্ঞানকে অক্ষর দ্বারা গঠিত শব্দাবলীর জ্ঞানের ভিত্তিতে পাওয়া অতীন্দ্রিয় জ্ঞান হিসাবে বর্ণনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দের শ্রেণী বিভাগ : কুমারিল ভট্ট শব্দকে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করেন। যথা, মানবীয় এবং অতিমানবীয়। মানবীয় শব্দ হল বিশ্বস্ত ব্যক্তির বচন। এ জাতীয় শব্দ-জ্ঞানের বৈধতা নির্ভর করে বাক্য উচ্চারণকারী ব্যক্তির-বিশ্বস্ততার উপর। অতিমানবীয় শব্দ হল বেদের বচন। এর বৈধতা স্বতপ্রমাণিত। সুতরাং উভয় প্রকার শব্দই বৈধ জ্ঞান দান করে। কুমারিল ভট্ট মানবীয় ও অতিমানবীয় এ দুই প্রকার শব্দের কথা বললেও প্রভাকর মিশ্র মানবীয় শব্দকে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। কেননা, কোন ব্যক্তি যে বচন উচ্চারণ করে তার বৈধতা নির্ভর করে ঐ ব্যক্তির চরিত্রের বিশ্বস্ততার উপর। অন্য কথায়, চরিত্রের বিশ্বস্ততার বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে বচনের বিশ্বস্ততা অনুমিত হয়। এখানে ব্যক্তির জ্ঞান হল কারণ এবং উচ্চারিত বাক্য হল কার্য। কারণ থেকে কার্য অনুমিত হয়। এজন্য মানবীয় শব্দ অনুমানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বৈদিক ধর্মগ্রন্থের জ্ঞান অনুমিতভাবে বৈধ নয় বরং স্বতপ্রমাণিত ভাবে বৈধ। তাই তাঁর মতে, ধর্মগ্রন্থের শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ-জ্ঞান নাই।[২৪]

(৪) **উপমান বা তুলনা :** প্রভাকর মিশ্র উপমান বা তুলনাকে কোন প্রত্যক্ষিত বস্তুর সাথে স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত বস্তুর সাদৃশ্যজ্ঞান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন।[২৫] যেমন, পূর্বে দেখা কোন গরুর স্মৃতির সাথে বর্তমানে বনে দেখা গরু-সদৃশ প্রাণীকে 'গবয়' বলে চিনতে পারাই হল উপমান। প্রভাকর মিশ্র প্রদত্ত উপমানের সংজ্ঞা কুমারিল ভট্ট প্রদত্ত সংজ্ঞার সাথে প্রায় অভিন্ন। উপমান সম্পর্কে কুমারিল ভট্ট ও প্রভাকর মিশ্রের মতের মধ্যে যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে তাহল, কুমারিল ভট্টের মতে, যে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে উপমান-জ্ঞান লাভ করা যায় সে সাদৃশ্য একাধিক বস্তুতে অবস্থিত একই রকম গুণাবলী থেকে গঠিত হয়। অন্যদিকে প্রভাকর মিশ্র এ সাদৃশ্যকে একটি স্বতন্ত্র প্রকার (category) হিসাবে গণ্য করেন।[২৬]

উপমান কেন স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে গণ্য হয় এর পক্ষে মীমাংসা দার্শনিকগণ যুক্তি উপস্থাপন করেন। তাঁদের মতে, উপমান প্রত্যক্ষ নয়, কারণ এতে পূর্বজ্ঞাত বস্তুটি জ্ঞানোৎপত্তির সময় অনুপস্থিত থাকে। উপমান স্মৃতিও নয়, কারণ বর্তমান বস্তুর সাদৃশ্য পূর্বজ্ঞাত নয়। ব্যক্তিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল না হওয়ায় তা অনুমানও নয়। আবার বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচন নয় বলে তা শব্দও নয়। তাই উপমান স্বতন্ত্র প্রমাণ।

(৫) **অর্থাপত্তি :** অর্থাপত্তি-প্রমাণ হল মীমাংসাদর্শনে স্বীকৃত একটি নতুন প্রমাণ। শবরস্বামী অর্থাপত্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, প্রত্যক্ষিত বস্তুর অসঙ্গতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য যখন কোন অপ্রত্যক্ষিত বস্তুর পূর্ব-ধারণা করা হয় তখন তাকে অর্থাপত্তি বলে।[২৭] যেমন, যদি আমরা জানি যে দেবদত্ত জীবিত অথচ যদি প্রত্যক্ষ করি যে সে তার বাড়ীতে অনুপস্থিত তবে দু'টি বিষয়ের মধ্যে যে অসঙ্গতি উৎপন্ন হয় তা সমাধানের জন্য বাড়ীর বাইরে দেবদত্তের অস্তিত্বের ধারণা করি। এ ধারণাই অর্থাপত্তি। কুমারিল ভট্ট শবরস্বামীর এ ব্যাখ্যার সাথে একমত পোষণ করেন।

অর্থাপত্তি সম্পর্কে কুমারিল ভট্ট ও প্রভাকর মিশ্রের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। প্রভাকর মিশ্রের মতে অর্থাপত্তির মধ্যে সন্দেহের উপাদান বর্তমান। কিন্তু কুমারিল ভট্টের মতে অর্থাপত্তির মধ্যে সন্দেহের কোন উপাদান নাই। প্রভাকর মিশ্রের মতে দেবদত্ত জীবিত অথচ বাড়ীতে অনুপস্থিত দেখে আমাদের মনে সন্দেহ জাগে। এ সন্দেহ নিরসনের জন্য আমরা যে পূর্ব ধারণা করি তা দেবদত্তের জীবিতাবস্থা ও তার বাড়ীতে অনুপস্থিতির মধ্যকার সন্দেহ নিরসন করে। প্রভাকর মিশ্রের মতে অর্থাপত্তিতে সন্দেহের যে উপাদান থাকে তাই তাকে অনুমান থেকে পৃথক করে। কেননা অনুমানে সন্দেহ নাই।

কুমারিল ভট্ট মনে করেন অর্থাপত্তিতে সন্দেহের উপাদান অনুপস্থিত। তাঁর মতে,আমরা দেবদত্তকে তার বাড়ীতে প্রত্যক্ষ করি না। অথচ এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত যে সে জীবিত। এ দু'টি জ্ঞাত এবং সন্দেহহীন বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য আমরা বাড়ীর বাইরে দেবদত্তের উপস্থিতির পূর্ব ধারণা করি। যদি দেবদত্ত জীবিত এ জ্ঞান সন্দেহজনক হত তবে তা পূর্ব ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারত না।[২৮]

সাম্প্রতিক কালে, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস রচয়িতা এবং বিশিষ্ট ভারতীয় দর্শন বিশেষজ্ঞ যদুনাথ সিন্‌হা প্রভাকর মিশ্রের সাথে দ্বিমত পোষণ করে এবং কুমারিল ভট্টের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বলেন যে, দেবদত্তের জীবিতাবস্থা সম্পর্কে যদি সন্দেহ থাকে তবে তার গৃহে অনুপস্থিতির পূর্ব ধারণা করা যায় না। কেবলমাত্র তার জীবিতাবস্থা নিশ্চিত হলেই গৃহে তার অনুপস্থিতি সম্পর্কে পূর্ব ধারণা করা যায়।[২৯]

যদিও অর্থাপত্তি অনুমানের মতই পূর্ব ধারণার উপর নির্ভরশীল তবুও ব্যাপ্তি জ্ঞান নির্ভর নয় বলে তা অনুমান নয়। এছাড়া অনুমানে দু'টো বিষয়ের মধ্যে কোন অসঙ্গতি থাকে না। কিন্তু অর্থাপত্তিতে দু'টো জানা বিষয়ের মধ্যে অসঙ্গতি থাকে। এবং এ অসঙ্গতি নিরসনের জন্যেই পূর্ব ধারণা করা হয়। কিন্তু অনুমানকে পূর্ব ধারণা বলা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাপত্তির শ্রেণী বিভাগ : অর্থাপত্তি দু'প্রকার। যথা, দৃষ্টার্থাপত্তি ও শ্রুতার্থাপত্তি। দৃষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন বিরোধিতার মধ্যে সামঞ্জস্য করার জন্য যে অদৃষ্ট বিষয়ের কল্পনা করা হয় তাকে দৃষ্টার্থাপত্তি বলে। যেমন, দেবদত্ত জীবিত অথচ বাড়ীতে অনুপস্থিত থাকায় যখন দেবদত্ত বাড়ীর বাইরে আছে বলে ধারণা করা হয় তখন তা দৃষ্টার্থাপত্তি। অন্যদিকে শ্রুত কোন শব্দের অর্থ সহজে উপলব্ধি করা না গেলে যে অর্থান্তর কল্পনা আবশ্যক হয় তাকে শ্রুতার্থাপত্তি বলে। যেমন, কথোপকথনের সময় একব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বললঃ শেষ কর। তখন প্রথম ব্যক্তির বক্তব্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য শেষোক্ত ব্যক্তি 'কথা, 'কাজ' এ জাতীয় শব্দের কল্পনা করে নেয়। এটাই শ্রুতার্থাপত্তি।

(৬) **অনুপলব্ধি :** উপরোক্ত পাঁচ প্রকার প্রমাণ ছাড়াও কুমারিল ভট্ট আরও একটি প্রমাণকে স্বীকার করেন যাকে অনুপলব্ধি বলা হয়। শবরস্বামীর মতে, যে বস্তু ইন্দ্রিয়ের নিকট অস্তিত্বশীল নয় সে বস্তুর অস্তিত্বহীনতার জ্ঞানই অনুপলব্ধি।[৩০] তিনি এ জ্ঞানকে যে কোন প্রকার বৈধ জ্ঞানের অনুপস্থিতি হিসাবে উপস্থাপিত করেন। কুমারিল ভট্টও শবরস্বামীর সাথে একমত। তিনি প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান ও অর্থাপত্তি দ্বারা বস্তুর অনস্তিত্বের যে জ্ঞান পাওয়া যায় না সে জ্ঞানকেই অনুপলব্ধি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন। তাঁর মতে, অনস্তিত্বের জ্ঞান কেবল যথার্থ অনুপলব্ধি থেকে জানা যায়। তাই একে যোগ্যানুপলব্ধি বলে। এটা বৈধ জ্ঞানের স্বতন্ত্র উপায়। উল্লেখ্য, যে অবস্থায় যে বস্তু প্রত্যক্ষিত হয় সে অবস্থায় সে বস্তু প্রত্যক্ষিত না হলেই তার অভাব আছে বলা যায়। সুতরাং অনস্তিত্বের জ্ঞান অনুপলব্ধির মাধ্যমেই আসে।

শবরস্বামী ও কুমারিল ভট্ট অনুপলব্ধিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করলেও প্রভাকর মিশ্র অনুপলব্ধিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না। তিনি অনস্তিত্বকে কোন তত্ত্বগত সত্তা হিসাবে স্বীকৃতি দেন না এবং একে জানার জন্য অনুপলব্ধিকে একটি আলাদা প্রমাণ বলেও মনে করেন না। তাঁর মতে, সকল প্রকার বৈধ জ্ঞানই বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত। অনুপলব্ধির কোন স্বতন্ত্র বস্তু নাই। সুতরাং এটা জ্ঞানের কোন স্বতন্ত্র উপায় নয়। তাই অনুপলব্ধি স্বতন্ত্র প্রমাণ নয়।[৩১]

জ্ঞানের প্রামাণ্য : মীমাংসা দর্শনে জ্ঞানের স্বতপ্রামাণ্য স্বীকার করা হয়। মীমাংসা দার্শনিকদের মতে, স্মৃতি ব্যতীত অন্য সব জ্ঞানই স্বতপ্রামাণ্য। কারণ এগুলো অতিরিক্ত কোন শর্তের উপর বা অন্য কোন জ্ঞানের উপর নির্ভর না করে নিজেরাই নিজেদের বৈধতা প্রত্যয়ন করে। মীমাংসা দর্শনে এ সূত্রটিকে স্বতপ্রামাণ্যবাদ বলা হয়।

মীমাংসা জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কে উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দেখা যায়, এতে ভারতীয় দর্শনের সর্বাধিক ছয়টি প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে এবং এসব প্রমাণের দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানকে বিভিন্ন ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। মূলত বৈদিক বর্ণাশ্রম প্রথা, বৌদ্ধ দর্শনের আপেক্ষিকতাবাদ, সাম্যবাদ ও অহিংসা নীতি এবং তৎপূর্ববর্তী চার্বাক ও জৈন দর্শনের বেদ বিরোধিতার প্রভাবে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজকাঠামো সংশয়ের সম্মুখীন হয় এবং ভারতীয় মানসে বেদ বিরোধী মনোভাব গভীরতর প্রভাব বিস্তার করে। এ প্রেক্ষাপটে বেদের অপৌরুষেয়তা, প্রামাণ্য ও নিঃশর্ত কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য মীমাংসা দার্শনিক জৈমিনি বিপুলাকার *মীমাংসা সূত্র* গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। ধর্মের স্বরূপ অনুসন্ধান করা এ গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য হওয়ায় ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানলাভ করার জন্য জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা এ গ্রন্থে বিশেষ গুরুত্ব পায়। মীমাংসা দার্শনিকগণ ধর্মকে জানার জন্য বেদ বা শব্দ প্রমাণকে একমাত্র প্রমাণ বলে মনে করেন । তবে, শব্দপ্রমাণ বা বেদ ছাড়া অন্য কোন প্রমাণের মাধ্যমে ধর্মের যথার্থ জ্ঞান যে সম্ভব নয় একথা প্রমাণের জন্যই তাঁরা প্রত্যক্ষসহ অন্যান্য সকল লৌকিক প্রমাণ নিয়ে বিশদ বিচারমূলক আলোচনা করেন। তাঁদের এ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ভারতীয় দর্শনালোচনায় স্বীকৃত বিচারমূলক ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া বৈধ জ্ঞানোৎপত্তির বিভিন্ন উপায় এবং এসব উপায়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের প্রকৃতির ভিন্নতা সম্পর্কে খ্রিষ্টপূর্ব যুগেও যে মীমাংসা দার্শনিকগণ সচেতন ছিলেন তাও তাঁদের প্রমাণতত্ত্বের আলোচনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। মীমাংসা প্রমাণতত্ত্বে কুমারিল ভট্ট নির্দেশিত ছয়টি প্রমাণ এবং এগুলো দ্বারা প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান নিম্নে ছকের সাহায্যে দেখানো হলঃ

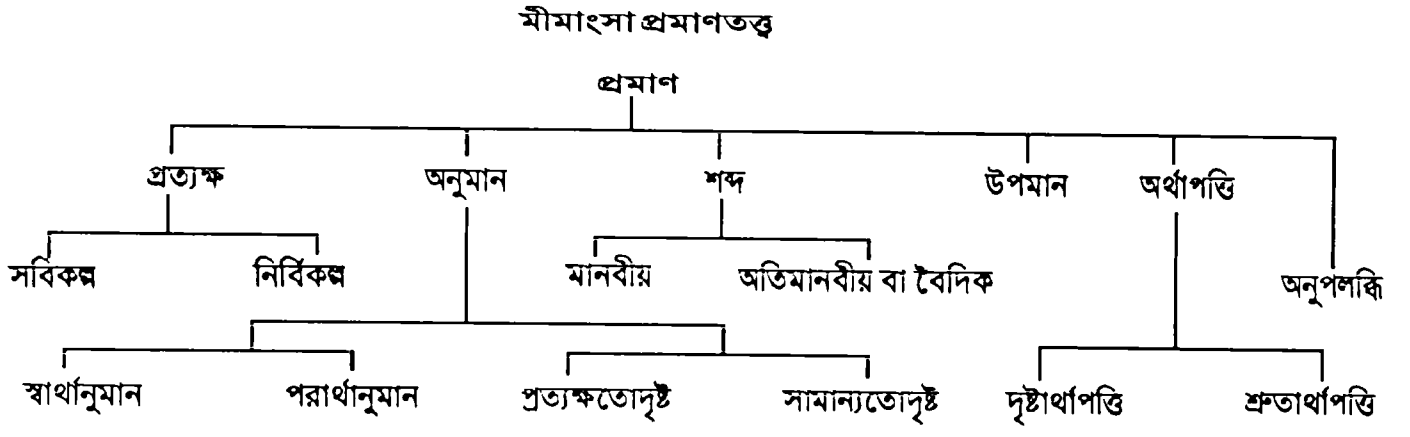

১.২ বেদান্ত জ্ঞানবিদ্যা

মীমাংসা জ্ঞানবিদ্যার আলোচানায় একথা বলা হয়েছে যে, চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের বেদ বিরোধিতার প্রভাব থেকে ব্রাহ্মণ প্রধান সমাজ এবং বৈদিক চিন্তা ও চর্চাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে জৈমিনি রচিত *মীমাংসা সূত্র* গ্রন্থের ভিত্তিতে বেদের কর্মকাণ্ডের উপর প্রাধান্য দানকারী মীমাংসা দর্শন গড়ে উঠে। ফলে উপনিষদীয় জ্ঞানকাণ্ড অত্যন্ত গৌণ হয়ে পড়ে। একদিকে বৌদ্ধদের বেদ বিরোধিতা অন্যদিকে মীমাংসকদের জ্ঞানকাণ্ড বিমুখতা, এ দু'টি বিরোধী শক্তির প্রতিক্রিয়ার ফলই হল জ্ঞানকাণ্ড প্রধান বেদান্ত তথা অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এ দর্শনে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।[৩২] অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা শঙ্করাচার্য অজ্ঞানতা বা অবিদ্যাকেই সংসার বন্ধনের কারণ হিসাবে মনে করে তত্ত্বজ্ঞান বা সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের বিশুদ্ধ জ্ঞানকেই মোক্ষলাভের উপায় হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং প্রমাণ, প্রমেয়, খ্যাতিবাদ ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন অনুসারে যথার্থ জ্ঞানের দু'টি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার : অবাধিতত্ব বা অবিরোধিতা এবং অনধিগতত্ব বা নতুনত্ব। যথার্থ জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য জ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে এবং যথার্থজ্ঞানে নতুনত্ব থাকবে। অর্থাৎ তা পূর্বেজ্ঞাত কোন বিষয় হবে না। অন্যকথায়, এ জ্ঞান অভিজ্ঞতালব্ধ হবে। স্মৃতি অনধিগত নয় বলে তাকে অদ্বৈত বেদান্তে যথার্থ জ্ঞান বলে স্বীকার করা হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান অবাধিত ও অনধিগত বলে তা যথার্থ জ্ঞান। এ জ্ঞান অদ্বয়। কারণ তা অন্যকোন জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় না।

শঙ্করাচার্য তত্ত্বগত সত্তা ও অভিজ্ঞতামূলক সত্তার মধ্যে পার্থক্য করেন। তাঁর মতে, তত্ত্বগত সত্তাকে যথার্থ বা উচ্চতর জ্ঞানের মাধ্যমে এবং অভিজ্ঞতামূলক সত্তাকে অযথার্থ বা নিম্নতর জ্ঞানের মাধ্যমে জানা যায়। তত্ত্বগত সত্তার জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কেবল অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। তাই তাঁর মতে, সকল প্রকার প্রমাণ হল আত্মা ও ব্রহ্মের অভিন্নতার জ্ঞান। যখনই অদ্বৈত আত্মাকে জানা যায় তখন জ্ঞাতা ও জ্ঞানের উপায় বা প্রমাণের মধ্যকার পার্থক্যও লুপ্ত হয়।

বেদান্ত দর্শনেও যথার্থ জ্ঞানের কারণ বা উৎসকে প্রমাণ বলা হয়।[৩৩] শঙ্করাচার্য প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এ তিনটি প্রমাণ স্বীকার করেন। পরবর্তীতে বেদান্ত ভাষ্যকারগণ ভট্ট-মীমাংসকদের মত মোট ছয়টি প্রমাণকে স্বীকার করেন। যথা, প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। নিম্নে এসব প্রমাণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

(১) প্রত্যক্ষ : শঙ্করাচার্য নির্দেশিত প্রত্যক্ষের প্রকৃতি মীমাংসা দার্শনিক কুমারিল ভট্ট নির্দেশিত প্রত্যক্ষের অনুরূপ।[৩৪] শঙ্করাচার্যের মতে, বাহ্যিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে মন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুর সাথে সংযুক্ত হয় এবং বস্তুর আকারে আকারিত হয়।[৩৫] বস্তুর আকারে আকারিত এ মানসিক ধরনকে বৃত্তি বলে। এই বৃত্তিই প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

প্রত্যক্ষের শ্রেণী বিভাগ : শঙ্করাচার্যের দর্শনে বিভিন্ন দিক থেকে প্রত্যক্ষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন, প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের প্রকৃতির ভিন্নতার প্রেক্ষিতে : নির্বিকল্প ও সবিকল্প প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষের উপায়ের ভিন্নতার ভিত্তিতে : ইন্দ্রিয়জাত এবং অ-ইন্দ্রিয়জাত বা মানসিক প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষজাত বিষয়ের প্রকৃতির ভিত্তিতে : বিষয়গত ও জ্ঞানগত প্রত্যক্ষ এবং ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করার প্রকৃতির ভিন্নতার প্রেক্ষিতে : জীবস্বাক্ষী ও ঈশ্বরস্বাক্ষী প্রত্যক্ষ।

নির্বিকল্প ও সবিকল্প প্রত্যক্ষ : প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের প্রকৃতির ভিন্নতার প্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষকে নির্বিকল্প ও সবিকল্প এ দু'শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। শঙ্করাচার্য প্রদত্ত এ দুই প্রকার প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা ভট্ট-মীমাংসকদের নির্বিকল্প ও সবিকল্প প্রত্যক্ষের সংজ্ঞার অনুরূপ।[৩৬] তবে কুমারিল ভট্টের মতে প্রথমে নির্বিকল্প ও পরে সবিকল্প প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্ত দার্শনিকদের মতে সবিকল্পের পরেও নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ সম্ভব। সবিকল্প প্রত্যক্ষে যে ভেদজ্ঞান থাকে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে তা লোপ পায় এবং জীব ও ব্রহ্মের অভিন্ন জ্ঞান জন্মে।[৩৭]

ইন্দ্রিয়জাত এবং অ-ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষ : প্রত্যক্ষের উপায়ের ভিন্নতার প্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষকে ইন্দ্রিয়জাত এবং অ-ইন্দ্রিয়জাত এ দু'শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে প্রত্যক্ষ হয় তাকে ইন্দ্রিয়জাত এবং মনের সাহায্যে যে প্রত্যক্ষ হয় তাকে অ-ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষ বলা হয়। বেদান্ত দর্শনে মনকে ইন্দ্রিয় বলে স্বীকার করা হয় নি বলেই মনের প্রত্যক্ষকে অ-ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষ বলা হয়। ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষে মন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাহ্য বস্তুর সাথে সংযুক্ত হয়। কিন্তু মানস প্রত্যক্ষে মন বাহ্য বস্তুর সাথে সংযুক্ত হয় না। এ প্রত্যক্ষের দ্বারা শুধুমাত্র আনন্দ, বেদনা এবং এ জাতীয় মানসিক অবস্থাকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

বিষয়গত ও জ্ঞানগত প্রত্যক্ষ : প্রত্যক্ষজাত বিষয়ের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে শঙ্করাচার্য প্রত্যক্ষকে বিষয়গত ও জ্ঞানগত প্রত্যক্ষে বিভক্ত করেন। প্রত্যক্ষের বিষয়কে মানসিক ধরনগুলোর সাহায্যে প্রত্যক্ষ করে বিষয়ের অনুরূপ যে বৃত্তিজ্ঞান জন্মে তাকে বিষয়গত প্রত্যক্ষ বলে। পক্ষান্তরে, যখন মানসিক ধরনের মাধ্যমগুলোর সাহায্য ছাড়াই কোন জ্ঞানকে আত্মা প্রত্যক্ষ করে তখন তা জ্ঞানগত প্রত্যক্ষ। এতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-এর ভেদ রহিত হয়।

জীবস্বাক্ষী ও ঈশ্বরস্বাক্ষী প্রত্যক্ষ : ব্রহ্মকে উপাধি ও বিশেষণভেদে দু'ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। এ দুই প্রকার প্রত্যক্ষকে জীবস্বাক্ষী ও ঈশ্বরস্বাক্ষী প্রত্যক্ষ বলা হয়। শাশ্বত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম যখন অন্তকরণের অবিদ্যাপ্রসূত উপাধি দ্বারা শর্তাবদ্ধ হয়ে প্রত্যক্ষিত বিষয়ের আকার ধারণ করে তখন তাকে জীবস্বাক্ষী প্রত্যক্ষ বলা হয়। অন্যদিকে, শাশ্বত চৈতন্যরূপ ব্রহ্ম যখন মায়াবৃত্তি দ্বারা শর্তাবদ্ধ হয়ে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের বিষয়ের আকার ধারণ করে তখন তা ঈশ্বরস্বাক্ষী প্রত্যক্ষ। জীবস্বাক্ষী প্রত্যক্ষের বহুবিধ কারণ থাকে। কিন্তু ঈশ্বরস্বাক্ষী প্রত্যক্ষের কারণ একটিই, তা হল মায়া।

(২) **অনুমান :** শঙ্করাচার্য মধ্য পদের সাথে সাধ্য পদের নিয়ত বা ব্যাপ্তি সম্পর্কের ভিত্তিতে যে জ্ঞান হয় তাকে অনুমান বলেন। শঙ্করাচার্য প্রদত্ত অনুমানের প্রকৃতি মীমাংসা দার্শনিক শবরস্বামী বা কুমারিল ভট্ট প্রদত্ত অনুমানের প্রকৃতির অনুরূপ।[৩৮] ভারতীয় দর্শনের বিশিষ্ট পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য শঙ্করাচার্য নির্দেশিত অনুমান ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন যে, অনুমানে মন অনুমিত বস্তু সম্পর্কে শুধুমাত্র চিন্তা করে কিন্তু এর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য বেরিয়ে যায় না। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের উপাদান এবং এর ব্যাখ্যা একটি এককে মিলিত হয় কিন্তু অনুমানে এগুলো আলাদা থাকে।[৩৯]

অনুমানের প্রকার ভেদ : অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে শুধুমাত্র দুই প্রকার অনুমানকে স্বীকার করা হয়। যথা, স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। বেদান্ত স্বার্থানুমান ও পরার্থনুমানের প্রকৃতি মীমাংসা স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমানের প্রকৃতির অনুরূপ।[৪০] ন্যায় দর্শনেও এ দুই প্রকার অনুমানকে স্বীকার করা হয়েছে। তবে পার্থক্য হল, ন্যায় দর্শনে শুধু পরার্থানুমানের জন্য প্রতিজ্ঞা, হেতু ,উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এ পাঁচটি অবয়বকে স্বীকার করা হয়। পক্ষান্তরে, মীমাংসা দর্শন স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান উভয়ের জন্য পাঁচটির পরিবর্তে প্রথম তিনটি অবয়বকেই যথেষ্ট মনে করে। অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন শুধুমাত্র পরার্থানুমানের ক্ষেত্রে তিনটি অবয়বকে স্বীকার করে। এ অবয়ব তিনটি হল প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ অথবা উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন।

(৩) **শব্দজ্ঞান :** যখন কোন বাক্য অন্য কোন প্রমাণের বিরোধিতা না করে এর পদগুলোর মধ্যে নিরপেক্ষ সম্পর্ককে নির্দেশ করে তখন সে বাক্যকে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে শব্দজ্ঞান বলা হয়। এখানে নিরপেক্ষ সম্পর্ক বলতে স্ববিরোধিতা বর্জিত সম্পর্ককে বুঝানোহয়েছে।

অদ্বৈত বেদান্ত মতে, একটি বাক্য অর্থপূর্ণ হওয়ার জন্য চারটি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। প্রথমত, আকাঙ্খা অর্থাৎ বাক্যের আবশ্যকীয় পদসমূহের মধ্যে সংশ্লেষণাত্মক সম্পর্ক। যেমন, একটি ক্রিয়া উদ্দেশ্য, সহকারী ক্রিয়া, কর্ম ইত্যাদির প্রয়োজন বোধ করবে। দ্বিতীয়ত, যোগ্যতা অর্থাৎ তাৎপর্যবোধক পদসমূহের অর্থের মধ্যে স্ববিরোধিতা থাকবে না। যেমন ধোঁয়া দ্বারা জলসেচন করছি, এরূপ বাক্য হবে না। তৃতীয়ত, আসক্তি অর্থাৎ বাক্যের বিভিন্ন পদগুলোর উচ্চারণের মধ্যে সময়ের নৈকট্য থাকবে। বাক্যের একটি পদ চার ঘন্টা আগে অন্য পদ চার ঘন্টা পরে উচ্চারিত হলে চলবে না। চর্তুথত, তাৎপর্য অর্থাৎ বাক্য বাক্য দ্বারা নির্দেশিত বস্তুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। যেমন, খেতে বসে সৈন্ধব আন বললে লবণের কথা বুঝতে হবে, ঘোড়ার কথা নয়। যদিও ঘোড়ার আরেক নাম সৈন্ধব। তাৎপর্য হল বক্তার উদ্দীষ্ট এবং বাক্য যে বস্তুগত সম্বন্ধ নির্দেশ করে তার অনুরূপতা।

বাক্য শব্দ বা পদ নিয়ে গঠিত। পদ ধ্বনি নিয়ে গঠিত। অদ্বৈত বেদান্ত মতে, ধ্বনি সৃষ্ঠ নয় বরং প্রকাশিত। ধ্বনির আকার শাশ্বত। শুধু এর প্রকাশ একটি বিশেষ সময়ে। এভাবে শব্দও শাশ্বত। ঈশ্বর একে স্মরণ করেন ও আমাদের কাছে প্রকাশ করেন। বেদ হল এরূপ শব্দ। তাই তা শাশ্বত এবং শাশ্বত সত্যের প্রকাশক। বৈদিক শব্দ তাই স্বতপ্রমাণিত।

(৪) **উপমান :** সাদৃশ্য জ্ঞানের উপায়কেই উপমান বলা হয়। অদ্বৈত বেদান্ত নির্দেশিত উপমানের প্রকৃতি মীমাংসা উপমানের অনুরূপ।[৪১] পূর্ব প্রত্যক্ষিত কোন বস্তুর সাথে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বর্তমানে প্রত্যক্ষিত কোন বস্তুর জ্ঞানকে উপমান বলে। এধরনের জ্ঞান প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা নয় বরং কেবলমাত্র উপমান দ্বারাই লাভ করা যায়। তাই উপমান জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র উপায়। যেমন, বর্তমানে প্রত্যক্ষিত 'ক' যদি পূর্ব প্রত্যক্ষিত 'খ' এর সদৃশ হয় তবে আমাদের এই জ্ঞান হয় যে, 'ক' 'খ' সদৃশ। এতে ক-এর সাথে খ-এর সাদৃশ্যের উপলব্ধি জন্মে। এটি ব্যাপ্তি দ্বারা অনুমিত বা প্রত্যক্ষিত নয়। কারণ, এখানে শুধু ক-ই প্রত্যক্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) **অর্থাপত্তি :** মীমাংসা জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, মীমাংসা দার্শনিক কুমারিল ভট্ট অর্থাপত্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কোন প্রত্যক্ষিত বিষয়ের অসঙ্গতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য কোন অপ্রত্যক্ষিত বিষয়ের পূর্ব ধারণা করাকে অর্থাপত্তি বলেছেন। অদ্বৈত বেদান্ত নির্দেশিত অর্থাপত্তির প্রকৃতি কুমারিল ভট্ট নির্দেশিত অর্থাপত্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।[৪২] কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে, অর্থাপত্তি হল সিদ্ধান্ত, অনুগ বা ফল থেকে আশ্রয় বাক্য, পূর্বগ বা কারণের পূর্ব ধারণা। এটি জ্ঞাত কোন তথ্য থেকে একটি প্রকল্প গঠনের মত।[৪৩] সুতরাং, অর্থাপত্তিতে কার্য বা ফল জ্ঞাত থাকে। কারণ সম্পর্কে পূর্ব ধারণা করা হয়।

(৬) **অনুপলব্ধি :** অদ্বৈত বেদান্ত মতে, অনুপলব্ধি হল এমন একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ যার মাধ্যমে অনস্তিত্বের জ্ঞান পাওয়া যায়। অনস্তিত্ব জ্ঞান হল প্রত্যক্ষযোগ্য কোন কিছুর অনস্তিত্ব জ্ঞান। অদ্বৈত বেদান্ত নির্দেশিত অনুপলব্ধি প্রমাণের প্রকৃতি মীমাংসা কুমারিল ভট্ট নির্দেশিত অনুপলব্ধির অনুরূপ।[৪৪]

উল্লেখ্য যে, মীমাংসা দার্শনিক প্রভাকর মিশ্র অনস্তিত্বকে শূন্য আধারের প্রত্যক্ষের সাথে অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু মীমাংসা দার্শনিক কুমারিল ভট্টের সাথে একমত প্রকাশ করে প্রভাকর মিশ্রের যুক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে একথা বলা হয় যে, যদি পানি পাত্রের অনস্তিত্বের জ্ঞান পানি পাত্রহীন শূন্যস্থানের জ্ঞানের সাথে অভিন্ন হয় তবে পানি পাত্র যখন উপস্থিত তখনও তা প্রত্যক্ষ করা যাবে। তবে, অদ্বৈত বেদান্তে একথা মনে করা হয় যে, কোন বস্তুর অনস্তিত্ব ঐ বস্তুর আধেয় অর্থাৎ যেখানে বস্তুটি ছিল সে স্থানের জ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কারণ, জগতের অবভাস ব্রহ্মের আধেয় থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কিন্তু, এটাও ঠিক যে, অনস্তিত্ব জ্ঞান অনুপলব্ধির দ্বারাই ঘটে। আধেয়কে প্রত্যক্ষ করা থেকে এজ্ঞান পাওয়া যায় না।

বেদান্ত দর্শনে চার প্রকার অনস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে।[৪৫] এগুলো হলঃ (ক) প্রাক অনস্তিত্ব অর্থাৎ নির্দিষ্ট আকার লাভের আগে এর উপাদানে কোন বস্তুর অনস্তিত্ব; (খ) পরবর্তী অনস্তিত্ব অর্থাৎ বস্তুর ধ্বংসের পরে এর অনস্তিত্ব; (গ) পারস্পরিক অনস্তিত্ব অর্থাৎ একটি বস্তুতে অন্যটির অনস্তিত্ব; যেমন, ব্রহ্ম জগতের সত্তার অনস্তিত্ব, এবং (ঘ) পরম অনস্তিত্ব বা সর্বকালীন ও সর্বজনীন অনস্তিত্ব। যেমন, বায়ুতে রং-এর অনস্তিত্ব। অদ্বৈত বেদান্ত মতে, এ চার প্রকার অভাবের যে কোনটি অনুপলব্ধির বিষয় হতে পারে।

জ্ঞানের প্রামাণ্য : শঙ্করের মতে, সঙ্গতিই হল সত্যতার মানদণ্ড। অবশ্য সঙ্গতি ছাড়াও তিনি অনুরূপতা ও প্রায়োগিক উপযোগিতাকে সত্যতার মানদণ্ড বলে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, সঙ্গতি তত্ত্বজ্ঞানের এবং অনুরূপতা ও প্রায়োগিক উপযোগিতা ব্যবহারিক সত্যতার মানদণ্ড। শঙ্কর নির্দেশিত তত্ত্বজ্ঞানের সত্যতার মানদণ্ড জ্ঞানের স্বতপ্রামাণ্য এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের মানদণ্ড পরতপ্রামাণ্য নির্দেশ করে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান বা বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রামাণ্য জ্ঞানের মধ্যে নিহিত, বাইরের কোন শর্তের উপর নির্ভরশীল নয়। অদ্বৈত বেদান্ত নির্দেশিত জ্ঞানের প্রামাণ্য মীমাংসা জ্ঞানের প্রামাণ্য সম্পর্কিত মতের অনুরূপ। কারণ, মীমাংসা দর্শনেও জ্ঞানের স্বতপ্রামাণ্য স্বীকৃত হয়েছে।

অদ্বৈত বেদান্ত জ্ঞানবিদ্যা তথা প্রমাণতত্ত্বের উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, বেদের কর্মকাণ্ডের অনুসারী মীমাংসা দর্শনে স্বীকৃত সবগুলো প্রমাণ বেদান্ত দর্শনে স্বীকার করা হয়েছে এবং অনেকগুলো প্রমাণের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও বেদান্ত দার্শনিকগণ ভাট্ট-মীমাংসক ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেছেন। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম-মোক্ষের এই তিনটি উপায়ের কথা ভারতীয় দর্শনে সাধারণভাবে স্বীকৃত হলেও বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় জ্ঞান বা ভক্তি বা কর্মের প্রাধান্য দিয়েছে। উপনিষদের নিস্রপঞ্চ ব্রহ্মবাদের দার্শনিক প্রবক্তা বাদরায়নের ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে এবং তদনুসারী অদ্বৈত বেদান্তে কর্ম ও ভক্তির তুলনায় জ্ঞানকেই প্রাধাণ্য দেয়া হয়েছে। বেদান্ত জ্ঞানতত্ত্বে যেসব প্রমাণকে স্বীকার করা হয়েছে তাদের দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানের শ্রেণী বিভাগসহ বেদান্ত প্রমাণতত্ত্ব ছকের সাহায্যে নিম্নে দেয়া গেলঃ

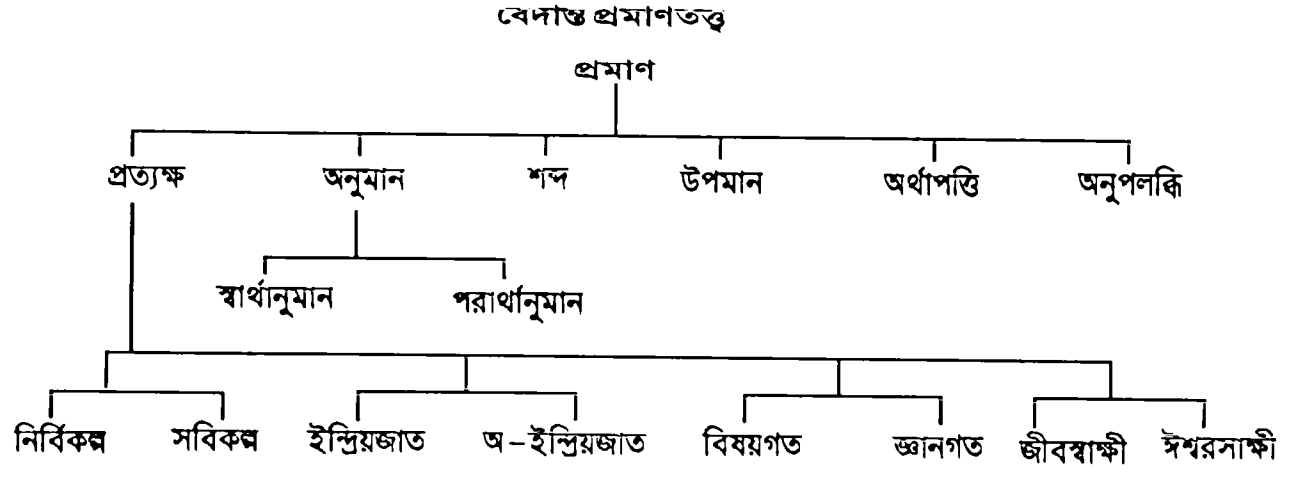

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ ন্যায় জ্ঞানবিদ্যা

ন্যায় দর্শনে বেদকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করা হলেও এ দর্শন স্বাধীন চিন্তা ও বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত।[৪৬] ষড়দর্শনের অন্যান্য প্রধান মতবাদসমূহের মত ন্যায় দর্শনেও মোক্ষের উপর যথেষ্ঠ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু, মোক্ষলাভের জন্য তত্ত্বজ্ঞান প্রয়োজন। ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি গৌতম তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য যে ষোল প্রকার পদার্থের জ্ঞান প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন এগুলোর মধ্যে প্রমাণ হল প্রথম পদার্থ। তাই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব কিনা তা নির্ধারণের জন্য জ্ঞানবিদ্যা তথা যথার্থ জ্ঞানের পদ্ধতি বা প্রমাণতত্ত্বের আলোচনা ন্যায় দর্শনে যথেষ্ঠ গুরুত্ব পায়। তাই ন্যায় তত্ত্ববিদ্যা, মুক্তিতত্ত্ব ইত্যাদি ন্যায় জ্ঞানবিদ্যার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ন্যায় দর্শন সবিস্তারে জ্ঞানপদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করেছে এবং সংশয়বাদ যে যুক্তিসিদ্ধ নয় তা প্রমাণ করেছে। এ কারণেই ন্যায় দর্শন জ্ঞানবিদ্যাকেন্দ্রিক।[৪৭]

যথার্থ জ্ঞানলাভের পদ্ধতি বা প্রমাণ নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করে বলে ন্যায় দর্শনকে প্রমাণশাস্ত্রও বলা হয়। ন্যায় জ্ঞানবিদ্যায় প্রমা বা বৈধজ্ঞানের প্রকৃতি, প্রমাণ বা বৈধজ্ঞানের উপায়, জ্ঞানের পরতপ্রামাণ্য, সত্যতার যাচাইনীতি ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। ন্যায় জ্ঞানবিদ্যা অনুসারে জ্ঞাতা বা প্রমাতৃ, জ্ঞেয় বা প্রমেয়, প্রমাণ এবং প্রমা মিলেই সত্তা গঠন করে। *ন্যায়সূত্র* গ্রন্থের ভাষ্যকার বাৎসায়ন যে জ্ঞান বস্তুর যথার্থ প্রকৃতির অনুরূপ সে জ্ঞানকেই প্রমা বা বৈধজ্ঞান বলেছেন। যে জ্ঞান বস্তুর যথার্থ প্রকৃতির অনুরূপ নয় সে জ্ঞান হল অপ্রমা। অর্থাৎ, অনুরূপতাই যথার্থ জ্ঞানের মানদণ্ড।

ন্যায় দর্শনে চারটি প্রমাণকে স্বীকার করা হয়েছে যথা, প্রত্যক্ষ, অনুমান উপমান ও শব্দ।[৪৮] এ ছাড়া ন্যায় দর্শনে অপ্রমাও চার প্রকার। যথা, বিপর্যয়, স্মৃতি, তর্ক ও সংশয়। এখানে চার প্রকার প্রমাণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

(১) **প্রত্যক্ষ :** ন্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষকে আত্মার কার্য বলা হয়েছে। প্রত্যক্ষে প্রথম আত্মার সাথে মনের সংযোগ ঘটে। তৎপর মনের সাথে ইন্দ্রিয়ের এবং ইন্দ্রিয়ের সাথে বস্তুর সংযোগ প্রত্যক্ষ হয়। ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম *ন্যায়সূত্র* গ্রন্থে প্রত্যক্ষের যে সংজ্ঞা দেন তা মীমাংসা প্রত্যক্ষের সংজ্ঞার সাথে অভিন্ন।[৪৯] গৌতমের সংজ্ঞানুসারে প্রত্যক্ষে চারটি উপাদান অন্তভূক্ত। যথা, ইন্দ্রিয়, বস্তু, ইন্দ্রিয় ও বস্তুর সন্নিকর্ষ এবং সন্নিকর্ষ থেকে উৎপন্ন জ্ঞান। তাই গৌতমের সংজ্ঞানুসারে যা প্রত্যক্ষযোগ্য নয় তার জ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা লাভ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ যোগীদের ইন্দ্রিয় বহির্ভূত প্রত্যক্ষের জ্ঞান গৌতমের প্রত্যক্ষের সংজ্ঞায় অনুপস্থিত। কিন্তু পরবর্তী নব্য নৈয়ায়িক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রত্যক্ষকে সাক্ষাৎ সচেতনতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন।[৫০] নব্য নৈয়ায়িক ভরদ্বাজ প্রত্যক্ষ বলতে সাক্ষাৎ বৈধ জ্ঞানকে বুঝান। পরবর্তী নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চানন অন্যকোন মাধ্যম দ্বারা নির্দেশিত নয় এমন সাক্ষাৎ জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন।[৫১] নব্য নৈয়ায়িকদের সাথে গৌতমের প্রত্যক্ষের সংজ্ঞার অমিল হল, গৌতম প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের উপস্থিতি অনিবার্য মনে করেন। কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকগণ প্রত্যক্ষের জন্য ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। প্রত্যক্ষের এই সংজ্ঞাগুলো যোগজ প্রত্যক্ষণসহ মানুষের সকল প্রকার প্রত্যক্ষণকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ন্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষের স্থান সর্ব প্রধান। বাৎসায়নের মতে, যখন কোন ব্যক্তি বিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছ থেকে কোন জ্ঞান পায় তখন তার মধ্যে কোন একটি বিশেষ লক্ষণের মাধ্যমে আরোহাত্মক অনুমান দ্বারা এ জ্ঞানকে যাচাই করার বাসনা থেকে যায়। আবার অনুমান দ্বারা যাচাই হয়ে গেলে তার মধ্যে বিষয়টিকে চোখে দেখার বাসনা থাকে। কিন্তু প্রত্যক্ষ করার পর তার মধ্যে অন্য কোনভাবে জ্ঞান নেবার আর বাসনা থাকে না। এ ছাড়া অনুমান, উপমান, শব্দ, সবই প্রত্যক্ষ নির্ভর। যেমন, যাকে আগে দেখি নাই তাকে অনুমান করা যায় না। দু'টি জিনিসকে প্রত্যক্ষ না করলে উপমান অসম্ভব। শব্দের ক্ষেত্রেও আগে শব্দ শুনতে হয়। সুতরাং শ্রবণও এক প্রকার প্রত্যক্ষ।

প্রত্যক্ষের শ্রেণী বিভাগ : ন্যায় দার্শনিকগণও মীমাংসা দার্শনিকদের মত নির্বিকল্প ও সবিকল্প এই দু'প্রকার প্রত্যক্ষকে স্বীকার করেন। এ ছাড়া, ন্যায় দর্শনে প্রত্যাভিজ্ঞাকেও প্রত্যক্ষের একটি প্রকার হিসাবে ধরে নেয়া হয়। গঙ্গেশ লৌকিক ও অলৌকিক এ দু'প্রকার প্রত্যক্ষের কথা বলেন। লৌকিক প্রত্যক্ষ বলতে তিনি সবিকল্প ও নির্বিকল্প প্রত্যক্ষকে বুঝিয়েছেন। অলৌকিক প্রত্যক্ষকে তিনি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ প্রত্যক্ষ। সুতরাং ন্যায় দর্শনে মোট প্রত্যক্ষ হল ছয় প্রকার। যথা, নির্বিকল্প, সবিকল্প, প্রত্যাভিজ্ঞা, সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ প্রত্যক্ষ।

নির্বিকল্প, সবিকল্প ও প্রত্যাভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ : নির্বিকল্প প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা নিয়ে প্রাচীন ও নব্য ন্যায় দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ লক্ষিত হয়। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ বলতে অসংজ্ঞায়নযোগ্য ও নামহীন প্রত্যক্ষকে বুঝান। প্রত্যক্ষের একটি স্তরে কোন বস্তু তার দ্রব্য, গুণ, কার্য ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা যেভাবে গুণান্বিত থাকে সেভাবে বস্তুটিকে উপলব্ধি করা যায়। অথচ এর কোন নামকরণ করা যায় না। এরূপ প্রত্যক্ষকেই নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ বলে। কোন বস্তুকে উপরোক্ত সকল গুণাবলীর দ্বারা উপলব্ধি

Dhaka University Institutional Repository

করার সাথে সে বস্তুর নাম দিতে পারাকে সবিকল্প প্রত্যক্ষ বলে।[৫২] কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকগণ নির্বিকল্প ও সবিকল্প প্রত্যক্ষের যে সংজ্ঞায়ন করেছেন তা মীমাংসা দার্শনিকদের নির্বিকল্প ও সবিকল্প প্রত্যক্ষের সংজ্ঞার সাথে অভিন্ন।[৫৩] ন্যায় দার্শনিকদের মতে, নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ হল সবকল্প জ্ঞানের সূচনা বিন্দু। তবে সঠিক অর্থে এটা নিজে জ্ঞান নয়।[৫৪]

প্রত্যাভিজ্ঞা হল পূর্ব প্রত্যক্ষিত কোন বস্তুকে পূর্ব প্রত্যক্ষিত বলে প্রত্যয়ন করতে পারা। এতে প্রত্যক্ষ ও স্মৃতি উভয়ের উপাদান অন্তর্ভুক্ত। ইন্দ্রিয় ও বস্তুর সংযোগ এর প্রধান কারণ এবং স্মৃতির উপাদান সংস্কার এর সহযোগী কারণ।

সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ প্রত্যক্ষ : গঙ্গেশ-এর মতে, যখন কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সে বিষয়ের জাতিগত লক্ষণ প্রত্যক্ষের মাধ্যমে সাধারণভাবে সে বিষয়কে প্রত্যক্ষ করা হয় তখন তাকে সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ বলে। যেমন, সাধারণভাবে যখন আমরা ধোঁয়া প্রত্যক্ষ করি তখন এর জাতিগত লক্ষণ প্রত্যক্ষের মাধমে সমস্ত ধোঁয়াকেই প্রত্যক্ষ করি। কোন ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সংযোগের সময় যদি উক্ত বিষয় সম্পর্কিত কোন পূর্ব-প্রত্যক্ষিত জ্ঞানের স্মৃতি জাগ্রত হয় তবে তাকে জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ বলে। যেমন, বরফের চাক্ষুস প্রত্যক্ষের সময় শীতলতার পূর্ব সংবেদনের স্মৃতিজ্ঞান ঘঠে। জ্ঞানলক্ষণ পূর্ব-প্রত্যক্ষ নির্ভর। যোগ সাধনালব্ধ অলৌকিক শক্তির সাহায্যে যোগীদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, দূরবর্তী ও অতি সূক্ষ বস্তুকে সমানভাবে প্রত্যক্ষ করাকে যোগজ প্রত্যক্ষ বলে। এ প্রত্যক্ষ স্বজ্ঞাজাত, তাই অলৌকিক। এই সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ প্রত্যক্ষণ হল বিশেষ সন্নিকর্ষের মাধ্যম।

প্রাচীন ও নব্য উভয় ন্যায় দার্শনিকগণই সবিকল্প প্রত্যক্ষকে বৈধ বলে স্বীকার করেন।[৫৫] কিন্তু, প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ নির্বিকল্প প্রত্যক্ষকে সবিকল্প প্রত্যক্ষর উপায় হিসাবে বৈধ বলেছেন।[৫৬] কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকগণ নির্বিকল্প প্রত্যক্ষকে বৈধ বা অবৈধ কিছুই বলেন নি। কেননা নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ তার বিষয়বস্তু ও গুণাবলীর মধ্যকার সম্পর্ককে অনুভব করতে ব্যর্থ হয়।

(২) অনুমান : ন্যায় দর্শনে অনুমানের যে সংজ্ঞা দেয় হয় তা মীমাংসা দার্শনিক শবরস্বামী প্রদত্ত অনুমানের সংজ্ঞার অনুরূপ।[৫৭] ন্যায় মতে, অনুমানের ক্ষেত্রে প্রথমে পক্ষের মধ্যে হেতু বা চিহ্ন বা লিঙ্গ বা কারণকে প্রত্যক্ষ করতে হয়। দ্বিতীয় স্তরে এই কারণ বা লিঙ্গের সাথে সাধ্য বা বিধেয়ের নিয়ত সম্পর্কের প্রত্যাভিজ্ঞা হয়। এবং তৃতীয় স্তরে পক্ষের মধ্যে অপ্রত্যক্ষিত বিধেয় বা সাধ্যের বা লিঙ্গের উপস্থিতির অনুমান করা হয়। এধরনের অনুমান ব্যক্তির নিজের জন্য করা হয়। অনুমানের এ ব্যাখ্যা হল মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির ব্যাখ্যা। অনু শব্দের অর্থ পশ্চাৎ এবং মান শব্দের অর্থ জ্ঞান। তাই অনুমান বলতে ন্যায় দার্শনিকগণ এমন জ্ঞানকে বুঝান যা অন্যকোন জ্ঞান অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরে আসে।

অনুমানের শ্রেণী বিভাগ : তিনটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ন্যায় দর্শনের অনুমানকে মোট সাত ভাগে ভাগ করা হয়। উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে ন্যায় অনুমান দুই প্রকার। যথা, স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। হেতু ও সাধ্যের মধ্যকার ব্যাপ্তি সম্পর্কের প্রকৃতির ভিত্তিতে ন্যায় অনুমান তিন প্রকার। যথা, পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। হেতু ও সাধ্যের মধ্যকার ব্যাপ্তি সমন্ধ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতির ভিত্তিতে ন্যায়ের অনুমান তিন প্রকার। যথা, কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয় ব্যতিরেকী।

স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান : উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে ন্যায়-এর অনুমানকে স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। জ্ঞাতা নিজের জন্য যে অনুমান করেন তা স্বার্থানুমান। স্বার্থানুমান প্রকাশের প্রয়োজন হয় না। নব্য নৈয়ায়িক অন্নংভট্টের মতে, এ অনুমান হল ব্যক্তির নিজের জন্য অনুমানের মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া।[৫৮] অন্যদিকে, যখন অপরকে বোঝানোর জন্য কোন অনুমান করা হয় তখন তাকে পরার্থানুমান বলে। এ অনুমান প্রকাশ করার প্রয়োজন হয়।[৫৯] প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই পাঁচটি বাক্য বা অবয়বে পরার্থানুমান প্রকাশিত হয়। এ অনুমানের তিনটি পদ থাকে। সাধ্য, পক্ষ ও হেতু। এই অনুমানের সিদ্ধান্তে অনুমানের পাঁচটি অবয়বকে আন্তসম্পর্কে সম্পর্কিত করার মাধ্যমে পক্ষের মধ্যে সাধ্যের অস্তিত্বকে প্রমাণ করা হয়। এধরনের অনুমানকেই ভারতীয় দর্শনে ন্যায় অনুমান বলা হয়।[৬০]

সুতরাং দেখা যায়, উদ্দেশ্যের দিক থেকে ন্যায় ও মীমাংসা স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান পরস্পরের অনুরূপ হলেও অবয়বের প্রকৃতির দিক থেকে মীমাংসা ও ন্যায় স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান ভিন্ন। কারণ, মীমাংসা স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান তিনটি অবয়ব দ্বারা গঠিত। বেদান্ত দর্শনেও এ দুই প্রকার অনুমানকে স্বীকার করা হয়েছে। তবে পার্থক্য হল, ন্যায় দর্শনে শুধু পরার্থানুমানের পাঁচটি অবয়বকে স্বীকার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন শুধুমাত্র পরার্থানুমানের জন্য তিনটি অবয়বকে স্বীকার করে। এই অবয়ব তিনটি হল, প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ বা উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান ঃ গৌতম তাঁর *ন্যায়সূত্র* গ্রন্থে পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট–এই তিন প্রকার অনুমানের কথা বলেন। হেতু ও সাধ্যের মধ্যকার ব্যাপ্তি সম্পর্কের প্রকৃতির ভিন্নতার ভিত্তিতে অনুমানকে এ তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। যখন প্রত্যক্ষ কারণের ভিত্তিতে অপ্রত্যক্ষ কার্যের অনুমান করা হয় তখন তাকে পূর্ববৎ অনুমান বলে। যেমন, আকাশের মেঘ দেখে বৃষ্টি হবে এ অনুমান করা। পূর্ব অভিজ্ঞতাই এ অনুমানের ভিত্তি। যে অনুমানে কার্যকে প্রত্যক্ষ করে অপ্রত্যক্ষ কারণ সম্পর্কে অনুমান করা হয় সে অনুমান শেষবৎ অনুমান। যেমন, নদীর স্রোতের প্রখরতা দেখে অতিবৃষ্টির অনুমান। আবার, যখন কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষিত নয় বরং পূর্ব অভিজ্ঞতা ও সাদৃশ্যের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষিত চিহ্ন থেকে অপ্রত্যক্ষিত বস্তুকে অনুমান করা হয় তখন তা সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। এতে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্পর্ক থাকে। তবে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে না। যেমন, শিংযুক্ত প্রাণী দেখে তার দ্বি খণ্ডিত ক্ষুর অনুমান।

বাৎসায়ন এই তিন প্রকার অনুমানের অন্য তিনটি অর্থের কথা বলেন।[৬১] পূর্ববৎ অনুমান হল পূর্বজ্ঞাত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল অনুমান। অর্থাৎ যেখানে কারণের দ্বারা কার্য অনুমিত হয়। শেষবৎ অনুমান হল অপনয়ন বা পরিশেষ পদ্ধতি–নির্ভর অনুমান। এখানে কার্যের দ্বারা কারণ অনুমতি হয়। এবং সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান হল প্রত্যক্ষযোগ্য চিহ্ন থেকে অপ্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুর অনুমান। এখানে চিহ্ন ও বস্তুর সম্পর্কও প্রত্যক্ষিত নয়।

কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী এবং অন্বয়–ব্যতিরেকী অনুমানঃ গঙ্গেশ অনুমানকে অন্য যে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন তাহল, কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী এবং অন্বয়ব্যতিরেকী।[৬২] হেতু ও সাধ্যের মধ্যকার ব্যাপ্তি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পদ্ধতির উপর নির্ভর করে এ তিনটি ভাগ করা হয়।

যে অনুমানে কেবলমাত্র হেতু ও সাধ্যের অন্বয়ের উপর ভিত্তি করে অনুমান করা হয় তাকে কেবলান্বয়ী অনুমান বলে। এতে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে শুধুমাত্র অন্বয়–ব্যাপ্তি থাকে। কোন প্রকার বিরুদ্ধ ব্যাপ্তি থাকে না। এর সাধ্য ও পক্ষ আশ্রয় বাক্য এবং সিদ্ধান্ত সদর্থক। এরিস্টটলীয় সহানুমানের প্রথম সংস্থানের (BARBARA) মূর্তির সাথে কেবলান্বয়ী অনুমানের তুলনা করা যেতে পারে। যখন হেতু ও সাধ্যের মধ্যে কেবলমাত্র নঞর্থক ব্যাপ্তি সম্পর্ক বা ব্যতিরেকী সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে অনুমান করা হয় তখন তা কেবলব্যতিরেকী অনুমান। এতে হেতু ও সাধ্যের অনুপস্থিতির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ অনুমানের সাধ্য আশ্রয় বাক্য সার্বিক নঞর্থক, পক্ষ আশ্রয় বাক্য এবং সিদ্ধান্ত সার্বিক সদর্থক হয়। তাই এর অনুরূপ বৈধ কোন মূর্তি পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্যায় পাওয়া যায় না।

যেমন, কোন বস্তু যা পানি, আগুন, বায়ু ও আকাশ থেকে পৃথক নয় তার গন্ধ নাই

মাটি হয় এমন বস্তু যার গন্ধ আছে

মাটি হয় এমন বস্তু যা উক্ত চারটি পদার্থ থেকে পৃথক

যে অনুমানে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে অন্বয় ও ব্যতিরেকী উভয় প্রকার সম্পর্কের ভিত্তিতে অনুমান করা হয় সে অনুমানই অন্বয় ব্যতিরেকী অনুমান। এতে পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে অন্বয়ী পদ্ধতি এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে ব্যতিরেকী পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। অন্বয় ব্যতিরেকী অনুমানে অন্বয়ী দৃষ্টান্তে হেতু উপস্থিত।[৬৩] কিন্তু, ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তে হেতু অনুপস্থিত থাকে। যেমন,

সকল মানুষ হয় বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন

রহিম হয় একজন মানুষ

রহিম হয় বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন

কোন জীব যে মানুষ নয় সে নয় বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন

রহিম হয় একজন মানুষ

রহিম নয় বিচারবুদ্ধিহীন

উল্লেখ্য যে, ন্যায় দর্শনের কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয় ব্যতিরেকী অনুমানের সাথে পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ জন ষ্টুয়ার্ট মিলের অন্বয়ী, ব্যতিরেকী ও অন্বয় ব্যতিরেকী আরোহ অনুমানের তুলনা করা যায়।

ন্যায় দর্শনে স্বীকৃত কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী এবং অন্বয়ী–ব্যতিরেকী এ তিন প্রকার অনুমানকে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে অস্বীকার করা হয়েছে। অদ্বৈত বেদান্ত মতে, কেবলান্বয়ী অনুমান বলে কোন অনুমান নেই। কারণ, ব্রহ্ম হল সকল বিসদৃশ সত্তার স্থায়ী ভিত্তি। সকল বস্তুর নাস্তিকতা এতে অস্তিত্বশীল। অন্বয়ী ব্যতিরেকী বলেও কোন অনুমান নেই। কারণ, এর আংশিক ভিত্তি ব্যতিরেকী ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমানের কারণ হতে পারে না। আবার কেবলব্যতিরেকী বলেও কোন অনুমান নেই। কারণ, সাধ্য ও পক্ষপদের নিয়ত অনুপস্থিতির সম্পর্ক অনুমানের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। শঙ্করাচার্যের মতে, কেবলব্যতিরেকী অনুমান মূলত অর্থাপত্তি। ন্যায় দর্শন নির্দেশিত উপরোক্ত তিন প্রকার অনুমানের স্থলে বেদান্ত দর্শন শুধু অন্বয়ীরূপ অনুমানের কথা বলে।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) **উপমান :** ন্যায় মতে, উপমান হল তৃতীয় প্রমাণ। প্রসিদ্ধ বা পূর্ব পরিচিত বস্তুর সাথে সাদৃশ্য দ্বারা অপ্রসিদ্ধ বা অপরিচিত নতুন বস্তুর জ্ঞানলাভই হল উপমান।[৬৪] কোন বস্তুর বিশদ বিবরণকে সংজ্ঞা, সংজ্ঞা দ্বারা যে বস্তু নির্দেশিত হয় তাকে সঙ্গি এবং সংজ্ঞা ও সঙ্গির সম্বন্ধ দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাকে উপমান জ্ঞান বা উপমিতি বলে। যেমন, কোন ব্যক্তি পূর্বে নীলগাই বা গবয় দেখে নি। একজন অরণ্যবাসী তাকে বলল যে, গবয় গরু সদৃশ। এটা সংজ্ঞা। সে ব্যক্তি বনে গিয়ে একটি প্রাণী প্রত্যক্ষ করল যার সাথে গরুর সাদৃশ আছে। এই প্রাণী হল সঙ্গি। সংজ্ঞা ও সঙ্গির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে জ্ঞান হল যে, প্রাণীটি গবয়। এ জ্ঞান উপমান। গৌতমের মতে, কোন অপরিচিত বস্তুর সাথে পরিচিত বস্তুর সাদৃশ্যের উপরই উপমান নির্ভরশীল। এ সাদৃশ্য একটি অপরিচিত বস্তুর সাথে একটি বিশেষ নামের বা সংজ্ঞার সম্পর্ক নির্দেশ করে। এতে যা উপলব্ধি করা হয় তা প্রত্যক্ষণ, অনুমান বা শব্দ দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না।

ন্যায়ের উপমানে পাঁচটি উপাদান থাকে।[৬৫] (১) পূর্বে অপ্রত্যক্ষিত অপরিচিত বস্তুর প্রত্যক্ষণ; (২) অন্য একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি যিনি উভয় বস্তুই দেখেছেন এবং উভয়ের সাদৃশ্য সম্বন্ধে জানেন সে ব্যক্তির কাছ থেকে শব্দজ্ঞানের মাধ্যমে শুনে অপরিচিত বস্তুর সাথে পরিচিত বস্তুর সাদৃশ্যের পরোক্ষ জ্ঞান; (৩) পরিচিত বস্তুর সাথে অপরিচিত বস্তুর সাদৃশ্যজ্ঞানের প্রত্যক্ষণ; (৪) বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রত্যাভিজ্ঞা; এবং (৫) প্রত্যক্ষিত অপরিচিত বস্তু অর্থাৎ সঙ্গি ও তার নাম বা সংজ্ঞার মধ্যকার সম্পর্ক জ্ঞান। একেই বলে উপমিতি। এই সাদৃশ্য জ্ঞানে স্মৃতি ও প্রত্যক্ষ অন্তর্ভুক্ত। এ পর্যায়ে সংজ্ঞা বা উক্তিটি থেকে যে জ্ঞান আহরিত হয় তা স্মৃতি, এবং প্রত্যক্ষিত প্রাণীটির জ্ঞান হল প্রত্যক্ষ।

পরবর্তী নৈয়ায়িক গঙ্গেশ প্রদত্ত উপমানের সংজ্ঞা গৌতম প্রদত্ত সংজ্ঞা থেকে ব্যাপকতর। গঙ্গেশের মতে, উপমান হল এমন একটি জ্ঞান যেখানে একটি শব্দ একটি অপরিচিত বস্তুর জাতিগত লক্ষণকে প্রকাশ করে এবং এই জাতিগত লক্ষণের সাথে একটি পরিচিত বস্তুর মিল ও অমিল খুঁজে পাওয়া যায়।[৬৬] তাঁর মতে, গবয় কোন বিশেষ বস্তুর নাম নয় বরং এটি একটি বস্তুর জাতিগত লক্ষণ নির্দেশ করে।

উপমানের শ্রেণী বিভাগ : উদয়ণাচার্য এবং বৈদিক ভাষ্যকার বাচস্পতিমিশ্র দু'প্রকার উপমানের কথা বলেন। স্বধর্মোপমান বা সাদৃশ্যের ভিত্তিতে উপমান। বিধর্মোপমান বা বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে উপমান। গঙ্গেশও এ দু'প্রকার উপমানের কথা বলেন [৬৭]

স্বধর্ম ও বিধর্মো উপমান : যখন সংজ্ঞা ও সঙ্গির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে উপমান জ্ঞান সাধিত হয় তখন তা স্বধর্মোপমান। যেমন, গবয় গরু সাদৃশ। আবার যখন বৈসাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে উপমান জ্ঞান সাধিত হয় তখন তা বিধর্মোপমান। যেমন, ঘোড়া গরুর মত নয়।

ভরদ্বাজ এই দুই প্রকার উপমান ছাড়াও আরেক প্রকার উপমানের কথা বলেন। এতে নির্দিষ্ট গুণাবলীর সাদৃশ্যের ভিত্তিতে উপমান সাধিত হয়। যেমন, ঘাড় লম্বা ও গলা ঝুলন্ত চতুস্পদ জন্তুই উট--ভারতের উত্তর প্রদেশের একজন লোকের এ উক্তি থেকে দক্ষিণ প্রদেশের একজন লোকের উট সম্পর্কে জ্ঞানই হল এ প্রকার উপমান। কিন্তু, বাচস্পতি মিশ্রের মতে, এধরনের উপমান বিধর্মোপমানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

মীমাংসা উপমানের সাথে ন্যায় উপমানের পার্থক্য : মীমাংসা উপমানের সাথে ন্যায় উপমানের দু'টি পার্থক্য দেখা যায়; (১) মীমাংসা উপমানে স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত বস্তুর সাথে প্রত্যক্ষিত বস্তুর সাদৃশ্য দেখা হয়, কিন্তু ন্যায় উপমানে সংজ্ঞা বা প্রসিদ্ধ বস্তুর বিবরণের সাথে সঙ্গি বা সংজ্ঞা নির্দেশিত বস্তুর জ্ঞানের সাদৃশ্য দেখা হয়। (২) মীমাংসা উপমানে কেবলমাত্র সাদৃশ্যের ভিত্তিতে উপমান জ্ঞান হয়। কিন্তু ন্যায় উপমানে কোন কোন সময়ে বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতেও উপমান সাধিত হয়।

পাশ্চাত্য সাদৃশ্যানুমানের সাথে ন্যায় উপমানের পার্থক্য : পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্যায় সাদৃশ্যমূলক অনুমান ও ন্যায়ের উপমান উভয়ই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সাধিত হলেও তিন দিক থেকে এদের পার্থক্য আছে। (১) সাদৃশ্যানুমান শব্দ জ্ঞান নির্ভর নয় কিন্তু উপমান শব্দ জ্ঞান নির্ভর। (২) সাদৃশ্যানুমান লিঙ্গ ও লিঙ্গির সম্বন্ধ নয় কিন্তু উপমান লিঙ্গ ও লিঙ্গির সম্বন্ধ জ্ঞান। (৩) সাদৃশ্যানুমানে কখনও বৈসাদৃশ্যের উপর নির্ভর করা হয় না। কিন্তু উপমানে কোন কোন সময় বৈসাদৃশ্যের উপর নির্ভর করা হয়।

(৪) **শব্দ প্রমাণ :** ন্যায় দর্শনের চতুর্থ বা শেষ প্রমাণ হল শব্দ। গৌতম শব্দের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, যে ব্যক্তির নৈতিক নিয়ম বা ধর্ম সম্পর্কে সাক্ষাৎ জ্ঞান আছে এবং যে ব্যক্তি অন্যান্য মানুষের পাপমুক্তি ও পুণ্যলাভের পথ প্রদর্শন করতে পারে সে ব্যক্তিই বিশ্বস্ত বা আপ্ত-ব্যক্তি এবং তাঁর বচনই আপ্ত বচন বা শব্দ। এসব ব্যক্তি বস্তুর যথার্থ স্বরূপের জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম।[৬৮] বাক্য বা বচনের মাধ্যমে শব্দ জ্ঞান প্রকাশিত হয়। বচনের জ্ঞানই হল প্রমাণ এবং বচনের জ্ঞানের অর্থ উপলব্ধিই হল প্রমিতি। উল্লেখ্য যে, ন্যায় মতে প্রত্যক্ষণ হল ইন্দ্রিয় ও বস্তুর পারস্পরিক সংযোগের জ্ঞান অনুমান হল ব্যাপ্তি জ্ঞান, উপমান সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের জ্ঞান এবং শব্দ হল বাক্য বা শব্দের জ্ঞান।

Dhaka University Institutional Repository

মীমাংসা দার্শনিক কুমারিল ভট্ট মানবীয় ও অতিমানবীয় শব্দ জ্ঞানের কথা বলেন। প্রভাকর মিশ্র শুধুমাত্র বৈদিক শব্দের কথা বলেন, কিন্তু ন্যায় শব্দ প্রমাণ শুধুমাত্র মানবীয়। ন্যায় শব্দ প্রমাণকে যথার্থ হওয়ার জন্য এর প্রায়োগিক মূল্য থাকতে হবে অর্থাৎ তা শ্রোতার পাপমুক্তির পথ নির্দেশ করবে। মীমাংসা শব্দ প্রমাণের এই প্রায়োগিক গুরুত্ব নাই।

শব্দের শ্রেণী বিভাগ : প্রাচীন ও নব্য ন্যায় মিলে ন্যায় শব্দ প্রমাণকে মোট চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ শব্দের বিষয়বস্তুর প্রকৃতির ভিন্নতার প্রেক্ষিতে শব্দ প্রমাণকে দুইভাগে ভাগ করেন। যথা, প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুর শব্দ ও অপ্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুর শব্দ। অন্যদিকে, শব্দকর্তার প্রকৃতির ভিন্নতার ভিত্তিতে নব্য নৈয়ায়িকগণ শব্দকে দুইভাগে ভাগ করেন। যথা, লৌকিক শব্দ ও বৈদিক শব্দ।

প্রত্যক্ষযোগ্য ও অপ্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুর শব্দ : প্রাচীন ন্যায় দার্শনিকগণ শব্দকে প্রত্যক্ষযোগ্য ও অপ্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুর শব্দ – এই দুই ভাগে ভাগ করেন।[৬৯] শব্দের বিষয়বস্তুর প্রকৃতির ভিন্নতার ভিত্তিতে এ পার্থক্য করা হয়। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু সম্পর্কে আপ্ত ব্যক্তির বচনকে প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুর শব্দ এবং ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু সম্পর্কে আপ্ত ব্যক্তির বচনকে অপ্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুর শব্দ বলে। প্রথম প্রকার শব্দ জ্ঞানের বিষয়বস্তু এ জগতে পাওয়া যায়, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার শব্দজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে এ জগতে পাওয়া যায় না। পরজগতে অর্থাৎ স্বর্গ, নরক বা পরজন্মে এধরনের শব্দজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে পাওয়া যায়।[৭০]

লৌকিক ও বৈদিক শব্দ : নব্য নৈয়ায়িকগণ দু'ধরনের শব্দ প্রমাণের কথা বলেন। এগুলো হল, লৌকিক শব্দ ও বৈদিক শব্দ।[৭১] শব্দ কর্তার প্রকৃতির ভিন্নতার ভিত্তিতে এ বিভাগ করা হয়। লৌকিক শব্দ হল ব্যক্তি মানুষের বচন। বিশ্বস্ত ব্যক্তির বচন হলে তা বৈধ এবং অবিশ্বস্ত ব্যক্তির বচন হলে তা অবৈধ। সুতরাং, লৌকিক শব্দের বৈধতা স্বতপ্রমাণিত নয় বরং ব্যক্তির চরিত্রের বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করে। বৈদিক শব্দ হল বেদের বচন। নৈয়ায়িকদের মতে, বেদ নৈর্ব্যক্তিক নয়। বেদ সর্বজ্ঞ ব্যক্তি ঈশ্বরের শব্দ দ্বারা গঠিত। তাই তা বৈধ। সুতরাং, বৈদিক শব্দ স্বতপ্রমাণিত।

মীমাংসা শব্দ প্রমাণের সাথে নৈয়ায়িক শব্দ প্রমাণের পার্থক্য : মীমাংসা দর্শনে শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করা হলেও নৈয়ায়িকদের শব্দ প্রমাণের সাথে মীমাংসা শব্দ প্রমাণের পার্থক্য লক্ষিত হয়। এগুলো হল; (১) মীমাংসা ভাষ্যকার কুমারিল ভট্ট ও প্রভাকর মিশ্র উভয়ই শব্দজ্ঞানকে অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞান হিসাবে আখ্যায়িত করেন। অর্থাৎ, মীমাংসা শব্দজ্ঞানের বিষয়বস্তু অতীন্দ্রিয়। কিন্তু, ন্যায় দর্শনে শব্দজ্ঞানকে শুধুমাত্র অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞান বলা হয় নাই। প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুর জ্ঞানকেও শব্দ বলা হয়েছে। সুতরাং, ন্যায়ের শব্দজ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় উভয় প্রকার বস্তুর জ্ঞান, কিন্তু মীমাংসা শব্দজ্ঞান শুধুমাত্র অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞান। এবং (২) নব্য নৈয়ায়িকগণ বৈদিক শব্দের কথা বললেও পূর্ববর্তী নৈয়ায়িকগণ কেবল মানবীয় শব্দের কথা বলেছেন। কিন্তু মীমাংসা দর্শনে দুই প্রকার শব্দকে স্বীকার করা হয়েছে।

জ্ঞানের প্রামাণ্য : নৈয়ায়িকগণ অনুরূপতাকে সত্যতার মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেণ। অর্থাৎ, তাঁদের মতে, জ্ঞানের সত্যতা জ্ঞানের মধ্যে নয় বাইরের শর্তের উপর নির্ভর করে। একারনে ন্যায় দর্শন জ্ঞানের স্বতপ্রামাণ্য স্বীকার করে না, বরং পরতপ্রামাণ্য স্বীকার করে। অর্থাৎ, জ্ঞানের প্রামাণ্য জ্ঞানের মধ্যে নয় বরং জ্ঞানের বাইরে অন্যান্য শর্তের উপর নির্ভরশীল। এদিক থেকে ন্যায় দর্শন মীমাংসা ও বেদান্ত বিরোধী। কারণ, মীমাংসা দর্শনে সকল প্রকার জ্ঞানের এবং বেদান্ত দর্শনে বিশুদ্ধ বা তত্ত্বজ্ঞানের স্বতপ্রামাণ্য স্বীকার করা হয়েছে।

পূর্বেই একথা বলা হয়েছে যে, ন্যায় দর্শন প্রধানত জ্ঞানবিদ্যাকেন্দ্রীক এবং ন্যায় তত্ত্ববিদ্যা মূলত ন্যায় জ্ঞানবিদ্যার উপর নির্ভরশীল। ন্যায় জ্ঞানবিদ্যা তথা প্রমাণতত্ত্বের উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ন্যায় দার্শনিকগণ জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় জ্ঞানের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, প্রমা, অপ্রমা, প্রমাণ, সত্যতা, প্রামাণ্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গুরুত্ব সহকারে এবং বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে প্রমাণতত্ত্বের আলোচনা সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ন্যায় দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ এবং উপমান এই চার প্রকার প্রমাণকে গ্রহণ করলেও প্রত্যক্ষকে সর্ব প্রধান ও সর্ব প্রথম স্থান দিয়েছেন। কারণ, নৈয়ায়িকদের মতে, প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণই সিদ্ধ হয় না। অনুমান, উপমান, শব্দ সবই প্রত্যক্ষ নির্ভর। এ ছাড়াও, নৈয়ায়িকগণ মীমাংসা ও অদ্বৈত বেদান্ত স্বীকৃত অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না। তাঁরা অর্থাপত্তিকে অনুমানের মধ্যে এবং অনুপলব্ধিকে প্রত্যক্ষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেছেন।[৭২] ন্যায় প্রমাণতত্ত্বের উপরোক্ত আলোচনা এ কথাই প্রমাণ করে যে, ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যা বিচারবিযুক্তবাদী নয়, বরং অতি সূক্ষ বিচার বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়া, তত্ত্ববিদ্যার পূর্বে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার উপর প্রাধান্য দেয়ার জন্য ন্যায় জ্ঞানবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ মর্যাদার দাবীদার। কেননা, তত্ত্ববিদ্যার আলোচনার পূর্বে এ জ্ঞান কিভাবে পাওয়া যায় অর্থাৎ জ্ঞানবিদ্যা তথা প্রমাণতত্ত্বের আলোচনা করা যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। নৈয়ায়িকগণ তাঁদের প্রমাণতত্ত্বে যেসব প্রমাণকে স্বীকার করেছেন এবং এসব প্রমাণ দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানকে যেভাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন তা নিম্নে ছকের সাহায্যে দেখানো হল :

Dhaka University Institutional Repository

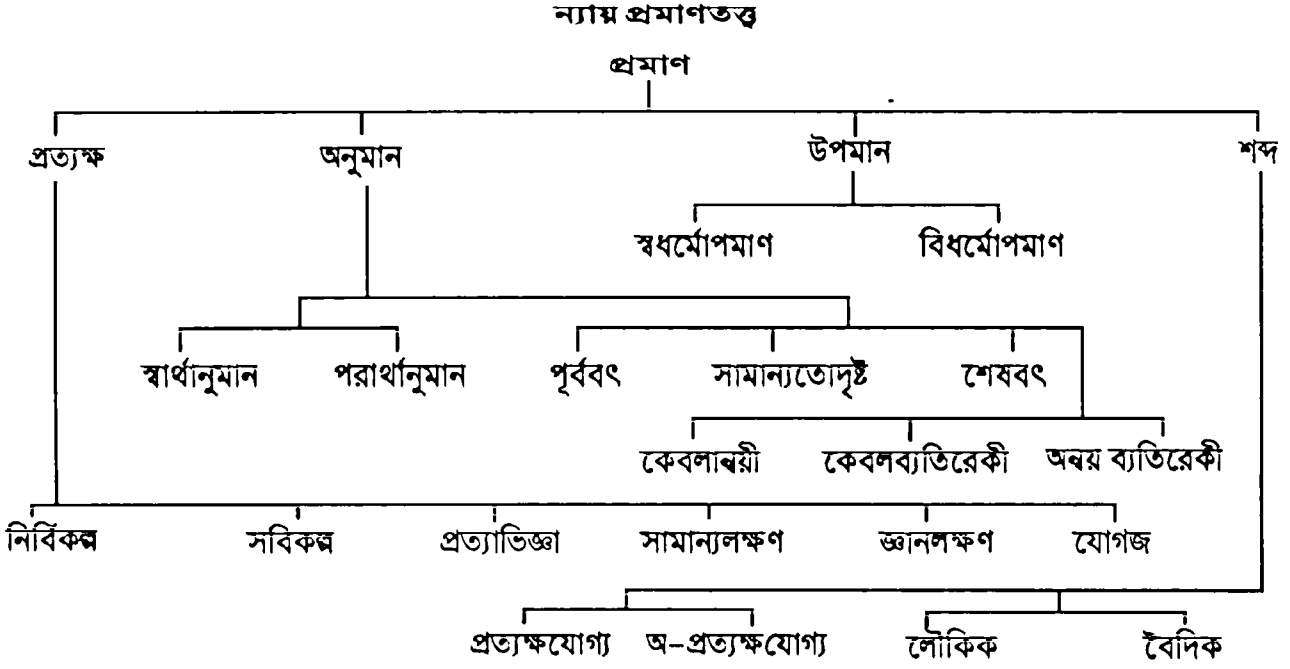

১.৪ সাংখ্য জ্ঞানবিদ্যা

ভারতীয় দর্শনের প্রাচীনতম চিন্তাধারার মধ্যে অন্যতম সাংখ্য দর্শন মূলত বেদের জ্ঞানকাণ্ডের অনুসারী।[৭৩] সাংখ্য দার্শনিকগণ তত্ত্বজ্ঞান লাভকেই আত্মা অর্থাৎ পুরুষ বা কর্তা বা জ্ঞাতার মোক্ষলাভের একমাত্র পথ বলে মনে করায় এ দর্শনে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। সাংখ্য শব্দটির একটি অর্থ হল সম্যক জ্ঞান (সম্ > সম্যক, খ্যা > জ্ঞান)। সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য বৈধ জ্ঞানের উপায় বা প্রমাণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাই সাংখ্য জ্ঞানবিদ্যায় যথার্থ জ্ঞানের প্রকৃতি তথা প্রমা ও প্রমাণতত্ত্ব সবিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে।

সাংখ্য দার্শনিকদের মতে, জ্ঞানের মধ্যে চারটি উপাদান অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞাতা বা প্রমাতৃ, জ্ঞেয় বা প্রমেয়, জ্ঞানের উপায় বা প্রমাণ এবং বৈধ জ্ঞান বা প্রমা। সাংখ্য দর্শনের অন্যতম ভাষ্যকার, সাংখ্য প্রবচন ভাষ্য এবং সাংখ্য শাস্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে, বিশুদ্ধ আত্মা বা পুরুষই জ্ঞাতা বা প্রমাতৃ, বুদ্ধির ধরন যা বিষয়বস্তুর আকারে আকারিত হয় তাই প্রমাণ। আত্মায় বস্তুর আকারের সাথে বুদ্ধির ধরনের যে প্রতিফলন ঘটে তাই বৈধ জ্ঞান, আত্মায় প্রতিফলিত বুদ্ধির ধরন দ্বারা যে বস্তুর উপলব্ধি ঘটে তাই জ্ঞেয় বস্তু। সুতরাং বুদ্ধির ধরন হল জ্ঞানের উপায় এবং বুদ্ধির ধরনের ফলস্বরূপ আত্মায় যে জ্ঞান হয় তাই হল বৈধ জ্ঞান। আত্মা প্রত্যক্ষভাবে বুদ্ধির ধরনকে জানে। বুদ্ধির ধরনের মাধ্যমে বাহ্য বস্তু আত্মায় প্রতিফলিত হলে আত্মা বাহ্য বস্তুর জ্ঞান পায়। অর্থাৎ আত্মা বাহ্য বস্তুকে পরোক্ষভাবে জানে। জ্ঞানোৎপত্তির সময় বাহ্য বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের এবং ইন্দ্রিয়ের সাথে মনের সংযোগ হয়। তখন বুদ্ধি বিষয়াকারে পরিণত হয় এবং এতে পুরুষের বা আত্মার চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয়। এ অবস্থায় পুরুষ বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে।

সাংখ্য দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কপিল বৈধজ্ঞান বলতে পূর্বে জ্ঞাত নয় এমন কোন বস্তুর সবিকল্প জ্ঞানকে বুঝান।[৭৪] *সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী* গ্রন্থের রচয়িতা বাচস্পতি মিশ্রের মতে, বুদ্ধির ধরন যখন একটি বস্তুকে সংশয়াতীত, যথার্থ এবং পূর্বে অজ্ঞাত বলে উপলব্ধি করে তখন বৈধজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ বুদ্ধির ধরনের ফলস্বরূপ আত্মায় যে জ্ঞান হয় তাই বৈধ জ্ঞান।[৭৫] বৈধজ্ঞান হল নির্দিষ্ট ও সবিকল্প জ্ঞান। বৈধ জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হল যথার্থতা, নতুনত্ব এবং সুনির্দিষ্টতা। সাংখ্য দর্শনে তিনটি প্রমাণকে স্বীকার করা হয়েছে। এগুলো হলঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ।[৭৬]

(১) **প্রত্যক্ষ ঃ** *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থের রচয়িতা ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ প্রমাণের যে সংজ্ঞা দেন তা মীমাংসা বা ন্যায় দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রমাণের সংজ্ঞার সাথে অভিন্ন।[৭৭] বাচস্পতি প্রত্যক্ষের তিনটি উপাদানের কথা বলেন। প্রথমত, প্রত্যক্ষের অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক একটি যথার্থ বস্তু থাকবে। এ বৈশিষ্ট্যই ভ্রান্তি থেকে প্রত্যক্ষকে আলাদা করে। এখানে মাটি, জল এগুলো বাহ্য এবং সুখ, দুঃখ অভ্যন্তরীণ বস্তু। দ্বিতীয়ত, একটি বিশেষ ধরনের প্রত্যক্ষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সাথে বিশেষ ধরনের বস্তুর সংযোগের ফলে ঘটে। এ বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষকে অনুমান, স্মৃতি ইত্যাদি থেকে পৃথক করে। তৃতীয়ত, প্রত্যক্ষ বুদ্ধির ক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষকে সংশয় ও অনির্দিষ্ঠ জ্ঞান থেকে পৃথক করে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যক্ষের শ্রেণী বিভাগ : সাংখ্য দর্শনে প্রত্যক্ষকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যক্ষে উপায়ের ভিন্নতার প্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষ দুই প্রকার। যথা, লৌকিক ও অলৌকিক। প্রত্যক্ষের প্রকৃতির দিকে থেকে প্রত্যক্ষ দুই প্রকার। যথা, সবিকল্প ও নির্বিকল্প।

লৌকিক ও অলৌকিক প্রত্যক্ষ : প্রত্যক্ষের উপায়ের ভিন্নতার ভিত্তিতে সাংখ্য দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষকে লৌকিক ও অলৌকিক এ দুই ভাগে ভাগ করেন। বাহ্য ইন্দ্রিয় ও বাহ্য বস্তুর সংযোগের ফলে যে প্রত্যক্ষ হয় তা লৌকিক প্রত্যক্ষ। পক্ষান্তরে, অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা যে প্রত্যক্ষ হয় তা অলৌকিক প্রত্যক্ষ। অন্য কথায়, যোগীদের স্বজ্ঞাজাত জ্ঞান হল অলৌকিক প্রত্যক্ষ।

সবিকল্প ও নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ : মীমাংসা দর্শনের মত সাংখ্য দর্শনেও প্রত্যক্ষের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে প্রত্যক্ষকে সবিকল্প ও নির্বিকল্প এ দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়। বাচস্পতি মিশ্র নির্বিকল্প প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মীমাংসা দার্শনিক কুমারিল ভট্ট প্রদত্ত সংজ্ঞার উদ্বৃতি দিয়েছেন।[৭৮] তিনি সবিকল্প প্রত্যক্ষের যে সংজ্ঞা দেন তাও কুমারিল ভট্ট প্রদত্ত সবিকল্প প্রত্যক্ষের সংজ্ঞার সাথে অভিন্ন।[৭৯] সাংখ্য দার্শনিকদের মতে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ বাহ্য ইন্দ্রিয় এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষ অন্তরেন্দ্রিয় বা মনের কাজ।

(২) **অনুমান:** সাংখ্য দার্শনিকগণ প্রদত্ত অনুমানের সংজ্ঞা মীমাংসা দার্শনিক শবরস্বামী প্রদত্ত অনুমানের সংজ্ঞার অনুরূপ।[৮০] বাচস্পতি মিশ্রের মতে, অনুমান হল সেই জ্ঞান যা মধ্যপদের ভিত্তিতে সাধ্য ও পক্ষপদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। তাঁর মতে, অনুমান-জ্ঞান সাধ্য ও পক্ষ পদ থেকে নি:সৃত হয়।[৮১]

সাংখ্য দর্শনে মধ্য পদের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, মধ্য পদ অবশ্যই পক্ষপদে উপস্থিত থাকবে। দ্বিতীয়ত, মধ্যপদ সকল সদর্থক দৃষ্টান্তে উপস্থিত থাকবে। তৃতীয়ত, মধ্যপদ সকল নঞর্থক দৃষ্টান্তে, অর্থাৎ যেখানে সাধ্যপদ অনুপস্থিত সেখানে অনুপস্থিত থাকবে। চতুর্থত, স্ববিরোধী সিদ্ধান্তে মধ্যপদ অনুপস্থিত থাকবে। পঞ্চমত, মধ্যপদ পক্ষ পদের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হবে না। সাংখ্য দার্শনিকগণ পঞ্চ-অবয়বযুক্ত ন্যায় অনুমানকে স্বীকার করেছেন।[৮২]

অনুমানের শ্রেণী বিভাগ : অনুমানকে সাংখ্য দর্শনে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। বাচস্পতি মিশ্র অনুমানকে দু'ভাগে ভাগ করেন। যথা, বীত এবং অবীত। অবীত অনুমানকে শেষবৎ বা পরিশেষ অনুমানও বলা হয়। তিনি বীত অনুমানকে আবার দু'ভাগে ভাগ করেন। যথা, পূর্ববৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। সুতরাং বলা যায়, সাংখ্য দর্শনের অনুমান মোট তিন প্রকার। পূর্ববৎ, সামান্যতোদৃষ্ট এবং অবীত বা শেষবৎ। বিজ্ঞান ভিক্ষুও এ তিন প্রকার অনুমানের কথা বলেন। সাংখ্য দার্শনিকদের বিভিন্ন প্রকার অনুমানের সংজ্ঞা ন্যায়ের পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের সংজ্ঞার সাথে অভিন্ন।[৮৩]

শব্দ : ইতিপূর্বে মীমাংসা শব্দ-প্রমাণ আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, মীমাংসা দার্শনিক কুমারিল ভট্ট শব্দকে মানবীয় এবং অতিমানবীয় এ দু'ভাগে ভাগ করেন। বিন্তু প্রভাকর মিশ্র মানবীয় শব্দকে অস্বীকার করেন এবং শুধুমাত্র অতিমানবীয় শব্দকে স্বীকার করেন। সাংখ্য দার্শনিকদের শব্দ-প্রমাণ কুমারিল ভট্ট নির্দেশিত অতি মানবীয় শব্দ এবং প্রভাকর মিশ্র নির্দেশিত শব্দ-জ্ঞানের সাথে অভিন্ন।[৮৪] লৌকিক শব্দ প্রত্যক্ষ ও অনুমান নির্ভর বলে সাংখ্য দার্শনিকগণ একে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে স্বীকৃতি দেন নি। প্রাচীন ন্যায় দর্শনে বৈদিক বা অতি মানবীয় শব্দকে স্বীকার করা হয় নি। নব্য ন্যায় দর্শন উভয় প্রকার শব্দকে স্বীকার করেছে। সাংখ্য দার্শনিকদের মতে, বৈদিক শব্দ বলতে যথার্থ প্রত্যাদেশকে বুঝায়। বেদ হল অতীন্দ্রিয় সত্তার প্রত্যাদেশ। তা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উর্দ্ধে এবং নৈর্ব্যক্তিক। যেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নেই সেহেতু শব্দ-প্রমাণ ঈশ্বরের দ্বারাও সৃষ্ট নয়। আবার শব্দ ব্যক্তির দ্বারাও সৃষ্ট নয়। তথাপি তা শাশ্বত নয়।[৮৫] বেদ হল প্রজ্ঞাশীল ঋষিদের প্রতি শাশ্বত সত্যের প্রত্যাদেশ। এর শাশ্বততা বলতে এটাই বুঝানো হয় যে, একই রকম সত্য বিভিন্ন সময়ের ঋষিদের কাছে বিরামহীনভাবে প্রত্যাদেশিত হয়।[৮৬] বৈদিক শব্দ নৈর্ব্যক্তিক বলে সন্দেহ ও প্রতারণার উর্দ্ধে। বেদের সত্য-প্রত্যাদেশ দেবার অভ্যন্তরীণ শক্তি আছে। তাই তা স্বতপ্রামাণ্য।

উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি স্বতন্ত্র প্রমাণ নয় : সাংখ্য দর্শনে উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণের স্বীকৃতি দেয়া হয় না। কেননা, বিশ্বস্ত ব্যক্তির বচন হল লৌকিক শব্দ, গরুর প্রত্যক্ষণ হল প্রত্যক্ষ এবং এর দ্বারা নির্দেশিত গবয়ের জ্ঞান হল অনুমান। সুতরাং সাংখ্যদের মতে, উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করার মত কোন কারণ নেই। অন্যদিকে, স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে অর্থাপত্তি দু'টো ঘটনার মধ্যকার অসঙ্গতিকে অপসারণ করতে পারে না। এক্ষেত্রে অর্থাপত্তিকে অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়। সুতরাং অর্থাপত্তিও অনুমান ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ ছাড়া,সাংখ্য দার্শনিকদের মতে, অনুপলব্ধির কোন স্বতন্ত্র বস্তু নাই। সুতরাং অনুপলব্ধি স্বতন্ত্র প্রমাণ নয়। কারণ, একমাত্র অপরিবর্তনীয় আত্মা ছাড়া অন্য সবকিছুই নিয়ত পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তন প্রত্যক্ষযোগ্য। একটি বিশেষ স্থানে একটি পানিপাত্রকে প্রত্যক্ষণ না করার অর্থ হল ঐ স্থানের নির্দিষ্ট পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা। মীমাংসা দার্শনিক প্রভাকর মিশ্রের মত সাংখ্য দার্শনিকগণও একথা বলেন যে, অনুপলব্ধিতে যেহেতু কোন বস্তু যেখানে ছিল সেখানে সে বস্তুর অনুপস্থিতি উপলব্ধি করা হয় সেহেতু এ অনুপলব্ধি মূলত শুন্যস্থান বা আধারের জ্ঞানের সাথে অভিন্ন।[৮৭] সুতরাং এটি স্বতন্ত্র প্রমাণ নয়।

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানের প্রামাণ্য : সাংখ্য দার্শনিকগণ জ্ঞানের বৈধতা ও অবৈধতা জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল বলে মনে করেন। জ্ঞানের বৈধতা জ্ঞানের কারণের উপর নির্ভর করে না। তাই বৈধজ্ঞান সব সময়ই স্বতপ্রামাণ্য। যে জ্ঞান বৈধ তা স্বনিহিতভাবেই বৈধ এবং যে জ্ঞান অবৈধ তা স্বনিহিতভাবেই অবৈধ। কার্যকারিতা বা বাস্তব উপযোগিতা হল সত্যতা বা যথার্থতার পরীক্ষা। বৈধজ্ঞান কার্য সম্পাদনে সক্ষম। কিন্তু তাই বলে জ্ঞানের বৈধতা সফল কার্য সম্পাদনের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং জ্ঞানের প্রামাণ্যের ক্ষেত্রে সাংখ্য দার্শনিকদের মত মীমাংসা ও বেদান্ত দার্শনিকদের মতের সাথে অভিন্ন এবং ন্যায় মতের বিরোধী। কারণ, ন্যায় দর্শনে জ্ঞানের পরতপ্রামাণ্য স্বীকৃত হয়েছে।

সাংখ্য জ্ঞানবিদ্যা তথা প্রমাণতত্ত্বের উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, সাংখ্য দার্শনিকগণ মীমাংসা ও বেদান্ত দার্শনিকদের প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধিকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন নি। কারণ তাঁদের মতে, এ তিনটি প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এ তিনটি প্রমাণের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। সাংখ্য প্রত্যক্ষের শ্রেণী বিভাগ অদ্বৈত বেদান্ত প্রত্যক্ষের শ্রেণী বিভাগের অনুরূপ। আবার সাংখ্য শব্দ-জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ প্রভাকর মীমাংসক ও অদ্বৈত বেদান্তের শব্দ-জ্ঞানের শ্রেণী বিভাগের সাথে অভিন্ন। জ্ঞানের প্রমাণ্যের ক্ষেত্রে সাংখ্যরা মীমাংসা ও বেদান্ত দার্শনিকদের সাথে একমত। সাংখ্য জ্ঞানবিদ্যার সমালোচনায় একথা বলা হয় যে সাংখ্য দার্শনিকগণ জ্ঞাতা অর্থাৎ পুরুষ এবং জ্ঞেয় অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে যে দ্বৈতবাদের সৃষ্টি করেন তাঁদের জ্ঞানবিদ্যায় তাঁরা এর সন্তোষজনক সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের প্রমাণতত্ত্বের আলোচনা থেকে সম্ভবত একথা স্বীকার করতেই হয় যে, প্রাচীনকালেও তাঁরা যথেষ্ট বিশ্লেষণী ও বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। সাংখ্য দার্শনিকদের দ্বারা স্বীকৃত প্রমাণগুলো এবং এসব প্রমাণ দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানের শ্রেণী বিভাগ নিম্নে ছকের সাহায্যে দেখানো হলঃ

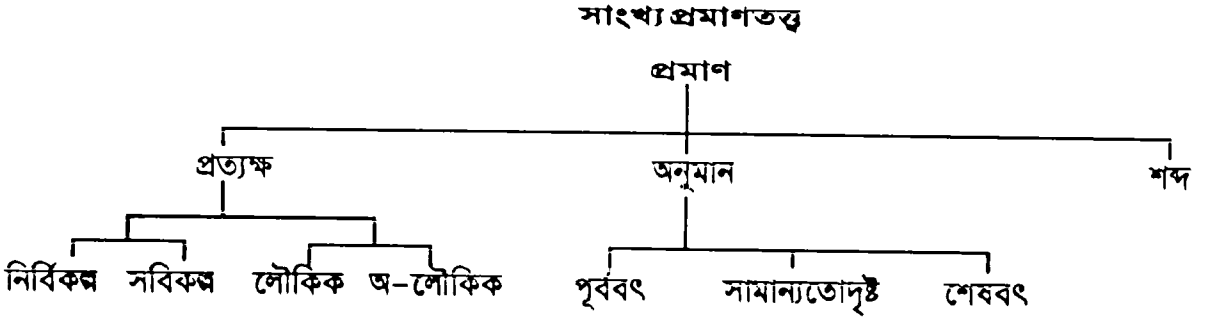

১.৫ যোগ জ্ঞানবিদ্যা

মহর্ষি পতঞ্জলী প্রতিষ্ঠিত যোগ দর্শন মূলত সাংখ্য দর্শনের একটি পদ্ধতিগত ও ব্যবহারিক দিক।[৮৮] পতঞ্জলী কতিপয় বিষয় ব্যতীত কপিলের দ্বারা প্রবর্তিত সাংখ্য মতকেই স্বীকার করেন। সাংখ্য দর্শনের নীরিশ্বরবাদের ক্ষেত্রে যোগ দর্শন ঈশ্বরবাদ সমর্থন করে বলে যোগ দর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এ দর্শনে কেবলমাত্র জ্ঞানকেই মোক্ষলাভের উপায় মনে করা হয়েছে। যোগ দর্শন সাংখ্যের জ্ঞানযোগ সমর্থন করে কিন্তু এর সাথে কর্মযোগকে যুক্ত করে। এতে জ্ঞান, ধ্যান, ক্রিয়া সব কিছুকেই মোক্ষের উপায় হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। সুতরাং যদিও সাংখ্যের মত যোগ দর্শনে জ্ঞানকেই একমাত্র মোক্ষের উপায় বলে অভিহিত করা হয় নি তবুও একথা সত্য যে, মোক্ষলাভের উপায় হিসাবে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার উপর যোগ দর্শনেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। এজন্যই যোগ দর্শনে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

সাংখ্য দর্শনের মত যোগ দর্শনও দেহস্থ ইন্দ্রিয়জ ও বাহ্য বিষয় এ উভয়ের সংযোগ হেতু চিত্তে যে সকল বিকার বা পরিমাণ ঘটে তাকে বৃত্তি নামে আখ্যায়িত করে। এ বৃত্তিই হল জ্ঞান। বৃত্তি বা জ্ঞান পাঁচ প্রকার। যথা, প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। প্রমাণের মাধ্যমেই যথার্থ জ্ঞান সাধিত হয়।

যোগ দর্শন বস্তুবাদকে সমর্থন করে। এ দর্শন অনুসারে বাহ্যবস্তুর যথার্থ সত্তা আছে। এবং জ্ঞানের মানসিক প্রকারগুলো দ্বারা বাহ্য বস্তুকে যথার্থভাবে জানা যায়। বস্তুর স্বকীয় যোগ্যতার জন্যই চৈতন্যের কাছে এটি উপস্থিত হয় এবং এর ফলেই জ্ঞান সম্ভব হয়। সুতরাং জ্ঞানের যথার্থতার জন্যই বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করতে হয়। যোগ দর্শনের অন্যতম ভাষ্যকার, *যোগভাষ্য* বা ব্যাসভাষ্যের রচয়িতা বেদব্যাসের মতে বৈধজ্ঞান দ্বারা যথার্থ বস্তুকে উপলব্ধি করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

যোগভাষ্যের ভাষ্য *তত্ত্ববৈশারদী* গ্রন্থের রচয়িতা বাচস্পতি মিশ্র বৈধ জ্ঞানকে অনধিগত বা পূর্বে অজ্ঞাত অথচ সফল কার্য সম্পাদনকারী জ্ঞান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন।[৮৯] ব্যাসের মতে, ভ্রান্তি বৈধ জ্ঞানের সাথে আত্মবিরোধী। যোগদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি পতঞ্জলীও সাংখ্য দার্শনিকদের মত তিন প্রকার প্রমাণকে স্বীকার করেছেন। এগুলো হল প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ।[৯০] এগুলোর প্রকারভেদ সম্পর্কে যোগ দার্শনিকদের মত সাংখ্য মতের অনুরূপ।

(১) **প্রত্যক্ষ :** প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ সম্পর্কে যোগ দার্শনিকগণ সাংখ্য দার্শনিকদের সাথে একমত।[৯১] যোগ দর্শনে সরাসরি উপলব্ধিকেই প্রত্যক্ষ বলা হয়েছে। বাচস্পতি মিশ্র প্রত্যক্ষের চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন। প্রথমত, প্রত্যক্ষে জ্ঞানের সঠিক বস্তুর যথার্থ উপলব্ধি ঘটে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষে একটি বাহ্য বস্তুকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করা হয়। তৃতীয়ত, প্রত্যক্ষে জ্ঞানের আকার বাহ্য বস্তুর অনুরূপ হয়। কারণ, বুদ্ধি বাহ্য বস্তুকে জ্ঞানাকারে পরিণত করে। চতুর্থত, প্রত্যক্ষে বস্তুর সামান্য লক্ষণ বা বিশেষ লক্ষণকে প্রত্যক্ষ করা হয় না। এমনকি এতে এমন কোন দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ করা হয় না যার মধ্যে এসব লক্ষণ অবস্থান করে। বরং এতে সামান্য ও বিশেষ উভয় লক্ষণ দ্বারা বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত বস্তুর জ্ঞান হয় যাতে বিশেষ লক্ষণগুলোর উপলব্ধিই হল প্রধান। এ বৈশিষ্ট্যই প্রত্যক্ষকে অনুমান থেকে আলাদা করে। কারণ, অনুমানে শুধু সামান্যলক্ষণের জ্ঞান হয়, সাংখ্য ও ন্যায় দর্শনের মত যোগ দর্শনেও অনুমান এবং শব্দের চেয়ে প্রত্যক্ষকে অধিকতর শক্তিশালী প্রমাণ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

(২) **অনুমান :** যোগ দর্শনের অনুমান-প্রমাণের প্রকৃতি ও প্রকারভেদ সাংখ্য অনুমান-প্রমাণের অনুরূপ।[৯২] যোগ দর্শন অনুসারে লিঙ্গ বা চিহ্ন এবং অনুমিত বস্তুর বা লিঙ্গীর মধ্যে নিয়ত সম্পর্কের জ্ঞানই অনুমানের ভিত্তি।[৯৩] প্রত্যক্ষে যেখানে বিশেষ লক্ষণকে উপলব্ধি করা হয় সেখানে অনুমানের ক্ষেত্রে সামান্যধর্মকে উপলব্ধি করা হয়।

(৩) **শব্দ :** যোগ দর্শনের শব্দ-প্রমাণ সাংখ্য শব্দ-প্রমাণের অনুরূপ।[৯৪] কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি, যিনি কোন বস্তু প্রত্যক্ষ বা অনুমান করেছেন তিনি যদি অন্য ব্যক্তিকে বচনের মাধ্যমে জ্ঞান দেন তবে বক্তার বচন থেকে শ্রোতার যে জ্ঞান হয় তাই শব্দ-জ্ঞান বা আগম। যোগ দার্শনিকদের মতে, বক্তাকে অবশ্যই সকল প্রকার ভ্রান্তি মুক্ত হতে হবে এবং তাঁর সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান ও শ্রোতার প্রতি সহানুভূতি থাকতে হবে। চরিত্রের দিক থেকেও বক্তা অবশ্যই বিশ্বস্ত হবেন। যদি বক্তা যথার্থ বস্তুকে প্রত্যক্ষ বা অনুমান না করেন এবং তিনি যদি বিশ্বস্ত না হন তবে শব্দ-প্রমাণ বৈধ হবে না। যোগ দার্শনিকদের মতে, ঈশ্বর আদি বক্তা। তিনি সর্বজ্ঞ। তাই তাঁর দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট বেদই হল শব্দ-জ্ঞান।

জ্ঞানের প্রামাণ্য : জ্ঞানের প্রামাণ্যের ক্ষেত্রেও যোগ দার্শনিকগণ স্বাভাবিকভাবেই সাংখ্য দর্শনের অনুসারী। অর্থাৎ যোগ দর্শনে জ্ঞানের স্বতপ্রামাণ্য স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং জ্ঞানের প্রামাণ্যের ক্ষেত্রে যোগ দর্শনের সাথে সাংখ্য, মীমাংসা ও অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের মিল এবং ন্যায় দর্শনের অমিল পরিলক্ষিত হয়। কারণ, ন্যায় দর্শনে পরতপ্রামাণ্য স্বীকার করা হয়।

যোগ জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কে উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, যোগ দার্শনিকগণ মূলত সাংখ্য দর্শনের মূলতত্ত্বকে গ্রহণ করে নিয়ে তাঁদের দার্শনিক মত প্রদান করেছেন। এ জন্য গীতায় যিনি সাংখ্য ও যোগকে একরূপ দেখেন তাঁকেই সম্যকদর্শী হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে।[৯৫] সাংখ্য দর্শনের সাথে যোগ দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল, যোগ দর্শনে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয়েছে এবং সাংখ্যের জ্ঞান মার্গের সাথে যোগ দর্শন কর্মমার্গকেও যুক্ত করেছে। অর্থাৎ বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে জ্ঞানলাভ যাতে সহজসাধ্য হয় তার পদ্ধতি নির্দেশ করেছে। তবে প্রমাণতত্ত্বের ক্ষেত্রে সাংখ্য দার্শনিকদের মতকেই যোগ দার্শনিকগণ স্বীকার করে নিয়েছেন। যোগ প্রমাণতত্ত্বে স্বীকৃত প্রমাণ এবং এর দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানের প্রকারভেদ ছকের সাহায্যে নিম্নে দেখানো গেলঃ

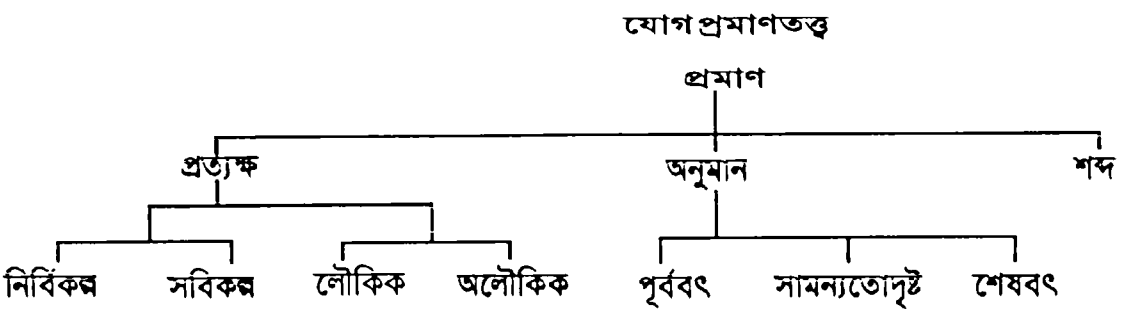

Dhaka University Institutional Repository

১.৬ বৈশেষিক জ্ঞানবিদ্যা

সাংখ্য ও যোগ দর্শনের মত ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়ে যথেষ্ট মিল লক্ষিত হয়।[৯৬] ন্যায় দর্শনের সাথে অভিন্নতার কারণে বৈশেষিক ও ন্যায়কে সমানতন্ত্র বলা হয়। ন্যায়ের মত বৈশেষিক দর্শনেও মোক্ষকে জীবনের পরম লক্ষ্য হিসাবে আখ্যায়িত করে মোক্ষের জন্য দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তত্ত্বজ্ঞান তথা যথার্থ জ্ঞানলাভের মাধ্যমে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটলেই মোক্ষলাভ সম্ভব। এজন্যই জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা ন্যায় দর্শনের মত বৈশেষিক দর্শনেও যথেষ্ঠ গুরুত্ব পায়।

বৈশেষিক দর্শনে বৈধ জ্ঞানকে বিদ্যা এবং অবৈধ জ্ঞানকে অবিদ্যা বলা হয়। বিদ্যা হল বস্তুর যথার্থ প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আর অবিদ্যা হল বস্তুর যথার্থ প্রকৃতি সম্পর্কে ভ্রান্ত জ্ঞান। বৈশেষিক দর্শনে দুই প্রকার প্রমাণ স্বীকার করা হয়েছে। এগুলো হল, প্রত্যক্ষ ও অনুমান। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের প্রকৃতি ও বিভাগ সম্পর্কে বৈশেষিক মত ন্যায় দার্শনিকদের মতের অনুরূপ।[৯৭] ন্যায় দার্শনিকগণ উপমান ও শব্দকে আলাদা প্রমাণরূপে স্বীকার করেন। কিন্তু বৈশেষিক দার্শনিকদের মতে উপমান ও শব্দ অনুমানের অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের মতে, যেহেতু শব্দ-প্রমাণের ভিত্তি হল শব্দ ও তার অর্থের মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধ এবং শব্দ হল লিঙ্গ বা চিহ্নস্বরূপ, যার মাধ্যমে শব্দের অর্থ অনুমান করা হয় সেহেতু শব্দ হল অনুমান। উপমান প্রকৃত পক্ষে শব্দ-প্রমাণ নির্ভর। কেননা উপমান বিশ্বস্ত ব্যক্তির উক্তির বৈধতার উপর নির্ভরশীল এবং এজন্য উপমানও অনুমানের অন্তর্গত।[৯৮]

ন্যায় উপমানের সমালোচনা : বৈশেষিক দার্শনিকগণ উপমানকে প্রত্যক্ষিত বস্তুর সাথে স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত বস্তুর সাদৃশ্যজ্ঞান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন। ন্যায়ের উপমান-প্রমাণকে সমালোচনা করতে গিয়ে তাঁরা একথা বলেন যে, ন্যায়ের উপমানে সংজ্ঞার সাথে সংজ্ঞীর সাদৃশ্য থাকে। তাই এতে যখন গবয়কে গবয় বলে উপমিতি জন্মে তখন জ্ঞাতা হয় লিঙ্গী গবয়ের স্বতন্ত্র স্বরূপ অর্থাৎ গবয়-স্বরূপ উপলব্ধি করেন নয়ত লিঙ্গী গবয় লিঙ্গ গরুর যে সাদৃশ্যমূলক লক্ষণগুলো ধারণ করে সে লক্ষণগুলো উপলব্ধি করেন। কিন্তু এতে গবয়স্বরূপের যে উপলব্ধি হয় তাতে উপমান হয় না। কারণ, লিঙ্গ বা গবয় দর্শনের সময় মূলত লিঙ্গীর সাথে লিঙ্গ বা গরুর সাদৃশ্য করা হয়। ফলে এতে লিঙ্গী বা গরুর প্রত্যাভিজ্ঞা হয়। এজন্যই বৈশেষিক দার্শনিকদের মতে, ন্যায়ের উপমান হয় প্রত্যক্ষ নয়ত প্রত্যাভিজ্ঞা,[৯৯] উপমান নয়। সালিকানাথ মিশ্র একইভাবে ন্যায়ের উপমানের সমালোচনা করে একে প্রত্যাভিজ্ঞা বলেছেন।[১০০]

জ্ঞানের প্রামাণ্য : ন্যায় দর্শনের মত বৈশেষিক দর্শনও জ্ঞানের পরত প্রামাণ্য স্বীকার করে। অর্থাৎ জ্ঞানের প্রামাণ্য জ্ঞানের বাইরের শর্তের উপর নির্ভরশীল। এদিক থেকে বৈশেষিক দর্শন সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে। কারণ, এসব দার্শনিক মতবাদে জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকৃত হয়েছে।

বৈশেষিক জ্ঞানবিদ্যা তথা প্রমাণতত্ত্ব সম্পর্কিত উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, যদিও বৈশেষিক দর্শন মোক্ষ বা মুক্তির প্রকৃতি ও মুক্তিলাভের উপায়ের ক্ষেত্রে ন্যায়ের অনুরূপ মত পোষণ করে তবুও জ্ঞানবিদ্যার, বিশেষত প্রমাণতত্ত্বের আলোচনায় ন্যায় প্রমাণতত্ত্বকে অনুরূপভাবে মেনে না নিয়ে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছে। তত্ত্ববিদ্যার ক্ষেত্রে ন্যায়ের ষোড়শ-পদার্থে যেমন বৈশেষিকের সপ্ত-পদার্থ প্রতিস্থাপিত হয়েছে তেমনি প্রমাণতত্ত্বের ক্ষেত্রেও ন্যায়ের চতুর্বিধ প্রমাণ বৈশেষিক দর্শনে দ্বিবিধ প্রমাণে রূপান্তরিত হয়েছে। বৈশেষিকগণ যুক্তি ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ন্যায়ের উপমান ও শব্দ-প্রমাণ কিভাবে স্বতন্ত্র প্রমাণ না হয়ে বরং অনুমানের পর্যায়ভুক্ত তাও দেখানোর চেষ্টা করেছেন। সুতরাং বলা যায়, ন্যায় ও বৈশেষিক সমাণতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানবিদ্যার, বিশেষত প্রমাণতত্ত্বের আলোচনায় বৈশেষিক দর্শন স্বতন্ত্র ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। বৈশেষিক নির্দেশিত প্রমাণতত্ত্ব নিম্নে ছকের সাহায্যে দেখানো হলঃ

বৈশেষিক প্রমাণতত্ত্ব

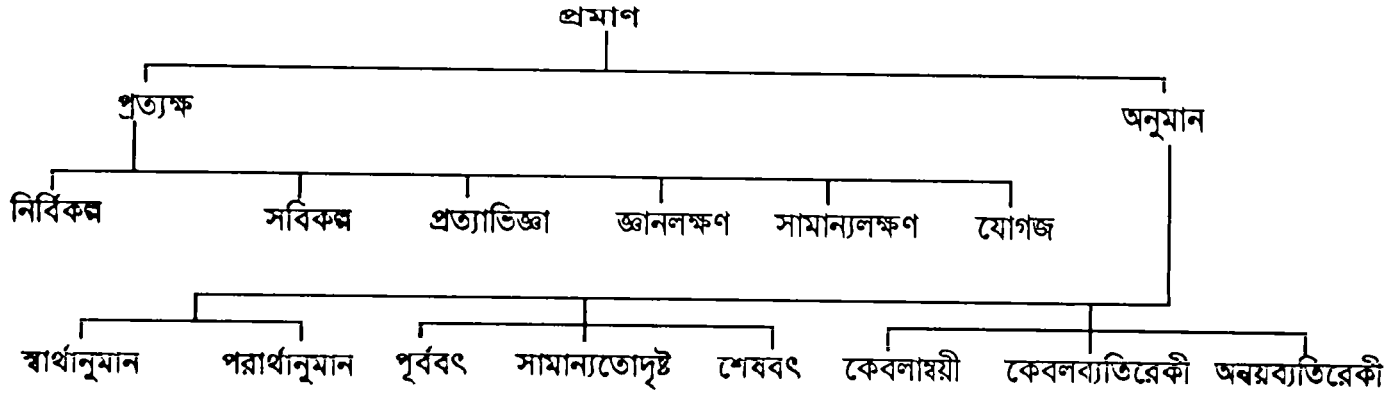

Dhaka University Institutional Repository

১.৭ বৌদ্ধ জ্ঞানবিদ্যা

বৌদ্ধ দর্শন ভারতীয় দর্শনে বেদ বিরোধী তিনটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি।[১০১] একটি বিশেষ সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে একদিকে যেমন যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের আগ্রহ ও শাস্ত্রের প্রতি অন্ধ আনুগত্যই মানুষের মনকে অধিকার করেছিল অন্যদিকে তেমনি একেশ্বরবাদের প্রভাবে ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান অপেক্ষা চরমতত্ত্বের জ্ঞানকেই শ্রেয়তর বিবেচনা করা হচ্ছিল। এই দু'টি ভাবধারার সংঘাতের সন্ধিক্ষণে প্রধানত পরাজাগতিক চিন্তাসর্বস্ব চিরায়ত সমাজ কাঠামোর মধ্যে গৌতম বুদ্ধ ভারতীয় দর্শনের একটি স্বাধীন যুক্তিনির্ভর চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়কারী এ চিন্তাধারায় যথার্থ জ্ঞানের বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্বসহ বিবেচনা করা হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনের মূল লক্ষ্য হল মানুষের দুঃখের বিনাশ তথা নির্বাণের পথনির্দেশ করা। দুঃখের জন্য বৌদ্ধ দর্শনে যে দ্বাদশ নিদান-জনিত ভবচক্রের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে প্রথম নিদান হল অবিদ্যা বা চারটি আর্য সত্য সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব। সুতরাং দুঃখ মুক্তির জন্য প্রথম প্রয়োজন অবিদ্যা দূরীকরণ বা যথার্থ জ্ঞানলাভ। যথার্থ জ্ঞানলাভের জন্য যথার্থ জ্ঞানের পদ্ধতি বা প্রমাণ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ অত্যাবশ্যক। তাই বৌদ্ধ দর্শনে প্রমাণতত্ত্ব যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে।

পাশ্চাত্য দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের মত বৌদ্ধ দর্শনেও জ্ঞানের উপাদানগুলো দেশ ও কালে অস্তিত্বশীল থাকে বলে মনে করা হয়েছে। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ সম্যক জ্ঞানকে প্রমা এবং অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞানকেই সম্যক জ্ঞান বলে মনে করেন। যা পূর্বে জ্ঞাত ছিল না তাকে জানিয়ে দিয়ে জ্ঞাতাকে প্রবৃত্ত কিংবা নিবৃত্ত করাই জ্ঞানের কাজ। স্মৃতিজ্ঞান যেহেতু পূর্বে জানা জ্ঞানেরই পুনরুৎপাদন সেহেতু বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে তা প্রমা নয়।

বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্মোত্তর বৈধ জ্ঞান বলতে জ্ঞেয় বস্তুর সাথে সমন্বয়পূর্ণ জ্ঞানকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, সঠিক জ্ঞান অকাম্য বস্তু বর্জন করতে সাহায্যে করে। ধর্মোত্তর ন্যায় দার্শনিকদের মত সত্যতার প্রায়োগিক পরীক্ষার কথা বলে বাস্তববাদী প্রয়োগবাদ সমর্থন করেন।[১০২] বৌদ্ধ দর্শনে মোট দুই প্রকার প্রমাণকে স্বীকার করা হয়েছে। এগুলো হল, প্রত্যক্ষ ও অনুমান।[১০৩] শুধুমাত্র এই দুই প্রকার উৎস থেকেই বৈধ জ্ঞান সম্ভব হয়। নিম্নে এসব প্রমাণ সংক্ষেপে আলোচিত হলঃ

(১) **প্রত্যক্ষ ঃ** *ন্যায় বিন্দু গ্রন্থের* রচয়িতা প্রখ্যাত বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্মকীর্তি প্রত্যক্ষ বলতে কল্পনাবর্জিত ভ্রান্তিহীন বস্তুর জ্ঞানকে বুঝান।[১০৪] এ জ্ঞান বৈধ। কারণ, এতে একটি বস্তুর স্বলক্ষণ বা স্বতন্ত্র উপলব্ধি জন্মে। প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের প্রকৃতির ভিন্নতার প্রেক্ষিতে মীমাংসা দর্শনে প্রত্যক্ষকে সবিকল্প ও নির্বিকল্প এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্মকীর্তি সবিকল্প প্রত্যক্ষকে তথাকথিত হিসাবে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে, সবিকল্প প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষের আওতাভুক্ত নয়। কারণ, এতে কল্পনা অন্তর্ভুক্ত। সবিকল্প প্রত্যক্ষ অবৈধ। কারণ, তা বস্তুর যথার্থ জ্ঞান নয়। নির্বিকল্প এবং গুণবিশিষ্ট বস্তুর উপর মনের প্রাক-প্রতাবকৃত আদর্শ গঠনই হল সবিকল্প প্রত্যক্ষ। এতে বস্তুর নাম জানা যায়। কিন্তু বস্তুর নাম বস্তুর গঠনের সাথে যুক্ত নয়। তাই তা অবৈধ। ধর্মকীর্তির মতে, কেবলমাত্র নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ-জ্ঞানই বৈধ। কারণ, এতে বস্তুর স্বতন্ত্র বা স্বলক্ষণ উপলব্ধি জন্মে। এতে কোন প্রকার কাল্পনিক গঠন বা নাম মিশ্রিত থাকে না। সুতরাং দেখা যায়, বৌদ্ধ দর্শনে একমাত্র নির্বিকল্প প্রত্যক্ষের অস্তিত্বকেই স্বীকার করা হয়েছে

প্রত্যক্ষের শ্রেণী বিভাগ ঃ প্রত্যক্ষের উপায়ভেদে বৌদ্ধ দর্শনে চার প্রকার প্রত্যক্ষের কথা বলা হয়েছে। যথা, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয় জ্ঞান, মানসিক প্রত্যক্ষ বা মনবিজ্ঞান, আত্মসচেতনতা বা স্ব-সংবেদন এবং যোগী-প্রত্যক্ষ বা যোগীর স্বজ্ঞাজ্ঞান।

ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ হল ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত কোন বস্তুর সরাসরি জ্ঞান। মানসিক প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের দ্বারা উৎপন্ন হয়। যখন ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ কাজ করে তখন কোন বস্তুর রং সম্পর্কে জ্ঞাতার উপলব্ধি জন্মে। যখন ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের কাজ সম্পন্ন হয় তখন রং-এর মানসিক প্রত্যক্ষ হয়। তাই মানসিক প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং তা একই অনুক্রমে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের পরবর্তী মুহূর্তে উৎপন্ন হয়। ধর্মোত্তর মানসিক প্রত্যক্ষ সম্পর্কে এ কথা বলেন যে, ইন্দ্রিয় তার কার্য সম্পাদনে বিরত না থাকলে মানসিক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হতে পারে না।[১০৫] তাই মানসিক প্রত্যক্ষকে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের পরবর্তী প্রতিরূপ বলে মনে হয়। ন্যায় ও মীমাংসা দর্শনের মানস-প্রত্যক্ষ থেকে বৌদ্ধ মানসিক প্রত্যক্ষ বা মনবিজ্ঞান আলাদা। আত্মসচেতনতা বা স্ব-সংবেদন হল চিত্ত ও অনুভূতির জ্ঞান। সকল প্রকার চিত্ত ও অনুভূতির আত্মসচেতনতা আছে। এগুলো স্ব-আলোকে আলোকিত। এসব নিজেরাই নিজেদের উপলব্ধি করে। আত্মা দ্বারা এদের উপলব্ধি ঘটে না। কারণ, আত্মা অস্তিত্বশীল নয়। তাই চিত্ত বা অনুভূতির দ্বারা প্রত্যক্ষ করাকে আত্মসচেতনতা বা স্ব-সংবেদন বলে। আনন্দ, বেদনা ইত্যাদির অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষ স্ব-সংবেদনের অন্তর্ভুক্ত। আমরা আনন্দ, বেদনা ইত্যাদি আত্মার বিভিন্ন অবস্থার দ্বারা আত্মাকে প্রত্যক্ষ করি। যোগী-প্রত্যক্ষ বা যোগীর স্বজ্ঞা-জ্ঞান হল বৌদ্ধ দর্শনে নির্দেশিত তৃতীয় প্রকারের প্রত্যক্ষ। যোগী-প্রত্যক্ষ বলতে গভীর অনুধ্যান দ্বারা যোগীদের সাক্ষাৎ ও স্পষ্ট জ্ঞানকে বুঝানো হয়। এ জ্ঞান, ইন্দ্রিয় দ্বারা লব্ধ নয়। ধর্মকীর্তির মতে, চারটি আর্য সত্যের জ্ঞান যা জ্ঞানের সাধারণ উপায় দ্বারা লব্ধ নয় এবং সকল প্রকার ভ্রান্তির উর্দ্ধে তা যোগী প্রত্যক্ষ দ্বারা লাভ করা যায়।[১০৬]

Dhaka University Institutional Repository

(২) অনুমান ঃ অনুমান দ্বারা বস্তুর মধ্যকার জাতিগত বা সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী উপলব্ধি করা যায়। অনুমান সাধ্য ও হেতুর ব্যাপ্তি সম্পর্ক নির্ভর। বৌদ্ধ দর্শনে দুই প্রকার অনুমানের কথা বলা হয়েছে। যথা, স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। পক্ষের মধ্যে অবস্থানকারী মধ্যপদ বা হেতু পদের জ্ঞানের মাধ্যমে সাধ্যের যে জ্ঞান হয় সে জ্ঞানই স্বার্থানুমান। স্বার্থানুমান বচন দ্বারা সাধিত হয় না বরং সাধ্যের সাথে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কে সম্পর্কিত হেতু পদের মাধ্যমে সরাসরি স্বার্থানুমান সাধিত হয়। বৌদ্ধ দ্বিতীয় প্রকারের অনুমান হল পরার্থানুমান। এ অনুমানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো স্বার্থানুমানের অনুরূপ। এদের মধ্যে মূল পার্থক্য হল, পরার্থানুমানকে বচনের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হয়।[১০৭] এদিক থেকে ন্যায় স্বার্থানুমানের ও পরার্থানুমানের সাথে বৌদ্ধ স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমানের মিল পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অমিল হল, পরার্থানুমানের অবয়বের সংখ্যা নিয়ে। বৌদ্ধ পরার্থানুমান ত্রি-অবয়বী। এ তিনটি অবয়ব হলঃ সিদ্ধান্ত, পক্ষ ও সাধ্য। সাধ্যে উদাহরণ থাকে। যেমন,

পর্বতে আগুণ আছে,
কারণ, পর্বতে ধুম আছে,
যেমন, পাকশালায় ধুম থাকে কিন্তু হ্রদে থাকে না।

উল্লেখ্য যে, বৌদ্ধ দার্শনিকদের ত্রি-অবয়বী পরার্থানুমানের সাথে মীমাংসা দার্শনিকদের ত্রি-অবয়বী পরার্থানুমানের মিল পরিলক্ষিত হয়। ন্যায় দার্শনিকদের দ্বারা স্বীকৃত পঞ্চ-অবয়বী ন্যায় অনুমানকে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ সমালোচনা করেন।

জ্ঞানের প্রামাণ্য ঃ বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে, যে জ্ঞান বিষয়ানুযায়ী হয়, সে জ্ঞানই যথার্থ। যদি জ্ঞান অনুসারে বিষয় প্রাপ্তি ঘটে, অর্থাৎ জ্ঞান যদি সফল প্রবৃত্তির কারক হয়। তবেই জ্ঞান বিষয়ানুযায়ী হয়েছে বোঝা যাবে। সুতরাং জ্ঞানের প্রামাণ্য জ্ঞানের মধ্যে নয়, রং অন্যান্য বাহ্যিক শর্তের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ জ্ঞান পরতপ্রামাণ্য। সুতরাং জ্ঞানের প্রামাণ্যের ব্যাপারে বৌদ্ধ দর্শন ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের সাথে একমত এবং সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও অদ্বৈত বেদান্তের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে।। কারণ, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে জ্ঞানের স্বতপ্রামাণ্য স্বীকৃত হয়েছে।

বৌদ্ধ প্রমাণতত্ত্ব সম্পর্কে উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বৌদ্ধ দর্শনেও নির্বাণ বা মুক্তির জন্য যথার্থ জ্ঞানের উপায় তথা প্রমাণতত্ত্বের আলোচনা যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। তবে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ মীমাংসা বা বেদান্তের ছয়টি, ন্যায়ের চারটি, সাংখ্য ও যোগের তিনটি স্বীকৃত প্রমাণের মধ্যে মাত্র দু'টিকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এদিক থেকে তাঁদের সাথে বৈশেষিক প্রমাণতত্ত্বের মিল পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া বৌদ্ধ দর্শনে যথার্থ জ্ঞানের মানদণ্ড হিসাবে সফল ক্রিয়াকারিত্বের কথা বলায় তাঁদের জ্ঞানতত্ত্বে বিশ শতকের পাশ্চাত্য প্রয়োগবাদী ও উপযোগবাদী দর্শনের মূল সুর ধ্বনিত হয়েছে বলে মনে হয়। এসব দিক থেকে বিচার করে বৌদ্ধ দর্শন, বিশেষত বৌদ্ধ জ্ঞানবিদ্যা পরবর্তী দর্শনের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে একথা বলা যায়। নিম্নে বৌদ্ধ প্রমাণতত্ত্ব ছকের সাহায্যে দেখানো হলঃ

বৌদ্ধ প্রমাণতত্ত্ব

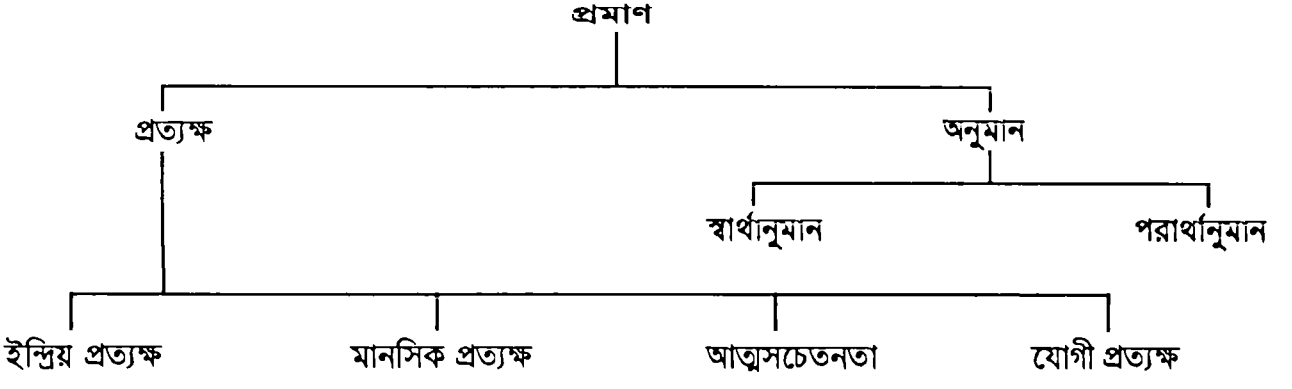

Dhaka University Institutional Repository

১.৮ জৈন জ্ঞানবিদ্যা

ভারতীয় দর্শনে প্রাগৈতিহাসিক ধারার বাহক গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক অন্যতম বেদ বিরোধী নিরীশ্বরবাদী জৈন দর্শন জ্ঞানবিদ্যা, তর্কবিদ্যা, অধিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা ও ধর্ম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে।[১০৮] অন্য দু'টি বেদ বিরোধী দার্শনিক সম্প্রদায় চার্বাক ও বৌদ্ধ শাশ্বত আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে। কিন্তু জৈনগণ বেদ বিরোধী ও নিরীশ্বরবাদী হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধমতের বিরোধিতা করে শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং চৈতন্যকে আত্মার স্বাভাবিক গুণ বলে অভিহিত করেন। তাঁদের মতে, চৈতন্যই জ্ঞান। তাই তাঁরা সর্বজ্ঞতাকেও আত্মার স্বাভাবিক গুণ বলে মনে করেন। অবিদ্যামূলক কর্মের প্রভাবে সর্বজ্ঞ আত্মা সাময়িকভাবে যখন দেহাবদ্ধ হয় তখন তার সর্বজ্ঞতা সাময়িকভাবে ঢাকা পড়ে। এ বদ্ধাবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য জৈন দার্শনিকগণ সম্যক জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করেন। মিথ্যা জ্ঞান থেকে সম্যক জ্ঞানকে পৃথকভাবে জানার জন্য যথার্থ জ্ঞানের পদ্ধতি বা প্রমাণতত্ত্বের আলোচনা জৈন দর্শনে সমধিক গুরুত্ব পায়।

জৈন দর্শনে জ্ঞেয় বস্তুর মননিরপেক্ষ অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। জৈন দার্শনিকদের মতে, জ্ঞেয় বস্তুর যথাযথ ধারণাই যথার্থ জ্ঞান। যথার্থ জ্ঞান সন্দেহের উর্দ্ধে। এ জ্ঞান মানুষের উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করে। জৈন জ্ঞানকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ *পরীক্ষামুখসূত্র* এর রচয়িতা মানিক্যনন্দি পূর্বে অজ্ঞাত কোন জ্ঞানের ও বস্তুর সবিকল্প অবগতিকে বৈধ জ্ঞান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন। বৌদ্ধ দর্শনে যেখানে শুধু নির্বিকল্প জ্ঞানকেই বৈধ জ্ঞান বলা হয়েছে সেখানে জৈন দার্শনিকদের মতে, বৈধ জ্ঞান হল সবিকল্প জ্ঞান। প্রখ্যাত জৈন দার্শনিক বাদিদেব সূরিও মানিক্যনন্দির বৈধ জ্ঞানের সংজ্ঞার সাথে একমত।[১০৯] বৈধ জ্ঞানের বাস্তব দিকও বর্তমান। এর প্রায়োগিক উপযোগিতা আছে। কারণ, এ জ্ঞান জ্ঞাতার অজ্ঞতা নিবারণ করে এবং জ্ঞাতাকে মন্দ বর্জন ও ভাল নির্বাচন করতে পরিচালিত করে। এছাড়া বৈধ জ্ঞান জ্ঞাতাকে সত্যের জ্ঞানের সাথে অভিন্ন করে তুলে।[১১০]

জৈন দর্শনে বৈধ জ্ঞানকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ জ্ঞান এবং পরোক্ষ জ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রত্যক্ষ-প্রমাণ দ্বারা সাধিত হয়। পরোক্ষ জ্ঞানের জন্য পাঁচটি প্রমাণ আছে। যেমন, স্মৃতি, প্রত্যাভিজ্ঞা, তর্ক বা আরোহ, অনুমান বা অবরোহ এবং শব্দ বা আগম। সুতরাং জৈন দর্শনে ছয় প্রকার প্রমাণকে স্বীকার করা হয়েছে। এগুলো নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলঃ

(১) **প্রত্যক্ষ ঃ** জৈন দর্শনে প্রত্যক্ষের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনে স্বীকৃত প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা থেকে পৃথক। তবে নব্য ন্যায় দার্শনিক গঙ্গেশ, বিশ্বনাথ ও ভরদ্বাজের প্রত্যক্ষের সংজ্ঞার সাথে জৈন দার্শনিকদের প্রত্যক্ষের সংজ্ঞার মিল দেখা যায়।[১১১] জৈন দর্শনে প্রত্যক্ষ বলতে স্পষ্ট জ্ঞানকে বুঝানো হয়। অন্যকোন জ্ঞানের মাধ্যম ছাড়া একটি বস্তুকে তার বিশেষ গুণাবলীসহ উপলব্ধি করাকে প্রত্যক্ষ বলে। অনুমান ও শব্দ দ্বারা যা অনুভব করা যায় প্রত্যক্ষ দ্বারা এর চেয়ে বেশী অনুভব করা যায়। এই প্রমাণ সকল প্রকার পরোক্ষ প্রমাণের চেয়ে বেশী শক্তিশালী।[১১২] মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনে স্বীকৃত প্রত্যক্ষের সাথে জৈন দার্শনিকদের প্রত্যক্ষের পার্থক্য হল, জৈন দর্শনে প্রত্যক্ষের জন্য ইন্দ্রিয় আবশ্যিক নয় কিন্তু অন্যান্য দর্শনে ইন্দ্রিয় ছাড়া প্রত্যক্ষ অসম্ভব।

প্রত্যক্ষের শ্রেণী বিভাগ ঃ জৈন দর্শনে দু'প্রকার প্রত্যক্ষকে স্বীকার করা হয়েছে। যথা, অভিজ্ঞতামূলক বা সমব্যবহারিক এবং অতীন্দ্রিয় বা পারমার্থিক। অভিজ্ঞতামূলক প্রত্যক্ষ বিরোধিতা বর্জিত। কাম্য বস্তুকে লাভ করার বা অকাম্য বস্তুকে বর্জন করার পথে এটি সব রকম কার্য সম্পাদন করে। অভিজ্ঞতামূলক প্রত্যক্ষ আবার ইন্দ্রিয়জাত বা অ-ইন্দ্রিয়জাত হতে পারে। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের উপর বাহ্য বস্তুর উদ্দীপনা সৃষ্টির ফলে ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষ ঘটে। বাহ্য বস্তুর সংবেদনযোগ্য গুণগুলোই এ প্রত্যক্ষে উপলব্ধি করা যায়। অন্যদিকে অ-ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষ মানসিক এবং এতে মনের মাধ্যমে আনন্দ, বেদনা, ইচ্ছা, অনুভূতি প্রভৃতির উপলব্ধি জন্মে। কিন্তু মন কোন ইন্দ্রিয় নয়। ইন্দ্রিয়জাত ও মানসিক উভয় প্রকার প্রত্যক্ষে একটি বস্তুর একটি অংশের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। এসব প্রত্যক্ষে কোন বস্তুর অসীম গুণাবলী ও সম্বন্ধকে উপলব্ধি করা যায় না।

অপরপক্ষে, অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ। কর্ম বন্ধনের মুক্তি হলে আত্মায় সমস্ত বস্তুর জ্ঞানের যে প্রত্যাদেশ হয় তাই অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ। এ প্রত্যক্ষ শুধুমাত্র আত্মার উপর নির্ভরশীল। অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ দু'প্রকার। অপূর্ণাঙ্গ বা বিকল এবং পূর্ণাঙ্গ বা সকল। অপূর্ণাঙ্গ অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ আবার দু'প্রকার। অবধি ও মনপর্যায়। অবধি হল ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ সংবেদনশীল বস্তুর প্রত্যক্ষ। মন বা আত্মা যখন কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয় তখন অবধি জ্ঞান হয়। যথার্থ সংজ্ঞা, যথার্থ বিশ্বাস ও যথার্থ আচরণের দ্বারাই এ জ্ঞান লাভ করা যায়। এ প্রত্যক্ষ হল দূরবর্তী সংবেদশীল বস্তুর স্বজ্ঞাজাত প্রত্যক্ষ। মনপর্যায় হল ট্যালিপ্যাথিক দ্বারা প্রাপ্ত অন্যমনের পদ্ধতি সম্পর্কিত জ্ঞান। অন্যদিকে পূর্ণাঙ্গ অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ হল সকল প্রকার দ্রব্য এবং অসংখ্য দৃষ্টিকোন থেকে এসব দ্রব্যের ধরণ সম্পর্কে সর্বজ্ঞের জ্ঞান। মুক্ত আত্মার পক্ষেই এ জ্ঞান সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

জৈন দার্শনিকগণ সবিকল্প প্রত্যক্ষের পূর্ব স্তর হিসাবে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষের অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না। কারণ, নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ বিশেষ গুণাবলীসহ বস্তুর প্রকৃতি নির্ধারণে ব্যর্থ হয় এবং এ জ্ঞান দ্বারা ভাল অর্জন ও মন্দ বর্জন করা যায় না।[১১৩]

(২) স্মৃতি : স্মৃতি হল পূর্ব প্রত্যক্ষিত কোন বস্তুর পূর্ব-বিন্যাসকে ঠিক সেভাবে পুনরুদ্রেক করার মাধ্যমে আহরিত জ্ঞান। স্মৃতি আত্মার একটি বিশেষ শক্তি। যেহেতু স্মৃতি পূর্ব-প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল সেহেতু তা স্বতন্ত্র কি না তা নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে জৈন দার্শনিকদের মতে, স্মৃতি তার উৎপত্তির জন্য পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল এবং স্মৃতি আত্মায় তার পূর্ব বিন্যাস থেকে উৎপন্ন হয় একথা সত্য। কিন্তু স্মৃতি তার বস্তুকে জানার জন্য পূর্ব-প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে না। যেহেতু স্মৃতি পূর্ব-প্রত্যক্ষিত বস্তুর যথার্থ প্রকৃতি যথার্থভাবে নির্ধারণ করতে পারে সেহেতু তা একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ।

(৩) প্রত্যাভিজ্ঞা : প্রত্যাভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও স্মৃতি দ্বারা উৎপাদিত যৌগিক জ্ঞান। প্রত্যাভিজ্ঞার দ্বারা একটি বস্তুর অভিন্নতা, সাদৃশ্য, পার্থক্য, আন্তসম্পর্ক এবং বস্তু ও তার চিহ্নের সম্পর্ক উপলব্ধি করা যায়। যেমন, এ হয় সেই দেবদত্তা এতে পৃথক প্রাণী অথবা বস্তুর মধ্যকার জাতিগত গুণাবলী উপলব্ধি করা হয়। জৈন দার্শনিকদের মতে, প্রত্যাভিজ্ঞা একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ। উপমান প্রত্যাভিজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

(৪) তর্ক বা আরোহ : অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাধ্য ও মধ্য পদের মধ্যকার ব্যাপ্তি সম্পর্কের যে জ্ঞান তাই আরোহ বা তর্ক। এ জ্ঞান সাধ্য বা পক্ষ পদের সহ-উপস্থিতির বা অন্বয়ী-ব্যাপ্তির দ্বারা সাধিত হতে পারে, আবার এ দু'য়ের সহ-অনুপস্থিতি অর্থাৎ ব্যতিরেকী-ব্যাপ্তি দ্বারাও সাধিত হতে পারে। যেমন, শুধুমাত্র আগুন থাকলেই ধোঁয়া থাকে। যেখানে ধোঁয়া সেখানেই আগুন। অথবা, আগুন ছাড়া ধোঁয়া থাকে না। যেখানে ধোঁয়া নেই সেখানে আগুন নেই। তর্ক-প্রমাণ সাধ্য পদের দ্বারা মধ্য পদের সর্বজনীন উপস্থিতি নির্দেশ করে।[১১৪]

(৫) অনুমান বা অবরোহ : অনুমান বা অবরোহ হল মধ্য পদের জ্ঞান থেকে সাধ্য পদের জ্ঞান নির্দেশ করা। যেমন, ধোঁয়া থেকে অগ্নি অনুমিত হয়।[১১৫] ধোঁয়া মধ্য পদ, অগ্নি সাধ্য পদ। অনুমান তর্ক নির্দেশিত ব্যাপ্তির উপর নির্ভরশীল। এতে সাধ্য, পক্ষ ও মধ্য এ তিনটি পদ থাকে। সাধ্য পদের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত পদই মধ্য পদ। সাধ্য পদের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির সাথে মধ্যপদের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি সংযুক্ত। এটাই মধ্য পদের একমাত্র লক্ষণ।

অনুমানের শ্রেণী বিভাগ : জৈন দর্শনে দু'ধার অনুমানের কথা বলা হয়। যথা, স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। নিজের জন্য যে অনুমান করা হয় তাই স্বার্থানুমান। অপরপক্ষে, অপর ব্যক্তির জন্য যে অনুমান করা হয় তা পরার্থানুমান। পরার্থানুমান প্রতিজ্ঞা ও হেতু এ দু'টি অবয়ব দ্বারা গঠিত। এতে দৃষ্টান্ত বাক্য থাকে না। এরূপ অনুমান বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য করা হয়। কম বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য যে পরার্থানুমান করা হয় তা দৃষ্টান্ত সহ তিনটি অবয়বে গঠিত। জৈন দর্শনে দশাবয়বযুক্ত পরার্থানুমানকেও স্বীকার করা হয়। এধরনের অনুমান বুদ্ধিহীন লোকের জন্য করা হয়। এর দশটি অবয়ব হল, প্রতিজ্ঞা, প্রতিজ্ঞা বিভক্তি, হেতু, হেতু-বিভক্তি, বিপক্ষ, বিপক্ষ-প্রতিষেধ, দৃষ্টান্ত, আশঙ্খা, আশঙ্খা প্রতিষেধ, এবং নিগময় বা সিদ্ধান্ত।[১১৬]

(৬) শব্দ বা আগম : শব্দ হল বিশ্বস্ত বা আপ্ত ব্যক্তি নির্দেশিত বস্তুর জ্ঞান। যে বাক্যের দ্বারা শব্দ-জ্ঞান প্রকাশিত হয় সে বাক্যের পদসমূহ তাদের প্রাকৃতিক ব্যক্তর্থের ক্ষমতা ও প্রথা অনুসারে তাদের বস্তুকে প্রকাশ করে। যিনি জ্ঞানের বস্তুগুলো যেভাবে আছে যথার্থ অর্থে ঠিক সেভাবেই জানেন এবং তার ধারণা সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারেন তিনিই বিশ্বস্ত ব্যক্তি। এরূপ ব্যক্তির বচন বস্তুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বস্তুর প্রকৃতির বিরোধী নয়।

শব্দ-প্রমাণের শ্রেণী বিভাগ : শব্দ দু'প্রকার। লৌকিক ও লোকত্তোর। জনক ও অন্যান্য ব্যক্তির দ্বারা উচ্চারিত শব্দ লৌকিক এবং তীর্থঙ্করদের দ্বারা উচ্চারিত শব্দ লোকত্তোর। জৈন দর্শন বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাস করে না। এ দর্শন তীর্থঙ্করদের প্রামাণ্যে বিশ্বাসী। কারণ, তীর্থঙ্করগণ পূর্ণতা অর্জন করেছেন এবং তাঁরা সর্বজ্ঞ।

জ্ঞানের প্রামাণ্য : জৈন দার্শনিকদের মতে, জ্ঞানের বিষয়ের সাথে জ্ঞানের মিল থাকলে জ্ঞান প্রামাণ্য আর বিষয়ের সাথে মিল না থাকলে প্রামাণ্য নয়। অর্থাৎ জ্ঞানের প্রামাণ্য জ্ঞানের মধ্যে নয় অন্য শর্তের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং জ্ঞান পরতপ্রামাণ্য। তবে জৈন দার্শনিকগণ মুক্ত পুরুষ অর্থাৎ তীর্থঙ্করগণ যে জ্ঞানের অধিকারী হন সে জ্ঞানকে স্বতপ্রামাণ্য বলে মনে করেন।

জৈন প্রমাণতত্ত্বের উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, জৈন প্রামণতত্ত্ব ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার অন্যান্য প্রমাণতত্ত্ব থেকে স্বাতন্ত্র্যের দাবী করে। কারণ, যদিও জৈন প্রমাণতত্ত্বে মীমাংসা ও বেদান্ত প্রমাণতত্ত্বের মত ছয়টি প্রমাণকে স্বীকার করা হয়েছে তবুও তাঁদের স্বীকৃত অধিকাংশ প্রমাণই মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনে স্বীকৃত প্রমাণ থেকে পৃথক। মীমাংসা ও বেদান্তের

Dhaka University Institutional Repository

মত জৈন দার্শনিকগণও প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ-প্রমাণকে স্বীকার করেছেন। তবে প্রত্যক্ষ ও অনুমান সম্পর্কে জৈন প্রমাণের ব্যাখ্যা মীমাংসা ও বেদান্ত দার্শনিকদের ব্যাখ্যা থেকে আলাদা। শব্দ-প্রমাণের ক্ষেত্রে তাঁরা অতি মানবীয় শব্দকে স্বীকার করেন নি, শুধু মানবীয় শব্দকেই স্বীকার করেছেন। যদিও শব্দ-প্রমাণলব্ধ জ্ঞানকে জৈনগন লৌকিক ও লোকোত্তর এ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন তবুও এ দু'টি বিভাগই মানবীয় শব্দ-প্রমাণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখ্য যে, একমাত্র জৈন দর্শন ছাড়া অন্য কোন ভারতীয় দর্শনে শুধুমাত্র মানবীয় শব্দ-প্রমাণ স্বীকৃত হয় নি। এর কারণ হল, জৈনগণ বেদ বিরোধী ও নিরীশ্বরবাদী ছিলেন অথচ তারা শব্দ প্রমাণকে স্বীকার করেছেন। সুতরাং যৌক্তিক কারণেই তাঁদের শব্দ-প্রমাণ শুধু মানবীয় শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ। জৈন দর্শন ছাড়া অন্য কোন ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় অনুমানকে পাশ্চাত্য দর্শনের মত আরোহ ও অবরোহ অনুমানে ভাগ করে আলোচনা করেন নি। বরং বলা যায় অনেক ক্ষেত্রে ভারতীয় অনুমানের মধ্যে পাশ্চাত্য আরোহাত্মক ও অবরোহাত্মক উভয় প্রকার অনুমান একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু একমাত্র জৈনগণই অনুমানকে আরোহ ও অবরোহ অনুমানে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। অবরোহকে তাঁরা বলেছেন অনুমান এবং আরোহকে বলেছেন তর্ক বা আরোহ। এছাড়া তাঁরা বুদ্ধিমান, অতিবুদ্ধিমান এবং কম বুদ্ধিমানের জন্য তিন প্রকার অনুমানের কথাও বলেছেন। মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনে আলোচিত উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি এ তিন প্রকার প্রমাণের মধ্যে উপমানকে জৈনগণ প্রত্যাভিজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এছাড়া তাঁরা জ্ঞাতার ও প্রমাণের প্রকৃতির ভিন্নতা অনুসারে জ্ঞানের স্বতপ্রামাণ্য ও পরতপ্রামাণ্য উভয়কে স্বীকার করেছেন। কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় যেমন, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন জ্ঞানের স্বতপ্রামাণ্য এবং বৌদ্ধ, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন জ্ঞানের পরতপ্রামাণ্য স্বীকার করে। সুতরাং জ্ঞানের প্রামাণ্যের ক্ষেত্রে জৈন দর্শনে ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতের সমন্বয় দেখা যায়। এসব দিক বিবেচনা করে এটা বলা যায় যে, ভারতীয় নিরীশ্বরবাদী জৈন দর্শন প্রমাণতত্ত্বের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র অবদান রেখেছে এবং ভারতীয় প্রমাণতত্ত্বে এ দর্শন নতুন ধারণা যোগ করতে সক্ষম হয়েছে। জৈন দর্শনে স্বীকৃত প্রমাণগুলো এবং এদের দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানের প্রকারভেদ নিম্নে ছকের সাহায্যে দেখানো হলঃ

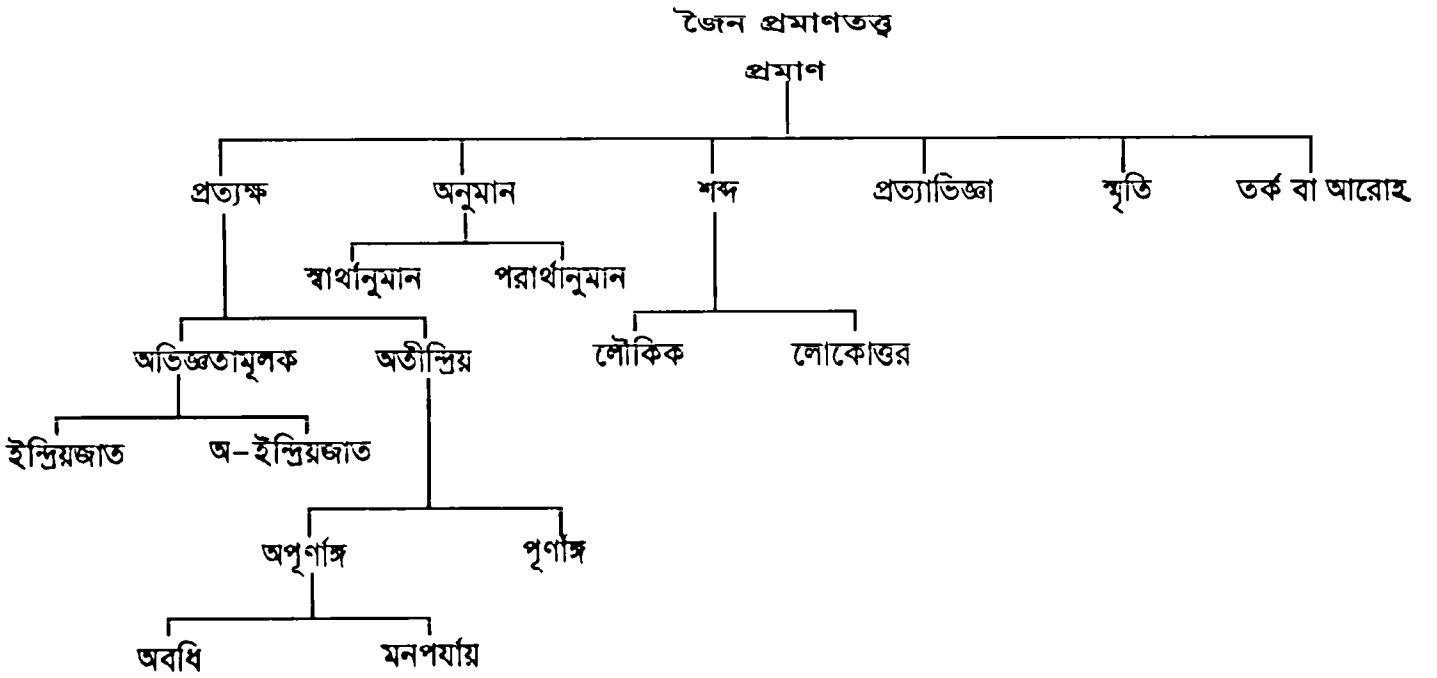

Dhaka University Institutional Repository

১.৯. নির্যাস

ভারতীয় দর্শনের মীমাংসা, বেদান্ত , ন্যায়, সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, বৌদ্ধ ও জৈন এ আটটি সম্প্রদায়ের জ্ঞানবিদ্যার উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম হিসাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষিত হয় ঃ

(১) ভারতীয় দর্শনের সকল সম্প্রদায় জ্ঞানবিদ্যার আলোচনাকে একটি অনিবার্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে এর আলোচনা করেছে। এর ফলে ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ের কাছে অপরিহার্য বিষয়রূপে পরিগণিত হয়েছে। জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় প্রধানত প্রমা, প্রমেয়, প্রমাণ, জ্ঞানের প্রামাণ্য এবং ভ্রম ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। তবে এর মধ্যে প্রমাণতত্ত্বের আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ভারতীয় দার্শনিকদের দর্শনালোচনার এ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করে বলা যায়, পাশ্চাত্য দর্শনের সকল দার্শনিক ভারতীয় দার্শনিকদের মত জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার উপর অপরিহার্য গুরুত্ব আরোপ করেন নি।

(২) যদিও মোক্ষ বা মুক্তির প্রকৃতি নিয়ে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ লক্ষিত হয় তবুও ঈশ্বরবাদী ও নিরীশ্বরবাদী ভেদে সবগুলো সম্প্রদায়ই মোক্ষ বা মুক্তির পথ নির্দেশ করাকে দর্শনালোচনার অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং মোক্ষলাভের যথার্থ উপায় জানার জন্য যথার্থ জ্ঞানলাভের পদ্ধতি তথা প্রমাণতত্ত্বের আলোচনাকে প্রাধান্য দিয়েছে। এছাড়া, অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় অধিবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছে এবং অধিবিদ্যার জ্ঞান পাওয়ার জন্যও জ্ঞানবিদ্যা, বিশেষত প্রমাণতত্ত্বের আলোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এদিক থেকে বিচার করে বলা যায়, ভারতীয় দার্শনিকদের মোক্ষতত্ত্ব এমনকি অধিবিদ্যার আলোচনাও জ্ঞানবিদ্যা নির্ভর। কারণ যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা, যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায় বা প্রমাণ, ভ্রান্ত জ্ঞান থেকে যথার্থ জ্ঞানের পার্থক্যের মানদণ্ড প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে মোক্ষতত্ত্ব এবং অধিবিদ্যার জ্ঞান পাওয়া যে অসম্ভব একথা ভারতীয় দার্শনিকগণ যথার্থই অনুধাবন করেছেন। তাই এক্ষেত্রে ভারতীয় দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে বেশী বিচারমূলক বলে মনে হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনে আধুনিক যুগে, বিশেষত কান্টের আগে অধিবিদ্যার আলোচনার জন্য জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কিত আলোচনার উপর প্রাধান্য দেয়া হয় নি। এছাড়া, প্রায় সবগুলো ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ই যথার্থ জ্ঞানকে আগে সংজ্ঞায়িত করেছে এবং পরে এ জ্ঞান পাবার উপায় তথা প্রমাণতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছে যা পাশ্চাত্য দর্শনে দেখা যায় না। পাশ্চাত্য দর্শনে যদিও প্রাচীন যুগ থেকে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা হয়েছে তবুও আধুনিক যুগের দার্শনিক কান্টই সম্ভবত প্রথম দার্শনিক যিনি সুস্পষ্টভাবে জ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যাকে বিচারবিযুক্তবাদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

(৩) উক্ত আটটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বৌদ্ধ ও বৈশেষিক দর্শনে শুধু প্রত্যক্ষ ও অনুমান নামক দু'টি প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে। সাংখ্য ও যোগ দর্শন বৌদ্ধ ও বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাথে শব্দ-প্রমাণ, ন্যায় দর্শন এ তিনটির সাথে উপমান-প্রমাণ এবং মীমাংসা ও বেদান্ত এ চারটির সাথে অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি নামক দু'টি প্রমাণ যোগ করে মোট ছয়টি প্রমাণকে স্বীকার করেছে। জৈন দর্শন অবশ্য মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনে স্বীকৃত উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি প্রমাণকে স্বীকার করে নি। তবে এ দর্শনে প্রত্যাভিজ্ঞা ও স্মৃতিকে প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে এবং অন্যান্য দর্শনে স্বীকৃত অনুমান-প্রমাণকে আরোহ ও অবরোহে পৃথক রূপ দিয়ে মোট ছয়টি প্রমাণ স্বীকার করেছে। এক কথায়, আলোচিত আটটি সম্প্রদায় সর্বোচ্চ ছয়টি এবং সর্বনিম্ন দু'টি প্রমাণ স্বীকার করেছে এবং সকলেই সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করেছে। এ কারণে ভারতীয় দার্শনিকগণকে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মত বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদী ও বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতাবাদী গোষ্ঠীতে পৃথক করা যায় না। এছাড়া, পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানের সর্বোচ্চ তিনটি উপায় যথা, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও স্বজ্ঞা-কে স্বীকার করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনের স্বীকৃত ছয়টি প্রমাণ পাশ্চাত্য দর্শনে অনুপস্থিত।

(৪) জ্ঞানের প্রামাণ্যের সমস্যাটিও ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার একটি সাধারণ অর্থাৎ অপরিহার্য সমস্যা। উপরের আটটি সম্প্রদায়ই প্রমাণতত্ত্বের সাথে সাথে জ্ঞানের প্রামাণ্য সম্পর্কে অপরিহার্যভাবে আলোচনা করেছে। ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যায় জ্ঞানের প্রামাণ্যকে অপরিহার্য আলোচ্য বিষয় হিসাবে বিবেচনা করার কারণ হল, ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যায় সকল জ্ঞানকেই, যথার্থ জ্ঞান বলা হয় নি। বরং জ্ঞানের মধ্যে যথার্থ এবং অযথার্থ দু'প্রকার জ্ঞানই অন্তর্ভুক্ত। তাই যথার্থ জ্ঞান বা প্রমাকে অযথার্থ জ্ঞান বা অপ্রমা থেকে পৃথক করার জন্য ভারতীয় দর্শনের আটটি সম্প্রদায়ই জ্ঞানের প্রামাণ্য নিয়ে আলোচনা করেছে এবং সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত দর্শনে জ্ঞানের স্বতপ্রামাণ্য এবং ন্যায়, বৈশেষিক ও বৌদ্ধ দর্শনে জ্ঞানের পরতপ্রামাণ্য স্বীকৃত হয়েছে। জৈন দর্শনে সাধারণ মানুষের জ্ঞানকে পরতপ্রামাণ্য এবং তীর্থঙ্করদের জ্ঞানকে স্বতপ্রামাণ্য বলা হয়েছে। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় জ্ঞানের প্রামাণ্যের সমস্যাটি ভারতীয় দর্শনের মত জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় অপরিহার্য গুরুত্ব পেতে দেখা যায় না। এর কারণ হল, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যায় জ্ঞান বলতে যথার্থ ও অযথার্থ উভয় প্রকার জ্ঞানকে বুঝানো হয় নি বরং শুধুমাত্র যথার্থ জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী জ্ঞানের প্রামাণ্যের প্রশ্নটিকে ইউরোপীয় দর্শনের সমস্যা না বলে ভারতীয় দর্শনের সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।[১১৭]

Dhaka University Institutional Repository

(৫) ভারতীয় দার্শনিকগণ জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায়ও তাঁদের ঐতিহ্যগত দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অর্থাৎ পূর্বপক্ষ, পূর্বপক্ষ খণ্ডন ও উত্তর-পক্ষ এ পদ্ধতি অনুসরণ করে যথেষ্ট বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। কারণ, ভারতীয় দর্শনে কোন সম্প্রদায় যখন কোন নতুন প্রমাণকে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছে তখন এর পেছনে যুক্তি উপস্থাপন করেছে। আবার যখন অন্যকোন সম্প্রদায়ের স্বীকৃত কোন প্রমাণকে স্বতন্ত্র প্রমাণ নয় বলে বর্জন করেছে তখনও এর বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছে। এসব কারণে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতীয় দর্শনের একটি সম্প্রদায় যখন তাদের প্রমাণতত্ত্ব উপস্থাপিত করেছে তখন অন্য সম্প্রদায় নির্দেশিত প্রমাণতত্ত্বকে উপেক্ষা করে নি। পাশ্চাত্য দর্শনের আলোচনায় ভারতীয় দর্শনালোচনার এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুপস্থিত। কারণ, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তাঁদের দার্শনিক মতবাদ উপস্থাপনের সময় আবশ্যিকভাবে প্রচলিত মতবাদকে বিচার করে দেখেন নি, যদিও বিশেষ করে বৃটিশ দর্শনে লক,বার্কলে এবং হিউমের জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় এ দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

এ অধ্যায়ে ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যা, বিশেষত প্রমাণতত্ত্ব আলোচনাকালে চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা আলোচিত হয় নি। আলোচনার অগ্রগতিতে চার্বাক জ্ঞানবিদ্যার বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখবো যে, চার্বাক প্রমাণতত্ত্ব পূর্বালোচিত আটটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রমাণতত্ত্বের চেয়ে স্বতন্ত্র। মূলত ভারতীয় দর্শনে চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। কারণ, একমাত্র চার্বাক জ্ঞানবিদ্যায়ই শুধুমাত্র একটি প্রমাণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষকে স্বীকার করা হয়েছে। তাই চার্বাক ভিন্ন অন্যকোন ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়কে বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতাবাদী হিসাবে আখ্যায়িত করা যায় না। প্রত্যক্ষ-প্রমাণ তথা অভিজ্ঞতাবাদের ভিত্তিতে চার্বাকগণ ঈশ্বর, আত্মা, কার্যকারণের আবশ্যিক সম্পর্ক ইত্যাদি অভিজ্ঞতা দ্বারা পাওয়া যায় না এমন সব ধারণাকে পরিহার করেছে। এছাড়া, চার্বাকগণ অন্যান্য সবল সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত অনুমান প্রমাণকেও অস্বীকার করেছে যা ভারতীয় অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায় থেকে চার্বাক দর্শনকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা চার্বাক জ্ঞানবিদ্যার বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে চার্বাকদের স্থান নির্ণয় করতে প্রয়াসী হব। নিম্নে চার্বাকদের প্রমাণতত্ত্বসহ ভারতীয় প্রমাণতত্ত্বকে সংক্ষেপে ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল। সুবিধার জন্য জৈন প্রমাণতত্ত্ব সর্বপ্রথমে সন্নিবেশিত হলঃ

ছকে ভারতীয় প্রমাণতত্ত্ব

জৈন দর্শন	প্রত্যক্ষ*	অনুমান*	শব্দ	প্রত্যাভিজ্ঞা	স্মৃতি	তর্ক বা আরোহ
মীমাংসা দর্শন	ঐ	ঐ	ঐ	উপমান	অর্থাপত্তি	অনুপলব্ধি
বেদান্ত দর্শন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
ন্যায় দর্শন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	x	x
সাংখ্য দর্শন	ঐ	ঐ	ঐ	x	x	x
যোগ দর্শন	ঐ	ঐ	ঐ	x	x	x
বৈশেষিক দর্শন	ঐ	ঐ	x	x	x	x
বৌদ্ধ দর্শন	ঐ	ঐ	x	x	x	x
চার্বাক দর্শন	ঐ	x	x	x	x	x

* অন্যান্য সম্প্রদায় কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞার সাথে অভিন্ন নয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী

১। ভারতীয় দার্শনিকগণ প্রধানত নয়টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এর মধ্যে সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত এ ছয়টি সম্প্রদায় বেদ বিশ্বাসী এবং চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন এ তিনটি বেদ বিরোধী। বেদ বিশ্বাসী ছয়টি সম্প্রদায়কে ষড়দর্শন বলা হয়। এ ছয়টি সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। এরা বেদে বিশ্বাস করলেও ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। বাকী চারটি সম্প্রদায় ঈশ্বর ও বেদ উভয়ে বিশ্বাস করে। অবশ্য এ নয়টি সম্প্রদায় ছাড়া তন্ত্র ও শৈব নামের আরও দু'টি সম্প্রদায় আছে। তবে তাঁদের গুরুত্ব ভারতীয় দর্শনে উল্লেখযোগ্য নয়। তাই এখানে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায় বলতে এ নয়টি সম্প্রদায়কেই বুঝানো হল।

২। Paul Edwards (ed.): *The Encyclopedia of Philosophy*, New York, Macmillan Publishing Co. Inc, and Free Press, 1972, Vol. 1 তুলনীয়; F. Thilly: *A History of Philosophy*, Allahabad, Central Book Depot, 1978, পৃ· ৫৬। Robert Ackermann: *Theories of Knowledge*, Bombay, Tata McGrow-Hill Publishing Co. Ltd. 1965 এর ভূমিকায় প্লেটো ও এরিষ্টটলের হাতেই পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনার শুরু বলে মত প্রকাশ করেন। অবশ্য Paul Edwards (ed.): *The Encyclopedia*. পূর্বোক্ত, গ্রন্থের ৯ম পৃষ্ঠায় যদিও সোফিষ্টদের হাতেই পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার সূত্রপাত বলে উল্লেখ করা হয় তবুও প্লেটোকেই "real originator of epistemology" হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে।

৩। S. N. Das Gupta : *A History of Indian Philosophy*, New York, Cambridge University Press, 1969, Vol. I, পৃ· ৬৫।

৪। নৈয়ায়িকগণই বৈধ জ্ঞান বুঝাতে প্রমা এবং অবৈধ জ্ঞান বুঝাতে অপ্রমা কথা দু'টির প্রচলন করেন। দ্রষ্টব্যঃ C. D. Bijalwan: *Indian Theory of Knowledge*, New Delhi, Heritage Publishers, 1977 পৃ· ৩৮-৩৯। অধ্যাপক ডি. এম. দত্ত প্রমার প্রকৃতি সম্পর্কে বলেন, প্রমাকে সাধারণত এমন একটি জ্ঞান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যার মধ্যে সত্য ও নতুনত্ব এ দু'টো বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং প্রথম বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনের সবগুলো গোষ্ঠীই একমত। দ্রষ্টব্যঃ D. M. Datta: *Six Ways of Knowing*, University of Calcutta, 1972, পৃ· ২০

৫। মহর্ষি জৈমিনি (৪০০ খ্রিঃপূঃ) প্রতিষ্ঠিত মীমাংসা দর্শনের অন্য নাম জৈমিনি দর্শন। বেদ কর্মকাণ্ড বা পূর্বকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড বা উত্তরকাণ্ডে বিভক্ত। মীমাংসা দর্শন বেদের কর্মকাণ্ড এবং বেদান্ত দর্শন বেদের জ্ঞানকাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদের পূর্বকাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে এ দর্শনকে পূর্ব-মীমাংসাও বলা হয়। জৈমিনি প্রণীত *মীমাংসাসূত্র*-ই এ দর্শনের মূল গ্রন্থ। খ্রিষ্টপূর্ব ছয় শতকে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন সমাজ কাঠামো বৈদিক বর্ণাশ্রম প্রথা, বৌদ্ধ দর্শনের আপেক্ষিকতাবাদ, সাম্যবাদ ও অহিংসা নীতির দ্বারা সংশয়ের সম্মুখীন হয়। ধর্মকর্মের এ বিতর্কের সমাধানকল্পে জৈমিনি বিপুলাকার *মীমাংসাসূত্র* গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। দ্রষ্টব্যঃ রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩, পৃ· ৩৬৫। শবরস্বামী জৈমিনিসূত্রের একজন খ্যাতনামা ভাষ্যকার। শবরস্বামীর পরবর্তী মীমাংসাসূত্রের ভাষ্যকারদের মধ্যে কুমারিল ভট্ট (৭০০ খ্রিঃ) এবং তাঁর শিষ্য প্রভাকর মিশ্র (৭০০ খ্রিঃ) সুপ্রসিদ্ধ। কুমারিল ভট্ট শবরস্বামীর মতকে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু প্রভাকর মিশ্র কুমারিল ভট্টের মত গ্রহণ করেন না। এদের মতপার্থক্যের কারনে মীমাংসা দর্শন কুমারিল মীমাংসা ও প্রভাকর মীমাংসা এদু'টি শাখায় বিভক্ত হয়। পার্থসারথী মিশ্র (১৩০০ খ্রিঃ) কুমারিল ভট্টের সমর্থক একজন প্রখ্যাত মীমাংসা দার্শনিক।

৬। J. N. Sinha: *A History of Indian Philosophy*, Vol.1, Calcutta, Sinha Publishing House, 1956, পৃ· ৭৭২

৭। প্রভাকর মিশ্র ও তাঁর অনুসারীগণ প্রমাণকে প্রত্যক্ষ ও অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন। সি· ডি· বিজলবনের মতে, প্রভাকরের সংজ্ঞা শূন্যগর্ভ। কারণ, অনুভূতি শব্দটির সংজ্ঞা দেয়া দুঃসাধ্য। কুমারিল ভট্টের মতে, প্রমাণ হল বস্তুর সেই নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত জ্ঞান যা অন্যকোন জ্ঞানের দ্বারা নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। কুমারিল এবং তাঁর অনুসারীদের প্রমাণ সম্পর্কিত এ সাধারণ সংজ্ঞাটিতে ন্যায়, বৈশেষিক এমনকি বৌদ্ধ দর্শনের প্রমাণ সম্পর্কিত মতবাদের মূলসূরের সমন্বয় লক্ষিত হয়। দ্রষ্টব্যঃ C. D. Bijalwan, পূর্বোক্ত, পৃ· ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

৮। ইন্দ্রিয় বলতে এখানে জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বুঝানো হল। মীমাংসা, ন্যায় ও বৈশেষিক দার্শনিকদের মতে, জ্ঞানেন্দ্রিয় মোট ছয়টি। এর মধ্যে পাঁচটি বাহ্য ইন্দ্রিয়। যথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। এবং একটি অন্তরেন্দ্রিয় অর্থাৎ মন। প্রতিটি বাহ্যেন্দ্রিয় এক একটি ভূত দ্বারা গঠিত। চক্ষু তেজস দ্বারা গঠিত। তেজসের ধর্ম হল বর্ণ। তাই চক্ষু প্রত্যক্ষ করে। কর্ণ ব্যোম বা আকাশ দ্বারা গঠিত। ব্যোমের ধর্ম শব্দ। তাই কর্ণ শোনে। নাসিকা ক্ষিতির দ্বারা গঠিত। ঘ্রাণ ক্ষিতির ধর্ম। তাই নাসিকা ঘ্রাণ নেয়। জিহ্বা অপ-এর দ্বারা গঠিত। অপ বা জলের ধর্ম আস্বাদন। তাই জিহ্বা স্বাদ গ্রহণ করে। ত্বক মরুৎ বা বায়ুর দ্বারা গঠিত। বায়ুর ধর্ম স্পর্শ। তাই ত্বক স্পর্শ করে। অর্থাৎ যে ভূত দ্বারা যে বাহ্য ইন্দ্রিয় গঠিত সে বাহ্য ইন্দ্রিয় সে উপাদানের বিশেষ গুণ প্রত্যক্ষ করে। মন বা অন্তরেন্দ্রিয় কোন ভৌত গুণের দ্বারা গঠিত নয় বলে এর প্রত্যক্ষের সীমারেখা নাই। মন বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলোর তদারক করে সবরকম জ্ঞানকে সুবিন্যস্ত করে।

সাংখ্য দর্শনে মোট একাদশ ইন্দ্রিয়কে স্বীকার করা হয়েছে। পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয় এবং মন। মন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় উভয়ের সহায়ক। অবশ্য সাংখ্য দর্শনে মন ছাড়াও বুদ্ধি ও অহং নামে আরও দু'টি অন্তকরণের কথা বলা হয়েছে। এরা সকলেই জ্ঞানোৎপত্তি ও জ্ঞানকে কর্মে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে কাজ করে থাকে। সুতরাং বলা যায়, সাংখ্য দর্শন তেরোটি ইন্দ্রিয়কে স্বীকার করেছে। তিনটি অভ্যন্তরীণ এবং দশটি বাহ্য। এছাড়া বুদ্ধ অভিধর্ম মতাবলম্বীরা বাইশটি ইন্দ্রিয়ের কথা বলেছেন।

৯। মীমাংসা দার্শনিক বাচস্পতি মিশ্র, প্রাচীন ন্যায় দার্শনিক উদয়ঠাকুর প্রমুখ ইন্দ্রিয়ের সাথে বস্তুর ছয় প্রকার সংযোগ হতে পারে বলে মত প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে তিনটি মুখ্য এবং তিনটি গৌণ। মুখ্য সংযোগগুলো হলঃ (১) সংযোগ অর্থাৎ কোন দ্রব্যের সাথে ইন্দ্রিয়-সংযোগ, (২) সমবায় অর্থাৎ কোন শব্দের সাথে ইন্দ্রিয়-সংযোগ, (৩) বিশেষ্য-বিশেষণভাব অর্থাৎ অনস্তিত্বের সাথে ইন্দ্রিয়-সংযোগ। গৌণ তিনটি সংযোগ হলঃ (১) সংযুক্ত-সমবায় অর্থাৎ কোন গুণের সাথে ইন্দ্রিয়-সংযোগ। যেমন, নীল রং-এর সাথে সংযোগ, (২) সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় অর্থাৎ কোন সার্বিক গুণের সাথে ইন্দ্রিয় সংযোগ। যেমন, নীলত্বের সাথে সংযোগ, (৩) সমবেত-সমবায় অর্থাৎ শব্দের সার্বিকতার সাথে বা শব্দত্বের সাথে ইন্দ্রিয়-সংযোগ। এ ছয় প্রকার সংযোগ ছাড়াও নব্য-নৈয়ায়িকগণ আরও তিন প্রকার সংযোগের কথা বলেন। সেগুলো হলঃ (১) সামান্যলক্ষণ, (২) জ্ঞানলক্ষণ, ও (৩) যোগজ সংযোগ। সুতরাং নব্য নৈয়ায়িকদের মতে, সংযোগ নয় প্রকার। দ্রষ্টব্যঃ C. D. Bijalwan, *Indian Theory of Knowledge*,পূর্বোক্ত, পৃ· ১১০-১১৩। এজন্য নৈয়ায়িকগণ একে সংযোগ না বলে বরং সন্নিকর্ষ বলেছেন। কারণ, সার্বিক বা গুণ ইত্যাদির সাথে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে না বরং সন্নিকর্ষ ঘটে।

১০। সমযোগর্থে চ সংশব্দো দুস্প্রয়োগনিবারণম্।
কুমারিলঃ *শ্লোকবার্তিক*, বেনারস, চৌখম্ব সংস্কৃত সিরিজ, ১৮৯৮-৯৯, ৪ঃ ৩৮

১১। পূর্বোক্তঃ ৪ঃ৬০,৬৯,৮৩-৮৫। এবং
পার্থ সারথী মিশ্রঃ *শাস্ত্রদীপিকা*, বোম্বে, নির্ণয় সাগর প্রেস, ১৯১৫, পৃ· ৩৫-৩৬

১২। J. N. Sinha: *History of Indian Philosophy*, Vol .I, পূর্বোক্ত, পৃ· ৭৭৩

১৩। মেয়মাতৃপ্রমাসু সা। -- দ্রব্যজাতিগুণেষি্ব ন্দ্রিয়সংযোগোথা সা প্রত্যক্ষা প্রতীতিঃ।
শালিকানাথঃ *প্রকরণপঞ্জিকা*, পণ্ডিত মুকুন্দ শাস্ত্রী সম্পাদিত, বেনারস, চৌখম্ব সংস্কৃত সিরিজ, ১৯০৩, পৃ· ৫২

১৪। মীমাংসা মতে, যেহেতু সকল প্রকার জ্ঞানই আত্মায় উৎপন্ন হয় সেহেতু আত্মার দিক থেকে বিচার করলে জ্ঞান এক প্রকার। তা'হল প্রত্যক্ষ। এছাড়া প্রত্যক্ষ, অনুমান ইত্যাদি জ্ঞানের যে বিভাগ মীমাংসা দর্শনে স্বীকার করা হয়েছে তা মূলত জ্ঞানের বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিচার করে। অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়বস্তু যে বিভিন্ন ধারায় জ্ঞানের ক্ষেত্রে আসে সেদিক থেকে বিচার করে জ্ঞানের বিভিন্ন প্রকারভেদ স্বীকার করা হয়েছে। দ্রষ্টব্যঃ S. N. Das Gupta: *History*, Vol.1, পূর্বোক্ত, পৃ· ৩৮২-৩৮৩

১৫। কুমারিলঃ *শ্লোকবার্তিক*, পূর্বোক্ত, ৪ঃ ১১২, ১১৩

১৬। J. N. Sinha: *History*, Vol .I, পূর্বোক্ত, পৃ· ৭৭৪

১৭। কুমারিলঃ *শ্লোকবার্তিক*, পূর্বোক্ত, ৪ঃ ১২০-১২৫

১৮। J. N. Sinha: *History*, Vol.I, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭৭। এবং S. N. Das Gupta: *History*, Vol. I, পূর্বোক্ত, পৃ· ৩৭৮

১৯। কুমারিল ব্যাপ্তি সম্পর্কের পরিচয় দিতে গিয়ে হেতুপদের সাথে সামাণ্যধর্ম বা সাধ্যপদের নিত্য সম্পর্ককেই ব্যাপ্তি বলেছেন। তাঁর মতে, সামান্যধর্মের তুয়োদর্শনহেতু ব্যাপ্তি হয়। সাংখ্যকার কপিলের মতে, নিয়ত ধর্মলক্ষণযুক্ত উভয় পদের সম্পর্কই ব্যাপ্তি। বাচস্পতি, জয়ন্ত, উদয়ন ও ভরদ্বাজ ব্যাপ্তিকে সাধ্য ও হেতুর মধ্যকার নিয়ত, শর্তহীন স্বাভাবিক সম্পর্ক হিসাবে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপ্তি। বাচস্পতি, জয়ন্ত, উদয়ন ও ভরদ্বাজ ব্যাপ্তিকে সাধ্য ও হেতুর মধ্যকার নিয়ত, শর্তহীন স্বাভাবিক সম্পর্ক হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন। তবে বৈশেষিক দার্শনিক কণাদ ব্যাপ্তি শব্দটির ব্যবহার না করে 'প্রসিদ্ধি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। প্রশস্তপদ 'ব্যাপ্তি' বা ' প্রসিদ্ধি' শব্দ ব্যবহার না করে 'সহচর্য' কথাটির ব্যবহার করেছেন। দ্রষ্টব্য, J. N. Sinha: *History*, পূর্বোক্ত, পৃ· ২৯০

২০। জ্ঞানসম্বন্ধনিয়মস্যৈকদেশস্যদর্শনাৎ।
একদেশান্তরবুদ্ধিরনুমানসবাধিতে।।
শালিকানাথঃ *প্রকরণপঞ্জিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৬৪ (একদেশ= লিঙ্গ এবং একদেশান্তর= সাধ্য)

২১। J. N. Sinha: *History*, Vol. I, পূর্বোক্ত, পৃ· ৭৮১
এবং S. N. Das Gupta: History., V.I, পূর্বোক্ত, পৃ· ৩৮৯

২২। Ganga Nath Jha: *Indian Thought*, Allahabad, University Of Allahbad, 1911, পৃ· ৪৯ এবং শালিকানাথঃ *প্রকরণপঞ্জিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৭৮–৭৯ এবং পার্থসারথী মিশ্রঃ *শাস্ত্রদীপিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৬৪, ৬৯

২৩। বাক্যার্থে তু পদার্থেভ্যঃ সম্বন্ধানুভবাদ্ ঋতে।
বুদ্ধিরুৎপদ্যতেতেনতিন্নাসাবক্ষবুদ্ধিবৎ।।
কুমারিলঃ *শ্লোকবার্তিক*, পূর্বোক্ত, শব্দ, ১০৯

২৪। শাস্ত্রং শব্দবিজ্ঞানাদসন্নিকৃষ্টেঽর্থে বুদ্ধিঃ। (পৃ· ৮৭)
এবং, ন শাস্ত্রব্যতিরিক্তং শব্দমস্তি (পৃ· ৯৪)
শালিকানাথঃ *প্রকরণপঞ্জিকা*, পূর্বোক্ত।

২৫। সাদৃশ্যদর্শনোথংজ্ঞানংসাদৃশ্য বিষয়কমুনমানম্।
শালিকানাথঃ *প্রকরণপঞ্জিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১১০

২৬। S. N. Das Gupta: *History*. Vol. I, পূর্বোক্ত, পৃ· ৩৯১

২৭। দৃষ্টেনার্থেন দৃষ্টস্যার্থস্যার্থান্তরকল্পনায়ামসত্যামনুপপত্তিমাপাদয়তা যা২র্থান্তরকল্পনা সা২র্থাপত্তিঃ।
শালিকানাথঃ *প্রকরণপঞ্জিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১১৩

২৮। পার্থসারথী মিশ্রঃ *শাস্ত্রদীপিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৭৭–৭৯

২৯। J. N. Sinha: *A History of Indian Philosophy*, Vol. II, Calcutta Central Book Agency, 1952, পৃ· ৫৬৮

৩০। পূর্বোক্ত, Vol. I, পৃ· ৭৮৯

৩১। সর্বংপ্রমাণংপ্রমেয়া২বিনাভাবি।
ন চাভাবাখ্যস্য প্রমাণস্য প্রমেয়ং কিং চিৎ প্রতীতিবলসিদ্ধম্।
শালিকানাথঃ *প্রকরণপঞ্জিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১১৮
প্রমেয়াসদ্ভাবাচ্চ ন প্রমাণান্তরমকল্পত ইতি স্থিতম্।
পূর্বোক্ত, পৃ· ১২৫

৩২। মহর্ষি বাদরায়ণ পাঁচশত পঞ্চান্নটি সূত্র সমন্বিত যে বহ্মসূত্র রচনা করেন একে ব্যাসসূত্র, বেদান্তসূত্র, বাদরায়ণসূত্র, শারীরকৃতসূত্র, শারীরক মীমাংসা, উত্তর মীমাংসা, উপনিষদ দর্শন, বেদান্ত দর্শন ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। বহ্মসূত্র আনুমানিক ২০০ খ্রিঃ পূঃ অব্দের রচনা। ব্রহ্মসূত্রের সূত্রগুলো সংক্ষিপ্ত হওয়ায় এর উপর বিভিন্ন ভাষ্যকার ভাষ্য রচনা করেন। ভাষ্যগুলোর মধ্যে শঙ্করাচার্য রচিত শারীরক ভাষ্য উল্লেখযোগ্য। তাঁর ব্যাখ্যাত বেদান্তকে অদ্বৈত বেদান্ত বলা হয়।

৩৩। তত্র প্রমায়াঃ করণং প্রমাণম্।
ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রঃ *বেদান্ত পরিভাষা*, শ্রীশরচন্দ্র ঘোষাল (অনূদিত), ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩২২ বঙ্গাব্দ, পৃ· ৫

৩৪। দ্রষ্টব্যঃ মীমাংসা প্রত্যক্ষ,

৩৫। ভারতীয় দর্শনে মনকে তার বিভিন্নমুখী কাজের প্রেক্ষিতে অন্তকরণ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। বেদান্ত দর্শনে মন বা অন্তকরণকে স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় বলে স্বীকার করা হয় নাই।

৩৬। দ্রষ্টব্যঃ মীমাংসা প্রত্যক্ষ প্রমাণ,

৩৭। রমেন্দ্রনাথ ঘোষঃ *ভারতীয় দর্শন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩, পৃ· ৫০২

Dhaka University Institutional Repository

৩৮। দ্রষ্টব্যঃ মীমাংসা অনুমান

৩৯। K.C. Bhattacharya: *Studies in Vedantism*, Calcutta, Calcutta University, 1909, পৃ· ৫৪

৪০। পরার্থানুমান অংশ

৪১। দ্রষ্টব্যঃ মীমাংসা উপমান

৪২। দ্রষ্টব্যঃ মীমাংসা অর্থাপত্তি প্রমাণ

৪৩। K. C, Bhattacharya: *Studies in Vedantism*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৬৭

৪৪। দ্রষ্টব্যঃ মীমাংসা অনুপলব্ধি প্রমাণ

৪৫। J. N. Sinha, *History*, Vol. ll, পূর্বোক্ত, পৃ· ৫৬৯

৪৬। মহর্ষি গৌতম (২০০ খ্রিঃ পূঃ) ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। স্কন্দপুরাণে অহল্যাপতি গৌতম মুনিকেই অক্ষপাদ বলা হয়েছে। তাই মাধবাচার্য তার *সর্বদর্শন সংগ্রহ* গ্রন্থে ন্যায় দর্শনের নাম দিয়েছেন অক্ষপাদ দর্শন। গৌতম লিখিত *ন্যায়সূত্র*– ই ন্যায় দর্শনের মূলগ্রন্থ। বাৎসায়ন গৌতমের ন্যায়সূত্রের উপর ভাষ্য রচনা করেন। ১২শ খ্রিষ্টাব্দে মিথিলার গঙ্গেশ উপাধ্যায় ন্যায় দর্শনকে তাঁর *তত্ত্বচিন্তামনি* গ্রন্থে পুনরায় আলোচনা করেন। এ আলোচনাকে ভিত্তি করে ১২শ শতকের শেষার্ধ থেকে ষোড়শ শতকের তৃতীয় পাদ পর্যন্ত মিথিলায় নব্যন্যায় গোষ্ঠী গড়ে উঠে। পনেরো থেকে সতেরো শতক পর্যন্ত বাংলাদেশই নব্যন্যায় এর আবাসস্থল হিসাবে গণ্য হয়। দ্রষ্টব্যঃ রমেন্দ্রনাথ ঘোষঃ *ভারতীয় দর্শন*, পূর্বোক্ত, পৃ· ২৯৬

৪৭। ন্যায় দর্শনে মোক্ষের জন্য ১৬টি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভের কথা বলা হয়েছে। এর প্রথম দু'টি হল যথাক্রমে প্রমাণ ও প্রমেয়। দ্রষ্টব্যঃ *ন্যায়সূত্র* ১.১.১। বুদ্ধ মতানুসারী নৈয়ায়িকগণ যে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন তার উত্তর হিসাবেই ন্যায় জ্ঞানবিদ্যার জন্ম ও বিকাশ। বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে, সকল প্রকার জ্ঞানই হল অভিজ্ঞতাপূর্ব। কিন্তু ন্যায় দার্শনিকগণ অভিজ্ঞতাপূর্ব জ্ঞানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন এবং দৃঢ় অভিজ্ঞতাবাদী সম্ভাবনার প্রতিষ্ঠা করেন। দ্রষ্টব্যঃ C. D. Bijalwan: *Indian Theory of Knowledge* পূর্বোক্ত, "Foroword".

৪৮। প্রত্যক্ষানুমাণোপমানশব্দাঃপ্রমাণানি। *ন্যায়সূত্র* (১·১·৩)
বাৎসায়নঃ *ন্যায়ভাষ্য*, ফনিভূষণ তর্কবাগীশ অনূদিত, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির, ১৩২৪ বংগাব্দ, পৃ· ১০১
গৌতম ন্যায়সূত্রে প্রমাণ শব্দটির কোন ব্যাখ্যা না দিয়েই জ্ঞানের চারটি উপায় সম্পর্কে বর্ণনা দেন। ফলে ন্যায় দর্শনে প্রমাণ শব্দটির কোন সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। দ্রষ্টব্যঃ C. D. Bijalwan: পূর্বোক্ত, পৃ· ৪১

৪৯। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নংজ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকংপ্রত্যক্ষম্।
বাৎসায়নঃ *ন্যায়ভাষ্য*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১১৪। তুলনীয়, মীমাংসা প্রত্যক্ষ প্রমাণ

৫০। প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারিত্বম লক্ষণম্।
উদ্বৃতঃ S. N. Das Gupta, *History*, Vol. 1. পূর্বোক্ত, পৃ· ৩৩৪

৫১। জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানাংপ্রত্যক্ষম্।
বিশ্বনাথঃ *সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*, বোম্বে, নির্ণয় সাগর প্রেস, ১৯১৬, পৃ· ২৩৭

৫২। জয়ন্তভট্টঃ *ন্যায়মঞ্জরী*, বেনারস, বিজিঅনগ্রম সংস্কৃত সিরিজ, ১৮৯৫, পৃ· ৯৯

৫৩। নব্যন্যায়ের দুই প্রকার প্রত্যক্ষের সংজ্ঞার জন্য, বিশ্বনাথঃ *সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ·২৫৩–৫৪
দ্রষ্টব্য। তুলনীয়ঃ মীমাংসা প্রত্যক্ষের শ্রেণী বিভাগ

৫৪। S. Radhakrishnan: *Indian Philosophy*, Vol. ll, New York, The Macmillan Publishing Co., 1962, পৃ· ৬০

৫৫। দ্রষ্টব্যঃ S. N. Das Gupta, *History*, Vol.1. পূর্বোক্ত, পৃ· ৩৩৯
এবং J. N. Sinha, *History*, Vol.1. পূর্বোক্ত, পৃ· ৪৭৩

৫৬। জয়ন্তভট্টঃ *ন্যায়মঞ্জরী*, পূর্বোক্ত, ৮৮, ৯৬

৫৭। দ্রষ্টব্যঃ মীমাংসা অনুমান

৫৮। অনুমানং দ্বিবিধম্–স্বার্থং পরার্থং চ।
তত্র স্বার্থং স্বানুমিতিহেতুঃ।।
অন্নংভট্টঃ *তর্কসংগ্রহ*, (অনুমান খণ্ড, শ্লোক ৪) শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী অনূদিত, কলিকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, পৃ· ৩০৪

Dhaka University Institutional Repository

৫৯। যত্তু স্বয়ং ধূমাদগ্নিমনুমায় পরপ্রতিপত্ত্যর্থং পঞ্চাবয়ববাক্যং প্রযুঙ্ক্তে তৎ পরার্থানুমানম্।
পূর্বোক্ত (শ্লোক ৫), পৃ· ৩১০

৬০। প্রতিজ্ঞাহেতুদা২তুদা২রণোপনয়-নিগমনান্যবয়বাঃ।
বাৎসায়নঃ *ন্যায়ভাষ্য*, পূর্বোক্ত, পৃ· ২৩৫ এবং জয়ন্ত ভট্টঃ *ন্যায়মঞ্জরী*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৫৮৫। বাৎসায়ন উক্ত গ্রন্থে দশাবয়ব যুক্ত ন্যায় অনুমানের অনুপপত্তি প্রদর্শন করে খণ্ডন করেন এবং পঞ্চাবয়বকে সমর্থন করেন। দ্রষ্টব্য, পৃ· ২৩৮-২৪৩

৬১। বাৎসায়ন : *ন্যায়ভাষ্য*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৪২-১৪৯

৬২। উদয়ঠাকুর এবং ভরদ্বাজও গঙ্গেশের মত তিন প্রকার অনুমানের কথা বলেছেন। উদয়ঠাকুর এ তিন প্রকার অনুমানের নাম দেন অন্বয়ী, ব্যতিরেকী এবং অন্বয়ব্যতিরেকী। ভরদ্বাজ, উদয়ঠাকুর ও গঙ্গেশ উভয়ের নামই ব্যবহার করেন।

৬৩। প্রাচীন নৈয়ায়িক উদ্দয়ঠাকুর তিন প্রকার হেতু'র কথা বলেছেন-সদর্থক বা অন্বয়ী, নঞর্থক বা ব্যতিরেকী এবং সদর্থক-নঞর্থক বা অন্বয়ী-ব্যতিরেকী। প্রথমটির ক্ষেত্রে সাধ্যের সাথে নিয়ত অন্বয়ী সম্পর্ক, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে সাধ্যের সাথে নিয়ত ব্যতিরেকী সম্পর্ক ও তৃতীয়টির ক্ষেত্রে সাধ্যের সাথে নিয়ত অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী সম্পর্ক বর্তমান থাকে। কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমানে যথাক্রমে এই তিন প্রকার হেতু পদই ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দয়ঠাকুরের এই মতকেই নব্যনৈয়ায়িক ভরদ্রাজ ও গঙ্গেশ এবং তাঁদের অনুসারীগণ ব্যাখ্যা করেছেন। দ্রষ্টব্যঃ J. N. Sinha, *History*, Vol. 1. পূর্বোক্ত, পৃ· ৪৯৩

৬৪। প্রসিদ্ধসাধর্ম্ম্যাৎসাধ্যসাধনমুপমানম্। (*ন্যায়সূত্র* ১· ১৬)
বাৎসায়নঃ *ন্যায়ভাষ্য*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৫২

৬৫। J. N. Sinha: *History*, পূর্বোক্ত, Vol .I, পৃ· ৫৫৮

৬৬। পূর্বোক্ত, পৃ· ৫৮০

৬৭। বাচস্পতি মিশ্রঃ *ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকা*, (১·১·৬), বেনারস, বিজিওনগ্রম সংস্কৃত সিরিজ, ১৮৯৮, পৃ· ১৩৪

৬৮। আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ (*ন্যায়সূত্র*, ১·১·৭)
বাৎসায়নঃ *ন্যায়ভাষ্য*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৫৬। গৌতমের মতে, ঋষিগণই আপ্তব্যক্তি। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎসায়নের মতে, সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা অর্থাৎ যিনি ধর্ম্ম বা পদার্থকে সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অবধারণ করেছেন, যিনি বাক্যপ্রয়োগে কৃতযত্ন অর্থাৎ প্রযুক্ত এবং যিনি এরূপ উপদেশ দানে সমর্থ অর্থাৎ উপদেষ্টা তিনি ঋষি, আর্য বা ম্লেচ্ছ যাই হোন না কেন তিনিই আপ্ত।

৬৯। স দ্বিবিধো দৃষ্টাদৃষ্টার্থত্বাৎ (*ন্যায়সূত্র*, ১·১·৮)
বাৎসায়নঃ *ন্যায়ভাষ্য*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৫৭

৭০। বাৎসায়নঃ *ন্যায়ভাষ্য*, (১·১·৮) পূর্বোক্ত, পৃ· ১৫৭-১৫৮

৭১। বাক্যং বিবিধং-বৈদিক, লৌকিকং চ।
বৈদিকমীশ্বরোক্ততাৎ সর্বমেব প্রমাণম্
লৌকিকং ত্বাপ্তোক্তং প্রমাণম্।
অন্যদপ্রমাণম্।
(শব্দখণ্ড, শ্লোক, ১৪) অন্নংভট্টঃ *তর্কসংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৩৮৫

৭২। D. M. Datta: *Six Ways of Knowing*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৬২

৭৩। ঈশ্বরকৃষ্ণের *সাংখ্য কারিকা*-ই সাংখ্য দর্শনের প্রাচীনতম প্রামাণ্য গ্রন্থ। ঈশ্বরকৃষ্ণ ছিলেন পঞ্চশিখ-এর শিষ্য। পঞ্চশিখ ছিলেন সাংখ্য দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি কপিলের শিষ্য। কপিল ঈশ্বরকৃষ্ণের পূর্ববর্তী দার্শনিক। বাচস্পতি মিশ্র নবম শতকে ঈশ্বরকৃষ্ণের *সাংখ্য কারিকা* গ্রন্থের উপর তত্ত্বকৌমুদী নামক ভাষ্য রচনা করেন। সাংখ্য শব্দের একটি অর্থ যথার্থ জ্ঞান। সাংখ্য দর্শন দ্বৈতবাদী তথা পুরুষ ও প্রকৃতি তত্ত্বে বিশ্বাসী। পুরুষ হল চেতনা বা আত্মা এবং প্রকৃতি হল জড়। উভয়ের মিলনেই জগতের সৃষ্টি। পুরুষকেই সাংখ্য দর্শনে জ্ঞাতা বলা হয়েছে। সাংখ্য দর্শনে জ্ঞানকে মোক্ষ বা মুক্তির উপায় বলা হয়েছে।

৭৪। বিজ্ঞানভিক্ষুঃ *সাংখ্য প্রবচনভাষ্য* (১·৮৭), Richard Garbe (ed.), London, Ginn and Company, 1895, পৃ· ৪৩-৪৪

৭৫। বাচস্পতি মিশ্রঃ *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* (৪), Tr. By Ganga Nath Jha, Bombay, Tookaram Tatya, F. T. C, 1896.

Dhaka University Institutional Repository

৭৬। দৃষ্টমনুমানমাপ্তবচনঞ্চসর্বপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ।
ত্রিবিধংপ্রমাণমিষ্টংপ্রমেয়সিদ্ধিঃপ্রমাণাদ্ধি।।
ঈশ্বরকৃষ্ণঃ *সাংখ্যকারিকা* (৪), স্বামী দিবাকরানন্দ অনূদিত, কলিকাতা, মডার্ন আর্ট প্রেস ১৯৮২, ২য় সংস্করণ, পৃ ১৬

৭৭। পূর্বোক্ত (৫), পৃ ১৯
তুলনীয় ঃ মীমাংসা ও ন্যায় প্রত্যক্ষ

৭৮। J. N. Sinha: *History*, Vol. ll, পূর্বোক্ত, পৃ ৬১

৭৯। দ্রষ্টব্যঃ মীমাংসা সবিকল্প ও নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ অংশ

৮০। মীমাংসা অনুমান

৮১। ঈশ্বরকৃষ্ণঃ *সাংখ্যকারিকা* (৫), পূর্বোক্ত, পৃ ১৯

৮২। পঞ্চাবয়বযোগাৎসুখসংবিত্তিঃ
বিজ্ঞান ভিক্ষুঃ *সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য* (৫·২৭), পূর্বোক্ত, পৃ ১২২
দ্রষ্টব্যঃ ন্যায় অনুমানের পরার্থানুমান অংশ

৮৩। দ্রষ্টব্যঃ ন্যায় অনুমানের পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান

৮৪। বিজ্ঞান ভিক্ষুঃ *সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য* (১·১০১), পূর্বোক্ত, পৃ ৫০

৮৫। পূর্বোক্ত, (৫·৪৮), পৃ ১২৬

৮৬। পূর্বোক্ত, (৫·৪৫), পৃ ১২৬

৮৭। পার্থসারথী মিশ্রঃ *শাস্ত্রদীপিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ ২৩৫–২৩৬ এবং J. N. Sinha: *Introduction to Indian Philosophy*, Agra, 1949, পৃ ২৩২

৮৮। মহর্ষি পতঞ্জলী প্রতিষ্ঠিত যোগ দর্শনকে পতঞ্জল দর্শন বা সাংখ্য প্রবচন নামেও অভিহিত করা হয়। পতঞ্জলী কপিল প্রবর্তিত সাংখ্য মত স্বীকার করেন। পতঞ্জলীর যোগ দর্শন সাংখ্য দর্শনের একটি পদ্ধতিগত ও ব্যবহারিক দিক। কেবল পার্থক্য হল, সাংখ্য দর্শন নিরীশ্বরবাদী ও যোগদর্শন ঈশ্বরবাদী। সাদৃশ্যের কারণে পতঞ্জল দর্শনকে সাংখ্য প্রবচন নামেও অভিহিত করা হয়। যোগসূত্র বা *পতঞ্জল সূত্র* ই যোগ দর্শনের মূলগ্রন্থ। পতঞ্জলী ১৯৪টি সূত্রে যোগসূত্র লিপিবদ্ধ করেন। যোগসূত্রের উপর ব্যাস রচিত ভাষ্যকে *যোগভাষ্য* বা *ব্যাসভাষ্য* (৪০০খ্রিঃ) বলে। বাচস্পতি মিশ্র ব্যাসভাষ্যের উপর *তত্ত্ববৈশারদী* (৯০০ খ্রিঃ) নামক ভাষ্য রচনা করেন। বিজ্ঞান ভিক্ষু রচিত *যোগবার্তিক* (১৬০০ খ্রিঃ) যোগদর্শনের অন্যতম ভাষ্য। যোগদর্শন সাংখ্য তত্ত্ববিদ্যাকে গ্রহণ করে এর সাথে ঈশ্বরের ধারণাকে যোগ করে। তাই যোগদর্শনকে আস্তিক সাংখ্য বলা হয়।

৮৯। J. N. Sinha, *History*, Vol. ll, পূর্বোক্ত, পৃ ১২৯

৯০। প্রত্যক্ষানুমানাগমপ্রমাণানি।
পতঞ্জলীঃ *যোগসূত্র* (১·৭)

৯১। দ্রষ্টব্য ঃ সাংখ্য জ্ঞানবিদ্যা, প্রত্যক্ষ প্রমাণ অংশ

৯২। দ্রষ্টব্যঃ সাংখ্য অনুমান

৯৩। পতঞ্জলীঃ *যোগসূত্র* (১·৭)

৯৪। দ্রষ্টব্যঃ সাংখ্য শব্দ–প্রমাণ

৯৫। যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।। *(শ্রীমদ্ভগবদগীতা ৫·৫)*
জগদীশচন্দ্র ঘোষ (অনূদিত)ঃ *শ্রীমদ্ভগবদগীতা*, কলিকাতা, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, পঞ্চদশ সংস্করণ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ ১৭৭

৯৬। ঋষি কণাদ (৩০০ খ্রিঃ পূঃ) বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর প্রকৃত নাম উলুক। তাই মাধবাচার্য তাঁর *সর্বদর্শনসংগ্রহ* গ্রন্থে বৈশেষিক দর্শনকে কণাদ বা উলুক্য দর্শন নামে অভিহিত করেন। এ দর্শন বিশেষ নামক একটি পদার্থকে স্বীকার করেছে বলে একে বৈশেষিক দর্শন বলা হয়। কণাদ প্রণীত *বৈশেষিক সূত্র*–ই হল বৈশেষিক দর্শনের মূলগ্রন্থ। কণাদের বৈশেষিক–সূত্রের উপর পরবর্তীতে বিভিন্ন ভাষ্যকার ভাষ্য রচনা করেন। কণাদ প্রণীত বৈশেষিক সূত্রে প্রকাশিত বৈশেষিক দর্শন নিরীশ্বরবাদী। কিন্তু পরবর্তী ভাষ্যকারদের দ্বারা প্রণীত বৈশেষিক দর্শন ঈশ্বরবাদী।

Dhaka University Institutional Repository

৯৭। দ্রষ্টব্যঃ ন্যায় অনুমানের আলোচনা উল্লেখ যে, বৈশেষিকগণ অনুমানের ভিত্তি হিসাবে নিয়ত সম্বন্ধের কথা বলেছেন। কিন্তু তারা 'ব্যাপ্তি' শব্দটি ব্যবহার করেন নি। কণাদ এ সম্পর্ককে 'প্রসিদ্ধি' এবং পরবর্তী বৈশেষিক দার্শনিক প্রশস্তপাদ একে 'বিধি' বা 'সম্য'বলেন।

৯৮। বাৎসায়নঃ *ন্যায়ভাষ্য*, পূর্বোক্ত, পৃ· ২৮০, ২৮৫ এবং বাচস্পতি মিশ্রঃ *ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকা*, পূর্বোক্ত, পৃ· ২৮৬

৯৯। J. N. Sinha: *History*, Vol . I, পূর্বোক্ত, পৃ· ৭৮৫।

১০০। শালিকানাথঃ *প্রকরণপঞ্জিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১১২

১০১। পালি ভাষায় লিখিত *ত্রিপিটক*-ই বৌদ্ধ দর্শনের মূলগ্রন্থ। *মিলিন্দপঞ্হ* (১০০ খ্রিঃ পূঃ), বুদ্ধঘোষের *বিশুদ্ধি-মাগ্গা* (৫০০খ্রিঃ) প্রভৃতি ত্রিপিটকের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। বুদ্ধ পরবর্তীকালে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ হীনযান ও মহাযান এ দু'শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েন। বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক হীনযান বা বস্তুবাদী শাখার এবং যোগাচার ও মাধ্যমিক মহাযান বা ভাববাদী শাখার অন্তর্ভুক্ত।

১০২। J. N. Sinha: *History*, Vol. II, পূর্বোক্ত, ৪১৪

১০৩। এখানে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক অর্থাৎ হীনযান মতানুসারে প্রমাণতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। ব্যবহারিকভাবে প্রমাণতত্ত্বের ব্যাপারে মাধ্যমিক ও যোগাচার অর্থাৎ মহাযান হীনযানদের সাথে মোটামুটি একমত। দ্রষ্টব্যঃ দেবব্রত সেনঃ *ভারতীয় দর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৫, পৃ· ১৩০ এর পাদটীকা। উল্লেখ যে, প্রমাণতত্ত্বের ক্ষেত্রে সৌত্রান্তিক ও বৈভাসিকদের মধ্যে মততেদ থাকার কারনে তাঁদেরকে যথাক্রমে বাহ্যানুমেয়বাদী (Representative Empiricist) এবং বাহ্যপ্রত্যক্ষবাদী (Direct Empiricist) বলা হয়। সৌত্রান্তিকদের মতে, বাহ্যবস্তু প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায় না। একমাত্র অনুমানের মাধ্যমে জানা যায়। কিন্তু বৈভাসিকদের মতে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান দুইই জ্ঞানের উৎস। তবে অনুমান প্রত্যক্ষ নির্ভর। দ্রষ্টব্যঃ নীরুকুমার চাকমাঃ *বুদ্ধঃ তাঁর ধর্ম ও দর্শন*, ঢাকা, ১১ এইচ, ফুলার রোড, ১৯৯০, পৃ·৬

১০৪। J. N. Sinha: *History*, Vol. II, পূর্বোক্ত পৃ· ৪১৪

১০৫। ধর্মোত্তরঃ *ন্যায় বিন্দুটিকা* ,বেনারস, কাশী সংস্কৃত সিরিজ, ১৯২৪, পৃ· ১৩

১০৬। পূর্বোক্ত, পৃ ১৪-১৫ এবং A. B. Keith, *Indian Logic and Atomism* , New Delhi, Oriental Books Reprint Corporation, 1977, পৃ· ৮১

১০৭। S. N. Das Gupta: *History*, Vol. II, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৫৬

১০৮। চব্বিশজন তীর্থঙ্কর বা শাস্ত্রকার জৈন দর্শনের প্রচারক। এদের প্রথম জনের নাম ঋষভদেব ও শেষজনের নাম বর্ধমান, যাকে মহাবীর বলা হয়। গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক মহাবীরের শিক্ষার উপরই জৈন ধর্ম ও দর্শনের গ্রন্থগুলো নির্ভরশীল। মৌর্য যুগে বৌদ্ধ দর্শনের মত জৈন দর্শনও পুনরায় প্রভাব বিস্তার করে। প্রথম মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত জৈন ধর্ম ও দর্শনের পৃষ্টপোষক ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু হন। দ্রষ্টব্যঃ W. M. Theodore de Bary (ed.): *Source of Indian Tradition*, Vol. I, New York, Columbia U. P. 1966, পৃ· ৪৩। পরবর্তী জৈন দার্শনিকগণ শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এ দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এদের মধ্যে মূল জৈন মত নিয়ে কোন দ্বিমত নেই। দিগম্বরদের মতে, তীর্থঙ্করগণ বস্ত্র পরিধান করতেন না এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধারণ করতেন না। কারণ, এসব মোক্ষ পরিপন্থী। কিন্তু শ্বেতাম্বরদের মত দিগম্বর মতের বিপরীত। জৈন দার্শনিক গ্রন্থগুলোর মধ্যে উমাস্বামীর *তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র* নামক গ্রন্থে জৈন দর্শনের মূলনীতিগুলো পাওয়া যায়। এর উপর বহু আলোচনা গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। তন্মধ্যে বিদ্যানন্দি স্বামী প্রণীত *তত্ত্বার্থশ্লোকবার্তিক* এবং অকলনদেব প্রণীত রাজবার্তিক উল্লেখযোগ্য। সিদ্ধসেন দিবাকর প্রণীত *ন্যায়াবতার*, মল্লিসেন প্রণীত *স্যাদ্বাদমঞ্জরী*, মানিক্যনন্দি রচিত *পরীক্ষামুখসূত্র* প্রভৃতি জৈন জ্ঞানবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যার প্রামাণ্য গ্রন্থ।

১০৯। J. N. Sinha: *History*, Vol. II, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৮৪

১১০। মানিক্যনন্দিঃ *পরীক্ষামুখসূত্র*(৫, ১-৩), এস, সি, বিদ্যাভূষণ (সম্পাদিত), কলিকাতা, বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা, ১৯০৯, পৃ· ৫

১১১। দ্রষ্টব্যঃ ন্যায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ

১১২। J. N. Sinha: *History*, Vol. II, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৮৬

১১৩। পূর্বোক্ত, পৃ· ১৮৭

১১৪। মানিক্যনন্দিঃ *পরীক্ষামুখসূত্র* (২, ১২-১৪), পূর্বোক্ত, পৃ· ২

১১৫। পূর্বোক্ত (২·৯), পৃ· ২

১১৬। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্যঃ J. N. Sinha: *History*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৯৫

১১৭। শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য শাস্ত্রীঃ *বেদান্ত দর্শন-অদ্বৈত বেদান্ত* , কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরাণ প্রেস, আগষ্ট, ১৯৪৯, পৃ· ৩১৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ভারতীয় দর্শনের আটটি দার্শনিক সম্প্রদায় যথা, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, জৈন, মীমাংসা ও বেদান্ত জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতীয় দর্শনের স্বীকৃত সর্বাধিক প্রমাণ সংখ্যা হল ছ'টি। প্রধানত এ প্রমাণগুলো হল, প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি। মীমাংসা ও বেদান্ত দার্শনিকগণ এ ছ'টি প্রমাণ স্বীকার করেছেন। জৈন দার্শনিকগণও মোট ছ'টি প্রমাণের কথা বলেছেন, যদিও তাঁদের প্রমাণগুলো উপরোক্ত ছ'টি প্রমাণ থেকে কিছুটা ভিন্ন। এগুলো হল, প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, প্রত্যাভিজ্ঞা, স্মৃতি এবং আরোহ বা তর্ক। এক কথায়, মীমাংসা, বেদান্ত এবং জৈন দর্শনেই সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রমাণ বা ছ'টি প্রমাণ স্বীকার করা হয়েছে। অন্যদিকে, এ আটটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃত নূন্যতম প্রমাণ সংখ্যা হল দু'টি। অর্থাৎ এদের সকলেই প্রত্যক্ষ এবং অনুমান নামক দু'টি প্রমাণকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এদের কেউই বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদ বা বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতাবাদকে সমর্থন করেন নি। ফলে এসব দার্শনিক সম্প্রদায়কে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মত বুদ্ধিবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী এ দু'টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যায় না। কিন্তু চার্বাক দার্শনিকদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। অধিবিদ্যার দিক থেকে চার্বাক দর্শন ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে যেমন একমাত্র বিশুদ্ধ বস্তুবাদী দর্শন তেমনি জ্ঞানবিদ্যার দিক থেকে চার্বাকগণ ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে একমাত্র বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতাবাদী। কারণ, চার্বাক দর্শনে মীমাংসা বা বেদান্তের মত ছ'টি প্রমাণকে স্বীকার করা হয় নি, আবার বৈশেষিক ও বৌদ্ধ দার্শনিকদের মত দু'টি প্রমাণেরও স্বীকৃতি দেয়া হয় নি। বরং স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। তাঁদের মতে, প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্যকোন উপায়েই যথার্থ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।[১]

২.১ প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ

চার্বাক দার্শনিক মতবাদ জ্ঞানবিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত।[২] চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা তাঁদের প্রত্যক্ষ সম্পর্কিত মতবাদের উপর নির্ভরশীল। মীমাংসা, বেদান্ত ও জৈন দর্শনে ভারতীয় দর্শনের সর্বাধিক অর্থাৎ ছ'টি প্রমাণকে স্বীকার করা হলেও চার্বাক দার্শনিকগণ একটি প্রমাণকেই বৈধ প্রমাণ বলে মনে করেন। তা হল প্রত্যক্ষ। তাঁদের মতে, প্রত্যক্ষই একমাত্র বৈধ জ্ঞানের উৎস এবং ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বহির্ভূত সবকিছুই অনিশ্চিত। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বহির্ভূত বলে অনুমানসহ অন্যান্য সকল প্রকার প্রমাণের বৈধতাকেও চার্বাক দার্শনিকগণ অস্বীকার করেন।৩ তাঁদের দর্শনকে 'লোকায়ত' দর্শন হিসাবে অভিহিত করারও অন্যতম কারণ হল তাঁদের প্রত্যক্ষ প্রমাণতত্ত্ব। কেননা তাঁরা একমাত্র প্রত্যক্ষযোগ্য জগৎ বা 'লোক'-কেই অস্তিত্বশীল বলেছেন। প্রত্যক্ষযোগ্য নয় বলে পরলোককে অস্বীকার করেছেন, অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে অনস্তিত্বশীল বলেছেন এবং প্রত্যক্ষযোগ্য ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এ চারিভূতকে যথার্থ সত্তা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে মূলত সাধারণ মানুষের উপযোগী দর্শন গড়ে তুলেছেন। এসব কিছুর মূলেই কাজ করেছে প্রত্যক্ষ প্রমাণতত্ত্ব।

ষড় ইন্দ্রিয়ে বিশ্বাসী মীমাংসা, ন্যায়, বৈশেষিক ও সাংখ্য দার্শনিকগণ মনকে একটি স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় হিসাবে স্বীকার করেছেন। কিন্তু চার্বাক দার্শনিকদের মতে, মন বাহ্য ইন্দ্রিয় থেকে পৃথক নয় এবং প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে তা বাহ্য ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ বাহ্য উদ্দীপক ও বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সংযোগে বাহ্য প্রত্যক্ষণ হয়, অতঃপর মানসিক প্রত্যক্ষণ ঘটে।

চার্বাক দর্শনে কেন প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হয় এ প্রশ্নের উত্তরে ভারতীয় দর্শনের প্রখ্যাত ভাষ্যকার মনিভদ্র দু'টি কারণের কথা উল্লেখ করেন। এর প্রথমটি হল, ধর্মের প্রবঞ্চনা এড়াবার জন্য। মনিভদ্রের ভাষায় ঃ

> এবম্ অমী অপি ধর্মচ্ছদ্মধূর্তাঃ পরবঞ্চনপ্রবণা যৎ কিঞ্চিৎ অনুমানাগমাদিদার্ঢ্যম্,
> আদর্শ্য ব্যর্থম্ মুগ্ধজনান্ স্বর্গাদিপ্রাপ্তিলভ্য ভোগাভোগপ্রলোভনয়া
> ভক্ষ্যাভক্ষ্যগম্যাগম্যহেয়োপাদেয়াদি সঙ্কটে পাতয়ন্তি,
> মুগ্ধ ধার্মিকান্ধম্ চ উৎপাদয়ন্তি ...।[৪]

অর্থাৎ অনুমান, আগম বা শব্দ ইত্যাদি জ্ঞানের তথাকথিত উৎসের দোহাই দিয়ে প্রতারণাপ্রবণ ধূর্তের দল সাধারণ মানুষের মনে স্বর্গপ্রাপ্তি সম্পর্কে মোহের সঞ্চার করে। এ সঙ্কট থেকে বাঁচার জন্য সাধারণ লোকের পক্ষে প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কোন প্রমাণকে স্বীকার করা নিরাপদ নয়। দ্বিতীয় যে কারণটির কথা মনিভদ্র উল্লেখ করেন তা হল, দারিদ্র ও দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া। মনিভদ্রের ভাষায় ঃ

কিঞ্চ চ অপ্রত্যক্ষম অপি অস্তিত্বতয়া অভ্যুপগম্যতে চেৎ জগৎ অনপহ্নুতম্ এব স্যাৎ, দরিদ্রঃ হি স্বর্ণরাশিঃ মে অস্তি ইতি অনুধ্যায় হেলয়া এব দৌঃস্থ্যম্ দলয়েৎ, দাসঃ অপি স্বচেতসি স্বামিতাম্ অবলম্ব্য কিংকরতাম্ নিরাকুর্য্যাৎ ইতি। ... এবং ন কশ্চিৎ সেব্য-সেবকভাবঃ দরিদ্রধনিভাবঃ বা স্যাৎ।[৫]

অর্থাৎ, অপ্রত্যক্ষকে যদি সত্যের সম্ভাবনা দিতে হয় তবে দরিদ্রের পক্ষে তার দারিদ্রের কথা, দাসের পক্ষে দাসত্বের কথা ভুলে থাকা অসম্ভব নয়। কারণ, দরিদ্র 'স্বর্ণরাশির মালিক হয়েছি'- একথা কল্পনা করে, দাস নিজেকে স্বামী মনে করে তার নিজের অবস্থাকে অবহেলায় দমন করতে পারে। এভাবে দরিদ্র-ধনিভাব ও সেব্য-সেবকভাব সবকিছুই নস্যাৎ হয়ে যায়।

মনিভদ্রের উক্তি থেকে দেখা যায়, মানুষের দারিদ্র ও দাসত্বের কারণরূপ শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই চার্বাক দর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যেই চার্বাকগণ প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কোন প্রমাণ স্বীকার করেন নি।

মনিভদ্র নির্দেশিত উপরোক্ত কারণ দু'টিকে চার্বাকদের প্রমাণতত্ত্বের সামাজিক কারণ হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। চার্বাক দর্শন চর্চা মূলত এই সামাজিক কারণ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। চার্বাক প্রমাণতত্ত্বের পেছনে যে দার্শনিক কারণটি বিদ্যমান তাও এই সামাজিক কারণের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষকে অতিপ্রাকৃতের উপর নির্ভরশীলতার হাত থেকে মুক্তিদানের জন্য দর্শন থেকে অধিবিদ্যাকে বর্জন করা চার্বাকদের জন্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। এ লক্ষ্য সাধনের জন্য একমাত্র যথার্থ হাতিয়ার যে প্রত্যক্ষবাদী প্রমাণতত্ত্ব, বিশ শতকের পাশ্চাত্য যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের মত, চার্বাকগণ তা যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়। আলোচনার অগ্রগতিতে আমরা দেখব যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতেই চার্বাকগণ দর্শন থেকে সকল প্রকার অধিবিদ্যার ধারণাকে বর্জন করে লোকায়ত তথা ইহজাগতিক দর্শনকে জনপ্রিয় করে তুলতে প্রয়াসী হন।

চার্বাকদের মতে, প্রত্যক্ষ দু'ভাবে হতে পারে। বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ।[৬] বাহ্য বস্তুর সাথে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে বাহ্য প্রত্যক্ষণ ঘটে থাকে। যেহেতু অতীত বা ভবিষ্যতের বাহ্য প্রত্যক্ষ সম্ভব নয় সেহেতু সার্বিক জ্ঞানও সম্ভব নয়।[৭] অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ নির্ভর। কারণ, মন স্বাধীনভাবে বাহ্য বস্তুর সাথে সম্পর্কিত হতে পারে না। তাই মন বাহ্য ইন্দ্রিয় নির্ভর।[৮] বাহ্য প্রত্যক্ষ যেসব উপাদান সরবরাহ করে মন কেবল তার উপরই কাজ করতে পারে। মন বাহ্য ইন্দ্রিয় থেকে স্বাধীন নয়। ***সর্বদর্শন সংগ্রহ*** গ্রন্থে মাধবাচার্য বলেন, **অন্তঃকরণস্য বহিরিন্দ্রিয় তন্ত্রত্বেন বাহ্যেঽর্থে স্বাতন্ত্র্যেণ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ।**[৯] অর্থাৎ, মন বহিরিন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় স্বতন্ত্রভাবে বাহ্যবস্তুর সাথে সম্পর্কিত হতে পারে না।

সুতরাং অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষ বাহ্যিক প্রতক্ষের পরবর্তী। প্রত্যক্ষকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ এ দু'ভাগে ভাগ করায় এবং অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষকে বাহ্য প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল এবং পরবর্তী হিসাবে চিহ্নিত করায় চার্বাক প্রত্যক্ষণের সাথে আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক হিউমের প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত মতবাদ তথা ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা মতবাদের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এছাড়া, শুধুমাত্র প্রত্যক্ষকে বৈধ প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করায় চার্বাক দর্শনে সাম্প্রতিক যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী মতবাদেরও পূর্বাভাষ পাওয়া যায়।[১০]

প্রত্যক্ষের প্রকৃতি : প্রত্যক্ষ শব্দটির দু'টি অংশ, প্রতি+অক্ষ। প্রতি শব্দের অর্থ পূর্বে বা কাছাকাছি বা সম্পর্কিত এবং অক্ষ শব্দের অর্থ চক্ষু। সুতরাং আক্ষরিক অর্থে চক্ষুর সাথে যে জ্ঞান সম্পর্কিত তাই প্রত্যক্ষ এবং একমাত্র চক্ষুই এর উৎস। উল্লেখ্য যে, প্রত্যক্ষকে কখনও বিশেষ্য অর্থে আবার কখনও বিশেষণ অর্থে ব্যবহার করা হয়। বিশেষ্য অর্থে প্রত্যক্ষ দ্বারা প্রত্যক্ষিত জ্ঞানকে এবং বিশেষণ অর্থে প্রত্যক্ষ দ্বারা জ্ঞানের উৎসকে বুঝায়। ভারতীয় দর্শনে প্রধানত জ্ঞানের উৎস বা প্রমাণ বুঝাতেই প্রত্যক্ষ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাই ন্যায় দার্শনিক কেশবমিশ্র প্রমুখ প্রত্যক্ষিত জ্ঞান বুঝাতে প্রত্যক্ষ শব্দটির পরিবর্তে সাক্ষাৎকার শব্দটি এবং প্রত্যক্ষিত জ্ঞানের উৎস বুঝাতে প্রত্যক্ষ শব্দটির ব্যবহারের কথা বলেন।[১১]

আক্ষরিক অর্থে চাক্ষুষ জ্ঞানকে একমাত্র প্রত্যক্ষজ্ঞানের ভিত্তি বলা হলেও ভারতীয় দর্শনে প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যে সবক'টি জ্ঞানেন্দ্রিয় অন্তর্ভুক্ত এবং কমপক্ষে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ প্রমাণের মাধ্যম। চার্বাক দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে প্রমাণ সাধিত হয় তাকেই বুঝিয়েছেন।

কখন একটি বিষয়কে প্রত্যক্ষ বলা হবে, এ নিয়েও ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রাচীন ন্যায় দার্শনিক উদয়ঠাকুর প্রমুখের মতে, আক্ষরিক অর্থে ইন্দ্রিয়ের সাথে যা সম্পর্কিত তাকেই প্রত্যক্ষের বিষয় বলা যাবে এবং ইন্দ্রিয়ের সাথে কোন কিছুর সম্পর্ক বা সন্নিকর্ষ ঘটলেই তা প্রত্যক্ষ।[১২] অন্যদিকে বৈশেষিক দার্শনিক প্রশস্তপদ প্রমুখের মতে, প্রত্যক্ষের উপর কোন বিষয় নির্ভরশীল হলে তার জ্ঞানই প্রত্যক্ষ।[১৩] কিন্তু নব্যনৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট প্রমুখ প্রত্যক্ষকে একটি বিশেষ উপজাতির জ্ঞান বলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের মতে, শুধু ইন্দ্রিয়ের সাথে সংযুক্ত বা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অবস্থিত বা ইন্দ্রিয়ের গঠনকারী বস্তুকে প্রত্যক্ষ বলা যাবে না। বরং প্রত্যক্ষ বলতে সেই সচেতনতাকে বুঝাবে যা ইন্দ্রিয় থেকে উৎপন্ন হয়।[১৪] জয়ন্ত ভট্ট প্রত্যক্ষের মধ্যে সচেতনতাকে আবশ্যিক উপাদান হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করায় তাঁর মতকে বেশী যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা হয়। কারণ, জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে জ্ঞাতার সচেতনতা অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সচেতনতাহীন জ্ঞাতার ইন্দ্রিয়ের সাথে বাহ্যবস্তুর সংযোগ জ্ঞানোৎপত্তি ঘটায় না বলে সচেতনতাহীন ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলা কতটুকু সঙ্গত এ সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ থাকে। চার্বাক দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষের প্রকৃতি সম্পর্কিত এ মতকেই সমর্থন করেন বলে মনে হয়। কারণ, তাঁরা মনকে বাহ্য ইন্দ্রিয় থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করেন না। সুতরাং ইন্দ্রিয় ও বস্তুর সংযোগের মধ্যে সবসময়ই সচেতনতা বিদ্যমান। মনকে বাহ্য ইন্দ্রিয় থেকে স্বতন্ত্র না মনে করায় চার্বাকদের প্রত্যক্ষণের মধ্যে সচেতনতাকে অনিবার্য উপাদান হিসাবে অনুমান করার অবকাশ থাকে। আর এ জন্যেই চার্বাকদের প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে একথা বলা হয় যে, চার্বাক প্রত্যক্ষণ হল 'অভ্যস্ত-দেহ-প্রতিক্রিয়া, যাকে 'দেহজ্ঞানমাত্র' বলা যায়। অর্থাৎ, একটি মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিতে প্রত্যক্ষণ সংঘটিত হয়। সংবেদনের পর এক ধরনের বাহ্য উদ্দীপকের ক্রম ক্রিয়ার ফলে অভ্যস্ত মস্তিষ্ক বিক্রিয়াই প্রত্যক্ষণ ঘটায়। একেই আধুনিক কালে ব্যাখ্যাতত্ত্ব (Interpretation Theory) বলা হয়।[১৫] সম্ভবত রাসেল একেই 'প্রাণী অভ্যাসের শারীর-তাত্ত্বিক অনুমান' বলেছেন।[১৬] কিন্তু প্রত্যক্ষণের এ মনোদৈহিক দিক সম্পর্কে বুদ্ধ-পূর্ব যুগের চার্বাকগণ সচেতন ছিলেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ভারতীয় সবগুলো দার্শনিক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষকে প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করে নিলেও তাঁদের মধ্যে প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা নিয়ে মতবিরোধ আছে। এ মতবিরোধকে বৃহত্তর অর্থে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।[১৭] প্রথমত, প্রত্যক্ষ হল স্বতন্ত্র (স্বলক্ষণ) বিশেষের অভ্রান্ত জ্ঞান। বৌদ্ধ দার্শনিকগণই এ মতের প্রধান সমর্থক। বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে, নাম বা সার্বিক ধারণা অর্থাৎ যেগুলোর মাধ্যমে আমরা সাধারণত বিশেষকে ব্যাখ্যা করে থাকি সেগুলো প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলো কল্পনা-জাত। দ্বিতীয়ত, জ্ঞেয়বস্তুর সাথে ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তা-ই প্রত্যক্ষ। ন্যায় দার্শনিক গৌতম, বৈশেষিক দার্শনিক কণাদ, মীমাংসা দার্শনিক কুমারিল ভট্টসহ বেশীরভাগ দার্শনিকই এ শ্রেণীর অন্তর্গত। তৃতীয়ত, প্রত্যক্ষ হল ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সরাসরি বা সাক্ষাৎ জ্ঞান। অদ্বৈত বেদান্ত, প্রভাকর মীমাংসা, নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশ, এবং চার্বাক দার্শনিকগণ এ শ্রেণীর অন্তর্গত। এ শ্রেণীর দার্শনিকদের মতে, দ্বিতীয় শ্রেণীর মতকে মেনে নিয়ে ইন্দ্রিয়ের সাথে জ্ঞেয় বস্তুর সংযোগকে প্রত্যক্ষ বললে স্মৃতিকেও প্রত্যক্ষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। কারণ, ইন্দ্রিয় ও বস্তুর সংযোগে স্মৃতিজ্ঞানেরও উদ্ভব হয়। কিন্তু তাঁরা স্মৃতিকে প্রত্যক্ষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে রাজী নন।

প্রত্যক্ষের প্রকার বা ধরন অনুসারেও ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যায় প্রত্যক্ষকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।[১৮] প্রথমত, নির্বিকল্পই প্রত্যক্ষের একমাত্র ধরন। এতে সবিকল্প অস্বীকৃত হয়েছে। বৌদ্ধরাই এ মতের প্রধান প্রতিনিধি। দ্বিতীয়ত, সবিকল্প ও নির্বিকল্প উভয়ই প্রত্যক্ষের ধরন। ন্যায় দর্শনসহ বেশীরভাগ দার্শনিক সম্প্রদায় এ মতের সমর্থক। তৃতীয়ত, সবিকল্পই প্রত্যক্ষের একমাত্র ধরন। এতে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ অস্বীকৃত হয়েছে। চার্বাকগণ এবং বেদান্ত দর্শনের মাধব ও বল্লবগোত্র এ মতের প্রতিনিধি।

ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি, সংখ্যা ও উপাদান : যেহেতু প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়কে অন্তর্ভুক্ত করে সেহেতু প্রত্যক্ষ সম্পর্কিত বিস্তারিত জ্ঞান পাবার জন্য ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি, সংখ্যা, উপাদান ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি সম্পর্কে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে যে মতভেদ বিরাজমান তা অনুসারে ভারতীয় দর্শিনিকদেরকে তিনটি দলে বিভক্ত করা যায়।[১৯] প্রথম দলের সমর্থকদের মতে, ইন্দ্রিয় হল এক প্রকার অঙ্গ। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ এ মতের সমর্থক। তাঁরা ইন্দ্রিয় বলতে গোলক বা ইন্দ্রিয়গহ্বর, অর্থাৎ নাক, কাণ, চোখ ইত্যাদি বুঝেছেন। এগুলো দৃশ্যযোগ্য। দ্বিতীয় দলের সমর্থকদের মতে, ইন্দ্রিয় অঙ্গ নয় বরং অঙ্গের স্বতন্ত্র শক্তি। মীমাংসা দার্শনিকগণ এ মতের সমর্থক। তৃতীয় দলের সমর্থকগণ ইন্দ্রিয়কে অঙ্গ বা অঙ্গের শক্তি কোনটাই বলেন নি। তাঁদের মতে, ইন্দ্রিয় একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য। এ দ্রব্য ইন্দ্রিয়-লব্ধ বস্তু দ্বারা গঠিত। চার্বাক দার্শনিকগণ এ দলের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, চার্বাকদের মতে, ইন্দ্রিয় ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ অর্থাৎ মাটি, জল, অগ্নি ও বায়ু এই চতুর্ভূত দ্বারা গঠিত। এসব উপাদান যে বস্তুতে আছে সেসব বস্তুই ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের বিষয়।

ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা নিয়েও ভারতীয় দর্শনে মতভেদ দেখা যায়।[২০] মীমাংসা, ন্যায় ও বৈশেষিক দার্শনিকদের মতে, ইন্দ্রিয় ছ'টি। যথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন। সাংখ্য দর্শন পরোক্ষভাবে মোট তেরোটি ইন্দ্রিয়কে স্বীকার করেছে। বৌদ্ধ অভিধর্ম মতাবলম্বীরা বাইশটি ইন্দ্রিয়কে স্বীকার করেছেন। কিন্তু চার্বাক দর্শনে মোট পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের কথা বলা হয়েছে। তাঁদের মতে, মন স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় নয়। বরং মন এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উপবস্তু।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্দ্রিয়ের উপাদান সম্পর্কেও ভারতীয় দার্শনিকগণ সকলে একমত নন। সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনে ইন্দ্রিয়ের জড়ীয় উপাদানকে অহংকার বলা হয়েছে।[২১] মীমাংসা, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে ইন্দ্রিয়ের জড়ীয় উপাদান হিসাবে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতের কথা বলা হয়েছে।[২২] বৌদ্ধদের মতে, রূপ বা জড়দ্রব্য দ্বারা ইন্দ্রিয় গঠিত।[২৩] জৈনদের মতে, পুদ্‌গল নামক স্বতন্ত্র দ্রব্য দ্বারা ইন্দ্রিয় গঠিত।[২৪] চার্বাকগণ মীমাংসা, ন্যায় ও বৈশেষিকদের পঞ্চভূত থেকে ব্যোম বা আকাশকে বাদ দিয়ে ক্ষিতি, অপ, তেজ, ও মরুৎ এই চতুর্ভূতকেই সব কিছুর মূল উপাদান বলে অভিহিত করেন। সুতরাং তাঁদের মতে, ইন্দ্রিয়ও এই চতুর্ভূতের সমন্বয়ে গঠিত। মীমাংসা, ন্যায় ও বৈশেষিক দার্শনিকগণ পঞ্চভূতের একেকটি ভূত দ্বারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের একেকটি ইন্দ্রিয় গঠিত বলে মনে করেন। তাঁরা এও মনে করেন যে, যে ইন্দ্রিয় যে ভূতে গঠিত সে ইন্দ্রিয় সে ভূতের বিশেষ গুণ প্রত্যক্ষ করে। তাঁদের মতে, মন কোন বিশেষ ভূতে গঠিত নয়। তাই এর প্রত্যক্ষ সীমাহীন। কিন্তু চার্বাকগণ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের গঠনের উপাদান হিসাবে বিশেষ ভূতের অবদান স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, চারটি ভূত সমন্বিত হয়েই পাঁচটি ইন্দ্রিয় গঠন করে। তাঁরা মনকেও এই চতুর্ভূতে গঠিত পঞ্চ-ইন্দ্রিয়-সম্পন্ন মানবদেহের উপজাত বিষয় বলে মনে করেন।

সুতরাং চার্বাক প্রত্যক্ষ-প্রমাণ সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, চার্বাক দার্শনিকগণ ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চতুর্ভূতে গঠিত পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে বাহ্য জগৎ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকেই একমাত্র বৈধ জ্ঞান বলেছেন। তাঁরা যেহেতু মানসিক প্রত্যক্ষকে বাহ্য-প্রত্যক্ষ-নির্ভর বলেছেন সেহেতু একথা বলা হয়ত অসঙ্গত হবে না যে, চার্বাকগণ প্রধানত বাহ্য প্রত্যক্ষকেই জ্ঞানের উপাদান সরবরাহকারী মাধ্যম বা জ্ঞানোৎপত্তির প্রাথমিক উৎস হিসাবে স্বীকার করেছেন।

এদিক থেকে বিচার করে ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যায় চার্বাক দার্শনিকদেরকে চরম অভিজ্ঞতাবাদী হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণ হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ায় চার্বাকদেরকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণবাদীও বলা হয়। তাঁদের এ জ্ঞানবিদ্যাগত অবস্থান অনন্য এবং অন্যান্য আটটি সম্প্রদায় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অভিজ্ঞতাবাদী হিসাবে চার্বাকগণ শুধুমাত্র প্রত্যক্ষকে প্রমাণ হিসাবে আখ্যায়িত করেই নিরত হন নি তাঁরা তাঁদের মতবাদকে যুক্তিপূর্ণ করার জন্য অনুমান ও শব্দসহ অন্যান্য সকল প্রকার প্রমাণকে অযথার্থ বলে খণ্ডন করেন।

২.২ অনুমান—প্রমাণের বৈধতা খণ্ডন

ন্যায় জ্ঞানবিদ্যায় অনুমানের বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। ন্যায় দর্শনে স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান এ দু' প্রকার অনুমানকে স্বীকার করা হয়েছে। পরার্থ ন্যায় অনুমান পঞ্চাবয়বী। যথা,

ক) পর্বতে বহ্নি আছে (প্রতিজ্ঞা)

খ) কারণ, পর্বতে ধুম আছে (হেতু)

গ) যেখানে ধুম সেখানেই বহ্নি, যেমন, পাকশালা (উদাহরণ)

ঘ) পর্বতে ধুম আছে (উপনয়)

ঙ) সুতরাং, পর্বতে বহ্নি আছে (নিগমন)

মীমাংসা, বেদান্ত, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনেও স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান- এ উভয় প্রকার অনুমানকে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু পঞ্চাবয়বী অনুমান স্বীকৃত হয় নি। বরং মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনে ত্রি-অবয়বী স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান, বৌদ্ধ দর্শনে ত্রি-অবয়বী পরার্থানুমান এবং জৈন দর্শনে দ্বি-অবয়বী, ত্রি-অবয়বী ও দশাবয়বী পরার্থানুমান স্বীকার করা হয়েছে।[২৫]

ন্যায় অনুমানে তিনটি পদ থাকেঃ সাধ্য, পক্ষ ও মধ্য। উপরোক্ত উদাহরণে মধ্যপদ ধুম, সাধ্যপদ বহ্নি এবং পক্ষপদ পর্বত। এতে মধ্যপদ সাধ্য পদের অস্তিত্বের ইঙ্গিত বহনকারী চিহ্ন। মধ্যপদ সর্বদাই অনুমানের উদ্দেশ্য বা পক্ষপদের মধ্যে অস্তিত্বশীল হয়ে সাধ্যের সাথে সার্বিক ও অনিবার্য সম্পর্কে সম্পর্কিত থাকে। মধ্যপদ ও সাধ্যপদের এই সার্বিক ও অনিবার্য সম্পর্কই 'ব্যাপ্তি সম্পর্ক'।[২৬] ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে অনুমানের প্রকারভেদ ও অবয়ব নিয়ে মতভেদ থাকলেও এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, ব্যাপ্তি সম্পর্কই অনুমানের মূলভিত্তি। লক্ষণীয় বিষয় হল, ব্যাপ্তি সম্পর্কের অস্তিত্ব অনুমানের কারণ নয় বরং ব্যাপ্তি সম্পর্কের জ্ঞানই অনুমানের কারণ।[২৭] কিন্তু অনুমানের ভিত্তি আরোহাত্মক সম্পর্ক বা ব্যাপ্তি সম্পর্কের জ্ঞানের সত্যতায় বিশ্বাস করার পক্ষে যথেষ্ট নিশ্চয়তা না থাকায় চার্বাকগণ অনুমানকে অস্বীকার করেন।[২৮] চন্দ্রধর শর্মা চার্বাকদের অনুমানের বৈধতা খণ্ডনের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে অবরোহাত্মক ও আরোহাত্মক উভয় প্রকার অনুমান খণ্ডনের পক্ষে যুক্তি উথাপন করেছেন। অবরোহাত্মক অনুমান চক্রক দোষে দুষ্ট। এতে সিদ্ধান্তকে সার্বিক আশ্রয়বাক্যে প্রথমেই স্বীকার করা হয় এবং তাকেই আবার সিদ্ধান্তে প্রমাণ করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়। কিন্তু এরূপ সার্বিক বাক্যের বৈধতা প্রমাণিত থাকে না। অন্যদিকে, আরোহাত্মক অনুমানে অবরোহাত্মক অনুমানের সার্বিক আশ্রয়বাক্যকে প্রমাণের কাজটিই সম্পাদন করা হয়। কিন্তু আরোহ অনুমানও অনিশ্চিত। কারণ, তা নিশ্চয়তা ছাড়াই জানা থেকে অজানার দিকে অগ্রসর হয়। প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ বচন সত্য হতে পারে। কিন্তু অপ্রত্যক্ষযোগ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে এরূপ বচন সত্য হবে এমন নিশ্চয়তা নাই।[২৯] তাই সরল গননামূলক আরোহ থেকে প্রকৃত আরোহকে পৃথক করার একমাত্র উপায় হল, আরোহ অনুমানকে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ভর অর্থাৎ নিয়ত বা ব্যাপ্তি সম্পর্ক নির্ভর বলে প্রমাণ করা। সুতরাং ব্যাপ্তি হল অনুমানের মূলভিত্তি। কিন্তু চার্বাকগণ ব্যাপ্তি সম্পর্ককে অনিশ্চিত বা অনুমানমূলক বলে মনে করেন। এতে চক্রক অনুপপত্তির উদ্ভব হয়,[৩০] ফলে আরোহ অনিশ্চিত এবং অবরোহ চক্রক দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। তাই অনুমানকে জ্ঞানের বৈধ উপায় হিসাবে গণ্য করা যায় না। ন্যায় দর্শনে অনুমান সম্পর্কে বলা হয়েছে, অনুমান প্রত্যক্ষ বিশেষমূলক জ্ঞান।[৩১] এখানে মূলত হেতু বা লিঙ্গের সাথে সাধ্য বা লিঙ্গীর নিয়ত সম্পর্ককে প্রত্যক্ষের উপরই জোর দেয়া হয়েছে। এটাই অনুমানের মূলভিত্তি। কিন্তু চার্বাকদের মতে, লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্পর্ক প্রত্যক্ষিত হলেও তা বিশেষ ঘটনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষিত হয়। সার্বিক সম্পর্ক প্রত্যক্ষিত হয়না। অনুমানের বিরুদ্ধে চার্বাকদের মূল আপত্তি এখানেই।

ভারতীয় দর্শনের অন্য আটটি সম্প্রদায় অনুমানকে প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করেছেন। তাঁদের স্বীকৃত অনুমানের ভিত্তি হল ব্যাপ্তি সম্পর্কের জ্ঞান। কিন্তু চার্বাকগণ অনুমানের ভিত্তি ব্যাপ্তির বৈধতা খণ্ডন করেন। এ সম্পর্কিত চার্বাকদের মতকে নিম্নোক্ত আকারে উপস্থাপন করা যায় ঃ

(ক) প্রতক্ষের মাধ্যমে ব্যাপ্তি জ্ঞান পাওয়া যায় না। প্রত্যক্ষ দুই প্রকার ঃ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের সাথে বস্তুর যথাযথ সংযোগের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। কিন্তু অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল বিশেষ বস্তুর সাথে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সম্ভব নয় বলে বাহ্য প্রত্যক্ষের মাধ্যমে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাধ্য ও মধ্যপদের নিয়ত সংযোগ জানা যায় না। অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষের মাধ্যমেও ব্যাপ্তি জ্ঞান সম্ভব নয়। কারণ, মন ইন্দ্রিয় থেকে স্বাধীন নয়। মন কেবলমাত্র বাহ্য প্রত্যক্ষ দ্বারা ইন্দ্রিয়ের নিকট থেকে প্রাপ্ত উপাদানগুলোর বিশ্লেষণ করতে পারে। যেহেতু বাহ্য প্রত্যক্ষে ব্যাপ্তি জ্ঞানকে পাওয়া যায় না এবং অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষ বাহ্য প্রত্যক্ষের দ্বারা সরবরাহকৃত উপাদানের উপর নির্ভরশীল সেহেতু অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষেও ব্যাপ্তিজ্ঞান পাওয়া যায় না। সুতরাং বলা যায়, প্রত্যক্ষে আমরা কেবল বিশেষ দৃষ্টান্ত পাই। চার্বাকদের প্রশ্ন, এ থেকে আমরা কিভাবে সকল সম্পর্কিত সার্বিক বচনে পৌছতে পারি? সুতরাং এ ধরনের জ্ঞান প্রমাণিত নয়।[৩২]

(খ) ব্যাপ্তি-জ্ঞান সাধ্য ও মধ্যপদের জাতিবাচক জ্ঞানও নয়। কারণ, শ্রেণী ও জাতিবাচক বৈশিষ্ট্যকে প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে জানা যায় না। সুতরাং কোন শ্রেণীবাচক বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব নাই। ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থে জয়ন্তভট্ট বলেন;

সামান্যদ্বারকো২প্যস্তি নাবিনাভাবনিশ্চয়।
বাস্তবং হি ন সামান্যং নাম কিং চন বিদ্যতে।।[৩৩]

অর্থাৎ, সামান্যের ভিত্তিরূপ নিয়ত সম্পর্কের নিশ্চয়তা নাই। বাস্তবে সামান্য বলতে কিছু নাই। এমনকি প্রত্যক্ষণ দ্বারা শ্রেণীবাচক বৈশিষ্ট্য জানা গেলেও তা সকল বিশেষ সাধ্য ও মধ্যপদের মধ্যকার নিয়ত সংযোগকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।[৩৪] কারণ বিশেষ সাধ্য ও মধ্যপদের স্থান, কাল ও পাত্রের ভিন্নতার কারণে ব্যাপ্তি সকল বিশেষ দৃষ্টান্তে অস্তিত্বশীল হতে পারে না। *ন্যায়মঞ্জরী* গ্রন্থে বলা হয়েছে;

দেশকালদশাভেদবিচিত্রাত্মসু বস্তুষু।
অবিনাভাবনিয়মো ন শক্যো ...।।[৩৫]

অর্থাৎ, দেশ, কাল এবং অবস্থার ভিন্নতাভেদে বিচিত্র বস্তুতে নিয়ত সম্পর্ক সম্ভব নয়।

(গ) ব্যাপ্তি জ্ঞান অনুমানের মাধ্যমেও সম্ভব নয়। কারণ, এতে অনবস্থা বা সীমাহীন অনুক্রম দোষ ঘটে। একটি ব্যাপ্তিকে জানার জন্য অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। এই অনুমান আবার ব্যাপ্তি নির্ভর এবং এ নির্ভরতা সীমাহীন।[৩৬] সুতরাং অনুমান প্রমাণও ব্যাপ্তি জ্ঞানলাভের জন্য যথেষ্ট নয়।

(ঘ) ব্যাপ্তি জ্ঞান শব্দ-প্রমাণ দ্বারাও লাভ করা যায় না। কারণ, বৈশেষিক দার্শনিকগণ শব্দ-প্রমাণকে অনুমান নির্ভর বলে প্রমাণ করেছেন। তাছাড়া শব্দ-প্রমাণ অনুমান নির্ভর না হলেও তাদ্বারা ব্যাপ্তি সম্পর্কে জানা যায় না। কারণ, এতে বিশ্বস্ত ব্যক্তির উচ্চারিত বচনের উপর নির্ভর করতে হয়। এখানে উচ্চারিত বচন হল শব্দের অর্থের চিহ্ন। শব্দের অর্থের উপলব্ধি আবার শব্দ ও এর অর্থের নিয়ত অপরিবর্তনীয় সংযোগের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এদিক থেকেও শব্দ-প্রমাণ শব্দ ও তার অর্থের ব্যাপ্তি সম্পর্ক নির্ভর।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থের নিয়ত অপরিবর্তনীয় সংযোগের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এদিক থেকেও শব্দ-প্রমাণ শব্দ ও তার অর্থের ব্যাপ্তি সম্পর্ক নির্ভর। তাই ব্যাপ্তি সম্পর্ক শব্দ-প্রমাণ নির্ভর হলেও অনবস্থা দোষ ঘটে।[৩৭]

(ঙ) উপমান বা তুলনা-প্রমাণ দ্বারাও ব্যাপ্তি জ্ঞানলাভ করা যায়না। কারণ, উপমার জ্ঞান বচন (যেমন, বন কর্মকর্তা নির্দেশিত বচন, বনগাই গাভি সদৃশ) নির্দেশিত বস্তুর (বনগাই) জ্ঞান। সুতরাং এ জ্ঞানও বচন ও তার অর্থের নিয়ত সংযোগের জ্ঞান নির্ভর। অর্থাৎ এখানেও আবার ব্যাপ্তি-জ্ঞানের জন্য ব্যাপ্তি নির্ভরতা বা অনবস্থা দোষ ঘটে।

(চ) ব্যাপ্তি জ্ঞান সাধ্য ও মধ্যপদের মধ্যকার নিয়ত সংযোগের জ্ঞান। নৈয়ায়িকদের মতে, এটা সকল প্রকার উপাধি বা শর্তমুক্ত। অর্থাৎ এ সম্পর্ক প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক। যেমন, ভিজা কাঠে আগুন লাগলে ধোঁয়া থাকে, এ দৃষ্টান্তে ভিজা কাঠ হল ধোঁয়া থাকার শর্ত বা উপাধি। উপাধি দু'রকম হতে পারে। নিশ্চিত বা শঙ্কিত। ভিজা কাঠ আমাদের জানা। তাই এখানে উপাধি নিশ্চিত। কিন্তু যে উপাধি অজানা তা শঙ্কিত উপাধি। অজানা বলে এর সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে দূর করা যায় না।[৩৮] চার্বাকদের যুক্তি হল, নৈয়ায়িকদের মত যদি যথার্থ হয় অর্থাৎ ব্যাপ্তি-জ্ঞান যদি শর্তহীন হয় তবে তা প্রমাণের উপায় কি? সকল শর্তকে কখনোই প্রত্যক্ষ করা যায় না। সকল প্রকার শর্তের অনুপস্থিতিকে অনুপলব্ধি-প্রমাণ দ্বারাও জানার উপায় নাই। কোন বস্তু ইন্দ্রিয়ের সামনে অনুপস্থিত একথা উপলব্ধি করতে হলে সেই বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত পূর্বজ্ঞান থাকতে হবে। সুতরাং সকল প্রকার শর্তের অনুপলব্ধি জ্ঞান অনিবার্যভাবে সকল প্রকার শর্তের উপস্থিতি-জ্ঞান নির্ভর। কিন্তু সকল প্রকার শর্তের উপস্থিতি জ্ঞানও প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। এছাড়া সকল প্রকার শর্তের অনুপলব্ধিও সম্ভব নয়। যেমন, আগুন ছাড়াও ধোঁয়ার অস্তিত্বের সন্দেহ সব সময়ই থেকে যায়। আবার যদি অনুমান, শব্দ বা উপমান দ্বারা সকল প্রকার শর্তের অনুপস্থিতিকে জানার চেষ্টা করা হয় তবে পূর্বোক্ত অনুমান, শব্দ ও উপমান প্রমাণ সম্পর্কিত অসুবিধাগুলোর উদ্ভব হয়। এছাড়া, শর্তের অনুপস্থিতির জ্ঞানকে জানতে গেলে ও একটি যুক্তির বৃত্ত সৃষ্টি হয়। যেমন, ব্যাপ্তি জ্ঞান শর্তের অনুপস্থিতির জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। শর্তের অনুপস্থিতি আবার শর্তের জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং ব্যাপ্তি জ্ঞান শর্তের জ্ঞান নির্ভর।[৩৯]

(ছ) চার্বাকগণ যুক্তি দিয়ে বলেন যে, ব্যাপ্তি সম্পর্ক বিরোধিতাহীন ঐক্যের প্রত্যক্ষণ। অর্থাৎ সরল গণনামূলক আরোহানুমান নির্ভর। কিন্তু অতীতে বহু ঘটনার মধ্যে দু'টি পদের সংযোগ থাকলেও ভবিষ্যতে থাকবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং অতীতের সম্পর্ক থেকে ভবিষ্যতের সম্পর্কের ব্যাপারে একটি প্রত্যাশা করা যেতে পারে মাত্র। কিন্তু এর দ্বারা কোন অনিবার্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একথা বলা যায় না।[৪০] পৃথিবীর সকল ক্ষেত্রে আগুন ও ধোঁয়ার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। যদি তা সম্ভব হয় তবুও এ সন্দেহ থেকে যায় যে, আগুন ছাড়াও ধোঁয়ার অস্তিত্ব থাকতে পারে। সর্বক্ষেত্রে তাদের একত্র উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা গেলেও অসংখ্য দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে সর্বক্ষেত্রে তাদের অনুপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। কারণ, যেসব ক্ষেত্রে আগুন অনুপস্থিত সেসব ক্ষেত্রে ধোঁয়াও অনুপস্থিত কি না এটা প্রত্যক্ষণ অসম্ভব।[৪১] আগুন ব্যতীত পৃথিবীর আর সব বস্তুই অগ্নিহীন। কিন্তু সব অগ্নিহীন বস্তু যে ধোঁয়াহীন এ বিষয় কখনও প্রত্যক্ষ করা যাবে না।

উপরোক্ত যুক্তিগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চার্বাকগণ যদিও প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণকে বৈধ বলে স্বীকার করেন নি তবুও ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত প্রধান প্রমাণগুলোর মাধ্যমে বিচার করে দেখিয়েছেন যে, ব্যাপ্তি জ্ঞানকে এর কোনটি দ্বারাই লাভ করা যায় না। যেহেতু প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান এর কোনটি দ্বারাই ব্যাপ্তি-জ্ঞান পাওয়া যায় না সেহেতু তাঁদের সিদ্ধান্ত হল, ব্যাপ্তি জ্ঞান নির্ভর অনুমান সম্ভব নয়। মাধবাচার্যের সর্বদর্শন সংগ্রহ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, তস্মাদ্‌বিনাভাবস্য দুর্বোধতয়া নানুমানাদ্যবকাঃ।[৪২] অর্থাৎ নিয়ত সম্পর্কের দুর্বোধ্যতাহেতু অনুমান প্রভৃতি সম্ভব নয়।

মাধ্যমিক বৌদ্ধ ও অদ্বৈত বেদান্তের অনুমানের সাথে তুলনা : মাধ্যমিক শূন্যবাদী বৌদ্ধ ও অদ্বৈত বেদান্ত দার্শনিকগণও অনুমানের চূড়ান্ত বৈধতা অস্বীকার করেছেন। তবে অনেকের[৪৩] মতে, চার্বাক দার্শনিকদের অনুমান খণ্ডন এবং শূন্যবাদী বৌদ্ধ ও অদ্বৈত বেদান্ত দার্শনিকদের অনুমান খণ্ডনের মধ্যে পার্থক্য আছে। কারণ, চার্বাক দার্শনিকগণ একমাত্র প্রত্যক্ষের বৈধতাকে স্বীকার করেছেন এবং অন্যান্য সকল প্রকার প্রমাণের সত্যতাকে প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল বলেছেন। কিন্তু শূন্যবাদী বৌদ্ধ ও অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে প্রত্যক্ষসহ সকল প্রকার প্রমাণের চূড়ান্ত বৈধতাকে অস্বীকার করা হলেও তাঁরা সকল প্রকার প্রমাণের অভিজ্ঞতাভিত্তিক বৈধতাকে স্বীকার করেছেন। চার্বাক দার্শনিকগণ চূড়ান্ত ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না।[৪৪] সুতরাং এসব পণ্ডিতদের মতে, শূন্যবাদী বৌদ্ধ ও অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে অনুমানের চূড়ান্ত বৈধতাকে অস্বীকার করা হলেও অভিজ্ঞতামূলক বৈধতাকে স্বীকার করা হয়েছে যা চার্বাকগণ করেন নি। প্রত্যক্ষের বৈধতাকে স্বীকার করে একই সময়ে একই ভিত্তি থেকে অনুমানের বৈধতাকে অস্বীকার করায় চার্বাক দার্শনিকদের বিরুদ্ধে স্ববিরোধিতার

অভিযোগ আনা হয়েছে।[৪৫] কারণ, প্রত্যক্ষ বৈধ এবং অনুমান অবৈধ এই মতবাদ অনুমানেরই ফল। এছাড়া অন্যকোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনুমান যে বৈধ নয় তাও চার্বাকগণ অনুমান ছাড়া প্রত্যক্ষ দ্বারা জানতে পারেন না। কারণ, অন্যের চিন্তা, ধারণা ইত্যাদি অনুমানের বিষয়, প্রত্যক্ষের বিষয় নয়।

কিন্তু চার্বাক দার্শনিকগণ দৈনন্দিন জীবনের উপযোগী অভিজ্ঞতামূলক অনুমানসহ সকল প্রকার অনুমানের বৈধতা যথার্থই অস্বীকার করেছেন কিনা এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। সপ্তম শতকের চার্বাকপন্থী দার্শনিক পুরন্দর একথা মনে করেন যে, প্রত্যক্ষযোগ্য জগতে অনুমান বৈধ কিন্তু অতীন্দ্রিয় জগতে অনুমান বৈধ নয়।[৪৬] পুরন্দরের এই মন্তব্যের সাথে সঙ্গতি রেখে সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত একথা বলেছেন যে, যে যুক্তির সাহায্যে সাধারণ অভিজ্ঞাতায় জানা ব্যবহারিক জীবনের অনুমানের প্রামাণ্য এবং অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত বা অতীন্দ্রিয় বিষয়ে অনুমানের অনুপযোগিতা, এ দুই-এর মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করা যায় সে যুক্তিটি হল দু'টি বিষয়ের মধ্যে নিয়ত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হলে অনুমান সম্ভব নয়-এ যুক্তি। নিয়ত সম্পর্ক স্থাপনের শর্ত হল দু'টি, বহু দৃষ্টান্তে উভয়কে একত্রে দর্শন, এবং বহু দৃষ্টান্তে একটির অভাবে অন্যটিরও অভাব দর্শন। কিন্তু এ জাতীয় দ্বিবিধ প্রত্যক্ষণ পারলৌকিক বিষয়ে সম্ভব নয় বলে এ বিষয়ে কোন নিয়ত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাও সম্ভব নয়। শুধু প্রত্যক্ষগোচর ইহলৌকিক বিষয়ে এ জাতীয় দ্বিবিধ দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষণের সম্ভাবনা আছে। তাই প্রত্যক্ষগোচর ইহলৌকিক বিষয়ে সাধারণ স্বীকৃত অনুমানের উপযোগিতা স্বীকার করা যায়।[৪৭] এ প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মত উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেনঃ

ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যের নানা নজির অবজ্ঞা না করলে পুরন্দর নামের দার্শনিককে চার্বাক মতের প্রবক্তা বলে স্বীকার করতে হবে। অতএব পুরন্দরের উপরোক্ত বক্তব্য চার্বাক মত বলেও স্বীকার করা প্রয়োজন। তাহলে চার্বাকরা কোন রকম অনুমানই মানতেন না এহেন দাবীকে অত্যুক্তি বলে সন্দেহ করারও কারণ আছে। বরং স্বীকার করা দরকার যে, চার্বাকমতে পরলোকাদির অনুমান অসম্ভব হলেও প্রত্যক্ষগোচর ইহলৌকিক বিষয়ে লোক প্রসিদ্ধ অনুমান স্বীকার্য।[৪৮]

চার্বাক দার্শনিকগণ অনুমানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন এ মতকে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অতিরঞ্জিত বলে মনে করেন।[৪৯] কিন্তু মাধবাচার্যের মতে, চার্বাকগণ অনুমান মাত্রেরই বিরোধী। কারণ, অনুমানের ভিত্তি ব্যাপ্তি-জ্ঞান নিশ্চিত নয়। বাচস্পতি মিশ্রের বর্ণনানুসারে, জন্তু জানোয়ারের আচরণ থেকে অনুমান পরায়ণতা যতটুকু পরিচয় পাওয়া যায় চার্বাকগণ তাও স্বীকার করেন নি। আধুনিক পণ্ডিতগণ বাচস্পতির বর্ণনাকে অত্যুক্তি বলে মনে করলেও মাধবাচার্যের মতামতকে প্রায় সকলেই যথার্থ বলে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু এতে দু'টি অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সেগুলো হল, (ক) লৌকিকসহ সকল প্রকার অনুমানকে অস্বীকার করলে সাধারণ লোক ব্যবহারই অসম্ভব হয়ে পড়ে। দৈনন্দিন জীবন হয়ে পড়ে অচল। এদিক থেকে চার্বাকগণ এত অসাবধান ছিলেন বলে মনে হয় না। অন্যদিকে তাঁদের দর্শন লোকায়ত। অথচ লৌকিক অনুমান অস্বীকার করলে তা সাধারণের কাছে সমাদৃত হয় কিভাবে- এ প্রশ্ন থেকে যায়।

(খ) লোকায়তিকদের প্রামাণিক গাঁথাগুলো অনুমান নির্ভর। কারণ, যজ্ঞে নিহত জীবের স্বর্গপ্রাপ্তি হলে যজ্ঞে নিহত স্বীয় পিতারও স্বর্গপ্রাপ্তি মানতে হবে, চার্বাকদের এ দাবীটিও অনুমান নির্ভর। এসব কারণে, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত হলঃ

"চার্বাক মতকে একেবারে খেলো প্রতিপন্ন করার উৎসাহে অনেকে বলেছেন এই মতে প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কিছুই প্রামাণ্য নাই। অতএব চার্বাকগণ অনুমান মানেন না,... কিন্তু প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য থেকে মনে হয় যে, পারলৌকিক বিষয়ে অনুমানকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলেও প্রত্যক্ষগোচর বা প্রত্যক্ষ অনুগামী লৌকিক অনুমান স্বীকার করায় চার্বাকদের আপত্তি ছিল না।"[৫০]

উক্ত বিতর্ক থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, চার্বাক দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষকেই অন্যতম প্রমাণ বলে স্বীকার করেছেন। তাঁরা প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয়ের অনুমানকে স্বীকার করলেও অপ্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় সম্পর্কিত অনুমানকে স্বীকার করেন নি। তবে চরম অভিজ্ঞতাবাদীদের পক্ষে কোন অনুমানকেই যৌক্তিক দিক থেকে বৈধ প্রমাণ বলে মনে করা এবং অনুমানলব্ধ জ্ঞানকে নিশ্চিত জ্ঞান বলে স্বীকার করার অবকাশ নাই। কারণ, অনুমানের ভিত্তি হেতু ও সাধ্যের মধ্যকার ব্যাপ্তি সম্পর্ক প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। অবশ্য একথা ঠিক যে, চরম অভিজ্ঞতাবাদীদের পক্ষে প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানকেও নিশ্চিত বলে দাবী করার অবকাশ নাই। কারণ, কোন প্রত্যক্ষণই ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ বা অধ্যাসের সম্ভাবনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নয়। তাই চরম অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে যৌক্তিক দিক থেকে সকল জ্ঞানই সম্ভাব্য এবং অতীন্দ্রিয় জ্ঞান অসম্ভব হতে বাধ্য।

এদিক থেকে বিচার করে একথা বলা হয়ত অসঙ্গত হবে না যে, চার্বাকদের পক্ষে প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কোন প্রমাণকে বৈধ হিসাবে স্বীকার করার অবকাশ ছিল না। তবে দৈনন্দিন জীবনে অনুমানের উপযোগিতাকে তাঁরা স্বীকার করতে পারেন। কেননা দৈনন্দিন জীবনে অনেক সময় অনুমানের মাধ্যমে সফল কার্য সম্পাদন সম্ভব হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে অনুমান সত্য বা যথার্থ বলেও

Dhaka University Institutional Repository

প্রমাণিত হয়। এ বিষয়টি সম্পর্কে চার্বাক দার্শনিকগণ অজ্ঞ বা অসচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। তবে তাঁদের মতে, অনুমানের এই সত্যতা বা যথার্থতা অনুমানের অনিবার্য বৈশিষ্ট্য নয় বরং তা আকস্মিক। অনুমান অনিবার্যভাবে নয় বরং আকস্মিকভাবেই সত্য হয় এবং সম্ভাব্যতা দ্বারাই আমাদের জীবন পরিচালিত হয়।[৫১] এ প্রসঙ্গে হিরিয়ান্নার মত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, যুক্তি বা অনুমানের সিদ্ধান্ত যে চূড়ান্ত নয় এ প্রসঙ্গে ভারতীয় অভিজ্ঞতাবাদীরা সচেতন ছিলেন। কারণ, সকল প্রকার যুক্তিই মূলত কিছু পরিমাণ আরোহাত্মক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এসব আরোহ অত্যন্ত বেশী পরিমাণে সম্ভাব্য হতে পারে তবে প্রতিপাদনযোগ্য সত্য নয়।[৫২] চার্বাকগণ মূলত তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিবিদ্যার চরম তাত্ত্বিকতার উপর নির্ভর করেই অনুমানের বৈধতাকে খণ্ডন করেছেন। এজন্য তাঁদেরকে চরম যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী আখ্যা দেয়া যায়।[৫৩] অনুমানলব্ধ জ্ঞান যে নিশ্চিত নয় বরং সম্ভাব্য মাত্র, চার্বাকদের এ মতের প্রতিধ্বনি শোনা যায় সমকালীন দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলের লেখায়। রাসেলও অনুমানলব্ধ জ্ঞান সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, সমগ্র জ্ঞানতত্ত্বের সবচেয়ে কঠিন সমস্যাটা সম্ভবত আরোহের সমস্যা। সমস্ত বৈজ্ঞানিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয় এর সাহায্যে। অথচ একে কেন আমরা একটা বৈধ যৌক্তিক পদ্ধতি বলে বিশ্বাস করবো তা বোঝা কঠিন। কিভাবে অথবা কেন যে আরোহ যুক্তিসিদ্ধ হবে সেটা দেখানোর সমস্যা এখনও তার সমাধান খুঁজে পায় নি। এর সমাধান না পাওয়া পর্যন্ত যুক্তিবাদী মানুষ এ মর্মে সন্দেহ করবে যে, তার খাদ্য পুষ্টি যোগাবে কিনা এবং আগামীকাল সূর্যোদয় হবে কি না।[৫৪]

সুতরাং রাসেলের পরিভাষা ব্যবহার করে প্রাচীন ভারতের চার্বাকদের যুক্তিবাদী মানুষ বলতে দ্বিধা থাকার কথা নয়। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ইতিমধ্যে জ্ঞাত নয় এমন কোন জ্ঞান মূলত একটি বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে যা অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রমাণও করা যায় না আবার খণ্ডনও করা যায়না।[৫৫] সাম্প্রতিক কালে বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে জ্ঞানবিদ্যার আলোচক আর. এম. চিজম–এর জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায়ও চার্বাক মতের অনুরণন শোনা যায়। তাঁর মতে, ইংরেজ দার্শনিক উইলিয়াম হোয়েওয়েল বলেছিলেন যে, নিছক দৃষ্টান্তসমূহের সংকলন থেকে ঐ সব দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তিশীল সাধারণীকরণের আবশ্যিকতার পক্ষে সামান্যতম যুক্তিও প্রদান করে না। অভিজ্ঞতায় কি ঘটেছে তা নিরীক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করতে পারে। কিন্তু যে কোন ঘটনা বা ঘটনাসমূহের কোন সংকলন থেকে কোন্ ঘটনাটি অবশ্যই ঘটবে তার কোন যুক্তিই খুঁজে বের করতে পারে না।[৫৬] চিজম্ হোয়েওয়েলের এ মতকে সমর্থন করেন।[৫৭]

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাপ্তি জ্ঞান ভিত্তিক অনুমানের বৈধতার প্রশ্নে যৌক্তিক বিরোধিতা করে প্রাচীন ভারতীয় চার্বাক দার্শনিকগণ অতি আধুনিক মননেরই পরিচয় দিয়েছেন। এ দৃষ্টিভঙ্গি নঞর্থক হলেও দর্শনের ইতিহাসে এর মূল্য অস্বীকার করা যায় না। কারণ, এটি হাজার হাজার বছর আগেই দার্শনিকদেরে অনুমানের সীমা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছে।[৫৮] কাজেই চার্বাকদের অনুমান বিরোধিতার কারণে যখন কোন কোন ভারতীয় দার্শনিক[৫৯] চার্বাকদের মতকে অর্থহীন বা বাজে বলে অবহেলা করেন এবং এ দর্শনকে 'আদৌ কোন দর্শন নয়' বলে উড়িয়ে দিতে চান তখন চার্বাকদের কাছে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের ঋণ স্বীকার করে সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেনঃ

"... প্রমা ও প্রামাণ্য বিষয়ে চার্বাকদের মতামতের যথেষ্ট মূল্য আছে। অনুমান সম্বন্ধে চার্বাকদের যে আপত্তি, আরোহানুমানের বিরুদ্ধে আধুনিক কালে সে আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে। চার্বাকদের ন্যায় পাশ্চাত্য কার্যকারিতাবাদী [প্রয়োগবাদী] ও দৃষ্টবাদী [প্রত্যক্ষবাদী] দার্শনিকগণ স্বীকার করেন যে, অনুমান দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান লাভ করা যায়না।"[৬০]

চার্বাকগণ যদি দৈনন্দিন জীবনে অনুমানের উপযোগিতাকে স্বীকার করেন এবং অনুমান যে কোন কোন সময় আকস্মিকভাবে সত্য হয় একথা বলেন তবে প্রশ্ন জাগতে পারে চার্বাকদের এই স্বীকৃতি তাঁদের অনুমানের বৈধতা খণ্ডনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না। এর উত্তরে বলা যায়, যা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, মাধ্যমিক বৌদ্ধ ও অদ্বৈত বেদান্ত দার্শনিকগণও অনুমানের চূড়ান্ত বৈধতা অস্বীকার করা সত্ত্বেও অভিজ্ঞতা ভিত্তিক অনুমানের বৈধতা স্বীকার করেছেন। এছাড়া অনুমানলব্ধ জ্ঞানের নিশ্চয়তা সম্পর্কে এখানে আলোচিত যেসব পাশ্চাত্য আধুনিক বা সমকালীন দার্শনিক সংশয় প্রকাশ করেছেন তাঁরাও সকলেই দৈনন্দিন জীবনে অনুমানের উপযোগিতাকে স্বীকার করে নিয়েই তাঁদের দার্শনিক জীবন ও কার্য সম্পাদন করেছেন। কিন্তু এতে অনুমান সম্পর্কিত যৌক্তিক তাত্ত্বিক আলোচনায় স্ববিরোধিতা দেখা দিয়েছে এ অভিযোগ দার্শনিক সুলভ নয়। রাসেল সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, কোন এক রকমের এবং কোন এক মাত্রায় আরোহের যুক্তিসিদ্ধতা যে থাকতেই হবে সে বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত। কিন্তু কিভাবে অথবা কেন আরোহ যুক্তিসিদ্ধ হবে সেটা দেখানোর সমস্যা এখনও এর সমাধান খুঁজে পায় নি। এ সমাধান না পাওয়া পর্যন্ত যুক্তিসিদ্ধ মানুষ সন্দেহ করবে।[৬১] চার্বাক দার্শনিকগণও সম্ভবত এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই অনুমানের বৈধতাকে সন্দেহ করেছেন অথচ দৈনন্দিন জীবনে এর উপযোগিতা ও আকস্মিক সত্যতা মেনে নিয়েছেন। এতে তাঁদের প্রত্যক্ষবাদী জ্ঞানতত্ত্বে কোনপ্রকার অসঙ্গতি সম্পাদিত হয়েছে একথা বলা দার্শনিক দৃষ্টিকোন থেকে সঠিক হবে বলে মনে হয় না।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চার্বাকদের অনুমান খণ্ডন সম্পর্কিত মতবাদ তাঁদের প্রত্যক্ষ প্রমাণতত্ত্বের পরিপূরক হিসাবে কাজ করেছে। অনুমান-প্রমাণ খণ্ডন ছাড়াও চার্বাকগণ শব্দ-প্রমাণকেও খণ্ডন করে তাঁদের অভিজ্ঞতাবাদকে আরও শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে প্রয়াসী হন।

২.৩ বেদ বা শব্দ প্রমাণের বৈধতা খণ্ডন

মীমাংসা, বেদান্ত, ন্যায়, সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি দর্শনে বেদের প্রাধিকার স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু চার্বাকগণ বেদের বৈধতাকে অস্বীকার করেন। বেদের বৈধতা অস্বীকার করার ক্ষেত্রে চার্বাকদের যুক্তি হল, বেদ মিথ্যা, স্ববিরোধিতা ও পুনরুক্তিতে পরিপূর্ণ। তাই বেদ বৈধ জ্ঞানের উৎস হওয়ার অযোগ্য।৬২

বেদ মিথ্যা এ কারণে যে, বেদ প্রদত্ত বচনসমূহ মিথ্যা। বেদ স্ববিরোধী কারণ, বেদ প্রদত্ত বচনসমূহ অসঙ্গতিপূর্ণ। বেদ পুনরুক্তিমূলক কারণ, একই বাক্য বেদে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং জ্ঞানের উৎস হিসাবে বেদের বৈধতা নাই।৬৩ চার্বাকদের মতে, বেদে যেসব রীতি ও অনুষ্ঠানাবলীর বর্ণনা আছে সেসব অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের ঠকিয়ে জীবিকার্জনের জন্য ব্রাহ্মণদের আবিষ্কার। আধুনিক কালের মার্কসীয় বস্তুবাদী দর্শন ধর্মীয় নিয়ম নীতিকে সামাজিক শ্রেণী শোষণের হাতিয়ার হিসাবে আখ্যায়িত করে যা ব্যাখ্যা দিয়েছে ভারতে বহুযুগ পূর্বে চার্বাক দর্শনে তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চার্বাকদের মতে, ব্রাহ্মণরা ছিল বুদ্ধিমত্তা ও মানবতাবর্জিত এবং তারা সৎ উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করতে পারত না।৬৪ তাই তারা জীবিকার্জনের জন্য এসব রীতিনীতি ও অনুষ্ঠানাদির আবিষ্কার করে। সুতরাং বেদ হল স্পষ্টত প্রতারকদের অবান্তর অসংলগ্ন বক্তব্য, তাদের জীবন ধারনের উপায়। জীবিকার্জনের উপায় আবিষ্কারের লক্ষ্যেই তারা ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করেছে। সর্বদর্শন সংগ্রহ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, এয্যা ধূর্তপ্রলাপমাত্রত্বেনাগ্নিহোত্রাদের্জীবিকামাত্রপ্রয়োজনত্বাৎ।৬৫ অর্থাৎ, তিন ধরনের ব্যক্তি [ভণ্ড, ধূর্ত, নিশাচর বা বেদ কর্তাগণ] কেবল জীবিকার প্রয়োজনেই যজ্ঞাদিকর্মের বিধান করেছেন।

তাঁরা ধর্মকে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে যাজকদের কর্ম বলেও আখ্যায়িত করেন। ধর্মে যে আত্মার সদ্গতির কথা বলা আছে তা শূন্যগর্ভ। কারণ আত্মা ও দেহ অভিন্ন। আত্মার সদ্গতির জন্য যেসব রীতি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলো হল, জীবিকার্জনের জন্য ভণ্ডদের আবিষ্কার। উল্লেখ্য যে, চার্বাকগণ আত্মার সদ্গতি সংক্রান্ত বৈদিক ধারণাকে ভণ্ডদের আবিষ্কার বলেই বিরত হন নি, তাঁরা শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব খণ্ডন করে তাঁদের এ অভিমতের যৌক্তিকতাও প্রদর্শন করেন।

২.৪ চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা ও শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব খণ্ডন

চার্বাক দার্শনিকদের আত্মা সম্পর্কিত মতবাদও তাঁদের জ্ঞানবিদ্যার সাথে সম্পর্কিত। কারণ, প্রত্যক্ষবাদী জ্ঞানবিদ্যাকে আপোষহীনভাবে সমর্থন করার মাধ্যমেই শাশ্বত আত্মার অস্তিত্বকে খণ্ডন করা সম্পর্কিত চার্বাক মতের ভিত্তি রচিত হয়েছে।

আত্মার ধারণাটি ধর্ম ও দর্শনের ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। সম্ভবত এটি প্রাচীনতম দার্শনিক সমস্যা।৬৬ ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের ইতিহাসে ঋগ্বেদ সংহিতায়ই প্রথম এ ধারণাটি লক্ষ্য করা যায়।৬৭ হিন্দু ধর্মে পরমাত্মা ও জীবাত্মা এ দুই ধরনের আত্মার কথা স্বীকৃত হয়েছে। উপনিষদ-পূর্ব বৈদিক সাহিত্যে এবং গীতায় ব্যক্তি আত্মার বিষয়টি বেশী পরিমাণে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতিতে পরমাত্মার আলোচনা প্রাধান্য লাভ করে। বৃহদারণ্যেকোপনিষদে আত্মাকেই জগতের মূলসত্তা বলা হয়েছে।৬৮ জৈন দর্শনে সাতটি তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে।৬৯ আত্মা হল এ সাতটি তত্ত্বের মধ্যে একটি। আত্মা দেহ থেকে স্বতন্ত্র নিত্য সত্তা। আত্মা জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা। ন্যায় দার্শনিকদের মতে, আত্মা দেহ, বাহ্য ইন্দ্রিয় এবং মনের অতিরিক্ত এক স্বতন্ত্র সত্তা। ন্যায় দার্শনিকগণও জৈন দার্শনিকদের মত আত্মাকে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা বলেছেন। বৈশেষিক দার্শনিকগণও আত্মা সম্পর্কে ন্যায় মতের অনুসারী। এ দর্শনেও আত্মাকে শাশ্বত ও সর্বব্যাপী দ্রব্য হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। মীমাংসা দার্শনিকগণও আত্মাকে দেহ মন ও বুদ্ধি থেকে ভিন্ন এক স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে বর্ণনা করেন। সাংখ্য ও যোগ দর্শন একথা মনে করে যে, আত্মা চিত্তবৃত্তি থেকে স্বতন্ত্র এক আধ্যাত্মিক সত্তা। বৌদ্ধ দর্শনে আত্মাকে স্বতন্ত্র দ্রব্য হিসাবে স্বীকার করা হয় নি। বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে, মানসিক অবস্থার ধারাবাহিক প্রবাহ-ই আত্মা।

পাশ্চাত্য দর্শনে মন ও আত্মাকে সাধারণত একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এও মনে করা হয়েছে যে, চেতনা হল মন বা আত্মার আবশ্যিক গুণ।৭০ কিন্তু ভারতীয় দর্শনে মন ও আত্মা একই অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও সাংখ্য দার্শনিকগণ মনকে স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে, মন সরাসরি দুঃখ, আনন্দ, ইত্যাদি জ্ঞানের কারণ হিসাবে কাজ করে। এদিক থেকে মন অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মত অচেতন। তবে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাথে এর পার্থক্য হল এটি অত্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

সূক্ষ্ম। অন্যদিকে সকল ভারতীয় দার্শনিকই চেতনাকে আত্মার আবশ্যিক গুণ বলে স্বীকার করেন নি। ন্যায় ও বৈশেষিক দার্শনিকদের মতে, আত্মা স্বরূপত অচেতন। চেতনা আত্মার আগন্তুক গুণ। মীমাংসা দার্শনিক প্রভাকর মিশ্রের মতে চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম। জৈন দার্শনিকদের মতে, চেতনা আত্মার আগন্তুক গুণ নয় বরং স্বরূপলক্ষণ। আত্মা জ্ঞাতা। সাংখ্য ও যোগ দার্শনিকদের মতে, আত্মা চৈতন্য স্বরূপ। আত্মা চৈতন্যবিশিষ্ট দ্রব্য নয় বরং আত্মা চিৎস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ। অদ্বৈত বেদান্ত দার্শনিকদের মতে, আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ। অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে আত্মাকে শুধু জ্ঞান বা চৈতন্য স্বরূপই বলা হয় নি বরং সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপও বলা হয়েছে। সাংখ্য দার্শনিকগণ আত্মাকে চৈতন্যস্বরূপ বলেছেন, তবে আনন্দ স্বরূপ বলেন নি।

চার্বাকগণ আত্মা সম্পর্কে উপরোক্ত দার্শনিক সম্প্রদায়গুলো থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মত পোষণ করেন। চার্বাক দার্শনিকদের মতে, ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ অর্থাৎ যথাক্রমে মাটি, জল, অগ্নি ও বায়ু এই প্রত্যক্ষযোগ্য চারিভূত দ্বারা জগৎ গঠিত হয়।[৭১] কোন কোন ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় এর সাথে ব্যোম বা আকাশকে অন্তর্ভূক্ত করে পঞ্চভূতের কথা বললেও চার্বাক দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষযোগ্য নয় বলে আকাশকে জগতের মূল উপাদানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন নি।[৭২] একই কারণে তাঁরা দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বকেও অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে, পূর্বোক্ত চতুর্ভূত যখন একটি বিশেষ পরিমাণে সমন্বিত হয়ে মানবদেহে পরিণত হয় তখন এতে চেতনা নামক গুণের উৎপত্তি হয়।৭৩ সুতরাং চেতনা দেহের আগন্তুক গুণ, দেহাতিরিক্ত কোন দ্রব্য নয়। অর্থাৎ চৈতন্য বিশিষ্ট দেহ ই আত্মা। তাঁদের মতে, মন হল দেহের ক্রিয়া, অর্থাৎ জড়ের কার্য। তাই একথা বলা হয় যে, চার্বাক বা লোকায়ত সুপ্ত চিন্তাধারার একটি বিকশিত রূপই হল আধুনিক জে, বি, ওয়াটসনের আচরণবাদ।[৭৪] সুতরাং চার্বাকদের মতে, আত্মা স্বতন্ত্র জ্ঞাতা নয়। গুড় জাল দিলে যেমন মাদক জাতীয় পানীয় উৎপন্ন হয় তেমনি জড় পদার্থ থেকে চেতনা সৃষ্টি হয়। মাধবাচার্য এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত চার্বাক লোকগাথাটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্যনলানিলাঃ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে।।
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ।
অহং স্থূলঃ কৃশোঽস্মীতি সামানাধিকরণ্যতঃ।।
দেহঃ স্থৌল্যাদিযোগাচ্চ স এবাত্মা ন চাপর।
মম দেহোঽয়মিত্যুক্তিঃ সম্ভবেদৌপচারিকী।।[৭৫]

অর্থাৎ, এখানে মাটি, জল, আগুন ও বায়ু শুধুমাত্র এই চার প্রকার ভূতবস্তুই বর্তমান। এই চার প্রকার ভূতবস্তু থেকেই চৈতন্য উৎপন্ন হয়। কিণ্ব প্রভৃতি বস্তুগুলো থেকে যেমন মদশক্তি উৎপন্ন হয়, তেমনি মৌল চতুর্ভূতের পারস্পরিক ক্রিয়া বিক্রিয়ায় স্বতস্ফূর্ত ও স্বাভাবিকভাবেই চৈতন্য উৎপাদিত হয়। আমি মোটা, আমি রোগা এ জাতীয় শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আসলে বিশেষ্য, বিশেষণ সম্পর্কই বর্তমান। মোটা প্রভৃতি বদ্ধ দেহেরই বিশেষণ। তাই স্বতন্ত্র কোন আত্মার কথা অবান্তর। আমার দেহ, এ জাতীয় কথা নেহাতই কথার কথা, যাকে বলে উপাচার।

সুতরাং চার্বাকদের মতে, দেহ থেকেই আত্মার উৎপত্তি এবং জড় দেহের ধ্বংস হলেই আত্মা ধ্বংস হয়। এ মতবাদ দেহাত্মবাদ নামে খ্যাত। এই দেহাত্মবাদের ধারণা বৃহদারণ্যকোপনিষদের যাজ্ঞ্যবল্ক্য-মৈত্রেয়ী উপাখ্যানে এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের ইন্দ্র-বিরোচন উপাখ্যানে পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যকোপনিষদে যাজ্ঞ্যবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলেন, ..এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি ন প্রেত্যসংজ্ঞাস্তীত্যরে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞ্যবল্ক্যঃ।[৭৬] অর্থাৎ, (এই মহান আত্মা) এই সর্বভূত থেকে (জীবাত্মারূপে) প্রকাশিত হয়ে এতেই বিলীন হয়। মৃত্যুর পর (তাহার) সংজ্ঞা থাকে না। আমি (যাজ্ঞ্যবল্ক) একথাই বলছি। এখানে যাজ্ঞ্যবল্ক আত্মা সম্পর্কে জড়বাদী মত প্রদান করে দেহ ও আত্মাকে অভিন্ন হিসাবে বর্ণনা করেছেন। রামায়ণের জাবালিও চার্বাক মতেরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন।[৭৭] অবশ্য দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় জাবালিকে লোকায়ত বলতে নারাজ। তাঁর মতে, এপ্রসঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার যে, রামচন্দ্রের ভর্ৎসনা শুনে জাবালি বলেন আমি আসলে নাস্তিক নই, সময় বুঝে নাস্তিক হই, আবার সময় বুঝে আস্তিক হই। অতএব তাঁকে লোকায়তিক মনে করার কোন কারণ নেই।[৭৮]

চার্বাকদের মতে, ইন্দ্রিয় ও বস্তু উভয়ই হল মাটি, জল, বায়ু ও আগুনের পুঞ্জমাত্র। এই উপাদানগুলো সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিষয়। উপাদানের বাইরে ইন্দ্রিয় বা বস্তু ইত্যাদির কোন অস্তিত্ব নাই। যখন দু'টি বস্তুর মধ্যে নিয়ত সংযোগ হয় তখন তারা একটি অন্যটির সাথে কারণিক সম্পর্কে সম্পর্কিত হয় এবং একটি অন্যটির জড়ীয় কারণরূপে কাজ করে। বাতি এবং আলো সব সময়ই একত্রে দেখা যায়। তাই বাতিই আলোর জড়ীয় কারণ। দেহ ও চেতনার মধ্যে এরকম নিয়ত সংযোগ বর্তমান। সুতরাং দেহ-ই

Dhaka University Institutional Repository

চেতনার জড়ীয় কারণ।[৭৯] তাই চার্বাকদের মতে, চেতনা হল আত্মা সমন্বিত দেহ। মাধবাচার্য সর্বদর্শন সংগ্রহ গ্রন্থে বলেন, তচ্চৈতন্যবিশিষ্টদেহ এবাত্মা।[৮০] অর্থাৎ, চেতনাবিশিষ্ট দেহ ই হল আত্মা। চেতনা দেহের উন্মেষমূলক গুণ। মাটি, জল, বায়ু ও আগুন সমন্বিত হয়ে যখন বিশেষ মানবদেহ গঠন করে তখন তাতে চেতনার উন্মেষ ঘটে। এসব উপাদান বিচ্ছিন্ন হলে চেতনাও ধ্বংস হয়।[৮১] চার্বাক দার্শনিকদের আত্মা সম্পর্কিত এ ধারণার সাথে আধুনিক পাশ্চাত্য বস্তুবাদী দার্শনিক ক্যাবাইনস (১৭৫৭-১৮০৮) এর ধারণার মিল পাওয়া যায়। ক্যাব্যাইনস আত্মা ও দেহকে প্রকৃতির দিক থেকে অভিন্ন বলে মনে করেন। তাঁর মতে, মন হল চেতনা সমন্বিত দেহ। দেহেরই চিন্তা, অনুভূতি ইচ্ছা আছে।[৮২] এছাড়া আধুনিক বস্তুবাদ মন সম্পর্কে উপঘটনাবাদী মতকে সমর্থন করে। উপঘটনাবাদ অনুসারে মন দেহের উপঘটনা বা উপবস্তু। এটি জড়ীয় দেহের কার্য। মার্ক্সীয় বস্তুবাদেও চেতনা বা মন সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করা হয়েছে। মার্ক্সীয় বস্তুবাদে চেতনার প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে বলা হয়েছে, মানুষের চেতনা হল অত্যন্ত সুসংগঠিত অঙ্গ মস্তিস্কেরই একটি বিশেষ গুণ।[৮৩] চেতনা মস্তিস্কের অগ্রভাগের বিপুল তৎপরতার সাথে জড়িত। আর মস্তিস্কের অগ্রভাগ স্নায়ুতন্ত্রের শত শত বছরের বিবর্তন প্রক্রিয়ার পরিণতিতে বিকশিত রূপ।[৮৪] কার্ল মার্ক্সের মতে, আমাদের চেতনা ও চিন্তা দেহগত অঙ্গ মস্তিস্ক থেকেই উৎপন্ন হয়। জড় থেকে চিন্তাকে পৃথক করা অসম্ভব।[৮৫] লেনিনও একই মত পোষণ করেন। তাঁর মতে, মস্তিস্কই হল চিন্তার অঙ্গ।[৮৬] মার্ক্সীয় মতানুসারে যে কোন পদার্থের মধ্যেই চেতনা থাকে না। শুধু সুসংগঠিত বস্তুর মধ্যেই চেতনার সৃষ্টি হয়। চার্বাকগণও একথা বলেছেন যে, চতুর্ভূত সমন্বিত হয়ে মানবদেহ গঠন করলেই তাতে চেতনার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে এ দুই মতবাদের মিল লক্ষিত হয়। সাম্প্রতিক কালের বিজ্ঞানও একথা প্রমাণ করেছে যে, চেতনা হল বস্তুর দীর্ঘ বিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সুসংগঠিত উচ্চতম উপাদান। বৌদ্ধ দার্শনিকগণও মনে করেন চেতনা অন্যকোন দেহ উৎপন্ন করতে পারে না। চার্বাকগণও অনুরূপ মত প্রদান করেন। এ জন্যই তারা পরজীবন, জন্মান্তর এবং পূর্বজন্ম অস্বীকার করেন। সাধারণত আত্মাকে জীবন, ঐচ্ছিক ক্রিয়া, চেতনা, স্মৃতি ইত্যাদির ধারক বলে মনে করা হয়।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, জীবন, ঐচ্ছিক ক্রিয়া, চেতনা, স্মৃতি এসব সর্বদা দেহাভ্যন্তরে প্রত্যক্ষিত হয়। বাইরে নয়।[৮৭] এরকম ধারণাও প্রচলিত আছে যে, দেহ হল আত্মার ধারক এবং জানা, অনুভব করা, ইচ্ছা ইত্যাদি আত্মার গুণ। কিন্তু চার্বাক দার্শনিকদের মতে, এ ধারণা ঠিক নয়। দেহ আত্মার ধারক নয় বরং দেহ ও আত্মা এক। জানা হল দেহেরই গুণ। কারণ, জানা দেহের সাথে অভিন্ন হিসাবে প্রত্যক্ষিত হয়। সুখ, দুঃখ, দেহের গুণ। কারণ, এগুলো দেহের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করে।[৮৮] এগুলো আত্মার গুণ হলে দেহের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারত না। কাম্য বস্তু অর্জন এবং অকাম্যবস্তু বর্জনের প্রতি দেহের সক্রিয়তা প্রত্যক্ষ করা যায়। এর দ্বারাই কাম্য এবং অকাম্য প্রকাশিত হয়। তাই এগুলো দেহের বিষয়। সুতরাং জানাও অবশ্যই দেহের বিষয়।[৮৯] চার্বাকগণ অনুভূতিকেও জড়দেহের একটি বৈশিষ্ট্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। শান্তরক্ষিতের মতে, কমলা শ্বতর (৫০০ খ্রিঃ) নামক একজন চার্বাক একথা মনে করেন যে, চেতনা দেহ থেকেই জীবনীশক্তির ক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। শান্তরক্ষিতের তত্ত্ব সংগ্রহ গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

কায়াদেব এতো জ্ঞানং প্রাণাপানাদ্যধিষ্ঠিতাৎ।
যুক্তং জায়ত ইত্যেতৎ কমলাশ্বতরোদিতম্।।[৯০]

অর্থাৎ কমলাশ্বতর নামক একজন চার্বাক বলেন, চেতনা থেকেই গঠিত দেহ জীবনী শক্তির ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়। চার্বাকদের মতে, দেহের সাথে আত্মার অভিন্নতা সাধারণ অভিজ্ঞতায়ও প্রমাণিত হয়। কেননা আমরা সাধারণত আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি সুন্দর, আমি কালো ইত্যাদি বলে থাকি। এখানে স্থূলতা, কৃশতা, সুন্দরত্ব ও কালোত্ব দেহের গুণ। সুতরাং দেহ চেতনাসমন্বিত আত্মার সাথে অভিন্ন।[৯১]

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, চার্বাক দার্শনিকগণ আত্মাকে দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র শাশ্বত সত্তা হিসাবে স্বীকার না করে দেহেরই একটি আগন্তুক বা অর্জিত গুণ হিসাবে অভিহিত করেছেন। তাঁরা দেহ ও আত্মাকে অভিন্ন হিসাবে আখ্যায়িত করে আত্মা সম্পর্কে দেহাত্মবাদী মতবাদ প্রদান করেছেন। আধুনিক বিশ্লেষণী পাশ্চাত্য দার্শনিক গিলবার্ট রাইল-এর সাথে চার্বাকদের মতের মিল পরিলক্ষিত হয়।[৯২] তাঁর মতে, মন দেহ ও জড় বস্তু থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও বিচ্ছিন্ন এমন কোন জিনিষ নয়। মন বলতে ব্যক্তির আচার-আচরণের রীতি, ধরন বা পদ্ধতিকেই বুঝায়। দেহযন্ত্রে ভূতসদৃশ মনের কল্পনাকে রাইল অলীক ও অবাস্তব বলেছেন।[৯৩] সুতরাং একথা বলা যায়, রাইল মন সম্পর্কে যে মতবাদ দিয়েছেন চার্বাকগণই সে মতবাদের আদি প্রবক্তা। চার্বাকদের আত্মার অস্তিত্ব খণ্ডনের মূলভিত্তি হল বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষবাদ। ডেভিড হিউমও অভিজ্ঞতাবাদের ভিত্তিতে শাশ্বত আত্মার অস্তিত্বকে খণ্ডন করেছেন। হিউম আত্মাকে রঙ্গমঞ্চের সাথে তুলনা করেন যা প্রত্যক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয়। আত্মা সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণা খণ্ডনের ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে চার্বাক ও হিউমের দর্শনের মধ্যে অনেকাংশে মিল পরিলক্ষিত হয়। তবে আত্মা সম্পর্কিত ইতিবাচক মতবাদ দিতে গিয়ে চার্বাকগণ যেখানে দেহাত্মবাদের কথা বলেছেন হিউম সেখানে বলেছেন পুঞ্জবাদের কথা। চার্বাকদের দেহাত্মবাদ বস্তুবাদভিত্তিক। কিন্তু হিউমের পুঞ্জবাদ মনোতাত্ত্বিক। এর কারণ সম্ভবত এই যে, চার্বাকগণ প্রভাবিত হয়েছিলেন তৎকালীন ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান বা রসায়ন বিজ্ঞান তথা আয়ুর্বেদশাস্ত্র দ্বারা এবং তাঁদের দর্শনের মূল সুর ছিল ভাববাদ বিরোধী, অর্থাৎ তৎকালীন ভারতীয় সমাজে বিরাজিত ব্রাহ্মণ্যবাদ ভিত্তিক বর্ণ বৈষম্যবাদ বিরোধী ও বস্তুবাদী। অন্যদিকে, হিউমের মতবাদে তাঁর সময়ের বৈজ্ঞানিক ও মনোবিজ্ঞানের উন্নতির প্রভাব ছিল স্পষ্ট। তাঁর মতবাদ ছিল বিশুদ্ধ জ্ঞানতাত্ত্বিক।

চার্বাক ও এপিকিউরিয়াস : গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরিয়াসের (৩৪১–২৭০ খ্রিঃ পূঃ) দর্শনের সাথে চার্বাক দর্শনের দেহাত্মবাদী মতবাদের বিশেষ মিল পরিলক্ষিত হয়।[৯৪] চার্বাকদের মত এপিকিউরিয়াসও দেহ এবং আত্মাকে অভিন্ন মনে করেন। তাঁর মতে, আত্মা চারটি ভিন্ন উপজাতির অনু'র যৌগস্বরূপ জড় দ্রব্য। আগুন, বায়ু, শ্বাসপ্রশ্বাস এবং এর চেয়েও সূক্ষ্মগতিশীল পদার্থ দ্বারা আত্মা গঠিত এবং তা মরণশীল। দেহের সাথে আত্মাও তার উপাদানসমূহে পর্যবসিত হয় এবং এর শক্তি হারায়।[৯৫] এজন্য এপিকিউরিয়াসের অনুসারী লিউক্রিটাস বলেন যে, মৃত্যু আমাদের জন্য কিছুই নয়। কারণ, এটা প্রমাণিত যে, মনের প্রকৃতি মরণশীল হবে।[৯৬] চার্বাকগণও আত্মা সম্পর্কে একই কথা বলেছেন। মাটি, পানি, বায়ু ও অগ্নি এই চারটি উপাদানের সমন্বয় দ্বারা দেহ গঠিত হলেই তার উন্মেষমূলক গুণ হিসাবে চেতনার উৎপত্তি হয় এবং দেহের মৃত্যুর সাথে চেতনাও উক্ত উপাদানসমূহে বিলুপ্ত হয়। এজন্যই চার্বাক দার্শনিকগণ মৃত্যু ও পরজন্মের ভীতিতে চিন্তিত নয়। তাঁরা বর্তমান জীবনকেই আদর্শ হিসাবে গণ্য করেন। সুতরাং দেখা যায়, গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরিয়াস খ্রিঃ পূঃ তৃতীয় শতকে আত্মা সম্পর্কে যে মতবাদ পোষণ করেছেন এর বহু পূর্বেকার চার্বাক নামক ভারতীয় সম্প্রদায় ছিলেন এ মতবাদের প্রবক্তা।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চার্বাকগণ শাশ্বত আত্মার ধারণা খণ্ডন করে আত্মা সম্পর্কে যে দেহাত্মবাদী মতবাদ প্রদান করেছেন তা তাঁদের প্রত্যক্ষ-প্রমাণতত্ত্বের পরিপূরক হিসাবেই কাজ করেছে। প্রত্যক্ষোত্তর আত্মার ধারণাকে খণ্ডন করা ছাড়াও তাঁরা কার্যকারণের মধ্যকার আবশ্যিক সম্পর্কের ধারণাকেও প্রত্যক্ষ- প্রমাণতত্ত্বের ভিত্তিতে অস্বীকার করেন। বিশ শতকের বিজ্ঞানেও এর যথেষ্ঠ সমর্থন পাওয়া যায়।

২.৫ চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা ও কার্যকারণতত্ত্ব খণ্ডন

কার্যকারণতত্ত্ব সম্পর্কিত চার্বাক মতবাদকে তাঁদের জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কিত মতবাদের উপর নির্ভরশীল বলে মনে করা হয়। কারণ, তাঁরা তাঁদের প্রত্যক্ষবাদী জ্ঞানতত্ত্বের ভিত্তিতেই কার্যকারণের অনিবার্য সম্পর্ক খণ্ডন করেছেন।

কার্যকারণতত্ত্ব দর্শন ও আধুনিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃত তত্ত্ব। এ তত্ত্বানুসারে মনে করা হয় যে, প্রত্যেক ঘটনারই কোন না কোন কারণ থাকে এবং কার্য ও কারণ অনিবার্য সম্পর্কে সম্পর্কিত। পাশ্চাত্য দর্শনে যেলিস যখন বিশ্বের উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন তখনই কার্যকারণতত্ত্বকে স্বীকার করে নেয়া হলেও একথা সত্য যে, গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটলের হাতেই কারণতত্ত্ব সুসংহত রূপলাভ করে। তিনি কোন বস্তুর উৎপত্তির জন্য কারণ চতুষ্টয়ের কথা বলেন। আধুনিক যুগের প্রখ্যাত যুক্তিবিদ জন ষ্টুয়ার্ট মিল একটি বিশেষ কার্যের কারণ হিসাবে সর্বক্ষেত্রেই একটি বিশেষ কারণের কথা বলে বহুকারণবাদ বর্জন করেন। তিনি কার্য ও কারণের সম্পর্ককে শর্তহীন, অনিবার্য, অপরিবর্তনীয়, অব্যবহিত পূর্ববর্তীতা ও পরবর্তীতার সম্পর্ক হিসাবে অভিহিত করেন। ভারতীয় দর্শনেও কার্যকারণ সম্পর্কের স্বীকৃতি পরিলক্ষিত হয়। চার্বাক ছাড়া অন্য সকল ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ই অবিদ্যাকে বন্ধনের একমাত্র কারণ বলে মনে করে একথা বলেন যে, অবিদ্যার হাত থেকে মুক্তি পেলেই মোক্ষলাভ সম্ভব। অর্থাৎ অবিদ্যা ও বন্ধনের সম্পর্ক অনিবার্য, শর্তহীন ও অপরিবর্তনীয়। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ প্রতীত্যসমুৎপাদ্‌বাদ বা কার্যকারণতত্ত্বকে তাঁদের দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং একে ধর্ম হিসাবে আখ্যায়িত করে যদৃচ্ছাবাদ, স্বভাববাদ, নিয়তিবাদ ও অলৌকিকতাবাদ বিরোধী এবং শাশ্বতবাদ ও উচ্ছেদবাদের মধ্যবর্তী পন্থা নির্দেশ করেছেন। মূলত ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বৌদ্ধ দর্শনেই কার্যকারণ মতবাদ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সুশৃংখলভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একমাত্র চার্বাক দর্শনেই কার্যকারণ এবং এর সার্বিকতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। চার্বাক দার্শনিকগণ কোন ঘটনার অপরিবর্তনীয় কারণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না।[৯৭] চার্বাকগণ মূলত অনুমানকে অস্বীকার করার ভিত্তিতেই কার্যকারণকে অস্বীকার করেছেন। প্রত্যক্ষণে দু'টি ঘটনার অভিজ্ঞতা হয়। কিন্তু দু'টি ঘটনার মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থির করে যদি একটিকে কারণ এবং অপরটিকে কার্য বলা হয় তবে একথাই স্বীকার করা হয় যে, অতীতে এ সম্পর্ক ছিল,

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু বর্তমানে আমরা মাত্র দু'টি ঘটনাকে প্রত্যক্ষণ করি। এ প্রত্যক্ষণের উপর ভিত্তি করে শাশ্বত অর্থাৎ অনিবার্য সম্পর্ক নির্ণয় করার অর্থ দাঁড়ায় অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ। আর যেহেতু অনুমানের ভিত্তি ব্যাপ্তি সম্পর্ক প্রত্যক্ষণ করা সম্ভব নয় সেহেতু অনিবার্য কারণ বলেও কিছু নেই। অর্থাৎ কার্যকারণের মধ্যকার অনিবার্য সম্পর্কের প্রত্যক্ষণ সম্ভব নয়।

চার্বাকদের মতে, কার্যকারণ হল বিভিন্ন ক্ষেত্রে একত্রে বহুবার প্রত্যক্ষিত পূর্বগ ও অনুগের মধ্যকার কাল্পনিক সম্পর্ক। এ সব ক্ষেত্রে একটি ঘটনার শুধুমাত্র একটি পূর্বগ এবং অন্য একটি ঘটনার শুধুমাত্র একটি অনুগকে প্রত্যক্ষ করা হয়। কিন্তু কোন ঘটনার একটি অপরিবর্তনীয় পূর্বগ ও অন্য ঘটনার অপরিবর্তনীয় অনুগ প্রত্যক্ষিত হয় না। কারণ, প্রত্যক্ষণ শুধুমাত্র বিশেষ দৃষ্টান্তে সীমাবদ্ধ। প্রত্যক্ষণ অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল দৃষ্টান্তকে অন্তর্ভুক্ত করে না। অতীতে অসংখ্য ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষিত দু'টি ঘটনার অনুক্রম ভবিষ্যৎ প্রতিকুল পরিবেশে ব্যর্থ হতে পারে। সুতরাং পূর্বগ ও অনুগের মধ্যে কোন অনিবার্য সম্পর্ককে জানা যায় না। এ সম্পর্ক শুধুমাত্র আকস্মিক। চার্বাকদের মতে, সকল ঘটনাই স্বতঃস্ফূর্ত বা আকস্মিক। কন্টকের তীক্ষ্ণতা, পক্ষী ও কীটপতঙ্গের প্রবৃত্তি, আখের মিষ্টত্ব, নিমের তিক্ততা, এগুলো সবই আকস্মিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত বা স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত গুণ। এ সব ঈশ্বর বা অতীন্দ্রিয় সত্তার সৃষ্ট নয়।৯৮ চার্বাক দার্শনিকগণ নৈসর্গিক সকল বস্তুর মধ্যে এই আকস্মিকতাকেই লক্ষ্য করেছেন। প্রকৃতির সবকিছুই আদি মৌল উপাদান ক্ষিতি, অপ, তেজ, ও মরুৎ-এর স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত বিশেষ প্রক্রিয়ার আকস্মিক ফল।৯৯ এতে কার্যকারণ সম্পর্ক নামক কোন অনিবার্য বৈশিষ্ট্য আমরা প্রত্যক্ষ করি না। এ ছাড়া, সর্বক্ষেত্রে এ আকস্মিক সম্পর্ক ঘটবেই এমন কোন কথা নেই। এক কথায়, অনুমান নির্ভর কার্যকারণ সম্পর্ক অনিশ্চিত বিষয় মাত্র।১০০ বিশ শতকে পাশ্চাত্য দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলও অনুমান নির্ভর কার্যকারণের আবশ্যিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, পাঠ্য পুস্তক একথা বলে যে, খ যদি অবশ্যম্ভাবীরূপে ক-এর পরে আসে তাহলে ক হল খ-এর কারণ। মনে হয়, অবশ্যম্ভাবিতার ধারণাটা সম্পূর্ণ নরত্বারোপী (anthropomorphic) এবং জগতের কোন আবিষ্কারযোগ্য বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল নয়। কতগুলো নিয়মানুসারে ঘটনাগুলো ঘটে, নিয়মগুলোকে সাধারণ করা যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা থেকে যায় নিরেট তথ্য।১০১ তিনি আরও বলেন, কারণটা যেন কার্যটাকে ঘটতে বাধ্য করছে, এরূপ কোন বাধ্যবাধকতার ধারণা আমাদের অবশ্যই থাকবে না। কার্য কারণকে বাধ্য করে, একথা বলা যেমন বিভ্রান্তিকর, কারণ কার্যকে বাধ্য করে একথা বলাও তেমনি বিভ্রান্তিকর। বাধ্যবাধকতা নরত্বারোপী। যা ঘটে, বিজ্ঞানের সম্পর্ক কেবল তারই সঙ্গে, যা অবশ্যই ঘটবে, তার সঙ্গে নয়।১০২

রাসেল একদিকে অনুমান ও কার্যকারণভিত্তিক অনিশ্চয়তাকে তুলে ধরেছেন অন্যদিকে আধুনিক পদার্থবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞানের আলোকে অনুমান-নিরপেক্ষভাবে বাস্তবে যা যেভাবে ঘটছে তার গাণিতিক দিকটাকে বুঝাতে চেয়েছেন। তবে তিনি পদার্থগত কার্যকারণের ক্ষেত্রেও সংশয় প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, আমাদের পরমাণুটার মধ্যে যে ইলেকট্রন আছে সেটা লাফ দিয়ে একটা ক্ষুদ্রতর কক্ষপথে চলে যায়। কখন যে ইলেকট্রনটা লাফ দেবে সে সম্পর্কে কোন কার্যকারণ নিয়ম আমাদের জানা নেই।১০৩ তিনি বৈজ্ঞানিক নিয়মের ক্ষেত্রেও সংশয় প্রকাশ করেন। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হল এই যে, আমাদের বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলো যে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত, সে বিষয়ে আমরা কখনও নিশ্চিত হতে পারি না। মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের আইনস্টাইনীয় পরিবর্তনের মধ্যে এর একটি স্মরণীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।১০৪

রাসেলের এই সংশয়ের মধ্যে বহুযুগ পূর্বেকার ভারতীয় চার্বাক দার্শনিকদের কার্যকারণের আকস্মিকতা মতবাদেরই সমর্থন পাওয়া যায়। চার্বাকগণ কার্যকারণের অনিশ্চয়তাকে উপলব্ধি করে চরম জ্ঞানতাত্ত্বিক আকস্মিকতাবাদ সৃষ্টি করেছেন। অপরদিকে রাসেল বাস্তববাদী দৃষ্টিকোন থেকে পদার্থগত কার্যকারণকে গ্রহণ করেও অনিশ্চয়তায় দোদুল্যমান।১০৫

প্রশ্ন হল, পূর্বগ ও অনুগের মধ্যে কোন অনিবার্য সম্পর্ক না থাকলে কার্যকারণ সম্পর্ককে কেন বিশ্বাস করা হয়। এ প্রশ্নের উত্তরে চার্বাক দার্শনিকগণ মানসিক কারণের কথা বলেন। দু'টি ঘটনার পূর্বগামী ও অনুগামীতার পুনরাবৃত্তির পর্যবেক্ষণ থেকে ভবিষ্যতেও সর্বক্ষেত্রে এই অনুক্রম বজায় থাকবে বলে মনে একটি প্রত্যাশা জন্মে। অসংখ্য ক্ষেত্রে দু'টি ঘটনার সংযুক্তি এ প্রত্যাশা উৎপন্ন করে যে, ঘটনা দু'টি সর্বক্ষেত্রে সংযুক্ত থাকবে। জয়ন্ত ভট্ট *ন্যায় মঞ্জরী* গ্রন্থে বলেন:

ভূয়োদর্শনতস্তাবদুদেতি মতিরীদৃশী।
নিয়তোঽয়মনেনেতি সকল প্রাণিসাক্ষিকা।১০৬

অর্থাৎ, বারবার প্রত্যক্ষণ থেকে এরূপ জ্ঞানের উদ্ভব হয়। এ সত্যটি সকল প্রাণীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। চার্বাক দার্শনিকদের কার্যকারণ নিয়মের এই গঠনমূলক ব্যাখ্যার সাথে রাসেলের ব্যাখ্যারও মিল লক্ষিত হয়। কারণ, ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, রাসেল

Dhaka University Institutional Repository

কার্যকারণকে নরত্বারোপী বলেছেন। এ ছাড়া তিনি এও বলেছেন যে, আমরা যখন মনে করি আমরা কোন প্রক্রিয়া বুঝতে পারছি তখন আসলে যা ঘটে তাহল, এমন একটা ঘটনা পরম্পরা আছে যা অতীতের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এত পরিচিত হয়ে উঠেছে যে, প্রত্যেক পর্যায়েই আমরা পরবর্তী পর্যায়টা আশা করি। এভাবে আমরা যাকে 'অবশ্যম্ভাবী' অনুক্রম বলি, তার ধারণায় এসে পৌছি।[১০৭]এ থেকে দেখা যায়, রাসেলও চার্বাকদের মত, কার্যকারণের মধ্যকার আবশ্যিক সম্পর্ককে 'আশা'র বিষয় বা মানসিক ব্যাপার হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

উল্লেখ্য যে, রাসেলের বহু আগে অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিউম প্রত্যক্ষবাদের ভিত্তিতে কার্যকারণের মধ্যকার আবশ্যিক সম্পর্ককে অস্বীকার করেছেন। তিনিও এ কথা বলেছেন যে, কার্যকারণের মধ্যকার আবশ্যিকতা বস্তুতে বা ঘটনায় নয় বরং মনে অবস্থিত।[১০৮] সুতরাং একথা বলা হয়তো অসঙ্গত হবে না যে, চার্বাক দার্শনিকদের কার্যকারণ সম্পর্কের অনিবার্যতা খণ্ডন যেমন পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার জন্য একটি সতর্কতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক তেমনি পাশ্চাত্য দর্শনে হিউমের সংশয়বাদও পরবর্তী দার্শনিক চিন্তাধারার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, চার্বাক দার্শনিকগণ পূর্ববর্তী ও অনুবর্তি ঘটনার মধ্যকার সম্পর্কের আবশ্যিকতা বা নিশ্চয়তার ধারণাকে খণ্ডন করে অনুগ ও পূর্বগের সহ-উপস্থিতির ঘটনাকে নিশ্চিতিহীন আকস্মিকতা দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন এবং কার্যকারণের ধারণাকে মানসিক প্রত্যাশাজাত ধারণা বলে অভিহিত করেছেন। এর ফলে চার্বাক দার্শনিকদের আকস্মিকতাবাদী বলা যায়। পরিবর্তনশীল জগতে চার্বাক দার্শনিকদের আকস্মিকতাবাদী ধারণা বিশ শতকের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তায়ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে বলে মনে হয়।

উল্লেখ্য যে, চার্বাকগণ অতীন্দ্রিয় শাশ্বত আত্মা, কার্যকারণের আবশ্যিক সম্পর্ক ইত্যাদি প্রত্যক্ষোত্তর ধারণাকে খণ্ডন করার মাধ্যমে তাঁদের অভিজ্ঞতাবাদী প্রমাণতত্ত্বকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁদের এ আপোষহীন প্রত্যক্ষবাদের মানদণ্ডের বিচারে ভারতীয় দর্শনের প্রচলিত অন্যসব অতিপ্রাকৃত বা প্রত্যক্ষোত্তর ধারণাকেও তাঁরা অস্বীকার করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁদের অন্যতম পদক্ষেপ হল কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের ধারণা খণ্ডন।

২.৬ চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা ও কর্মবাদঃ জন্মান্তরবাদ খণ্ডন

চার্বাক জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ তথা পূর্বজন্ম ও পরজন্ম সম্পর্কে চার্বাক মতের আলোচনাও প্রাসঙ্গিক বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ, চার্বাকগণ তাঁদের প্রত্যক্ষবাদী জ্ঞানবিদ্যার আলোকেই কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের ধারণা খণ্ডন করেন।

কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ ভারতীয় দর্শনে একটি বহুল আলোচিত ধারণা। সাধারণত দেহ থেকে স্বতন্ত্র শাশ্বত, অমর আত্মার ধারণা থেকেই কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ তথা পুনর্জন্ম ও পূর্বজন্ম ইত্যাদি ধারণার উৎপত্তি হয়। একথা মনে করা হয় যে, একই আত্মা পূর্বজন্মের কর্মফল অনুযায়ী বর্তমান জন্মলাভ করেছে এবং এজন্মের কর্মফল অনুযায়ী পরবর্তী জন্ম হবে। এটাই কর্মবাদ। কর্মবাদের ধারণার ভিত্তি হল কার্যকারণতত্ত্বে বিশ্বাস অর্থাৎ কর্ম অনুসারে ফলভোগ করতে হবে এই তত্ত্বে বিশ্বাস। কর্মবাদের উপর জন্মান্তরবাদের ধারণা নির্ভরশীল। জন্মান্তরবাদ অনুসারে মৃত্যুর পর আত্মা নতুন দেহ ধারণ করে। জীব যে সব কর্ম করে তার ফল একজীবনে শেষ না হলে জীবকে নুতনভাবে জন্মগ্রহণ করতে হয়। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ শাশ্বত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস না করেও প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ বা কার্যকারণ নীতির ভিত্তিতে কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদকে স্বীকার করেছেন। গৌতম বুদ্ধের মতে, জন্মান্তর অর্থে কোন চিরন্তন আত্মার নতুন দেহ ধারণ নয় বরং বর্তমান জীবন থেকে পরবর্তী জীবনের উদ্ভব। রাধাকৃষ্ণণের মতে, মৃতব্যক্তি নয় অপর এক ব্যক্তির উদ্ভব হয়। দেহ পরিবর্তন করে, এমন কোন আত্মা নাই। ব্যক্তির চরিত্রই কেবলমাত্র চলমান থাকে। কর্মের ফলেই কার্যকারণ নিয়মে এই পুনর্জন্ম হয় এবং কর্মফল থেকে মুক্তিকেই বৌদ্ধ দার্শনিকগণ নির্বাণ বলেছেন। সুতরাং দেখা যায়, ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ বা জন্মান্তরবাদকে সমর্থনের দু'টি ভিত্তি আছে এবং এ দু'টি ভিত্তির প্রেক্ষিতে কর্মবাদ সমর্থক দার্শনিকদের দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম শ্রেণীর দার্শনিকগণ শাশ্বত আত্মার ধারণার ভিত্তিতে কর্মবাদ সমর্থন করেছেন। চার্বাক ও বৌদ্ধ দার্শনিকগণ ছাড়া ভারতীয় অন্যসকল সম্প্রদায়ই এ শ্রেণীভুক্ত। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা শাশ্বত আত্মাকে অস্বীকার করে কার্যকারণ নিয়মের ভিত্তিতে কর্মবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু চার্বাক দর্শন এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গেছে যে, চার্বাক দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষযোগ্য নয় এমন কিছুকে স্বীকার করেন নি বলে শাশ্বত আত্মা এবং কার্যকারণতত্ত্ব

Dhaka University Institutional Repository

কোনটিকেই স্বীকার করেন নি। শাশ্বত আত্মা না থাকায় কর্মফল ভোগ করার মত কেউ থাকে না। আবার কার্যকারণ সম্পর্ক না থাকায় পূর্ববর্তী জীবনের ফলস্বরূপ পরবর্তী জীবনের উদ্ভবের সম্ভাবনাও রহিত হয়। তাই চার্বাক দার্শনিকগণ পূর্বজীবনকে অস্বীকার করেন। চার্বাক মতানুসারে পূর্ববর্তী জীবনকে অস্বীকার প্রসঙ্গে শান্তরক্ষিতের *তত্ত্ব সংগ্রহ* গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ

কার্যকারণতা নাস্তি বিবাদপদচেতসোঃ।
বিভিন্নদেহবৃত্তিত্বাদ্ গবাশ্বজ্ঞানযোরিব।।[১০৯]

অর্থাৎ পূর্ববর্তী চৈতন্য ও পরবর্তী চৈতন্যের মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নাই। গরু এবং অশ্বের দেহ আলাদা বলে এদের জ্ঞানও ভিন্ন। একই যুক্তিতে চার্বাকগণ পরবর্তী জীবনের অস্তিত্বও খণ্ডন করেন।

এমন যুক্তি দেয়া যেতে পারে যে, চেতনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকলেও চেতনার মধ্যে শক্তির আকারে অস্তিত্বশীল ধারাবাহিকতা আছে। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ এরূপ ধারাবাহিকতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেছেন। কিন্তু চার্বাক দার্শনিকদের মতে, মৃত্যুতে পূর্ববর্তী দেহ ধ্বংস হয় এবং নতুন দেহ জন্ম নেয়। এ দু'টি দেহ সম্পূর্ণ আলাদা। তাই শক্তির আকারে অস্তিত্বশীল চেতনার কোন ধারাবাহিকতাকেও স্বীকার করা যায় না। সুতরাং জন্মান্তরও সম্ভব নয়। *তত্ত্বসংগ্রহ* গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

জ্ঞানাধারাত্মা নো২সত্ত্বে দেহ এব তদাশ্রয়ঃ।
অন্তে দেহনিবৃত্তৌ চ জ্ঞানবৃত্তিঃ কিমাশ্রয়া?[১১০]

অর্থাৎ জ্ঞানের আধাররূপ আত্মাই হল দেহ। মৃত্যুতে দেহের ধ্বংস হলে জ্ঞানবৃত্তি কাকে আশ্রয় করে থাকবে? সুতরাং যেহেতু জন্মান্তর সম্ভব নয় সেহেতু পূর্বজন্মও নাই। এ কারণে চার্বাক দার্শনিকগণ দেহের মৃত্যুকেই মোক্ষ বলেছেন।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, চার্বাক দার্শনিকগণ ভারতীয় অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত পূর্বজন্ম, পরজন্ম তথা কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের ধারণাকে খণ্ডন করছেন। এ মতবাদ খণ্ডনে তাঁদের যুক্তি হল, শাশ্বত আত্মা ও কার্যকারণতত্ত্বকে অস্বীকার। আত্মা ও কার্যকারণতত্ত্ব খণ্ডনের ভিত্তি সরবরাহ করেছে চার্বাক প্রত্যক্ষবাদ বা অভিজ্ঞতাবাদ। সুতরাং বলা যায়, চার্বাক প্রত্যক্ষবাদী জ্ঞানতত্ত্বই তাঁদের কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ খণ্ডনের ভিত্তি রচনা করেছে। কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ খণ্ডিত হওয়ায় নৈতিকতা সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণা অর্থাৎ শাশ্বত পরম নৈতিক আদর্শের ধারণাও অস্বীকৃত হয় এবং ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে নৈতিকতা সম্পর্কিত একটি নতুন ধারার সূচনা হয়। এ ধারা তাঁদের অভিজ্ঞাতাবাদী জ্ঞানবিদ্যার সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

২.৭ চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা ও চার্বাক নীতিবিদ্যা

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে হিউমের সংশয়বাদকে যেমন লকের অভিজ্ঞতাবাদের যৌক্তিক পরিণতি হিসাবে মূল্যায়ন করা হয় তেমনি ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে চার্বাক দার্শনিকদের নৈতিকতা সম্পর্কিত মতকে তাঁদের জ্ঞানবিদ্যার যৌক্তিক পরিণতি বলে মনে করা হয়। ইন্দ্রিয়কেই একমাত্র বৈধজ্ঞানের উপায় হিসাবে ধরে নিয়ে যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শুধুমাত্র তারই অস্তিত্ব স্বীকার করায় চার্বাকদের কাছে প্রত্যক্ষযোগ্য নয় এমন কোন নৈতিক পরমাদর্শের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয়। তাই তাঁরা কাম বা ইন্দ্রিয় সুখকেই জীবনের পরমাদর্শ বলে অভিহিত করেন। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষিত বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ থেকেই ইন্দ্রিয় সুখ উৎপন্ন হয়। পুরুষার্থ সম্পর্কে চার্বাক মতের উল্লেখ করে মাধবাচার্যের *সর্বদর্শন সংগ্রহ* গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ অঙ্গনাদ্যালিঙ্গনাদিজন্যং সুখমেব পুরুষার্থঃ।[১১১] অর্থাৎ, সুখোৎপন্নকারী বস্তুর সাথে আলিঙ্গনজাত সুখই হল পরমপুরুষার্থ।

চার্বাক ছাড়া অন্যসব ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ই দুঃখের হাত থেকে মুক্তিকেই পুরুষার্থ বলেছেন। তবে মুক্তির প্রকৃতি বর্ণনায় তাঁদের মধ্যে মততেদ লক্ষিত হয়। বৌদ্ধদের মতে, দুঃখের আত্যন্তিক মুক্তিই নির্বাণ। অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা সৎ দৃষ্টি, সৎ সংকল্প, সৎ বাক্য, সৎ কর্ম, সৎ চেষ্টা, সৎ জীবিকা, সৎ স্মৃতি এবং সৎ সমাধি অনুসরণে তা লাভ করা যায়। জৈন মতে, আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি। ত্রিরত্ন অর্থাৎ সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চরিত্র অনুসরণ এবং পঞ্চমহাব্রত পালন অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয় বা চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকা, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ বা সকল প্রকার আসক্তি থেকে বিরত থাকা এ সবই মোক্ষলাভের উপায়। ন্যায়-বৈশেষিকগণও প্রায় একই মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, দেহ ও মনের সাথে আত্মার সংযোগহীনতা বা আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি। শ্রবণ, মনন ও নিধিধ্যাসন মুক্তিলাভের উপায়। সাংখ্য মতে, পুরুষের সাথে প্রকৃতির সংযোগ বিনাশ ও

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষের স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি। পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞানই মুক্তিলাভের উপায়। এ ভেদজ্ঞান অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা সাধিত হয়। যোগ দর্শনও একই মতে বিশ্বাসী। মীমাংসকদের মতে, স্বর্গ সুখলাভই মুক্তি। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুক্তিলাভ ঘটে। অদ্বৈত বেদান্ত মতে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার একাত্মতা উপলব্ধিই মুক্তি। সাধন চতুষ্টয়ের অধিকারি হয়ে বেদান্ত পাঠ মুক্তির উপায়। এক কথায়, চার্বাক ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় মোক্ষ বা মুক্তি বলতে হয় জাগতিক বন্ধন থেকে আত্মার মুক্তি না হয় জাগতিক সুখ দুঃখের হাত থেকে চিরমুক্তিকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু চার্বাক দার্শনিকগণ একদিকে যেমন শাশ্বত আত্মা বা পুনর্জন্মের ধারণায় বিশ্বাসী নন তেমনি অন্যদিকে মানুষ জাগতিক সুখ দুঃখের হাত থেকে চিরমুক্তি পেতে পারে এ সব ধারণাও তাঁরা পোষণ করতেন না। তাই তাঁরা মোক্ষ বা মুক্তি বলতে এ দু'টির কোনটিকেই না বুঝিয়ে মৃত্যুকে বুঝিয়েছেন। কারণ, মৃত্যুই সব কিছুর পরিসমাপ্তি। মোক্ষতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁরা যে মতবাদ প্রচার করেন সে মতবাদে ইহলোকবাদী বা জাগতিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। চার্বাকগণ বলেন, **কণ্টকাদিজন্যং দুঃখমেব নরকং। লোকসিদ্ধো রাজা পরমেশ্বরঃ। দেহোচ্ছেদো মোক্ষঃ। এবং ন স্বর্গোনাপবর্গো বা নৈরাত্মা পারলৌকিকঃ।**[১১২] অর্থাৎ, কণ্টকাদির কারণে প্রাপ্ত দুঃখই নরক। অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর নয় বরং প্রত্যক্ষযোগ্য রাজাই সকলের শাসনকর্তা ও প্রভু বা পরমেশ্বর। তিনিই সর্বোচ্চ ক্ষমতাশীল। দেহের মৃত্যুই মোক্ষ। স্বর্গ-নরক বলে কিছু নাই। শাশ্বত আত্মারও অস্তিত্ব নাই।

দেহের মৃত্যুকে মোক্ষ হিসাবে অভিহিত করলেও মোক্ষই চার্বাক দার্শনিকদের কাছে পরমপুরুষার্থ নয়। বরং ইন্দ্রিয় সুখভোগই হল পরমপুরুষার্থ। সম্পদকে চার্বাক দার্শনিকগণ সুখের উপায় হিসাবে মনে করেছেন। তাঁদের মতে, সুখ আত্মমূল্যে মূল্যবান। কিন্তু সম্পদের মূল্য সুখের উপায় হিসাবে। এভাবে সম্পদ ও সুখ উভয়ই মানুষের পরমকাম্য। *বৃহস্পতিসূত্র*-তে বলা হয়েছে, **কাম এবেক পুরুষার্থঃ।**[১১৩] অর্থাৎ কামই পুরুষার্থ। মধ্যযুগের একটি গ্রন্থ *সর্বমত সংগ্রহ*-তে বলা হয়েছে, অর্থকামাবেব পুরুষার্থৌ, ন ধর্মঃ।[১১৪] অর্থাৎ, অর্থ ও কামই পুরুষার্থ, ধর্ম পুরুষার্থ নয়। এখানে কাম বলতে ইন্দ্রিয় সুখকে বুঝানো হয়েছে। নীতিশাস্ত্র ও কামশাস্ত্রের রচয়িতা বাৎসায়নই সম্ভবত এ মতের প্রবক্তা।[১১৫] চার্বাকগণও একই মত পোষণ করে অতীন্দ্রিয় সুখকে অস্বীকার করেন। তাঁরা একথা বলেন যে, জাগতিক বা দৈহিক আনন্দ নিশ্চিত। কারণ, তা প্রত্যক্ষযোগ্য। কিন্তু অতীন্দ্রিয় জগতের পারলৌকিক আনন্দ অ-প্রত্যক্ষযোগ্য বিধায় অনিশ্চিত। সুতরাং প্রত্যক্ষযোগ্য জাগতিক সুখ প্রত্যাহার করে অতীন্দ্রিয় সুখ কামনা নির্বুদ্ধিতা। এ জন্যই তাঁদের পরামর্শ হলঃ **পিব খাদ চ, যদ্ অতীতং তন্নতে।**[১১৬] অর্থাৎ, খাও, পান কর, অতীত কখনও ফিরে আসবেনা।

পারলৌকিক সুখকে অস্বীকার করে জাগতিক সুখকে কাম্য বলায় চার্বাক দার্শনিকগণকে অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের চেয়ে বেশী আশাবাদী বলে মনে হয়। কারণ, অন্যান্য সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ই মোক্ষের জন্য জাগতিক বিষয়ের প্রতি অনীহার কথা বলে অন্তত আংশিক দুঃখবাদ ব্যক্ত করেছেন। কারণ, জাগতিক বিষয়ে অনাসক্তি মানুষকে অপেক্ষাকৃত বেশী ত্যাগী ও কম আশাবাদী হতে উৎসাহী করে। সম্ভবত এজন্যই ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলোকে পরিণামে না হলেও শুরুতে দুঃখবাদী বলা হয়। কিন্তু চার্বাকগণ এর ব্যতিক্রম।

বস্তুবাদের সমর্থক চার্বাক দার্শনিকগণ জগতের সব কিছু চতুর্ভূতে সৃষ্টি বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, মৃত্যুর পর দেহ তার উপাদান কারণে পর্যবসিত হবে। কোন অবিনশ্বর আত্মা নাই। তাই পূর্বজন্ম, জন্মান্তর, কর্মবাদ ইত্যাদির ধারণা অমূলক। এজন্যই চার্বাকগণ জাগতিক জীবনকে আনন্দ সহকারে ভোগ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। *তর্করহস্যদীপিকা* গ্রন্থে গুণরত্ন সূরী চার্বাক মতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন : **যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেত্তাবদ্ বৈষয়িকং সুখম্। ভষ্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমণং কুতঃ।**[১১৭] অর্থাৎ, যতদিন বাঁচ বৈষয়িক সুখ নিয়ে বাঁচ। দেহ ভষ্মীভূত হলে কিভাবে ফিরে আসবে?

স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠে, বৈষয়িক সুখ নিয়ে বাঁচার পরামর্শ দিয়ে চার্বাকগণ পরোক্ষভাবে সামাজিক বিশৃংখলা ও স্বেচ্ছাচারিতাকে অনুমোদন করেছেন কি না। এ প্রসঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্যের মত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বৃহস্পতি সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের কটূক্তির উপর মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, বৃহস্পতির প্রতি তাঁর সমর্থকগণ যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন তা থেকে অসামাজিক কার্যকলাপকে তিনি অনুমোদন করেছেন বলে মনে হয় না।[১১৮] বরং মনে হয় যে, তিনি সামাজিক শৃঙ্খলা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন এবং তা নিশ্চিত করেছেন। লোকায়তিকেরা বৃহস্পতিকে গণপতি আখ্যা দিয়েছিলেন। গণপতি বলতে তারা প্রকৃত গণস্বীকৃত রাষ্ট্রশাসককে বুঝিয়েছেন। গণস্বীকৃত রাষ্ট্রশাসকের এই ধারণা আধুনিক সুশৃঙ্খল গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ধারণার সাথে অনেকাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। এই ধারণা থেকে দু'টি বিষয় স্পষ্ট। প্রথমত, লোকায়তিকরা সামাজিক শৃঙ্খলা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। দ্বিতীয়ত, তৎকালীন ভারতবর্ষে বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনতার ঐক্যকে তারা গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্যের মতে, চার্বাকগণ সকল মানুষের সাম্যের প্রচারক ছিলেন। তাঁদের মতে, যেহেতু ব্রাহ্মণ কিংবা চণ্ডাল সকলেই একই রক্তমাংসে গড়া সেহেতু সকল মানুষ সমান এবং আনন্দের সকল সুযোগে সকল মানুষের অধিকারও সমান। দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্যের চার্বাক সম্পর্কিত এ মন্তব্য সঠিক হলে এ থেকে স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, চার্বাকগণ মূলত তাঁদের নীতিতত্ত্বে সামাজিক বিশৃঙ্খলার কথা বলেন নি। বরং তৎকালীন ভারতের শ্রেণী বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। চার্বাকদের সমসাময়িক ভারতীয় সমাজে আনন্দের উপাদানগুলো ছিল উচ্চ শ্রেণী তথা ব্রাহ্মণদের অধিকারে। তাঁরাই ছিলেন সম্পদশালী। চার্বাকগণ তাই আনন্দের উপাদানগুলোর উপর সকল মানুষের অধিকার ঘোষণা করেছেন। ফলে, তাঁদের এই সাম্যের দাবীর মধ্যে আধুনিক শ্রেণীহীন গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য যে, চার্বাকগণ যে নৈতিক বিশৃঙ্খলা প্রকাশ করেছেন তাঁর প্রমাণস্বরূপ তাঁদের সম্পর্কে প্রচলিত জনপ্রিয় একটি সমকালীন লোকগাথার উল্লেখ করা হয়। লোকগাথাটি হলঃ

যাবজ্জীবেৎসুখংজীবেৎ।
ঋণংকৃত্ত্বা ঘৃতংপিবেৎ।।

অর্থাৎ, যতদিন বাঁচ সুখে বাঁচ, ঋণ করেও ঘি খাও। এই লোকগাথা আসলে চার্বাকদের নিজেদের দ্বারা প্রচারিত বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং এটি উত্তর-পক্ষের চার্বাক সম্পর্কে উপহাস প্রবণ উক্তি যা লোকায়ত নামে প্রচারিত হয়ে প্রবাদের আকার নেয় এবং আজও এভাবে প্রচলিত আছে।[১১৯]

চার্বাক দার্শনিকগণ আনন্দ বা সুখকে জীবনের পরমলক্ষ্য হিসাবে অভিহিত করে যে আনন্দের সাথে বেদনা মিশ্রিত নয় সে আনন্দকে বেদনা মিশ্রিত আনন্দের চেয়ে উৎকৃষ্টতর বলেছেন। চার্বাকগণ যখন একথা বলেন যে, সবচেয়ে বেশী পরিমাণ ইন্দ্রিয় সুখের মধ্যে যখন সবচেয়ে কম পরিমাণ বেদনার উপস্থিতি থাকে তখনই সর্বোচ্চ ভাল নির্মিত হয়, তখন তাঁদের মতবাদে বিশ শতকের স্থূল উপযোগবাদী নীতিদার্শনিক জেরেমী বেনথামের মতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যা ইন্দ্রিয় সুখ উৎপাদনে সহায়ক তাই ন্যায়, যা দেহের বেদনা উৎপন্ন করে তা অন্যায়, এটি যেমন চার্বাকদের কথা তেমনি স্থূল সুখবাদীদেরও মূল কথা। তবে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করলে চার্বাকগণ দৈহিক বা ইন্দ্রিয়জাত আনন্দের কথা বলেছেন বলে তাঁদের মতবাদকে স্থূল সুখবাদ মনে করার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। কেননা যেহেতু দেহাত্মবাদী চার্বাক দার্শনিকগণ আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করেন নি সেহেতু ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতেই তাঁরা আনন্দকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন।[১২০] এ ছাড়া তাঁদের হাতে কোন বিকল্প ছিল বলে মনে হয় না। সর্বোপরি, দৈহিক ও মানসিক আনন্দের মধ্যে যে পার্থক্য আছে অর্থাৎ জন ষ্টুয়ার্ট মিল যে ভাবে সুখের গুণগত পার্থক্যের কথা বলে সূক্ষ্ম সুখবাদ প্রচার করেছেন, সুখ বা আনন্দের এরূপ বিশ্লেষণী ধারণা সম্পর্কে চার্বাকগণ তখনকার যুগে সচেতন থাকবেন এমন আশা করাও যুক্তিগ্রাহ্য হবে বলে মনে হয় না। তাই ইন্দ্রিয় সুখকে পরমউদ্দেশ্য বলায় চার্বাক দার্শনিকদের স্থূল সুখবাদী বা ভোগবাদী বলে আখ্যায়িত করলে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে বলেই মনে হয়। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, চার্বাক দার্শনিকগণ সকল মানুষের সাম্যের কথা বলে আনন্দের উপাদানগুলোর উপর সকল মানুষের সম অধিকারের কথা বলেছেন। এ থেকে বরং তাঁদের মতবাদে আধুনিক সর্ববাদী সুখবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অন্তত তাদের নীতিতত্ত্বের সামাজিক প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য বিচার করলে সম্ভবত তাই প্রমাণিত হয়। বেশী পরিমাণে ইন্দ্রিয় সুখের মধ্যে সবচেয়ে কম বেদনার উপস্থিতিকে চার্বাকগণ সর্বোচ্চ ভাল হিসাবে আখ্যায়িত করলেও যে সুখের সাথে দুঃখ বা বেদনা অনিবার্যভাবে সংযুক্ত বেদনার কারণে সে সুখ ভোগ বর্জন করাকে তাঁরা মুর্খতা বলে মনে করেন। *সর্বদর্শনসংগ্রহ* গ্রন্থে এ সম্পর্কে উদ্ধৃত হয়েছে : ত্যাজ্যং সুখং বিষয়সঙ্গমজন্ম পুংসাং দুঃখোপসৃষ্টমিতি মুর্খবিচারণৈষা।[১২১]

অর্থাৎ, বিষয় সংযোগজাত সুখ দুঃখের কারণ বিধায় তা ত্যাগ করা উচিৎ, মুর্খেরাই একথা বলে থাকেন। চার্বাক দার্শনিকদের সুখবাদী নৈতিকতা সম্পর্কিত মতবাদের সাথে গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টিপাস-এর নৈতিকতা সম্পর্কিত মতবাদের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এরিষ্টিপাসও ব্যক্তির নিজের সুখের উপর জোর দিয়ে পান, ভোজন, ও ফূর্তি করার কথা বলেছেন। কারণ, আগামীকাল মৃত্যুও হতে পারে। সুখবাদী এপিকিউরিয়াসও সুখকেই পুরুষার্থ বলেছেন। ওমর খৈয়ামও এরূপ মত পোষণ করতেন। তিনিও যতক্ষণ বেঁচে থাকা যায় ততক্ষণ পান করার কথা বলেছেন। কারণ, একবার মৃত্যু হলে আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নাই।[১২২]

উপরের অলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চার্বাকগণ শাশ্বত আত্মা, পূর্বজন্ম, পরলোক, ঈশ্বর ইত্যাদি অ-প্রত্যক্ষযোগ্য সকল বিষয়কে অস্বীকার করে ব্যক্তির প্রত্যক্ষযোগ্য ইহলৌকিক জীবনভিত্তিক নৈতিক মতবাদ প্রচার করেন যার মধ্যে আধুনিক স্থূল

Dhaka University Institutional Repository

সুখবাদী মতবাদের ইঙ্গিত রয়েছে। প্রত্যক্ষযোগ্য নয় বলেই তাঁরা শাশ্বত আত্মা, পরলোক ইত্যাদি ধারণাগুলো অস্বীকার করেছেন এবং এর ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে তাঁদের সুখবাদী মতবাদ। সুতরাং তাঁদের নৈতিকতা সম্পর্কিত মতের সাথে তাঁদের জ্ঞানবিদ্যার সম্পর্ক অস্বীকার করার অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। এ সব কারণে একথা বলা হয়ত অসঙ্গত হবে না যে, নৈতিকতা সম্পর্কিত চার্বাক মতবাদ তাঁদের প্রত্যক্ষবাদী জ্ঞানবিদ্যা ও বস্তুবাদী তত্ত্ববিদ্যারই যৌক্তিক পরিণতি। উল্লেখ্য যে, চার্বাক দার্শনিকদের নৈতিকতা সম্পর্কিত মত ভারতীয় অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়ের নৈতিকতা সম্পর্কিত মত থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমধর্মী। ফলে চার্বাক জ্ঞানবিদ্যার মত চার্বাক নীতিবিদ্যাও একদিকে যেমন তৎকালীন ভারতীয় শ্রেণী বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রথার বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিবাদস্বরূপ তেমনি পরবর্তী কালের নীতি দার্শনিকদের জন্য তা একটি সম্পূর্ণ নতুন দিক নির্দেশনা ও সতর্কতামূলক পদক্ষেপরূপে বিবেচ্য হওয়ার যোগ্য। চার্বাকদের নীতিতত্ত্বে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার স্পষ্ট প্রতিফলন থাকায় অনেকে তাঁদের নীতিদর্শনকে শুধুমাত্র নীতিদর্শন না বলে নৈতিক রাজনৈতিক দর্শন হিসাবে আখ্যায়িত করতে প্রয়াসী হয়েছেন।[১২৩] এ ছাড়া, নীতিদর্শনের ইতিহাসে প্রাক-বৌদ্ধ যুগের দার্শনিক চার্বাকগণই প্রথম নীতিতত্ত্বকে অধ্যাত্মবাদের হাত থেকে মুক্ত করেন এবং সুখবাদী নৈতিক আদর্শ প্রচার করার মাধ্যমে নীতি তত্ত্বের জগতে ইহলোকবাদ বা জাগতিকতাবাদের প্রবর্তন করেন একথা অস্বীকার করার উপায় নাই।

চার্বাকগণ তাঁদের অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নৈতিক আদর্শ হিসাবে ইহলোকবাদ বা জাগতিকতাবাদ প্রবর্তন করায় নৈতিকতার ক্ষেত্রে অতীন্দ্রিয় শাশ্বত পরমাদর্শ অস্বীকৃত হয় এবং সে সাথে প্রচলিত অধিবিদ্যা সংক্রান্ত মতবাদও প্রত্যাক্ষাত হয়। প্রচলিত অধিবিদ্যক মতবাদকে অস্বীকার করে চার্বাকগণ জগতের উৎপত্তি সম্পর্কে যে মতবাদ দেন তা বস্তুবাদী।

২.৮ চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা ও অধিবিদ্যা সংক্রান্ত মতবাদ

বুৎপত্তিগত অর্থে মেটাফিজিক্স বা অধিবিদ্যা কথাটি দ্বারা ফিজিক্স্ বা পদার্থবিদ্যার পরবর্তী আলোচনাকে বুঝায়। অধিবিদ্যার প্রধান কাজ হল তত্ত্বনির্ণয়। বিশ্বপ্রকৃতির আদি সত্তার অস্তিত্ব, প্রকৃতি, সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত আলোচনাই অধিবিদ্যার মূল আলোচনা। তত্ত্বের অনুসন্ধানের জন্য অধিবিদ্যা জ্ঞানের উৎস, প্রকৃতি ও সম্ভাব্যতা নিয়েও আলোচনা করে। চার্বাক অধিবিদ্যাও চার্বাক জ্ঞানবিদ্যার সাথে সম্পর্কিত। চার্বাক অধিবিদ্যা আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁদের জ্ঞানবিদ্যাই এর মূলভিত্তি। চার্বাক দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ হিসাবে আখ্যায়িত করায় আত্মা, পুণর্জন্ম, পরজন্ম, ঈশ্বর ইত্যাদি দর্শনের ইতিহাসে গুরুত্বের সাথে আলোচিত ধারণাও প্রত্যক্ষযোগ্য নয় বলে অস্বীকৃত হয়। ফলে তাঁরা জগতের মূলতত্ত্ব হিসাবে অপ্রত্যক্ষযোগ্য কোন ভাগ্যাত্মক বা আধ্যাত্মিক আদি কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, প্রত্যক্ষযোগ্য চতুর্ভূত অর্থাৎ, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ-ই বিশ্বপ্রকৃতির মূল কারণ। জড় বস্তুকে মূলতত্ত্ব হিসাবে স্বীকার করায় চার্বাক দার্শনিকদেরকে বস্তুবাদী আখ্যা দেয়া হয়।

আনুমানিক খ্রিষ্টীয় আট শতক থেকে ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে চার্বাক বলতে আপোষহীন কট্টর বস্তুবাদী দর্শনকে বা এর প্রবক্তাদেরকেই বুঝানো হয়। এর পূর্ববর্তী কোন বিশিষ্ট দার্শনিক গ্রন্থে চার্বাক শব্দটি চোখে পড়ে না। অবশ্য মহাভারতের শান্তিপর্বে (রচনাকাল ৪০০-৫০০ খ্রিঃ) রাজধর্মানুশাসন প্রসঙ্গে চার্বাক নামে ব্রাহ্মণদের তীব্র সমালোচক এক রাক্ষসের উপাখ্যান আছে। এই রাক্ষস বস্তুবাদী না হলেও যেহেতু বস্তুবাদী দর্শনে ব্রাহ্মণদের তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছে সেহেতু এই রাক্ষসের নামানুসারে বস্তুবাদী দর্শনের চার্বাক নামকরণ অসম্ভব নয়।[১২৪] তবে আট শতকের আগে বস্তুবাদী দর্শন বুঝাতে লোকায়ত শব্দটির ব্যবহার করা হত। চার্বাক ও লোকায়ত একই দার্শনিক মতের বিকল্প নাম মাত্র। মাধবাচার্য এ প্রসঙ্গে স্পষ্টতই বলেছেন, তস্য চার্বাকমতস্য লোকায়তম্ ইতি অন্বর্থম্অপরং নামধেয়ম্।[১২৫] অর্থাৎ, ওই চার্বাক দর্শনেরই অপর এক এবং বেশ জুৎসই নাম হল লোকায়ত।

বৌদ্ধ দার্শনিক শান্তরক্ষিত তাঁর *তত্ত্বসংগ্রহ* গ্রন্থে বস্তুবাদী দর্শন বলতে লোকায়ত নামটি ব্যবহার করেছেন। বাৎসায়ন-এর ন্যায়ভাষ্য-তে বস্তুবাদ বুঝাতে ভূতচৈতন্যবাদ (যে মতবাদ অনুসারে চৈতন্য পদার্থ থেকে উৎপন্ন), জৈন দার্শনিক হরিভদ্র রচিত *ষড়দর্শন সমুচ্চয়* এবং শঙ্করাচার্যের *বেদান্তভাষ্য* গ্রন্থে বস্তুবাদ বুঝাতে লোকায়ত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সেন্ট পিটাসবার্গ অভিধানে লোকায়ত শব্দটির অর্থ করা হয়েছে বস্তুবাদ। কিন্তু শান্তরক্ষিতের শিষ্য কমলশীলের *পঞ্জিকা*, ন্যায় দার্শনিক জয়ন্তভট্টের *ন্যায়মঞ্জরী*, জৈন দার্শনিক হরিভদ্রের *ষড়দর্শন-সমুচ্চয়* গ্রন্থের গুণরত্ন রচিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ তর্করহস্যদীপিকা, অদ্বৈত বেদান্ত দার্শনিক মাধবাচার্যের সর্বদর্শন সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে বস্তুবাদী দর্শন বুঝাতে চার্বাক শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং একথা বলা হয়ত অসঙ্গত হবে না যে, আনুমানিক আট শতকের বৌদ্ধ দার্শনিক কমলশীল থেকে পনেরো শতকের জৈন দার্শনিক গুণরত্ন পর্যন্ত সকলেই চার্বাক বলতে কট্টর বস্তুবাদী দর্শনকেই বুঝিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুবাদ অনুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণ হল বস্তু। সকল সত্তা এমনকি মানুষ, মানুষের আত্মা বা প্রাণও বস্তু থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। তাই, বস্তুবাদ প্রাণ ও মনকে দেহেরই কোন গুণ বা দেহ থেকে উৎপন্ন বলে মনে করে। আধুনিক বস্তুবাদ অনুসারে জীবন হল যৌগিক দেহযান্ত্রিক গতি। মন বা চেতনা হয় মস্তিষ্কের ক্রিয়া অথবা অত্যন্ত সুসংগঠিত বস্তুরই বিকশিত রূপ বা উপবস্তু। বস্তুবাদের সাথে অভিজ্ঞতাবাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কারণ, বস্তুবাদ অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে। এ মতবাদ মনে করে যে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই সঠিক জ্ঞানলাভ করা যায়।[১২৬] চার্বাক দার্শনিকগণ অভিজ্ঞতাবাদী। তাঁরা প্রত্যক্ষকেই একমাত্র বৈধ জ্ঞানলাভের উপায় বলে মনে করেছেন। যেহেতু তাঁদের কাছে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ সেহেতু প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুই তাঁদের মতে একমাত্র সত্তা। তাই, প্রত্যক্ষবাদী বা অভিজ্ঞতাবাদী হিসাবে চার্বাক দার্শনিকগণ বস্তুবাদকেই সমর্থন করেছেন।

বস্তুবাদী দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার। এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও বস্তুবাদী দর্শন উভয়ই বিকাশলাভ করেছে। তাই বস্তুবাদের জন্ম ও বিকাশ কোন বিশেষ দেশে সীমাবদ্ধ থাকে নি। প্রাচীন ভারত, চীন ও গ্রীসের দাসভিত্তিক সমাজে জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত ও মানুষের অভিজ্ঞতাভিত্তিক অন্যান্য জ্ঞানসূত্র বিকশিত হওয়ার ফলেই প্রথম বস্তুবাদের জন্ম হয়।[১২৭] প্রাচীন বস্তুবাদী দার্শনিকদের মধ্যে ভারতের চার্বাক দার্শনিকদের মত চীনের লাওজু, ওয়াংচু, গ্রীসের হিরাক্লিটাস, এ্যানাক্সগোরাস, এম্পিডক্লিস, এপিকিউরিয়াস প্রমুখ দার্শনিকদের নাম সুপরিচিত। প্রাচীন বস্তুবাদের অসম্পূর্ণতা ছিল এই যে, এর পক্ষে বস্তু ও মনের পার্থক্য ও সম্পর্কের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় নি। ইউরোপের মধ্যযুগীয় বস্তুবাদ ধর্মীয় প্রকৃতিবাদের রূপ গ্রহণ করে। সর্ববস্তুতে ঈশ্বর প্রকাশিত এবং প্রকৃতি ও ঈশ্বর উভয়ই নিত্যসত্তা, এই অভিমতের মাধ্যমে মধ্যযুগে বস্তুবাদ আত্মপ্রকাশ করে। ইউরোপে পুঁজিবাদের বিকাশের যুগেই বস্তুবাদের পরবর্তী পর্যায়ের বিকাশ ঘটে এবং বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সতেরো ও আঠার শতকে বস্তুবাদ মধ্যযুগের চেয়ে অধিকতর সুস্পষ্ট রূপলাভ করে। এযুগের বস্তুবাদী দার্শনিকদের মধ্যে বেকন, গেলিলিও, হবস, গেসেণ্ডী, স্পিনোজা ও লকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ যুগে বস্তুবাদী দার্শনিকগণ অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের উৎস এবং প্রকৃতিকে আদি সত্তা হিসাবে অভিহিত করে মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা ও যাজক প্রাধান্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গণিত ও বলবিদ্যার উন্নতির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় যান্ত্রিকতাই সতেরো ও আঠার শতকের বস্তুবাদী দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে রূপ নেয়। চেতনাসহ বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যকার অন্তর্নিহিত সংযোগসূত্র ব্যাখ্যায় এ সময়কার বস্তুবাদও ব্যর্থ হয়। কিন্তু আঠারো শতকে ফরাসী বস্তুবাদী দার্শনিক ডিডেরস, হেলভেটিয়াস, হলবাক প্রমুখ এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রমের প্রয়াস পান। এর পরবর্তী পর্যায়ে জার্মান দার্শনিক ফয়েরবাখের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক বস্তুবাদের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। বস্তুবাদের পূর্ণতর বৈজ্ঞানিক বিকাশ ঘটেছে উনিশ শতকে কার্ল মার্কস, ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ও লেনিনের দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দার্শনিক চিন্তায়। বস্তুবাদের ঐতিহাসিক বিকাশের প্রেক্ষিতে বিচার করলে চার্বাক দার্শনিকদের বস্তুবাদী চিন্তা ছিল প্রাচীনতম পর্যায়ের। তবে কালগত বিচারে ভারতীয় বস্তুবাদী দর্শনের ইতিহাসে চার্বাক বস্তুবাদের গুরুত্বকে অবহেলা করা যায় না।

উল্লেখ্য যে, ভারতীয় প্রাচীনতম দার্শনিক সাহিত্যেও বস্তুবাদের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীনতম আর্য সাহিত্য ঋগ্বেদেও বস্তুবাদের উল্লেখ আছে। ভগবদ্‌গীতা, মহাভারতের শান্তিপর্ব এবং শল্যপর্বে, বিষ্ণুপুরাণ, মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে বস্তুবাদের কিছু কিছু উল্লেখআছে।[১২৮] বিষ্ণুপুরাণে বস্তুবাদীদেরকে অসুর হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। জাগতিক আনন্দের প্রতি যাদের কামনা তীব্র, যারা বেদ ও বেদ-দত্ত নির্দেশকে বর্জন করেছেন এবং সকল প্রকার উৎসর্গ, উৎসর্গের উপাদান এবং যেসব দেবদেবীর প্রতি উৎসর্গ করা হয় সে সব দেবদেবীকেও বর্জন করেছেন বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে তারাই বস্তুবাদী।[১২৯] বৈবর্তপুরাণেও বস্তুবাদী বলতে উপরোক্ত শ্রেণীর লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে। রামায়ণের ঋষি যাবালি বস্তুবাদের সমর্থক ছিলেন। রামের প্রতি তার দেয় উপদেশকে চার্বাক মতের সাথে তুলনা করা যায়।[১৩০] চার্বাকদের এই মতের সাথে হরিবংশের রাজা ভেনা'র মতের মিল পরিলক্ষিত হয়।[১৩১] মহাভাষ্যের লেখক ভাগুরীও ছিলেন চার্বাকদের একনিষ্ঠ সমর্থক। গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক পালিশাস্ত্রে অজিত কেশকম্বলীর বস্তুবাদী মত বর্ণিত হয়েছে। তিনি দেহকে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ দ্বারা গঠিত বলেছেন। তাঁর মতে, মৃত্যুর পরে দেহ আবার যেসব উপাদানে গঠিত ছিল সে সব উপাদানে পরিণত হয়। অজিত কেশকম্বলীর শিষ্য পায়াশি আত্মাকে দেহের সাথে অভিন্ন মনে করেন এবং ভবিষ্যৎ জীবন ও পুনর্জন্মকে অস্বীকার করেন।

সুতরাং ঋগ্বেদের যুগ থেকে বৌদ্ধ যুগ পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যে বস্তুবাদের যথেষ্ট উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীনতম আর্য সাহিত্য বেদে বস্তুবাদের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা থেকে অনুমিত হয় যে, আর্য পূর্ব যুগেও ভারতের লোকমনে বস্তুবাদের ধারণা নিহিত ছিল।[১৩২] তবে একথা অনুমান করা হয়ত অসঙ্গত হবে না যে, প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতের বস্তুবাদে সংশয়বাদ ও অজ্ঞেয়তাবাদ মিশ্রিত ছিল। বৃহস্পতিই একে স্বতন্ত্র আকার দান করেন।[১৩৩] বৃহস্পতি সর্বপ্রথম ঋগ্বেদে যে বস্তুবাদের গোড়াপত্তন

Dhaka University Institutional Repository

করেন সে বস্তুবাদই স্পষ্টত বস্তুকে আদি সত্তা বলে স্বীকার করে। তাঁর মূল সূত্র ছিল জীবনও জড় থেকে উৎপন্ন।[১৩৪] বিশ শতকের মার্ক্সবাদী বস্তুবাদেও এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

চার্বাকগণ বস্তুবাদী বৃহস্পতিরই অনুসারী। তাই তাঁরা চরম অর্থে বস্তুবাদকে সমর্থন করেন। চার্বাকদের মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ-এই চার প্রকার প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুগত উপাদান দ্বারাই সব কিছু গঠিত। তাই যে বস্তুতে এই চার প্রকার উপাদান অনুপস্থিত সে বস্তু প্রত্যক্ষযোগ্য নয় এবং তা অস্তিত্বশীল নয়। এ জন্য চার্বাক দর্শনকে বস্তুবাদী ও বহুত্ববাদী দর্শন বলা হয়।[১৩৫] প্রশ্ন উপনিষদের ঋষি কবন্দি কাত্যায়নের মতবাদেও চার্বাক বস্তুবাদ ও বহুত্ববাদের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তিনিও চার্বাকদের মত মাটি, পানি, আগুন ও বায়ুকে আদি উপাদান বলেছেন।[১৩৬] অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চমহাভূতকে আদি উপাদান হিসাবে স্বীকার করে নিলেও প্রত্যক্ষযোগ্য নয় বলে চার্বাক দার্শনিকগণ ব্যোমকে অস্বীকার করে প্রত্যক্ষযোগ্য চারিভূতকেই জগতের আদি কারণ বলে স্বীকার করেছেন। এ ছাড়া অভিজ্ঞতাবাদ বা প্রত্যক্ষবাদের ভিত্তিতেই তাঁরা আত্মা, ঈশ্বর, পূর্বজন্ম, পরজন্ম, কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ, স্বর্গ, নরক, মোক্ষ, ইত্যাদি অধিবিদ্যক ধারণাগুলোকে অস্বীকার করেছেন। এ সব কারণেই সম্ভবত একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, চার্বাক অধিবিদ্যা তথা বস্তুবাদের প্রধান ভিত্তি হল প্রত্যক্ষপরায়ণতা। একমাত্র প্রত্যক্ষযোগ্য জগৎকে সত্য বলে মানা।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, চার্বাকদের অধিবিদ্যা সম্পর্কিত মতবাদে শাশ্বত সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয়ে বস্তুবাদী মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সকল প্রকার অধ্যাত্মবাদ ও পূর্বনির্ধারণবাদ অস্বীকৃত হয়। এ ছাড়া, তাঁরা অতীন্দ্রিয় কার্যকারণতত্ত্বকেও অস্বীকার করেন। ফলে জগতের কারণ ও উৎপত্তির পদ্ধতি সম্পর্কে নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। চার্বাকগণ স্বভাববাদ বা প্রকৃতিবাদ দ্বারাই জগতের কারণ ও উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেন। এ ব্যাখ্যাও তাঁদের অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যার পরিপূরক।

২.৯ চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা ও স্বভাববাদ

স্বভাববাদ হল বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতিতে মানুষের স্থান সম্পর্কিত মতবাদ। এ দার্শনিক মতবাদ অনুসারে মানুষের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক জীবন প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্ট ও স্বাভাবিক। সকল কিছুই প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসারী।[১৩৭] স্বভাববাদ নৃবিজ্ঞানবাদ (anthropologism) এর অত্যন্ত ঘনিষ্ট মতবাদ। নৃবিজ্ঞানবাদ অনুসারে নির্দিষ্ট কোন নিয়ম সামাজিক জীবনকে পরিচালনা করেন।[১৩৮] মূলত এটি অধ্যাত্মবাদ এবং পূর্বনির্ধারণবাদ বিরোধী একটি মতবাদ। স্বভাববাদও অধ্যাত্মবাদ এবং পূর্বনির্ধারণবাদ বিরোধী। চার্বাকগণ এ মতবাদ দ্বারাই তাঁদের অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে কারণতত্ত্ব ও জগতের উৎপত্তিতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেন, তবে আধুনিক স্বভাববাদে প্রাকৃতিক নিয়মের যে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় প্রাচীন স্বভাববাদে তা এত স্পষ্ট ছিল বলে মনে হয় না। ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে, সম্ভবত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই স্বভাববাদের সবচেয়ে পুরাতন উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৩৯] অদ্বৈত বৈদান্তিক দার্শনিক শঙ্কর স্বভাব বলতে বস্তুর প্রাকৃতিক গুণ বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, অগ্নির দহিকাশক্তি তার প্রাকৃতিক গুণ। পানির নিম্নমুখী বাহিকাশক্তি তার প্রাকৃতিক গুণ। বৌদ্ধ দার্শনিক অমলানন্দ স্বভাব বা প্রকৃতি বলতে বস্তু যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ যা থাকে তাকেই বুঝিয়েছেন। জীবন্ত দেহ যতক্ষণ থাকে শ্বাস-প্রশ্বাস ততক্ষণ থাকে। সুতরাং শ্বাস প্রশ্বাস হল জীবন্তদেহেরপ্রকৃতি।[১৪০] হরিভদ্রের রচিত ষড়দর্শন-সমুচ্চয় গ্রন্থের ব্যাখ্যায় গুণরত্ন স্বভাববাদের কিছুটা বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তা হলঃ

> স্বভাব বলতে বোঝায় বস্তুর স্বীয় বা স্বকীয় পরিণাম। স্বভাবের জন্যই সব কিছুর উৎপত্তি। যেমন, মৃত্তিকার পরিণাম ঘট। তেমনি, তন্তু বা সুতো থেকে শুধু কার্যই তৈরী হয়। স্বভাববাদ দিয়ে এজাতীয় পরিণাম নিয়মের কোন ব্যাখ্যাই সম্ভব নয়। অতএব সব কিছুই স্বভাবের পরিণাম বলে মানতে হবে। – মুগ ডাল যে সেদ্ধ হয় তারও কারণ স্বভাব। তাই স্বীকার করতে হবে, সব ঘটনার কারণ বলতে স্বভাব।[১৪১]

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, স্বভাববাদের মূলসূত্র হল অধ্যাত্মবাদ ও পূর্বনির্ধারণবাদ বিরোধিতা। যে কোন জাগতিক ঘটনার পর্যাপ্ত ব্যাখ্যায় ঘটনার জাগতিক কারণটুকুকে যথেষ্ট মনে করাই এ মতবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কারণ হিসাবে অতিপ্রাকৃত বা প্রকৃতি-বহির্ভূত অন্য কিছুকে না মানা, ঈশ্বর, অদৃষ্ট, ধর্ম, কর্মফল ইত্যাদিকে অস্বীকার করা এ মতবাদের প্রধান লক্ষ্য। এ জন্য কোন কোন পণ্ডিত স্বভাববাদের মধ্যে আধুনিক প্রাকৃতিক নিয়মের পূর্বাভাষ দেখতে পান।[১৪২] স্বভাববাদের সাথে বস্তুবাদ বা ভূতবাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। কারণ, বস্তুবাদীরা অতীন্দ্রিয় কারণের অস্তিত্ব অস্বীকার করায় স্বভাববাদকে স্বীকার করা ছাড়া আর

Dhaka University Institutional Repository

কোন উপায় থাকে না। সম্ভবত এ কারণেই চার্বাক দার্শনিকগণও বস্তুজগৎ, দেহ, আত্মা ইত্যাদির ব্যাখ্যায় স্বভাববাদের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। চার্বাকগণ পূর্ব-অস্তিত্ব, ভবিষ্যৎ জীবন, পুনর্জন্ম, কর্মবাদ, স্বর্গ, নরক, মোক্ষ বা মুক্তি ইত্যাদিকে অস্বীকার করেছেন। কারণ, এসব প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। শুধুমাত্র জড় জগৎই প্রত্যক্ষিত হয় বলে জড় জগৎই অস্তিত্বশীল। জড় জগতের বৈচিত্রের কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে স্বভাবের জন্যই জগতের বৈচিত্র ঘটে।[১৪৩] *সর্বদর্শন সংগ্রহ* গ্রন্থে চার্বাক মতের ব্যাখ্যায় মাধবাচার্য যে লোকগাথা উদ্ধৃত করেছেন তা থেকেও চার্বাক স্বভাববাদের পরিচয় পাওয়া যায়। লোকগাথাটি নিম্নরূপ ঃ

অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতং সমস্পর্শস্তিথানিলঃ।
কেনেদং চিত্রিতং তস্মাৎ স্বভাবাত্তদ্‌ব্যবস্থিতিঃ।।[১৪৪]

অর্থাৎ, অগ্নি উষ্ণ, জল শীতল, বাতাস গরম ঠাণ্ডা কিছুই নয়। এত বৈচিত্র কার সৃষ্টি? স্বভাবের জন্যই এগুলো এ রকম। চার্বাক স্বভাববাদ প্রসঙ্গে গোপীনাথ কবিরাজের মন্তব্য স্মরণযোগ্য। তিনি বলেনঃ

> মনে হয় চরম স্বভাববাদের প্রতিনিধি বলতে সুপ্রাচীন ভারতের একদল স্বাধীন চিন্তাশীল ছিলেন। আদিতে এদেরই লোকায়ত বলে উল্লেখ করার প্রথা ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এরাই অনেক ব্যাপকভাবে চার্বাক নামে পরিচিত হন। তাঁদের মতের আদি রূপটির বৈশিষ্ট্য বলতে কট্টর বস্তুবাদ, অদৃষ্টে অবিশ্বাস, আপোসহীন যুক্তিবাদ বা হয়ত বিতণ্ডাও বোঝায়।[১৪৫]

মহাভারতেও সরাসরি স্বভাবং ভূতচিন্তকাঃ একথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যারা শুধু ভূত বিষয়ে চিন্তা করেন তাঁরা স্বভাববাদী। বৃহৎ-সংহিতার ব্যাখ্যায় উৎপল ভট্ট বলেছেন যে, লোকায়তিকেরা স্বভাবকেই জগৎকারণ বলে গ্রহণ করেণ। স্বভাবের জন্যই বৈচিত্রময় জগতের উৎপত্তি, স্বভাব বশতই তার বিলোপ।[১৪৬]

ভূতবাদ বা বস্তুবাদের সাথে স্বভাববাদের এই ঘনিষ্টতার কারণেই একথা নির্দ্বিধায় বলা হয় যে, ভূতবাদী চার্বাক দার্শনিকগণ স্বভাববাদীও ছিলেন। বস্তুত স্বভাববাদ না মানলে চার্বাকদের ভূতবাদ বা চরম বস্তুবাদ প্রমাণ করা দুঃসাধ্য।[১৪৭] অনেকে লোকায়ত দেহাত্মবাদকে বস্তুবাদেরই একটি দিক বলে মনে করেন। স্বভাববাদই এর পদ্ধতি। চতুর্ভূত যথা ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ থেকে পৃথিবীর সব কিছুর উৎপত্তি। চুন, পান, সুপারি মিলে যেমন লাল রস উৎপন্ন হয় তেমনি কিন্ব প্রভৃতির সংমিশ্রণে মদিরাকারে পরিণত হলে চৈতন্য নামক দেহ উপাদানের সৃষ্টি হয়। এই পুরো প্রক্রিয়াটি প্রাকৃতিক নিয়মেই প্রকৃতিতে ঘটছে। স্বতস্ফূর্ততা ও আকস্মিকতাই এর বৈশিষ্ট্য। এ পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় অতীন্দ্রিয় হস্তক্ষেপের কোন স্থান নাই। উদ্দেশ্যমূলক কোন অস্তিত্ব অবান্তর।[১৪৮]

উপরের আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, চার্বাক দার্শনিকগণ মূলত ভারতের প্রাচীন স্বভাববাদী ধারণার অন্যতম প্রতিনিধি। সম্ভবত স্বভাব হল তাঁদের কাছে সব কিছুর কারণ সম্পর্কিত একটি তত্ত্ব। বস্তুর উপাদানগত স্বভাব থেকেই সকল বস্তুর উৎপত্তি। স্বতস্ফূর্ততা ও আকস্মিকতা এ স্বভাববাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বভাব থেকে বস্তুর উৎপত্তির প্রক্রিয়াটি হল স্বতস্ফূর্ততা ও আকস্মিকতা। কোন উদ্দেশ্যমূলক অতীন্দ্রিয় হস্তক্ষেপে নয় বরং স্বভাব থেকে স্বতস্ফূর্ত ভাবেই সব কিছুর উৎপত্তি ঘটে।

বস্তুবাদও স্বভাববাদকে সমর্থন করার ফলে চার্বাকগণ চারিভূতের স্বভাবগত কারণেই জগতের উৎপত্তি হয় বলে মনে করেন। এ ছাড়া, পূর্বের আলোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, তাঁরা কার্যকারণের আবশ্যিকতাকেও খণ্ডন করেছেন। এর পরিণতিতে তাঁদের কার্যকারণতত্ত্ব আকস্মিকতাবাদে পর্যবসিত হয়। এ আকস্মিকতাবাদও তাঁদের প্রত্যক্ষবাদী জ্ঞানবিদ্যার সাথে সম্পর্কিত ও পরস্পর পরিপূরক।

২.১০ চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা ও আকস্মিকতাবাদ

পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গেছে যে, চার্বাকগণ কার্যকারণের মধ্যকার অনিবার্যতাকে খণ্ডন করেন। এ ছাড়া জগতের উৎপত্তির ব্যাখ্যায় তাঁরা স্বভাববাদী মতবাদ পোষণ করেন। এখন প্রশ্ন হল, জড় থেকে স্বভাবগুণ বশত বস্তুজগতের উৎপত্তি হয় কিভাবে? চার্বাকদের উত্তর হল, আকস্মিকভাবে। এ মতবাদকে আকস্মিকতাবাদ বলা হয়।

আকস্মিকতাবাদ ঘটনার স্বতস্ফূর্ত আকস্মিক উৎপাদনে বিশ্বাস করে। এ মতবাদ কার্যকারণ মতবাদের বিরোধী। নির্দিষ্ট কার্যের জন্য নির্দিষ্ট কারণের উপস্থিতি অনিবার্য-- এ মতবাদের বিরোধিতা করে আকস্মিকতাবাদ বলে যে, অনুগের উপস্থিতির জন্য পূর্বগের উপস্থিতি অনিবার্য নয়। পূর্বগ ছাড়াই একটি বস্তু তার প্রকৃতিগত কারণে একটি বিশেষ সময়ে কোন বাহ্য কারণ ছাড়াই উৎপন্ন হতে পারে। ন্যায় দার্শনিক উদয়নের মতেঃ

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বকালাসত্ত্বে সত্যুত্তরকালসত্ত্বং কাদাচিৎকত্বম।
কাদাচিৎকত্বস্বভাবনিয়মো নির্হেতুকঃ স্বভাবনিয়মত্বাৎ।[১৪৯]

অর্থাৎ, পূর্বকালে না থাকলেও কখনো কখনো পরবর্তীকালে সে বস্তুর সৃষ্টি হতে পারে। কখনো কখনো কোনরূপ কারণ ছাড়াই স্বভাবগতভাবে কোন বস্তুর উদ্ভব হয়। ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি গৌতমের মতে, আকস্মিকতাবাদে কার্যের কারণ প্রয়োজন হয় না। যেমন, কাটার সূক্ষ্মতার কোন কারণ নাই। স্বভাবগতভাবেই কাটা সূক্ষ্ম। তিনি বলেন ঃ **অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ কণ্টকতীক্ষ্ণতাদিদর্শনাৎ।**[১৫০] অর্থাৎ, কাটার তীক্ষ্ণতা প্রভৃতির মত কারণ ছাড়াই ফলোৎপত্তি হয়।

অদ্বৈত বেদান্ত দার্শনিক শঙ্কর আকস্মিকতাবাদকে আকস্মিক ফলোৎপাদনের মতবাদ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এতে সুযোগমত আকস্মিকভাবে ঘটনা উৎপন্ন হয়। বৌদ্ধ দার্শনিক অমলানন্দের মতে, আকস্মিকতাবাদ অনুসারে নির্দিষ্ট কোন কারণের উপর নির্ভর না করে যে কোন সময় ঘটনা উৎপাদিত হতে পারে।[১৫১]

চার্বাক দর্শনের সাথে উপরোক্ত আকস্মিকতাবাদী মতবাদগুলোর যথেষ্ট মিল থাকায় চার্বাক দার্শনিকদিগকে আকস্মিকতাবাদী বলে অভিহিত করা হয়।[১৫২] অবশ্য চার্বাকদিগকে একাধারে স্বভাববাদী ও আকস্মিকতাবাদী হিসাবে অভিহিত করা যায় কি না এ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষিত হয়। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে নামক গ্রন্থে বিভিন্ন তথ্য প্রমাণসহ স্বভাববাদ ও আকস্মিকতাবাদ বা যদৃচ্ছাবাদের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করে এটা প্রমাণে প্রয়াসী হয়েছেন যে, স্বভাববাদ ও আকস্মিকতাবাদকে অভিন্ন মনে করলে স্বভাববাদকে খেলো করা হয়। কারণ, এ দু'টি পরস্পর অসঙ্গতিপূর্ণ মতবাদ। বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন করে তিনি যা বুঝাতে চেয়েছেন তাহল, স্বভাববাদে প্রাকৃতিক কার্যকারণকে স্বীকার করা হয়। তাই তা প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্পন্ন মতবাদ। অন্যদিকে, আকস্মিকতাবাদে কোন প্রকার কার্যকারণকে স্বীকার করা হয় না। এমনকি প্রাকৃতিক কার্যকারণকেও নয়। অর্থাৎ স্বভাববাদে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতাকে স্বীকার করা হয়, কিন্তু আকস্মিকতাবাদে তা করা হয় না। তিনি চার্বাক সমর্থিত স্বভাববাদের মধ্যে আধুনিক প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিশ্রুতি বা পূর্বাভাস খুঁজেছেন এবং চার্বাক দার্শনিকদের আকস্মিকতাবাদী নয় বরং স্বভাববাদী দার্শনিক হিসাবেই মূল্যায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন।[১৫৩] অন্যদিকে, দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী তাঁর চার্বাক দর্শন গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে তত্ত্বসংগ্রহকার শান্তরক্ষিতের মত উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, শান্তরক্ষিত স্বভাববাদীগণকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। একদল স্বভাবের কারণত্ব স্বীকার করেন এবং অপর দল করেন না। প্রথম দল বলেন, 'স্বত এব ভাবা জায়ন্তে' বা স্বভাবের জন্যই পদার্থের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ বস্তুর উৎপত্তির কারণ হল তার স্বভাব। তবে স্বভাবের কোন কারণ নেই। অপর দল বলেন, 'ন স্বতো নাপি পরতো ভাবানাং জন্ম' । অর্থাৎ, অকারণেই পদার্থের উৎপত্তি হয়। বস্তুর সৃষ্টিতে স্বভাব নিয়মেরও অপেক্ষা করে না। এদের মতে, এ জগৎ বৈচিত্র সৃষ্টি অহেতুক, আকস্মিক বা যাদৃচ্ছিক। দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর মতে, এই দ্বিতীয় দলের স্বভাববাদীগণের সাথে যদৃচ্ছা বা আকস্মিকতাবাদীদের কোন পার্থক্য নাই। এরা কার্যকারণের নিয়ত সুনির্দিষ্ট অব্যভিচারী সম্পর্ক স্বীকার করে না। এক কথায়, কার্যকারণ সম্বন্ধ অস্বীকার করার ক্ষেত্রে স্বভাববাদীগণের সাথে আকস্মিকতাবাদীদের কোন পার্থক্য নাই। তবে স্বভাববাদীগণের মধ্যে একদল স্বভাবের বা স্বভাব নিয়মের কারণতা অর্থাৎ দ্রব্য স্বভাবের অপরিবর্তনীয়তা স্বীকার করেন, অন্যদল তা করেন না। আকস্মিকতাবাদীরাও দ্বিতীয় দলের স্বভাববাদীদের অনুরূপ মত পোষণ করে সব কিছুর কারণকে আকস্মিক বলেন। তাই এদের সাথে আকস্মিকতাবাদীদের মতের মিল দেখা যায়।[১৫৪]

চার্বাক দার্শনিকদের কার্যকারণতত্ত্ব খণ্ডন শীর্ষক আলোচনায় আমরা দেখেছি কার্যকারণের মধ্যকার আবশ্যিক সম্পর্ককে অস্বীকার করে তাঁরা বলেছেন যে, পূর্বগ ও অনুগের মধ্যে কোন অনিবার্য সম্পর্ককে জানা যায় না। এ সম্পর্ক শুধুমাত্র আকস্মিক। প্রকৃতির সব বস্তুকেই তাঁরা আদি মৌল উপাদান চতুষ্টয়ের স্বাভাবিক, স্বতস্ফূর্ত বিশেষ প্রক্রিয়ার ফল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এ ছাড়া স্বভাববাদ বা প্রকৃতিবাদ শীর্ষক আলোচনায় চার্বাক লোকগাথা সম্পর্কিত মাধবাচার্যের উদ্ধৃতিতে আমরা দেখেছি যে, জাগতিক বৈচিত্রকে স্বভাবের সৃষ্টি বলা হয়েছে। প্রশ্ন হল, চার্বাকগণ স্বভাববাদকে স্বীকার করে প্রাকৃতিক কার্যকারণতা অর্থাৎ দ্রব্য স্বভাবের অপরিবর্তনীয়তা স্বীকার করেছেন কি না। চার্বাকদের স্বীয় বক্তব্য থেকে এর পক্ষে বা বিপক্ষে কোন তথ্য প্রমাণ কেউ উপস্থাপন করেন নি। তবে কার্যকারণ সম্পর্ক ও অনুমান খণ্ডনে চার্বাকগণ যে সব যুক্তি প্রদান করেছেন তা থেকে মনে হয় যে, তাঁরা কোন প্রকার ব্যাপ্তি সম্পর্কের নিশ্চয়তাকেই যৌক্তিক দিক থেকে মেনে নিতে নারাজ, যদিও ব্যবহারিক জীবনে এর উপযোগিতাকে তাঁরা অস্বীকার করেন নি। সুতরাং দ্রব্য স্বভাবের অপরিবর্তণীয়তাকে মেনে নিলে যৌক্তিক দিক থেকে চার্বাকগণ স্ববিরোধিতা সম্পাদন করবেন। যদি তাই হয় অর্থাৎ চার্বাকগণ যদি দ্রব্য স্বভাবের অপরিবর্তণীয়তা মেনে না নিয়ে চরম অর্থে আকস্মিকতাবাদী হন অথচ

Dhaka University Institutional Repository

স্বভাববাদকে স্বীকার করেন তবে চার্বাক মতবাদে আধুনিক বিচারে স্ববিরোধিতার সূত্র খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হল, স্বভাববাদকে মেনে নেয়া অথচ দ্রব্য স্বভাবের অপরিবর্তণীয়তা অস্বীকার করা বা আকস্মিকতার কথা বলা, এ দু'য়ের মধ্যে যে ধারণাগত বিরোধিতা আছে এ সম্পর্কে তৎকালীন যুগে চার্বাকগণ সচেতন থাকবেন এ দাবী খুব সঙ্গত বলে মনে হয় না। কারণ, এ পার্থক্যকরণ সুস্পষ্ট হয়েছে আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রাকৃতিক নিয়ম আবিস্কারের পর। অবশ্য উপনিষদের যুগেও যদৃচ্ছাবাদ ও স্বভাববাদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। কিন্তু উপনিষদ চার্বাকদের যুগের পরবর্তী ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্য।

প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে মনে হয়, চার্বাকগণ স্বভাববাদের দ্বারা আধ্যাত্মিকতা বা পূর্বনির্ধারণবাদেরই বিরোধিতা করতে প্রয়াসী হয়েছেন এবং জাগতিক সব কিছুর উৎপত্তির পদ্ধতি হিসাবে স্বতস্ফূর্ততা ও আকস্মিকতার কথা বলেছেন। এতে প্রাকৃতিক নিয়ম বা দ্রব্য স্বভাবের অপরিবর্তনীয়তা রক্ষিত হয়েছে কি না এসম্পর্কে সুষ্ঠু কোন বক্তব্য পাওয়া যায় না। এ সব কারণে চার্বাক দার্শনিকদের যেমন স্বভাববাদী বলে আখ্যায়িত করতে হয় তেমনি একথাও স্বীকার করতে হয় যে, তাঁদের দার্শনিক মতবাদে আকস্মিকতাবাদেরও ইঙ্গিত নিহিত আছে। চার্বাকদের এই আকস্মিকতাবাদের মূলভিত্তি সম্ভবত তাঁদের অভিজ্ঞতাবাদ। চরম অভিজ্ঞতাবাদীর জগৎ ব্যাখ্যায় আকস্মিকতাবাদের আশ্রয় নেয়া ছাড়া যৌক্তিক দিক থেকে সম্ভবত অন্যকোন বিকল্প নাই। উল্লেখ্য যে, ডেভিড হিউমও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জগৎ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আকস্মিকতাবাদের কথা বলেছেন। এদিক থেকে বিচার করে চার্বাক আকস্মিকতাবাদ আধুনিক বিচারে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হলেও তৎকালীন সময়ের পরবর্তী দার্শনিকদের জন্য এ মতবাদ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির এবং দর্শনালোচনায় সতর্কতামূলক পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছে।

সংক্ষিপ্তসার: চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কিত উপরের আলোচনা থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষিত হয় :

১। চার্বাকগণ ভারতীয় অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায় থেকে স্বতন্ত্র মত পোষণ করে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেন। প্রত্যক্ষ ছাড়া ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত অন্যকোন প্রমাণকে তাঁরা প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেন নি। মীমাংসা, বেদান্ত, ন্যায়, সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু চার্বাকগণ অনুমানের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে, প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান ইত্যাদি কোন প্রমাণ দ্বারাই অনুমানের যথার্থতা প্রমাণ করা যায় না। অনুমানের অযথার্থতা প্রমাণ করতে গিয়ে চার্বাকগণ মূলত অনুমানের মূলভিত্তি ব্যাপ্তি সম্পর্ককে অনিশ্চিত বলে প্রমাণ করেছেন। ব্যাপ্তি সম্পর্কের নিশ্চিতির প্রশ্ন তোলে অনুমান খণ্ডন সম্পর্কিত চার্বাক মতবাদে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের আরোহের নিশ্চিতি খণ্ডন সম্পর্কিত ধারণার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণ হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ায় চার্বাকদের চরম অভিজ্ঞতাবাদী বা প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এদিক থেকে বিচার করে বলা যায়, আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক হিউম যে চরম অভিজ্ঞতাবাদের কথা বলেছেন, বিশ শতকের পাশ্চাত্য যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকগণ যে প্রত্যক্ষবাদ প্রচার করেছেন এবং হিউম,এয়ার, রাসেল প্রমুখ দার্শনিক আরোহানুমানের নিশ্চিতি খণ্ডন করে সম্ভাব্যতা সম্পর্কিত যে মতবাদ প্রদান করে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছেন ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিক ঐতিহ্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চিন্তাধারার বাহক চার্বাক দার্শনিকদের চিন্তায় এ সব মতবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

২। প্রত্যক্ষ প্রমাণতত্ত্ব তথা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চার্বাকগণ ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনে স্বীকৃত এবং বহুল আলোচিত আত্মা সম্পর্কিত প্রচলিত ব্যাখ্যা তথা শাশ্বত আত্মার অস্তিত্বকে খণ্ডন করেন। শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব খণ্ডন করতে গিয়ে চার্বাকগণ আত্মাকে দেহাতিরিক্ত কোন সত্তা না বলে দেহ ও আত্মাকে অভিন্ন বলে মনে করেন। তাঁদের ব্যাখ্যানুসারে আত্মা দেহের আগন্তুক গুণ বা উপবস্তু। তাই তাঁদের আত্মা সম্পর্কিত মতবাদকে দেহাত্মবাদ নামে অভিহিত করা হয়। আধুনিক কালে পাশ্চাত্য বিশ্লেষণী দার্শনিক গিলবার্ট রাইল ও বস্তুবাদী দার্শনিক ক্যাবাইন প্রমুখের আত্মা সম্পর্কে উপঘটনাবাদী মতবাদে চার্বাক দার্শনিকদের মতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া, ডেভিড হিউমের আত্মা সম্পর্কিত মতবাদে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দার্শনিক কার্লমার্ক্সের মতবাদে, এমনকি সাম্প্রতিক কালের চেতনা সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায়ও চার্বাক মতের অনুরণন শোনা যায়। সুতরাং এদিক থেকে বলা যায়, আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানে আত্মার যে উপঘটনাবাদী ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে ভারতীয় দার্শনিক চার্বাকদের ব্যাখ্যায় এ সব মতবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁরা আত্মা সম্পর্কে যে দেহাত্মবাদী ধারণার কথা বলেছেন তার মধ্যে আধুনিক কালের আত্মা সম্পর্কিত উপঘটনাবাদী, পুঞ্জবাদী ও বস্তুবাদী মতের ভিত্তিভূমি নির্মিত হয়েছে। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে আত্মা সম্পর্কিত আধ্যাত্মবাদী মতবাদের স্থলে বস্তুবাদী মতবাদের প্রবক্তা হিসাবে চার্বাক দার্শনিকদের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। পরবর্তীতে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ যে অনাত্মবাদের কথা বলেন তার মধ্যেও চার্বাক মতবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৩। প্রত্যক্ষ প্রমাণতত্ত্বের ভিত্তিতে চার্বাক দার্শনিকগণ ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনে স্বীকৃত, এমনকি আধুনিক নিউটনীয় বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি হিসাবে স্বীকৃত কার্যকারণতত্ত্বকেও খণ্ডন করেন। তাঁরা কার্যকারণের আবশ্যিকতা সম্পর্কে নিশ্চিতিবাদকে খণ্ডন করে আকস্মিকতাবাদের প্রবর্তন করেন। তাঁদের মতে, কার্যকারণের সম্পর্ক নিশ্চিত নয়, সম্ভাব্য। কারণ, এ সম্পর্ক ব্যাপ্তি জ্ঞান নির্ভর আর ব্যাপ্তি জ্ঞান নিশ্চিত নয়, সম্ভাব্য বা আকস্মিক মাত্র। চরম অভিজ্ঞতাবাদী হিউমও কার্যকারণের আবশ্যিকতাকে নিশ্চিত না বলে সম্ভাব্য এবং আকস্মিক হিসাবে প্রমাণ করে জ্ঞানের ক্ষেত্রে সংশয়বাদী মতবাদ প্রদান করেন। বিশ শতকের বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদেও কার্যকারণের এই সম্ভাব্যতাতত্ত্ব তথা আকস্মিকতাবাদ সমর্থিত হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, কার্যকারণের আবশ্যিকতাতত্ত্ব খণ্ডনের ব্যাপারে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানে যে মতবাদ প্রদান করা হয়েছে বহু পূর্বে প্রাচীন ভারতে চার্বাক দার্শনিকগণই এ আকস্মিকতাবাদের প্রবর্তন করে গেছেন। এদিক থেকে বিচার করে চার্বাক দার্শনিকগণকে দর্শন ও বিজ্ঞানের ইতিহাসে কার্যকারণতত্ত্বের ক্ষেত্রে আকস্মিকতাবাদের প্রবক্তা হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এ ছাড়া, কার্যকারণকে অস্বীকার করে বস্তুর স্বভাব বা প্রকৃতি দ্বারা বস্তুর উৎপত্তি ব্যাখ্যা করায় তাঁদেরকে স্বভাববাদ বা প্রকৃতিবাদের প্রবক্তা হিসাবেও অভিহিত করা যায়।

৪। চার্বাকগণ প্রত্যক্ষ প্রমাণতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতীয় দর্শনের স্বীকৃত কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের ধারণা খণ্ডন করেন। তাঁদের মতে, কর্মফল ভোগ করার জন্য পুনর্জন্ম গ্রহণের ধারণা যথার্থ নয় বরং নিম্নশ্রেণীর মানুষকে পরলোকের ভয় দেখিয়ে শোষণ করার জন্য এ ধারণা উচ্চশ্রেণীর মানুষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে তৈরী করেছে। পুনর্জন্ম ও জন্মান্তরবাদ খণ্ডন করায় পূর্বজন্মের ধারণাও খণ্ডিত হয়েছে। এ ছাড়া, আত্মার মুক্তি নয় বরং দেহের মৃত্যুকেই মোক্ষ হিসাবে অভিহিত করে চার্বাকগণ মোক্ষ সম্বন্ধে ইহলোক বা জাগতিকতাবাদী মতবাদ প্রচার করেছেন। এদিক থেকে ভারতীয় দর্শনে চার্বাক দর্শন একমাত্র ব্যতিক্রম।

৫। প্রত্যক্ষ প্রমাণতত্ত্বের ভিত্তিতে চার্বাকগণ সুখকেই নৈতিকতার চরম আদর্শ হিসাবে অভিহিত করে সুখবাদী নৈতিক আদর্শকে সমর্থন করেছেন। প্রত্যক্ষযোগ্য নয় বলেই ঈশ্বর, আত্মা, পরজন্ম, পূর্বজন্ম, কর্মবাদ ইত্যাদির ধারণাকে পরিত্যাগ করে চার্বাকগণ মানুষের প্রত্যক্ষযোগ্য ইহলৌকিক যে সুখবাদী নৈতিক মতবাদ প্রচার করেছেন তাতে গ্রীক সুখবাদী এরিষ্টিপাস ও আধুনিক সুখবাদী জেরেমী বেনথামের স্থূল বা অসংযত সুখবাদী মতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এদিক থেকে বিচার করে নৈতিকতার ক্ষেত্রে চার্বাক দার্শনিকদেরকে স্থূল সুখবাদের প্রবক্তা হিসাবে অভিহিত করা সম্ভবত অসঙ্গত নয়। এ ছাড়া, নীতিতত্ত্বের সাথে চার্বাকগণ রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থার সংযোগ সাধন করায় অন্য আটটি ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের নীতিতত্ত্বের চেয়ে চার্বাক নীতিতত্ত্ব স্বতন্ত্ররূপ ধারণ করে। এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্য চার্বাক নীতিদর্শনকে শুধু নীতিদর্শন না বলে নৈতিক-রাজনৈতিক দর্শন হিসাবেও আখ্যায়িত করা হয়, যা অন্যান্য ভারতীয় সম্প্রদায়ের নীতিতত্ত্ব থেকে স্বতন্ত্র।

৬। প্রত্যক্ষ প্রমাণতত্ত্বভিত্তিক চার্বাক অধিবিদ্যা বহুত্ববাদী বস্তুবাদভিত্তিক। কারণ, তাঁদের মতে, প্রত্যক্ষযোগ্য ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চারটি জড়বস্তুই জগতের মূলতত্ত্ব। জগতের সকল বস্তু এমন কি চেতনাও এই চারিভূত দ্বারা গঠিত। পরবর্তীতে গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিটাস, এম্পিডক্লিস প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিক বস্তুবাদী মতবাদ প্রদান করেন এবং আধুনিক কালে কার্ল মার্কস দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী মতবাদ প্রদানের মাধ্যনে বস্তুবাদের সুসঙ্গত রূপ দেন। তাই, এদিক থেকে দর্শনের ইতিহাসে ভারতীয় চার্বাক দার্শনিক সম্প্রদায়কে প্রথম বস্তুবাদী দার্শনিক তথা বস্তুবাদের প্রবক্তা হিসাবেও অভিহিত করা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ভারতীয় দর্শন, বিশেষত জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে চার্বাক দার্শনিকগণ অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। তাঁরাই ভারতীয় দর্শনের একমাত্র চরম অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক। অভিজ্ঞতাবাদভিত্তিক তাঁদের দর্শনের অন্যান্য ধারণার ব্যাখ্যায়ও তাঁরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এমন কি মৌলিক ও বিশ্লেষণাত্মক ভূমিকা রেখেছেন এবং বহু দার্শনিক ধারণার গোড়াপত্তন করেছেন। এ সব দিক বিচার করে শুধু ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে নয় বরং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনের ইতিহাসে চার্বাক দার্শনিকদেরকে জ্ঞানবিদ্যার দিক থেকে প্রথম অভিজ্ঞতাবাদী, আত্মার ধারণার ব্যাখ্যায় প্রথম দেহাত্মবাদী, কার্যকারণতত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রথম আকস্মিকতাবাদী ও স্বভাববাদী, মোক্ষের ধারণার ব্যাখ্যায় প্রথম ইহলোকবাদী বা জাগতিকতাবাদী, নীতিতত্ত্বের দিক থেকে প্রথম সুখবাদী এবং তত্ত্ববিদ্যাগত দিক থেকে প্রথম বস্তুবাদী হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। এ সব কারণে ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে চার্বাকদের ভূমিকা ও স্থান সত্যিই অনন্য। আলোচনার অগ্রগতিতে আমরা ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে চার্বাকদের স্থান নির্ণয়ে প্রয়াসী হব।

Dhaka University Institutional Repository

২.১১ ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যায় চার্বাকদের অবস্থান

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে চার্বাক সম্প্রদায় একটি ব্যতিক্রমধর্মী এবং অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্বতন্ত্র দার্শনিক ধারার বাহক। জ্ঞানোৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণতত্ত্ব বা চরম অভিজ্ঞতাবাদ, অধিবিদ্যাগত দিক থেকে অর্থাৎ সত্তার স্বরূপ সম্পর্কে বস্তুবাদী মতবাদ, আত্মা সম্পর্কিত মতবাদের ক্ষেত্রে দেহাত্মবাদ, বস্তু ও চেতনার উৎপত্তি সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় স্বভাববাদ বা প্রকৃতিবাদ, কার্যকারণের ব্যাখ্যায় আকস্মিকতাবাদ, মোক্ষ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে ইহলৌকিকতাবাদ বা জাগতিকতাবাদ এবং নীতিতত্ত্বের তথা নৈতিক আদর্শ সম্পর্কিত মতের ক্ষেত্রে সুখবাদের দৃঢ় ও সুস্পষ্ট সমর্থক হিসাবেই ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে চার্বাকদের এই স্বাতন্ত্র্য। মূলত ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের একক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্র ধরেই ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে চার্বাক দর্শন প্রাচীনকাল থেকে তার নিজস্ব আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে।[১৫৫]

সনাতনী মানদণ্ডে ভারতীয় নব দর্শন বা নয়টি দার্শনিক সম্প্রদায়কে আস্তিক ও নাস্তিক নামে যে দু'টি ভাগে বিভক্ত করা হয় সে বিভাগ অনুসারে সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত, এই ছয়টি আস্তিক দার্শনিক সম্প্রদায় বেদকে স্বীকার করে তাঁদের দার্শনিক চিন্তাধারার আলোচনা করেছে। এদেরকে একত্রে ষড়দর্শন বলা হয়। ষড়দর্শনের মধ্যে বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক, প্রধানত এ পাঁচটি দর্শনকে বেদের জ্ঞানকাণ্ড তথা উপনিষদানুসারী দর্শন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।[১৫৬] যদিও উপনিষদীয় ভাবধারার অবিকৃত রূপায়ণ একমাত্র বেদান্ত দর্শনেই দেখা যায়। তবুও একথা বলা সম্ভবত অসঙ্গত হবে না যে, অন্যান্য দর্শনের ভাষ্যকারগণ বহুক্ষেত্রে বিভিন্ন মতবাদকে আশ্রয় করলেও মূলত এরা সকলেই উপনিষদের সঙ্গে অবিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন এবং জাগতিক দুঃখভোগের একান্ত নিবৃত্তিস্থল হিসাবে মোক্ষকে নির্দেশ করে সকলেই মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে দর্শনালোচনা করেছেন। ষড়দর্শনের মধ্যে মীমাংসা প্রত্যক্ষভাবে বেদের জ্ঞানকাণ্ড তথা উপনিষদানুসারী দর্শন নয়। এ দর্শন প্রধানত বেদের কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বৈদিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে স্বর্গলাভই এ দর্শনের চরম লক্ষ্য। প্রভাকর ও কুমারিলের রচনায় সংসার বন্ধনের পরিসমাপ্তি বা মোক্ষকে চরম লক্ষ্য হিসাবে নির্দেশ করে এই দর্শনও উপনিষদানুসারী অন্য দর্শনগুলোর সাথে একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। ভারতীয় দর্শনে বৌদ্ধ ও জৈন এ দু'টি দার্শনিক সম্প্রদায় ষড়দর্শন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্তি লাভ করে নাস্তিক হিসাবে পরিচিত। এসত্ত্বেও ভাবগত ঐক্যের বিচারে এ দু'টি দর্শনকেও উপনিষদীয় দর্শনের সমপর্যায়ের বলে মনে করা হয়।[১৫৭] বৈদিক অনুষ্ঠানের বিরোধী হলেও বৌদ্ধ দর্শনে সমসাময়িক দেশ ও কালের আধ্যাত্মিক ভাবধারার সাথে সঙ্গতি বিধানের প্রচেষ্টা স্পষ্ট। এদিক থেকে বিবেচনা করে রাধাকৃষ্ণণ প্রাথমিক বৌদ্ধ মতকে উপনিষদীয় চিন্তারই নতুন প্রকাশ বলে মন্তব্য করেন।[১৫৮] জৈন তীর্থঙ্করদের দার্শনিক চিন্তাও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই ভারতীয় সাহিত্যের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক উইন্টারনিট্জ পরবর্তী কালের সকল ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাই বস্তুতপক্ষে উপনিষদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।[১৫৯] সুতরাং দেখা যায়, বেদকেন্দ্রিক এবং আস্তিক বলে অভিহিত ষড়দর্শন এবং নাস্তিক বৌদ্ধ ও জৈন এই আটটি ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মূল ভাবগত দিক থেকে ভারতীয় অধ্যাত্ম ভাবধারার অনুসারী ও পৃষ্ঠপোষক।

ষড়দর্শন বেদকে স্বীকার করে গড়ে উঠলেও একথা সত্য যে, তা বেদের মধ্যে নিহিত বস্তুবাদী ভাবধারা অর্থাৎ সংহিতা ও ব্রাহ্মণ পর্যায়ের বৈদিক সাহিত্যের ধ্যান ধারণার চেয়ে বেদের অধ্যাত্মবাদী তথা উপনিষদীয় ভাবধারার প্রভাবে অধিক পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছে। এদিক থেকে একমাত্র চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনই ব্যতিক্রম। চার্বাক দর্শনে যেমন বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ পর্যায়ের সাহিত্যের ভাবধারা অর্থাৎ বেদের বস্তুবাদী ভাবধারা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে তেমনি অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক ভাবধারার প্রতি সুস্পষ্ট বিরোধাত্মক মনোভাবও প্রকাশ পেয়েছে। সনাতনী বিভাগের দিক থেকে চার্বাক দর্শন বৌদ্ধ ও জৈন এ দু'টি সম্প্রদায়ের সমপর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ নাস্তিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এ দু'টি নাস্তিক দর্শন থেকেও চার্বাক দর্শনের একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। কারণ, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন বেদপ্রামাণ্যে অবিশ্বাস করে নাস্তিক সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও তাঁরা নিজেদের শাস্ত্রপ্রামাণ্যে বিশ্বাস করে। যেমন, বৌদ্ধরা বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে তথা ত্রিপিটকে, জৈনরা জিনদের উপদেশাবলীতে অবিচলভাবে বিশ্বাস করেন। কিন্তু চার্বাকগণ কোন শাস্ত্রেই বিশ্বাস করেন না। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ পারমার্থিক অর্থে আত্মায় বিশ্বাস না করলেও ব্যবহারিক অর্থে আত্মায় বিশ্বাস করেন। জৈন দার্শনিকগণও আত্মায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু চার্বাক দর্শনে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। বৌদ্ধ ও জৈন উভয় সম্প্রদায়ই জন্মান্তরবাদ, কর্মবাদ, কার্যকারণ সম্পর্ক এবং মুক্তি বা নির্বাণের ধারণায় বিশ্বাস করে। কিন্তু চার্বাকগণ এসবের কোন কিছুকেই স্বীকার করেন না। প্রত্যক্ষ প্রমাণই, তাঁদের মতে, জ্ঞানের একমাত্র উৎস ও মানদণ্ড। সুতরাং, আস্তিক ও নাস্তিক উভয় সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের সাথে চার্বাক দর্শনের এসব স্বাতন্ত্র্যই তাঁদেরকে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে একটি অনন্য আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। চার্বাকগণ অন্য আটটি ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের বাইরে এসে একটি নিজস্ব একক ধারাকে বহন করেছেন, যে ধারাটির মূল উৎস বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অংশ। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে চার্বাক দর্শনের এই অধ্যাত্মবাদ বিরোধী ব্যতিক্রমধর্মী বস্তুবাদী অবস্থানের উৎস ও প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করতে হলে চার্বাকদের যুগে প্রাচীন ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

যদিও চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনের আবির্ভাবকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করা ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় তবুও বৌদ্ধশাস্ত্র, মহাভারত, মনুসংহিতা প্রভৃতি নজির থেকে অনায়াসেই অনুমান করা হয় যে, এ সম্প্রদায়টির ইতিহাস সুপ্রাচীন।১৬০ হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থেও চার্বাক মতের উল্লেখ পাওয়া যায়।১৬১ ঋগ্বেদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে এটা অনুমান করা হয় যে, খ্রিষ্টপূর্ব যুগে, এমনকি গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের বহু পুর্বে ভারতে চার্বাক বা লোকায়ত মতের অবির্ভাব ঘটেছিল। রামায়ণ ও মহাভারত খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ থেকে খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে লিখিত বলে অনুমিত হলেও এ দু'টি মহাকাব্যের কাহিনীগুলো বাস্তবে ঘটেছিল আরও অনেক আগে। কাব্য দু'টির মূল কাহিনী এবং গ্রন্থ দু'টির অন্তর্ভুক্ত বহু উপাখ্যানকে নিঃসন্দেহে খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের প্রথমার্ধের সময়কার বলে মনে করা হয়।১৬২ রামায়ণে লোকায়ত দার্শনিকদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। রামচন্দ্র ভরতকে বলেনঃ

কৃচ্চিন্ন লৌকায়তিকান ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে।
অনর্থকুশলীহ্যেতে বালাঃ পণ্ডিত মানিনাঃ।।১৬৩

অর্থাৎ, হে বৎস, আশা করি তুমি লোকায়তিক ব্রাহ্মণদের সেবা করছ না। তারা অনর্থকুশল এবং পণ্ডিত হলেও বালক। রামায়ণের কাহিনীগুলোকে প্রায়শই আর্য উপজাতি ও দক্ষিণ ভারতের জনসাধারণের মধ্যে সংগ্রামের স্মারক হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুও একথা বলেছেন যে, রামায়ণ ও মহাভারত হল ইন্দো-আর্যদের প্রাথমিক জীবনের বিবরণ, তাঁদের গৃহযুদ্ধের কাহিনী, যদিও এগুলো পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে।১৬৪ রামায়ণের মত ঋগ্বেদেরও দশম মণ্ডলের বাহাত্তর সুক্তের তৃতীয় ঋক-এ বৃহস্পতি লৌক্য নাম পাওয়া যায়। তাঁকে 'গণপতি' আখ্যাও দেয়া হয়েছে। তিনিই সম্ভবত চার্বাকদের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে খ্যাত বস্তুবাদীবৃহস্পতি।১৬৫ যদিও ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলকে অন্য নয়টি মণ্ডলের অনেক পরবর্তী কালের রচনা বলে মনে করা হয় তবুও বর্তমান কালের ভারতীয় ও বিদেশী পণ্ডিতদের বিতর্ক থেকে বৈদিক সাহিত্য রচনার যে সর্বশেষ সময় সীমা পাওয়া যায় তা হল ৭০০খ্রিঃপূঃ অব্দ। অর্থাৎ উত্তর বৈদিক সাহিত্য বা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল থেকে উপনিষদ পর্যন্ত ৭০০ খ্রিঃপূঃ অব্দের মধ্যে রচিত হয়েগিয়েছিল।১৬৬ এসব তথ্যের ভিত্তিতে লোকায়ত বা চার্বাক মতকে অন্তত ৭০০ খ্রিঃ পূঃ অব্দের পূববর্তী বলে মনে করা অসঙ্গত হবে বলে মনে হয় না।

খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের শুরুতে ভারতে লৌহ ব্যবহার শুরু হয় এবং দাস-মালিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। অবশ্য এ উপমহাদেশের আর্য-আগমনের পর থেকেই দ্রাবিড় অনার্যদের পদানত করে রাখার মাধ্যমে দাসপ্রথা শুরু হয়ে গিয়েছিল। শীঘ্রই পশু পালন ও চাষ-বাসকে কেন্দ্র করে আর্য অনার্য বর্ণপ্রথাটি অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে চালিত হয়ে জটিল বর্ণপ্রথার রূপ লাভ করে এবং অমার্জিত ধর্মীয় সংস্করণের সূত্রপাত এর সমর্থন যোগায়। চার্বাক দর্শন এ বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধেই একটি প্রতিবাদ। ঋগ্বেদে যে সমাজের পরিচয় পাওয়া যায় তা আদিম সাম্যবাদী সমাজের সর্বশেষ এবং শ্রেণীসমাজের প্রারম্ভের ইঙ্গিত বহন করে। অর্থাৎ ঋগ্বেদ হল আদিম সাম্যবাদী সমাজের শেষ ও শ্রেণী বিভক্ত সমাজের শুরুর সন্ধিক্ষণ।১৬৭ উপনিষদে যে শ্রেণী বিভক্ত সমাজের স্পষ্টরূপ দেখা যায় ঋগ্বেদে সে সমাজের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এ তিনটি বর্ণের বহুবিধ উল্লেখ পাওয়া যায়। এ তিন বর্ণকেই 'দ্বিজ' বলে গণ্য করা হত। তবে কেবলমাত্র ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলেই শুদ্র বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাদেরকে 'দ্বিজ' বলে গণ্য করা হত না। এরা বৈদিক আচারে দীক্ষিত হওয়া, বৈদিক ক্রিয়াকলাপে অংশ নেয়া ও বৈদিক ধর্মগ্রন্থ পাঠের আধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। শুধুমাত্র ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষ সুক্তে বলা হয়েছে ব্রাহ্মণরা 'পুরুষ'-এর মুখগহ্বর থেকে, ক্ষত্রিয়রা বাহু থেকে, বৈশ্যরা উরু থেকে এবং শুদ্ররা পদ থেকে উৎপন্ন হয়েছে।১৬৮ এই শুদ্ররা ছিল কৃতদাসের মত দরিদ্র, বঞ্চিত, শোষিত ও অন্য তিন সম্প্রদায়ের উপর নির্ভরশীল। বর্ণপ্রথার ফলে সুবিধাপ্রাপ্ত ধনী জমি-মালিক ও দাস-মালিকদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। সমাজের সম্পদ তাদের হাতে কুক্ষিগত হয়। সুখলাভের উপাদান সম্পদের উপর সকল মানুষের অধিকার থাকে না। এ অবস্থায় শোষিত মানুষ অর্থনৈতিক মুক্তি কামনা করে। বৈদিক যুগের এমনি এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বৃহস্পতির আর্বিভাব বলে মনে করা হয়।১৬৯

বৃহস্পতিলৌক্য তাঁর দ্বারা প্রচারিত বস্তুবাদী দর্শনে মানুষের সাম্য ও সুযোগের সমবন্টনের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং অতীন্দ্রিয়, পারলৌকিক সুখের আশার বাণীর পরিবর্তে ইন্দ্রিয়সুখ এবং প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য বিষয়ের উপর অতীন্দ্রিয় বিষয়ের চেয়ে বেশী গুরুত্ব প্রদান করেন। তাই তাঁর দর্শন তৎকালীন শোষিত, বঞ্চিত, মানুষেরই মুক্তির স্বাভাবিক দর্শনের রূপলাভ করে। এ কারণেই তিনি গণপতি উপাধি লাভ করেন। তাই এটা মনে করা হয় যে, অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বর্ণপ্রথায় আক্রান্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামো এবং ধর্ম-রাজনৈতিক, দাস-মালিক রাষ্ট্রের মুষ্টিমেয় সবল ব্যক্তির শাসন ও শোষণের পরিবেশেই প্রাচীন ভারতে লোকায়ত দর্শনের ধীর স্ফূরণ ঘটে।১৭০ মূলত সামাজিক দুর্ভোগের বিরুদ্ধে একটি আপোষহীন প্রতিবাদ হিসাবেই চার্বাক মতবাদ বিকশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুবাদের ভিত্তিতে চার্বাক দর্শন শোষণ বঞ্চনার উৎস শাস্ত্রবচনকে ধোঁকাবাজি ও ব্রাহ্মণদের জীবিকা নির্বাহের পথ হিসাবে ঘোষণা করে। এছাড়া এ দর্শন দেহাতীত আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করার মাধ্যমে পরলোক, পরজন্ম এবং এসবের তত্ত্বগত ভিত্তি কর্মবাদকে ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত করে। ফলে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের সবচেয়ে বড় দুর্ভোগ জাতিভেদের বিরুদ্ধে অভিযানের পথ প্রশস্ত হয়।[১৭১] এ সামাজিক রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণকেই চার্বাক দর্শনের পক্ষে লোকায়ত দর্শনের মর্যাদালাভের একটি অন্যতম কারণ হিসাবে ধারণা করা যেতে পারে। এ কারণে অনেকে মনে করেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহস্পতিলৌক্যের চিন্তার মধ্যেই সর্বপ্রথম বস্তুবাদী দার্শনিক চিন্তার বীজ পাওয়া যায়।[১৭২]

উপরে আলোচিত প্রেক্ষাপটকে স্মরণ রেখে ভারতীয় দর্শনের আধুনিক পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় সমাজে দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য–এ তিনটি বর্ণ) ও শুদ্রের শ্রেণী বিরোধ দর্শনের ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করেছে এবং এই বিরোধ প্রজা বা জন–দর্শন এবং রাজা বা যাজক সম্প্রদায়ের দর্শনের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই প্রজা বা জন–দর্শন অর্থাৎ সাধারণ মানুষের দর্শনই ভারতীয় পরিভাষায় 'লোকায়ত দর্শন' হিসাবে প্রচলিত হয়েছে, অন্যদিকে রাজ–দর্শন প্রচলিত হয়েছে দর্শন নামে।[১৭৩] এ বিরোধের ফলেই লোকায়ত বা জন–দর্শন যখন দেহাত্মবাদ তথা বস্তুবাদী মত প্রচার করে রাজ–দর্শন তখন অতীন্দ্রিয় দেহাতিরিক্ত আত্মার তত্ত্ব তথা ভাববাদ প্রচার করেছে। এ প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মত স্মরণযোগ্য। তাঁর মতে, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বস্তুবাদ বনাম ভাববাদের সংঘর্ষটি সর্ব প্রথম রূপায়িত হয় দেহাত্মবাদ–বনাম দেহাতিরিক্ত আত্মা সংক্রান্ত মতের মধ্যে সংঘর্ষ হিসাবে।[১৭৪] আসলে দেহাতিরিক্ত আত্মবাদ প্রতিষ্ঠায় দেহাত্মবাদের ধ্বংস সাধনই তৎকালীন সমাজের বিধান ছিল। একমাত্র চার্বাক দর্শনই দেহাতিরিক্ত সত্তা হিসাবে আত্মার অস্তিত্বের বিরোধিতা করে দেহাত্মবাদকে স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছে। অর্থাৎ ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে অধ্যাত্মবাদের বিরোধিতা ও দেহাত্মবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে চার্বাক বা লোকায়তরাই ছিল একমাত্র দার্শনিক গোষ্ঠী। এ দর্শন ছাড়া অন্যান্য দর্শনে ভাববাদ বিরোধিতার বীজ নিহিত থাকলেও একমাত্র চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনই সাহিত্য, দর্শন, লোকাচার ইত্যাদি সমস্ত দিক দিয়ে তৎকালীন সমাজ ও মানুষের সামনে ভাববাদের কপটাচারের মুখোস খুলে দিয়েছিল।[১৭৫] তাই চার্বাক দর্শন সম্পর্কে সর্বত্রই তুচ্ছ–তাচ্ছিল্য–পরিহাস–উপহাস–ঘৃণা–বিদ্বেষ সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। এমনকি লোকায়ত বা চার্বাক নামের সাথে অত্যন্ত গভীরভাবে সম্পৃক্ত সমকালীন প্রচলিত যে প্রবাদ– যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ,[১৭৬] তাও আসলে উত্তরপক্ষের বা সমালোচকদের উপহাস প্রবণ উক্তি।[১৭৭]

উল্লেখ্য যে, ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদী ধারণা শুধু চার্বাকদের মধ্যেই ছিল না বরং উপনিষদ বা বেদান্ত দার্শনিক উদ্দালক আরুণি থেকে শুরু করে বৌদ্ধ সর্বাস্তিবাদ, সাংখ্য আদিরূপ, ন্যায়–বৈশেষিক পরমানুবাদ প্রভৃতিকেও বস্তুবাদ ঘেষা মতবাদ বলে আখ্যায়িত করার মত যথেষ্ট কারণ রয়েছে।[১৭৮] তবে এ কথা সত্য যে, চার্বাকদের মত আপোষহীনভাবে বস্তুবাদের প্রচার অন্যকোন দার্শনিক সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। পরমাণুবাদের সমর্থন করেই ন্যায়–বৈশেষিক দার্শনিকদের আর্বিভাব হয়েছিল বলে এ দর্শন ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। তবুও এ দর্শন পরমাণুবাদের চরম ও যৌক্তিক পরিণতি হিসাবে বস্তুবাদী দর্শনে পরিণতি লাভ করে নি। ন্যায় দর্শনের উৎকর্ষকেই এর কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। উৎকর্ষ লাভের শর্ত হিসাবেই সমসাময়িক চিন্তাধারার কাছে ন্যায় দার্শনিকদের মাথা নোয়াতে হয়েছে এবং প্রসঙ্গ বিশেষে ভাববাদের সাথেও কমবেশী আপোষ করতে হয়েছে। কিন্তু চার্বাক দার্শনিকগণ এ রকম আপোষকে মেনে নেন নি। তাঁদের এই আপোষহীনতা এবং বস্তুবাদী দার্শনিক সম্প্রদায় হিসাবে ভারতীয় দর্শনে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য তাঁদের প্রত্যক্ষ প্রমাণতত্ত্বেও প্রমাণিত হয়েছে। চার্বাক ব্যতীত অন্য যে সব দার্শনিক সম্প্রদায় বস্তুবাদকে সমর্থন করেছে তাদের মধ্যে একমাত্র বৌদ্ধ ছাড়া আর সকলেই কমপক্ষে তিনটি প্রমাণ যথা, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দকে গ্রহণ করেছে। বৌদ্ধরা শব্দকে বাদ দিয়ে প্রত্যক্ষ এবং অনুমানকে প্রমাণ হিসাবে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু চার্বাক দার্শনিকগণ শুধুমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে প্রত্যক্ষবাদী হিসাবে তাঁদের অধ্যাত্মবাদ বিরোধী এবং বস্তুবাদী অবস্থানকে দৃঢ় করেছেন। এই আপোষহীনতার কারণেই হয়ত চার্বাকদের মতবাদ দর্শন হিসাবে উৎকর্ষ লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্য ভাববাদী দার্শনিকদের মত মর্যাদা ও উৎকর্ষ লাভ করতে পারে নি। তাঁদের কোন রচনা দুস্প্রাপ্য বা দুর্লভ হওয়ারও একটিই প্রধান কারণ। অনুমান করা হয় যে, বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা এ সব যথাসম্ভব ধ্বংস করা হয়েছে। তবুও একথা সত্য যে, বস্তুবাদী ও প্রত্যক্ষবাদী হিসাবে চার্বাক দর্শন যতটুকু টিকে আছে ততটুকু আপোষহীন। ফলে দার্শনিক উৎকর্ষের দিক থেকে তা সুযোগ বঞ্চিত হলেও বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষবাদের বৈপ্লবিক ভূমিকার দিক থেকে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে চার্বাক মত অতুলনীয়।[১৭৯]

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন হল চার্বাক দার্শনিকগণ কেন এমন সমসাময়িক অধ্যাত্মবাদবিরোধী তথা সমাজবিরোধী, প্রত্যক্ষবাদী, বস্তুবাদী দর্শন প্রচার করতে প্রয়াসী হন। এর উত্তরে প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক, বিশেষত চিকিৎসাশাস্ত্রের বা·রসায়নশাস্ত্রের প্রভাবকে একটি অন্যতম কারণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। আয়ুর্বেদই হল প্রাচীন ভারতের এই চিকিৎসাশাস্ত্র। আয়ুর্বেদের শুরু ঋগ্বেদে এবং বিকাশ অথর্ববেদে।১৮০ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে চারিবেদ থেকে ব্রহ্মা আয়ুর্বেদ সৃষ্টি করেন। আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র এ চারখানা গ্রন্থ হল উপবেদ। উপবেদ চতুষ্টয় অথর্ববেদমূলক বলে প্রসিদ্ধ হলেও এর শুরু ঋগ্বেদে। উপবেদের মূলভিত্তি বেদ হলেও এগুলো লৌকিক অর্থাৎ লোকযাত্রা নির্বাহক। এ উপবেদগুলোর মধ্যে আয়ুর্বেদ প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রের নামান্তর মাত্র।১৮১ যাতুবিদ্যা (মন্ত্র প্রভাবে উদ্দীষ্ট কার্য সম্পাদন বিদ্যা) যেমন অথর্ববেদের অঙ্গ ছিল তেমনি ফলিত জ্যোতিষ এবং চিকিৎসাশাস্ত্রও অথর্ববেদের অঙ্গ বলে পরিগণিত ছিল। চিকিৎসাশাস্ত্র মানবজীবনে অত্যাবশ্যকীয় হলেও অথর্ববেদের অঙ্গ হওয়ায় যাতুবিদ ও ফলিত জ্যোতিষীর মত চিকিৎসাবিদও তৎকালীন হিন্দু সমাজে নিন্দিত ছিলেন।১৮২ আয়ুর্বেদের শল্য, শালক্য, কায়, কৌমাবভৃত্য, অগদ, ভূতবিদ্যা, রসায়ন ও বাজীকরণতন্ত্র–এ আটটি ভাগের মধ্যে রসায়নশাস্ত্র অন্যতম। অনুমান করা হয় যে, ভারতীয় ইতিহাসে আয়ুর্বেদই সর্বাধিক প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রকৃতি বিজ্ঞানের দিকে প্রথম পদক্ষেপ রেখেছিল এবং তৎকালীন সামাজিক প্রতিকূলতার কারণেই তা খুব বেশী বিকশিত হতে পারে নি। ভারতীয় বিজ্ঞান চেতনার এই অবক্ষয়ের জন্য আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞানী প্রফুল্ল চন্দ্র রায় শঙ্করের মায়াবাদকে বিশেষভাবে দায়ী করেছেন।১৮৩

ভারতীয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তথা চিকিৎসাশাস্ত্রের লোকযাত্রা নির্বাহক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং এর প্রতি তৎকালীন উচ্চ হিন্দু সমাজের অবজ্ঞা বা নিন্দাসূচক মনোভাবসহ অন্যান্য বিভিন্ন সাদৃশ্য থেকে মনে করার অবকাশ থাকে যে, ভারতের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের এই বিকাশের সাথে চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল। প্রখ্যাত ন্যায় দার্শনিক জয়ন্তভট্ট তাঁর ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থে চার্বাক ভূতচৈতন্যবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে পূর্বপক্ষ হিসাবে চার্বাকদের একটি যুক্তির উল্লেখ করেন। যুক্তিটি নিম্নরূপঃ

> অন্ন পানাদি দ্বারা শরীর পুষ্ট হলে চেতনার উৎকর্ষ দেখা যায়। কিন্তু শরীরের পুষ্টির অভাব হলে চেতনাও ক্ষুন্ন হয়। এছাড়া ব্রাহ্মীঘৃত খেলে চেতনা বা জ্ঞান বাড়ে। অর্থাৎ ভূতবস্তুর আধিক্যে চৈতন্য বাড়ে, অভাবে কমে। সুতরাং চৈতন্য ও ভূতবস্তুর মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আছে।১৮৪

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে একথা বলা হয়েছে যে, প্রাণঃ প্রাণভূতম্ অন্নম্। অর্থাৎ অন্নই হল প্রাণীর প্রাণ।১৮৫ এছাড়া আয়ুর্বেদশাস্ত্রে ব্রাহ্মীঘৃতের কথাও আছে। এ থেকে এটা অনুমান করা হয় যে, চার্বাকগণ চেতনার কারণ হিসাবে যে অন্নপানাদি ও ব্রাহ্মীঘৃত–কে নির্দেশ করেছেন তার উৎস প্রাচীন ভারতের আয়ুর্বেদশাস্ত্র। অবশ্য ছান্দোগ্য উপনিষদের বিজ্ঞানমনস্ক ঋষি উদ্দালকের মুখেও অন্ন–এর উদাহরণ শোনা যায়। প্রাচীন ভারতের আয়ুর্বেদ তথা রসায়ন বা চিকিৎসাশাস্ত্র যে চার্বাক চিন্তার উপাদান সরবরাহ করেছে এ বিষয়ে আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। যেমন, দেহাত্মবাদের প্রমাণ করতে গিয়ে চার্বাকগণ মদ্য তৈরীর নানা উপকরণের মধ্যে নেশা না থাকলেও এগুলো মিলে যখন মদ্য উৎপন্ন করে তখন নেশাও উৎপন্ন হয় – এই সাদৃশ্যানুমানের দ্বারা ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ একত্রে সমন্বিত হয়ে মানবদেহ গঠন করলে তা'তে চেতনার উৎপত্তি হয় একথা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। এই মদশক্তির দৃষ্টান্তের ব্যবহারও আয়ুর্বেদশাস্ত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বস্তুগত উপাদান থেকে চৈতন্যের উৎপত্তির ক্ষেত্রে চার্বাকগণ স্বভাববাদের স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই স্বভাববাদকে অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় মেনে নেন নি। এমনকি অনেকে এর বিরোধিতাও করেছেন। স্বভাববাদ বিরোধিতার কারণ হিসাবে ভাববাদ ও অধ্যাত্মবাদ অচল প্রমাণিত হওয়ার ভয়ই বেশী পরিমাণে কাজ করেছে বলে মনে হয়। কিন্তু চার্বাকগণ আপোষহীনভাবে স্বভাববাদকে সমর্থন করেছেন। তাঁদের সমর্থিত স্বভাববাদে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রাকৃতিক নিয়মেরই প্রাথমিক রূপের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তৎকালীন সকল দার্শনিক সম্প্রদায় স্বভাববাদকে উপেক্ষা করলেও ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে। বিজ্ঞানীমহল, বিশেষত চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মূল প্রতিপাদ্য প্রসঙ্গে স্বভাববাদ স্বীকৃত হয়েছে। এদিক থেকেও ভারতে বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে চার্বাক মতের অচ্ছেদ্য ঘনিষ্টতা অনুমানের অবকাশ থাকে। ভারতীয় বস্তুবাদী দর্শন তথা চার্বাক দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হল, (১)শাস্ত্রশাসনের শৃঙ্খলমুক্তি, (২)ভূতচৈতন্যবাদ, (৩) প্রত্যক্ষবাদ, (৪) স্বভাববাদ ও (৫) জ্ঞানের বৈধতা সম্পর্কে প্রয়োগবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

আয়ুর্বেদশাস্ত্রের সাথে এ বৈশিষ্ট্যগুলোর হুবহু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, প্রথমত, আয়ুর্বেদের আদি গ্রন্থ *চরকসংহিতা* ও *সুশ্রুত সংহিতা*। *চরক সংহিতা* গ্রন্থে দু'রকম চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এগুলো হল দৈব-ব্যপাশ্রয় ভেষজ ও যুক্তি-ব্যপাশ্রয় ভেষজ। এ দু'প্রকার ভেষজের প্রথমটি হল, মন্ত্র, তাগা, তাবিজ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ণ। অর্থাৎ অথর্ববেদ নির্ভর ভেষজশাস্ত্র। *চরক সংহিতা* এই ভেষজশাস্ত্র বর্জন করে যুক্তি-ব্যপাশ্রয় ভেষজ-এর দিকে অগ্রসর হওয়ার আয়োজন করেছে। এতে ঔষধ হিসাবে একশত পঁয়ষট্টি রকম জীবজন্তুর রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, দুগ্ধ, মূত্র ইত্যাদি ছাড়াও নয়শত নব্বই রকম গাছের ফল-মূল-ছাল ইত্যাদি ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া, ক্ষয়রোগের নিরাময়ের উদ্দেশ্যে গোমাংসজাতীয় শাস্ত্র-নিষিদ্ধ খাদ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে শ্রুতি, স্মৃতি অর্থাৎ শাস্ত্রশাসনের অবজ্ঞা করা হয়েছে, যার সাথে চার্বাকদের উক্ত প্রথম বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয়ত, চরক সংহিতা-তে ইন্দ্রিয়যুক্ত দ্রব্যকে চেতন ও ইন্দ্রিয়হীন দ্রব্যকে অচেতন বলা হয়েছে। আবার চেতনার উপাদান হিসাবে ভূতবস্তুর কথাও বলা হয়েছে। এর সাথে চার্বাক ভূত-চৈতন্যবাদের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

তৃতীয়ত, আয়ুর্বেদে রোগীর রোগ নির্ণয় থেকে শুরু করে ঔষধ সেবন পর্যন্ত প্রত্যক্ষ নির্ভরতার বহু দৃষ্টান্ত আছে। যেমন, বলা হয়েছে, আমরা সম্যকভাবে পরিদর্শন করব এবং এর ভিত্তিতে সম্যক উপদেশ দেব। এছাড়া শল্যবিদ্যা শেখার জন্য *সুশ্রুতসংহিতা* লাশ কেটে প্রত্যক্ষ করার কথা বলা হয়েছে। এটা দুঃসাহসিক। কারণ, লাশ কাটা তৎকালিন ধর্ম সংস্কার বিরুদ্ধ।[১৮৬] এথেকে চার্বাক প্রত্যক্ষবাদের সাথে চিকিৎসাশাস্ত্র তথা প্রকৃতি বিজ্ঞানের যথেষ্ট মিল দেখা যায়।

চতুর্থত, চরক ও সুশ্রুত উভয় সংহিতায় স্বভাববাদের যথেষ্ট উল্লেখ আছে। যেমন, সুশ্রুত সংহিতায় খাদ্য গুরুপাক ও লঘুপাক হওয়ার কারণ হিসাবে স্বভাবের কথা এবং চরক সংহিতায় তেল, জল, লবণ ইত্যাদির বিশিষ্ট গুণাগুণের জন্য স্বভাবের কথা বলা হয়েছে।

পঞ্চমত, *চরক সংহিতা* গ্রন্থে কোন কথা সত্য কিনা তা নির্ণয়ের জন্য প্রায়োগিক মাপকাঠিকে মানদণ্ড হিসাবে ধরে নেয়া হয়েছে। এছাড়া, আয়ুর্বেদে বস্তুবাদকে সমর্থন করা হয়েছে বলে মনে হয়। এ সম্পর্কে *সুশ্রুত সংহিতা* গ্রন্থে প্রমাণ পাওয়া যায়। এতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য মতাদর্শগত দাবীর দিক থেকে বস্তুবাদকে অপরিহার্য হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ভূতেভ্যঃ হি পরং যস্মাৎ নাস্তি চিন্তা চিকিৎসিতে।[১৮৭] অর্থাৎ, ভূতবস্তুকে বাদ দিয়ে চিকিৎসার কথা চিন্তা করা যায় না। এসব বিষয় থেকে চার্বাক দর্শনের সাথে আয়ুর্বেদের উন্নতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়।

ভারতে প্রকৃতি বিজ্ঞানের উন্নতির যুগ ও চার্বাক যুগের সুনির্দিষ্টভাবে সঠিক কাল নির্ণয় সম্ভব না হলেও আনুসঙ্গিক পরিবেশ বিচারে অনুমিত হয় যে, চার্বাকগণ প্রাচীন ভারতের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং ঋগ্বেদের বস্তুবাদী ধারার অনুসারী। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশে বর্ণাশ্রম সমাজের নজির নেই। এছাড়া চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যার প্রতিও ঋগ্বেদ প্রশংসা মুখর। কিন্তু যজুর্বেদের যুগে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এতে চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি প্রবল ঘৃণাও প্রকাশিত হয়েছে। চিকিৎসাবিদদের অপবিত্র ইতর শ্রেণীর লোক বলা হয়েছে। বর্ণাশ্রম সমাজে কারিগর শ্রেণীর লোকের মর্যাদা হল নীচু বা ইতর শ্রেণীতে এবং বিজ্ঞানীরা কারিগর শ্রেণীর লোক। তাই এরূপ সমাজে বিজ্ঞানের অপমৃত্যু হতে বাধ্য। সুতরাং বলা যায়, যজুর্বেদের আগেই প্রথমবারের মত এ উপমহাদেশের সংস্কৃতিতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি ব্যাহত হয় এবং বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিদের ইতর শ্রেণীভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে শঙ্করের মায়াবাদ বিজ্ঞানের উন্নতির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এসব কারণে এ ধারণাকে যথার্থ বলে মনে হয় যে, ভারতে বিজ্ঞানের প্রাথমিক বিকাশ ঋগ্বেদের যুগ থেকে যজুর্বেদের যুগ পর্যন্ত এবং বিজ্ঞানমনস্কতার জন্যই অষ্টম-নবম শতক, অর্থাৎ উপনিষদের যুগ থেকে লোকায়ত দর্শনকে ইতর জনগণের দর্শন বলে অভিহিত করা শুরু হয়।

ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার প্রকৃতি আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, চার্বাক ছাড়া অন্য সবক'টি দার্শনিক গোষ্ঠীই প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু কেবলমাত্র চার্বাকগণই এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম। চার্বাকগণ শুধুমাত্র প্রত্যক্ষকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং মতান্তরে প্রত্যক্ষ-প্রসূত অনুমানকে স্বীকার করেছেন। এর কারণ হল, চার্বাক ব্যতীত আর প্রায় সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ই জগতের সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ভূত বা পদার্থের কথা বললেও তাঁরা প্রকারান্তরে এক বা একাধিক প্রত্যক্ষত্তোর ধারণার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন। ফলে এ প্রত্যক্ষত্তোর ধারণার জ্ঞান পাবার জন্য অনুমানকে প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করে নিতেও তাঁরা বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু চার্বাকগণ বস্তুবাদী হিসাবে বস্তু ব্যতীত আর কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। তাই তাঁদেরকে প্রত্যক্ষ ব্যতীত আর কোন প্রমাণকেই স্বীকার করতে হয় নি। কারণ, বস্তুকে জানার জন্য একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণই যথেষ্ট।

একই কারণে তাঁরা প্রত্যক্ষ-বহির্ভূত বস্তুর অস্তিত্বও অস্বীকার করেছেন। উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞানের মূল বৈশিষ্ট্যের সাথে চার্বাকদের প্রত্যক্ষতত্ত্বের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণ তথা প্রত্যক্ষকেই জ্ঞানার্জনের প্রাথমিক উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয় এবং পরবর্তীতে প্রত্যক্ষলব্ধ তথ্যকে পরীক্ষণ দ্বারা যাচাই করা হয়। এছাড়া, বিজ্ঞান প্রত্যক্ষত্তোর তত্ত্বকে অর্থাৎ আত্মা, কর্মবাদ, জন্মান্তর ইত্যাদি স্বীকার করে না। ফলে বিজ্ঞানমনস্ক সমাজে এসবের ভিত্তিতে উঁচুনীচু শ্রেণীভেদও দেখা যায় না। ভারতীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বস্তুবাদের সমর্থক চার্বাকগণ বিরাজিত সামাজিক ও ধর্মীয় ধারণাগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করার মাধ্যমে ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে চরম অভিজ্ঞতাবাদী অবস্থান নেন। এ অবস্থান তাঁদের আপোষহীন বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় বহন করে।

উপরের আলোচনা থেকে অনুমান করা সম্ভবত অসঙ্গত হবে না যে, ভারতীয় আদি সাহিত্য ঋগ্বেদের প্রকৃতিবাদী, দেহাত্মবাদী, প্রত্যক্ষবাদী ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং আয়ুর্বেদ বা প্রকৃতি বিজ্ঞান প্রদত্ত প্রাচীন ভারতের প্রাথমিক স্তরের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে চার্বাকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। প্রাচীন ভারতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশ চার্বাকদের উৎসাহিত ও প্রভাবিত করেছে। অন্যদিকে ভারতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে যে উন্নতি ঘটেছে একমাত্র চার্বাক দর্শনই চরম বস্তুবাদী তত্ত্ব প্রচার করে এর প্রাথমিক দার্শনিক ভিত্তি মজবুত করতে সাহায্য করেছে। এ প্রেক্ষাপটে চার্বাক দর্শনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়বলেনঃ

> অবশ্য চার্বাক সংক্রান্ত যেটুকু কথা আমাদের জানা আছে তার উপর নির্ভর করে মন্তব্যের সুযোগ আছে যে, ভারতীয় ইতিহাসে এই নামের সঙ্গে সংযুক্ত বস্তুবাদের প্রকৃত গুরুত্ব – বা এমনকি বৈপ্লবিক ভূমিকা- স্বীকার্য। বিশেষত ভাববাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে শুধু দার্শনিক বিচারের মানদণ্ডে নয়, – ভারতীয় ইতিহাসে প্রকৃতি বিজ্ঞানের যতটা বিকাশ হয়েছিল, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তারও উপযুক্ত জমি প্রস্তুতের কাজে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন ছিল। এবং ভারতীয় দর্শনে চার্বাক মত ছাড়া আর কোন দর্শনে নির্ভেজাল বস্তুবাদের পরিচয় পাওয়া যায় না বলে অনুমানের সুযোগ থাকে যে, ভারতে প্রকৃতি বিজ্ঞানের পক্ষ থেকে চার্বাক নাম উল্লেখ করে কোন ঋণের প্রমাণ না থাকলেও চার্বাক বা চার্বাক ঘেষা কোন মতাদর্শের উপর প্রকৃতি বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত ছিল।[১৮৮]

উপরের আলোচনা থেকে ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যায় চার্বাকদের অবস্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায় যে, ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে চার্বাক ছাড়া অন্য আটটি দার্শনিক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ইত্যাদিকে জ্ঞানের উপায় হিসাবে ধরে নিয়ে বেদের অধ্যাত্মবাদী ভাবধারা তথা উপনিষদীয় ধারার প্রতিনিধিত্ব করেন। এছাড়া, তাঁরা শ্রেণী বৈষম্যমূলক প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে প্রধানত সমাজের উচ্চশ্রেণীর প্রতিনিধিস্বরূপ বিজ্ঞান বিরোধী এবং অধ্যাত্মবাদী দর্শন চর্চা করেন। কিন্তু এমনি এক অবস্থায় একমাত্র চার্বাক দার্শনিকগণই অধ্যাত্মবাদী ধারার বিরোধিতা করে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী প্রত্যক্ষবাদী, বস্তুবাদী, স্বভাববাদী, দেহাত্মবাদী ইহজাগতিকতাবাদী ও সুখবাদী লোকায়ত দার্শনিক ধারাকে প্রতিষ্ঠা করানোর জন্য আপোষহীন মতবাদ প্রচার করেছেন। ঋগ্বেদের প্রকৃতিবাদী ও বস্তুবাদী উপাদানের দ্বারা তাঁরা তাঁদের দর্শনের ভিত্তি নির্মাণ করেছেন। এছাড়াও ভারতীয় লোকায়ত চিকিৎসাশাস্ত্র বা আয়ুর্বেদ তথা ভারতীয় প্রকৃতি বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক তাঁদের মতবাদকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করেছে। অর্থাৎ এ সম্প্রদায় ভারতীয় দর্শনের অন্য আটটি অধ্যাত্মবাদী সম্প্রদায়ের একমাত্র ব্যতিক্রম হিসাবে উপনিষদের পরিবর্তে বেদের প্রাচীনতম সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অংশের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করে অপোষহীন প্রত্যক্ষবাদ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছে। এ আপোষহীনতার কারণে অন্য আটটি দার্শনিক গোষ্ঠীর বিরোধিতার কাছে তাঁদের দর্শন পরবর্তীতে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে এবং যথেষ্ট পরিমাণে পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হয় নি। তাঁদের গ্রন্থ'বলী সম্ভবত সুপরিকল্পিতভাবে নষ্ট করা হয়েছে। তাঁদের প্রত্যক্ষ প্রমাণতত্ত্বে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত ছিল সম্ভবত, যথার্থ চর্চার অভাব এবং বিকৃত প্রচারণার প্রভাবে এ দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের কাছে বিরূপ, বিকৃত ও নিন্দাসূচক অর্থে পরিচিত হয়েছে। কিন্তু একথা সত্য যে, আজও ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের জীবন তথা লোকায়ত জীবনে চার্বাকদের প্রভাব স্পষ্ট। এক্ষেত্রে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পক্ষে যেটা সবচেয়ে আশ্চর্যজনক আবিষ্কার সেটা হল, দেশের পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলিতে 'ছোটজাতের' মানুষদের মনে যে চেতনা আজও বেঁচে রয়েছে তা আসলে লোকায়তিক চেতনারই নামান্তর।[১৮৯] এছাড়া, একথা বলাও অসঙ্গত হবে না যে, ভারতীয় অন্যসব দর্শনে স্বীকৃত অনুমান প্রমাণের ভিত্তি ব্যাপ্তি-জ্ঞানের বিরুদ্ধে চার্বাক জ্ঞানবিদ্যায় যে যুক্তি প্রদান করা হয়েছে আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ আরোহানুমানের সার্বিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে অনেকটা একই যুক্তির ব্যবহার করেছেন। সর্বোপরি, অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যাগত

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থানকে সঙ্গতিপূর্ণ করতে গিয়ে চার্বাকগণ জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষবাদ, তত্ত্ববিদ্যার ক্ষেত্রে বস্তুবাদ, আত্মা সম্পর্কিত মতবাদের ক্ষেত্রে দেহাত্মবাদ, নৈতিকতার ক্ষেত্রে সুখবাদ এবং মোক্ষের ক্ষেত্রে ইহজাগতিকতাবাদী তত্ত্বের প্রচার করে যে সঙ্গতিপূর্ণ দার্শনিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন আধুনিক বৃটিশ দার্শনিক লক ও বার্কলের দর্শনেও এরূপ সঙ্গতির পরিচয় পাওয়া যায় না। এজন্য আধুনিক পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতাবাদের লক ও বার্কলেকৃত অসঙ্গতিকে অপসারণ করার জন্য হিউমকে ভূমিকা রাখতে হয়। হিউম তাঁর চরম অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদে লক ও বার্কলেকৃত অভিজ্ঞতাবাদের অসঙ্গতিকে যেভাবে দূর করেন তাতে প্রাচীন ভারতীয় চার্বাক দার্শনিকদের চিন্তার অনুরণন শোনা যায়।

তাই, একথা বলা সম্ভবত অসঙ্গত হবে না যে, জ্ঞানবিদ্যাগত অবস্থান থেকে চার্বাকগণ তৎকালে যে মতবাদ প্রদান করেছেন তা আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদী ও বস্তুবাদী ধারণার সমকক্ষ না হলেও সময়ের বিচারে তাঁরা যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে গেছেন এবং তাঁদের দর্শনের অন্যান্য ধারণার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের প্রত্যক্ষবাদী জ্ঞানবিদ্যাগত অবস্থানের সাথে যে সঙ্গতিপূর্ণতা প্রদর্শন করেছেন এসব বিষয়ের বিচার করে ভারতীয় দর্শনে চার্বাকদের জ্ঞানবিদ্যাগত অবস্থান নিঃসন্দেহে আধুনিক বিচারেও যথেষ্ট প্রশংসনীয় এবং গুরুত্ববাহী বলে প্রতীয়মান হয়।

সংক্ষিপ্তসার: ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যায় চার্বাকদের অবস্থান সম্পর্কিত উপরের আলোচনা থেকে যে বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয় সেগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

(১) ভারতীয় দর্শনের প্রাচীন যুগ থেকে বেদের অধ্যাত্মবাদী ভাবধারার প্রভাবে প্রভাবিত সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত, বৌদ্ধ ও জৈন এ আটটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বেদের প্রাচীনতম অংশ সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগের প্রভাবে প্রভাবিত বেদের বস্তুবাদী ভাবধারার অনুসারী লোকায়ত আখ্যাপ্রাপ্ত চার্বাক দর্শন একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যময় ব্যতিক্রমী ধারার জন্ম দেয়। এ ধারার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল প্রত্যক্ষ প্রমাণতত্ত্ব বা চরম অভিজ্ঞতাবাদ, বিশুদ্ধ বস্তুবাদ ও দেহাত্মবাদ। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে প্রত্যক্ষবাদ ও বস্তুবাদের অনুসারী বিজ্ঞানমনস্ক দার্শনিক ধারার যে ঐতিহ্য পাওয়া যায় সে ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে এই ধারাটিই অনেকটা একক কৃতিত্বের দাবীদার।

(২) এই ব্যতিক্রমধর্মী লোকায়ত বা চার্বাক দার্শনিক মতবাদের যেমন একটি আর্থ-সামাজিক দিক ছিল তেমনি এর ছিল একটি বিশুদ্ধ দার্শনিক দিক। তৎকালীন শ্রেণী শোষণে আক্রান্ত ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় শোষিত বঞ্চিত সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে এ দর্শন লোকায়ত দর্শন হিসাবে শোষক বা উচ্চশ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে ছিল একটি সামাজিক বিদ্রোহ। অন্যদিকে, বিশুদ্ধ দার্শনিক দিক থেকে এ দর্শন ছিল জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণতত্ত্ব বা চরম অভিজ্ঞতাবাদী, তত্ত্ববিদ্যার ক্ষেত্রে বস্তুবাদী, আত্মা সম্পর্কিত মতের ব্যাখ্যায় দেহাত্মবাদী, বস্তু ও চেতনার উৎপত্তি সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় স্বভাববাদী বা প্রকৃতিবাদী, কার্যকারণের ব্যাখ্যায় আকস্মিকতাবাদী, মোক্ষতত্ত্বের ব্যাখ্যায় ইহজাগতিকতাবাদী এবং নৈতিক আদর্শের ব্যাখ্যায় সুখবাদী। আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, চার্বাকগণ এসব বিশুদ্ধ তত্ত্বের শুধু অনুসারীই ছিলেন না বরং কালের দিক থেকে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনের ইতিহাসের আলোকে বিচার করলে সম্ভবত তাঁদেরকে এসব দার্শনিক তত্ত্বের প্রবক্তা হিসাবেও অভিহিত করা যায়।

(৩) ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এই দার্শনিক ধারাটি পরবর্তীকালে অন্য আটটি অধ্যাত্মবাদ প্রভাবিত দার্শনিক সম্প্রদায়ের বিরোধিতা ও প্রতিকূলতার কারণে জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি একথা সত্য। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের পিছিয়ে পড়া নিম্ন শ্রেণীর মানুষের জীবনে এই লোকায়ত দর্শনের প্রভাব আজও প্রতীয়মান হয়। এছাড়া, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত অনেক মতবাদের সাথে চার্বাক দার্শনিক মতের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, গ্রীক পরমানুবাদ থেকে শুরু করে আধুনিক মার্ক্সীয় বস্তুবাদ পর্যন্ত বিভিন্ন দার্শনিকের তত্ত্ববিদ্যাগত ও আত্মা সম্পর্কিত মতবাদের সাথে যথাক্রমে চার্বাক বস্তুবাদ ও দেহাত্মবাদের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া, আধুনিক বৃটিশ দার্শনিক হিউমের অভিজ্ঞতাবাদে চার্বাক প্রত্যক্ষবাদ এবং হিউমের কার্যকারণ সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় চার্বাক আকস্মিকতাবাদই প্রতিধ্বনিত হয়। আধুনিক উপযোগবাদী নৈতিক আদর্শ সম্পর্কিত মতবাদে, বিশেষত বেনথামের স্থূল সুখবাদে চার্বাকদের নৈতিক আদর্শের, এবং যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী ও প্রয়োগবাদী দার্শনিক মতবাদে যথাক্রমে চার্বাকদের প্রত্যক্ষতত্ত্ব ও জ্ঞানের বৈধতা সম্পর্কিত মতবাদের অনুরণন শোনা যায়।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে এই ব্যতিক্রমধর্মী একক ধারাটির আর্থ-সামাজিক ও বিশুদ্ধ দার্শনিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী

১। চার্বাক দর্শন সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল চার্বাকদের দ্বারা রচিত গ্রন্থের অভাব। বিভিন্ন তথ্য থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, চার্বাকগণ তাঁদের মতবাদগুলো লিখে গেছে। তবে এসব রচনা আমাদের হাতে এস পৌঁছায়নি। প্রাচীন চীনে ২৫৬ থেকে ২১০ খ্রিষ্ট পূর্ব অব্দ পর্যন্ত যে চ ইন রাজবংশ রাজত্ব করেছিল তার চতুর্থ রাজা ওয়াঙ চেঙ স্বঘোষিত শে-হুয়োঙতি অর্থাৎ প্রথম সম্রাট নাম গ্রহণ করে অতীতকে মুছে ফেলে ইতিহাসে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে ২১৩ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে ইতিহাস বিষয়ক এবং কনফুসিয়াসের সমস্ত গ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। অবশ্য লুকিয়ে রাখা গ্রন্থগুলো তার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে। দ্রষ্টব্যঃ সিরাজুল ইসলামঃ লোয়াকত দর্শন, *Copula*, A Journal of the Department of Philosophy, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka. Vol. 2, No. 1, June, 1985, পৃ· ৩৫। ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় চার্বাকের ক্ষেত্রে উপরোক্ত কথাটি প্রযোজ্য বলে মনে করা হয়। কেননা চার্বাক চরম বস্তুবাদী দর্শন বিধায় পরবর্তী সময়ে বস্তুবাদ বিরোধী দার্শনিক গোষ্ঠীগুলো দ্বারা চার্বাক মতকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে তাঁদের সবগুলো গ্রন্থকে ধ্বংস করা হয়। তাই জওহরলাল নেহেরু দুঃখ করে বলেন যে, সম্ভবত ভারতীয় বস্তুবাদের অধিকাংশ রচনাই ধর্মযাজক ও অন্যান্য গোড়া ধর্মবিশ্বাসীদের দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। দ্রষ্টব্যঃ Jawaharlal Nehru: *The Discovery of India*, New Delhi, Jawharlal Memorial Fund, 1981, পৃ· ৯৭। এ কারণে বর্তমানকালে প্রধানত অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি প্রাচীন কিছু গ্রন্থ, প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত কিছু লোকগাথা এবং পূর্বপক্ষ হিসাবে চার্বাক ও লোকায়ত মতের বর্ণনা এই তিন প্রকার উপাদান অবলম্বন করেই চার্বাক মত নিয়ে আলোচনার ভিত্তি গড়ে উঠে।

২। S. Radhakrishnan (ed.) : *History of Philosophy:* Eastern and Western, Vol. 1, London, George Allen and Unwin Ltd., 1952, পৃ· ১৩৪

৩। M. Hiriyanna: *Indian Philosophy*, London, George Allen and Unwin Ltd., 1958, পৃঃ· ১৮৯

৪। মনিভদ্রঃ *ষড়দর্শন-সমুচ্চয়*এর টীকা-৮১। উদ্ধৃত, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ঃ *লোকায়ত দর্শন*, অখণ্ড, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৬৩, পৃ· ৫১

৫। পূর্বোক্ত, পৃ· ৫১-৫২

৬। J. N. Sinha: *History of Indian Philosophy*, Vol.1, Calcutta, Sinha Publishing House, 1956, পৃঃ ৭৫ এবং Cowell and Gough (Tr.): *Sarva Darsana Samgraha*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৬

৭। S. Radhakrishnan and C. A. Moore (ed.) : *A Sourcebook in Indian Philosophy*, New Jersey, Princeton, 1967, পৃ· ২৩১

৮। পূর্বোক্ত।

৯। মাধবাচার্যঃ *সর্বদর্শন সংগ্রহ*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ· ৯

১০। সিরাজুল ইসলামঃ *Copula*, পূর্বোক্ত , পৃ· ৫৫

১১। কেশবমিশ্রঃ *তর্কভাষা*, দেবদত্ত রামকৃষ্ণ এবং পণ্ডিত কেদারনাথ সাহিত্য ভূষণ সম্পাদিত, ১ম সংস্করণ, বোম্বে, সংস্কৃত ও প্রাকৃত সিরিজ সংখ্যা ৮৪, ১৯৩৭ ইং, পৃ· ৩২

১২। উদয়ঠাকুরঃ *ন্যায়বার্ত্তিক*, কলিকাতা, বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা, ১৮৮৭, ১·১·৪। প্রত্যক্ষ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, বাৎসায়নঃ *ন্যায়ভাষ্য*, ১ম খণ্ড, অনুবাদ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফনিভূষণ তর্কবাগীশ, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, পৃ· ১১৪-১৩৩

১৩। C. D. Bijalwan: *Indian Theory of Knowledge*, New Delhi, Heritage Publishers, 1977, পৃ· ৬৭

১৪। পূর্বোক্ত, পৃ· ৬৮

১৫। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, সিরাজুল ইসলামঃ *Copula*, June, 1985, পূর্বোক্ত, পৃ· ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

১৬। রাসেল বলেছেন Spontaneously and without conscious thougth we interpret what we see and hear and fill it out with customary adjuncts. *Human Knowledge: It's Scope and Limit*, New York, Simson & Schuoster, 1948, পৃ· ১৬৭

১৭। C. D. Bijalwan: *Indian Theory of Knowledge*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১১৪

১৮। পূর্বোক্ত

১৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোক্ত, পৃ· ৯৬ এবং D. M. Datta: *The Six Ways of Knowing*, Calcutta: University of Calcutta, 1972, পৃ· ৩৯–৪০

২০। ভারতীয় দর্শনে ইন্দ্রিয় দুই প্রকার। কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়। কর্মেন্দ্রিয় পাঁচ প্রকারঃ হাত, পা, পায়ু, উপাস্থ (যৌনইন্দ্রিয়) এবং বাক। যেসব ভারতীয় দার্শনিক কর্মেন্দ্রিয়কে স্বীকার করেন তাঁদের যুক্তি হল, এসব ইন্দ্রিয়েরও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মত স্বতন্ত্র কাজ আছে। কিন্তু কোন কোন ভারতীয় চিন্তাবিদ কর্মেন্দ্রিয়কে আলাদা ইন্দ্রিয় বলতে রাজী নন। তাঁদের যুক্তি হল এসব ইন্দ্রিয়ের স্বতন্ত্র কাজ নাই। কারণ আংশিকভাবে হলেও এসব ইন্দ্রিয়ের একটির কাজ অন্যটি দ্বারা সাধিত হয়। যেমন, পা না থাকলে গড়িয়ে চলা যায়, পাখিরা মুখ দিয়ে খাবার সংগ্রহ করে। এছাড়া, এসব অঙ্গকে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে গণ্য করলে ঠোঁট, বুক, কাধ এগুলোকেও কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে গণ্য করতে হয়। কারণ, এদেরও প্রতিটির স্বতন্ত্র কাজ নির্ধারিত আছে, যদিও একটির কাজ অন্যটির দ্বারা কিছুটা হলেও সাধিত হয়। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলোর ক্ষেত্রে কোন বিকল্প ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তাই এসব দার্শনিকদের মতে, যথার্থ অর্থে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলোই ইন্দ্রিয় পদবাচ্য।

২১। সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদ২হঙ্কারাৎ।
ভূতাদেস্তন্মাত্রঃসঃতামসস্তেজসাদুর্ভয়ম্।।
ঈশ্বরকৃষ্ণঃ *সাংখ্যকারিকা* (২৫) (অনূদিত,), স্বামী দিবাকরানন্দ, কলিকাতা, মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১৯৮২, পৃ·৭৬

২২। ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বকশ্রোত্রানীন্দ্রিয়ানিভূতেব্যঃ।
গৌতমঃ *ন্যায়সূত্র*, কলিকাতা, জীবানন্দ, ১৯১৯, ১,১,১২

২৩। বৌদ্ধ দর্শন অনুসারে মানুষের সত্তা পাঁচ প্রকারের উপাদান নিয়ে গঠিতঃ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা,সংস্কার ও বিজ্ঞান। পরিবর্তনশীল ও মূর্ত বৈশিষ্ট্যের জন্য দেহকে রূপস্কন্ধ এবং মনন লক্ষণের জন্য অন্য চারটিকে মন বা নামস্কন্ধ বলা হয়। এ উভয়ইঅনিত্য।

২৪। পুদ্‌গল শব্দটি দ্বারা জৈন দর্শনে জড়বস্তুর মূল উপাদান জড় পরমাণুকে বুঝায়। জৈনদের মতে জড় পরমাণু নিত্য ও অনন্ত। তবে এর আকার পরিবর্তিত হয়। বৌদ্ধ দর্শনে একথা বলা হয়েছে যে, পুদ্‌গল তত্ত্বে বিশ্বাস করার অর্থ হল আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাসকরা।

২৫। তুলনীয়ঃ প্রথম অধ্যায়, ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যা

২৬। তুলনীয়ঃ প্রথম অধ্যায় , ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার পাদটীকা নং ২১,

২৭। J. N.Sinha: *History*, Vol.1, পূর্বোক্ত, পৃ· ২৩৬

২৮। M. Hiriyanna: *Indian Philosophy*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৮৯

২৯। C. D. Sharma: *A Critical Survey of Indian Philosophy*, Delhi, Motilal Banarsidass, 1987, পৃ. ৮২, ১৪২

৩০। পূর্বোক্ত,পৃ. ৪৩। এবং মাধবাচার্যঃ *সর্বদর্শন সংগ্রহ*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ· ৬

৩১। অথ তৎপূর্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ববচ্ছেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ।
গৌতমঃ *ন্যায়সূত্র*, পূর্বোক্ত , ১, ১, ৫

৩২। S. Radhakrishnan (ed.): *History*, Vol . 1, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৩৪

৩৩। জয়ন্তভট্টঃ *ন্যায়মঞ্জরী*, মহামহোপাধ্যায় গঙ্গা শাস্ত্রী তৈলঙ্গ সম্পাদিত, ৩য় খণ্ড, ২য় অংশ, বেনারস, ই, জে , লাজারুস এণ্ড কোং, ১৮৯৫, পৃ· ১৯৯

৩৪। J. N. Sinha, *History*. Vol. 1, পূর্বোক্ত, পৃ· ২৩৬

৩৫। জয়ন্তভট্টঃ *ন্যায়মঞ্জরী*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১১৯

Dhaka University Institutional Repository

৩৬। S. Radhakrishnan & Moore (ed.): *Sourcebook.* পূর্বোক্ত, পৃ· ২৩১

৩৭। J. N. Sinha: *History*, Vol. I, পূর্বোক্ত, পৃ· ২৩৬-২৩৭

৩৮। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ঃ *ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৫৪

৩৯। J. N. Sinha: *History*, Vol. I, পূর্বোক্ত, পৃ· ২৩ এবং বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুনঃ মাধবাচার্যঃ *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৬-৯

৪০। ভূয়োদর্শনগম্যা২পি ন ব্যাপ্তিরবকল্পতে।
সহস্রশো২পি দৃষ্টৈব্যভিচারাবধারণাৎ।।
জয়ন্তভট্টঃ *ন্যায়মঞ্জরী*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৯

৪১। ভূয়োদৃষ্টা চ ধূমো ধূ২গ্নিসহচারীতি গম্যতাম্।
অনগ্নৌ তু স নাস্তীতি ন তি ভূয়োদর্শনাদ্গতিঃ।।
পূর্বোক্ত

৪২। মাধবাচার্যঃ *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ· ১২

৪৩। সি, ডি, শর্মা, প্রমুখ

৪৪। C. D. Sharma, *Indian Philosophy*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৪৩

৪৫। পূর্বোক্ত

৪৬। পুরন্দরঃ আহ-লোকপ্রসিদ্ধমনুমানং চার্বাকৈরপীষ্যত এব।
যৎ তু কৈশ্চিল্লৌকিকং মার্গমতিক্রম্য অনুমানমুচ্যতে তন্নিষিধ্যতে।।
কমলশীলঃ *তত্ত্বসংগ্রহ পঞ্জিকা*, বরোদা, গায়কোয়াড ওরিয়েন্টাল সিরিজ, ১৮৮৩, পৃ· ৪৩১

৪৭। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ঃ *ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে*, পূর্বোক্ত, পৃ·৬৩-৬৪

৪৮। পূর্বোক্ত, পৃ· ৬৪

৪৯। পূর্বোক্ত, পৃ· ৬১

৫০। পূর্বোক্ত, পৃ, ৮৮

৫১। J. N. Sinha: *Introduction to Indian Philosophy*, Calcutta, Sinha Publishiing House, 1970, পৃ· ১৮। তুলনীয়, Cowell and Gough (Tr.): *Sarva Darsan Samgraha*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৯

৫২। M. Hiriyanna: *The Essentials of Indian Philosophy*, London, George Allen & Unwin Ltd., 1969, পৃ· ৫৭-৫৮

৫৩। সিরাজুল ইসলাম, *Copula*, June 1985, পূর্বোক্ত, পৃ· ৫২

৫৪। B. Russell: *An Outline of Philosophy*, London, Unwin Paperbacks, 1983, পৃ· ১১, অনূদিত, আবদুল মতীনঃ *দর্শনের রূপরেখা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮১, পৃ· ১৭-১৮

৫৫। B. Russell, *The Problems of Philosophy*, Oxford, Oxford University Press Paperbacks, 1973, পৃ· ৩৮

৫৬। William Whewell : *Philosophy of the Inductive Sciences Founded upon Their History*, London, J. W. Parker & Son, 1840, পৃ· ৫৯-৬১, উদ্বৃত, R. M. Chisholm: *Theory of Knowledge*, 2nd ed. New Jersey, Prentice Hall, 1977. অনূদিত, মোঃ আবদুর রশীদঃ *জ্ঞানবিদ্যা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন, ১৯৮৯, পৃ· ৫০

৫৭। দ্রষ্টব্য, পূর্বোক্ত, অনুবাদ, পৃ· ৪৯-৫১

৫৮। সিরাজুল ইসলাম, *Copula*, June 1985, পূর্বোক্ত, পৃ· ৫৬

৫৯। C. D. Sharma: *Indian Philosophy*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৪৩

৬০। শ্রী সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ঃ *ভারতীয় ও পাশ্চত্য দর্শন*, কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩, পৃ· ২৬

৬১। B. Russell: *An Outline of Philosophy*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১১, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৮

Dhaka University Institutional Repository

৬২। তদপ্রামাণ্যমনৃত-ব্যাঘাত-পুনরুক্ত-দোষেভ্যঃ।
গৌতমঃ *ন্যায়সূত্র*, কলিকাতা, জীবানন্দ, ১৯১৬, ২·১·৫৭, তুলনীয়, Cowell and Gough (Tr.) : *Sarva Darsana Samgraha*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১০

৬৩। এবঞ্চাসংবাদবিসংবাদাভ্যামপ্রমাণত্ববেদঃ।
জয়ন্তভট্টঃ *ন্যায়মঞ্জরী*, পূর্বোক্ত, পৃ· ২৭৩

৬৪। বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্মিতা।
মাধবাচার্যঃ *সর্বদর্শন সংগ্রহ*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৩

৬৫। পূর্বোক্ত, পৃ· ৫

৬৬। Azizun Nahar Islam: *The Nature of Self, Suffering and Salvation*, Allahabad, Vohra Publishers and Distributors,1987, পৃ· ১

৬৭। পূর্বোক্ত, পৃ· ২

৬৮। *বৃহদারণ্যকোপনিষদ*, ১,৪,১ অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রমুখ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিতঃ *উপনিষদ*, অখণ্ড সংস্করণ, কলিকাতা, হরফ প্রকাশনী, অক্টোবর, ১৯৮০

৬৯। এ সাতটি হল আজীব, আসব, বন্ধ, সম্বর, নির্জরা, মোক্ষ ও আত্মা।

৭০। C. D. Bijalwan : *Indian Theory of Knowledge*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৯৮ এবং D. M. Datta: *The Six Ways of Knowing*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৪৭

৭১। Cowell and Gough (Tr.): *Sarva Darsana Samgraha*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৫

৭২। S. Radhakrishnan(ed.): *History*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৩৫

৭৩। পূর্বোক্ত এবং মাধবাচার্যঃ *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২

৭৪। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, সিরাজুল ইসলামঃ *Copula*, পূর্বোক্ত, June, 1985, পৃ· ৫২

৭৫। মাধবাচার্যঃ *সর্বদর্শন সংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৭

৭৬। *বৃহদারণ্যকোপনিষদ*, ২· ৪· ১২ এবং ৪, ৫, ১৩, পূর্বোক্ত, পৃ· ৭৩৪ ও ৮২২

৭৭। বাল্মীকিঃ *রামায়ণ*, (অনু·) মন্মথনাথ দত্ত, কলিকাতা, ১৮৯৩, ২· ১০৮· ৩ এবং মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৮,২২-৩৬ ও ৩৯, ৩-১১

৭৮। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ঃ *লোকায়ত দর্শন*, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, পৌষ, ১৩৭৫, পৃ· ৫২, পাদটিকা-৮১। এবং *রামায়ণ*, অযোধ্যাখণ্ড১০৯·৩৮-৩৯

৭৯। কমলশীলঃ *তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৫২৫-৫২৬

৮০। মাধবাচার্যঃ *সর্বদর্শন সংগ্রহ*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ· ৩ এবং Maxmuller F. (ed.): *Sacred Books of the East*. (Jaina Sutras), Part. 11, 1.1.12.

৮১। J. N. Sinha: *History*, Vol. 1, পূর্বোক্ত, পৃ· ২৪৫

৮২। J. N. Sinha: *Introduction to Indian Philosophy*, পূর্বোক্ত, পৃ· ২১৬

৮৩। V. G. Afanasyev: *Marxist Philosophy*, Moscow, Progress Publishers, 1980, পৃ· ৫৭, ৫৯

৮৪। শরীফ হারুন (অনু·)ঃ *দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ পরিচিতি*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ· ৩১

৮৫। Karl Marx: *Selected Works*, Vol. 1, Moscow, Progress Publishers, 1946, পৃ· ৩৯৭, ৪৩৫

৮৬। পূর্বোক্ত, Vol. XI, পৃ· ২০৮, ২১৪

৮৭। প্রাণচেষ্টাচৈতন্যস্মৃত্যাদয়শ্চ আত্মধর্মত্বেন অভিমতাঃ আত্মবাদিনাং। ভে২পি অন্তরেব দেহে উপলভ্যমানা বহিশ্চানুপলভ্যমানাঃ। দেহধর্মা এব ভবিতুমরহন্তি। (ব্রহ্ম সূত্রের শঙ্করভাষ্য, ৩, ৩, ৫৩) স্বামী বিশ্বরূপানন্দ (অনূদিত)ঃ *বেদান্ত দর্শন*, কলিকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮৯, পৃ· ৫১০

৮৮। শরীরবিকারহেতুত্বাচ্চ তেষাংশরীরগুণত্বম।
শালিকানাথঃ *প্রকরণ পঞ্জিকা*, পণ্ডিত মুকুন্দশাস্ত্রী (সম্পা), বেনারস, চৌখম্ব সংস্কৃত সিরিজ, ১৯০৩, পৃ· ১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

৮৯। শরীরাণাম আরম্ভ নিবৃত্তিদর্শনাদ্ ইচ্ছাদ্বেষজ্ঞানাইর যোগাইতি চৈতন্যম্।
গৌতমঃ *ন্যায়সূত্র*, কলিকাতা, জীবনান্দ, ১৯১৯, ৩· ২· ৩৭

৯০। শান্তরক্ষিতঃ *তত্ত্বসংগ্রহ*, ১ম খণ্ড, বরোদা, সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, ১৯২৬, ১৮৬৪
এবং বাল্মীকিঃ *রামায়ণ*, পূর্বোক্ত, ২·১০৮·১০

৯১। চৈতন্য বিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষঃ। দেহ এব চেতনশ্চাত্মা।
স্বামী বিশ্বরূপানন্দ (অনূদিত)ঃ *বেদান্তদর্শন*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৫০৯

৯২। Gilbert Ryle: *The Concept of Mind*, London, Hutchinson & Co. Publishers Ltd., 1949, 'Self Knowledge' অধ্যায়

৯৩। মুহাম্মদ জহরুল হকঃ "গিলবার্ট রাইল ও দেকর্তের দ্বৈতবাদ", *Proceedings of the Second General Conference of the Bangladesh Darsan Samiti*, Dhaka, Bangladesh Philosophical Association, 1977, পৃ· ৫৭

৯৪। আহম্মদ শরীফঃ *বাঙ্গালীর চিত্তাচেতনার বিবর্তনধারা*, ঢাকা, ইউনিভারসিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৭, পৃ· ৩৫

৯৫। F. Thilly: *A History of Philosophy*, Allahabad, Central Book Depot. 1978, পৃ· ১২৬-১২৭

৯৬। লিউক্রিটাস তাঁর *On the Nature of Things* (Book 111) গ্রন্থে একথা বলেছেন। উদ্বৃত, পূর্বোক্ত, পৃ· ১২৭।

৯৭। S. Radhakrishnan (ed.): *History*, Vol.1, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৩৪

৯৮। পূর্বোক্ত

৯৯। সিরাজুল ইসলামঃ *Copula*, June, 1985, পূর্বোক্ত, পৃ· ৫৭

১০০। পূর্বোক্ত

১০১। B. Russell: *An Outline*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৯০, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৪৫

১০২। পূর্বোক্ত, পৃ· ৯১, অনুবাদ, পূর্বোক্ত , পৃ· ১৪৬

১০৩। পূর্বোক্ত, পৃ· ১১৪, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৮২

১০৪। পূর্বোক্ত, পৃ· ১২৭, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৮৬

১০৫। সিরাজুল ইসলাম, *Copula*, June, 1985, পূর্বোক্ত, পৃ· ৫৮

১০৬। জয়ন্তভট্টঃ *ন্যায়মঞ্জরী*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১২২

১০৭। B. Russell: *An Outline*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৯০, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৪৫

১০৮। David Hume: *A Treatise of Human Nature*, London, Everyman's Library, 1968, পৃ· ৮১

১০৯। শান্তরক্ষিতঃ *তত্ত্বসংগ্রহ*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, ১৮৬১। উদ্বৃত, পূর্বোক্ত, পৃ· ২৪৬

১১০। পূর্বোক্ত, ১৮৬৮, উদ্বৃত, পূর্বোক্ত, পৃ· ২৪৬

১১১। মাধবাচার্যঃ *সর্বদর্শন সংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৩

১১২। পূর্বোক্ত, পৃ· ১৩

১১৩। রমেন্দ্রনাথ ঘোষঃ *ভারতীয় দর্শন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ· ১৩

১১৪। গণপতি শাস্ত্রী সম্পাদিতঃ *সর্বমতসংগ্রহ*, অনন্তসায়ন সংস্কৃত গ্রন্থসংখ্যা ২, ১৯১৮, পৃ· ১৫। উদ্বৃত, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ঃ *লোকায়তদর্শন*, পূর্বোক্ত, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৌষ ১৩৭৫, পৃ· ৮৯। অবশ্য এখানে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সর্বমত সংগ্রহের এ মতকে সমর্থন করার যথেষ্ঠ যুক্তি খুঁজে পান নি।

১১৫। তবে বাৎসায়ন উচ্চতম ও নিম্নতম অর্থাৎ বৌদ্ধিক ও ইন্দ্রিয়জাত সুখের মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন। তিনি সম্পদ, সুখ ও ধর্মের সমন্বয়কে পরম উদ্দেশ্য বলেছেন। চার্বাকগণ এথেকে ধর্মকে বাদ দিয়েছেন।

১১৬। Cowell and Gwugh (Tr.) : *Sarva Darsana Samgraha*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১০ এবং হরিভদ্রসূরীঃ *ষড়দর্শন সমুচ্চয়*, বেনারস, চৌখম্ব সংস্কৃত সিরিজ, নং ৯৫, পৃ· ৮২

১১৭। গুণরত্নসূরীঃ *তর্করহস্যদীপিকা*, কলিকাতা, বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা, ১৯১৪, পৃ· ৩০২

১১৮। S. Radhakrishnan (ed.): *History*, Vol. 1, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৩৭

১১৯। রাসবিহারী দত্ত, *ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ খণ্ডন*, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯, পৃ· ২০২

১২০। সিরাজুল ইসলামঃ *Copula*, June, 1986, পূর্বোক্ত, পৃ· ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

১২১। মাধবাচার্যঃ *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ· ৪

১২২। S. Radhakrishnan, *History*, Vol. 1, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৩৮

১২৩। সিরাজুল ইসলাম, *Copula*, June, 1986, পূর্বোক্ত, পৃ· ৫৫

১২৪। দেবীপ্রসাদচট্টোপাধ্যায়ঃ *ভারতেবস্তুবাদ*, পূর্বোক্ত, পৃ· ২২

১২৫। উদ্বৃত, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৪

১২৬। সাইয়েদ আবদুল হাইঃ *দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা কোষ*, ২য় খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬, পৃ· ৫২৩

১২৭। সরদার ফজলুল করিমঃ *দর্শনকোষ*, ১ম সংস্করণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩, পৃ· ২৯০

১২৮। *ভগবদ্‌গীতা*, ১৬ঃ ৮, *মহাভারত*, ১৪১৪, ১৪৩০–৪২, এবং ৩৬১৯, *বিষ্ণুপুরাণ*, ৩ঃ১৮, ১৪–২৬, *মনুসংহিতা*, ২ঃ১১৫, এবং ৩ঃ১৫০, ১৬ এবং ৫ঃ৮৯ এবং ৮ঃ২২, ৩০৯ এবং ৯ঃ৬৫, ৬৬, এবং ১২ঃ৩৩, ৯৫, ৯৬

১২৯। *বিষ্ণুপুরাণ*, ১ঃ৬, ২৯–৩১

১৩০। S. Radhakrishnan (ed.) : *History*, Vol. পূর্বোক্ত, পৃ· ১৩৩

১৩১। পূর্বোক্ত

১৩২। আহমদ শরীফঃ *বাঙ্গালীর চিন্তাচেতনার*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৩৪

১৩৩। S. Radhakrishnan (ed.) : *History*, Vol.1, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৩৩

১৩৪। পূর্বোক্ত, পৃ· ১৩৫

১৩৫। M. Hiriyanna: *Indian Philosophy*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৯১

১৩৬। S. Radhakrishnan (ed.): *History*, Vol.1, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৩৩

১৩৭। সাইয়েদ আবদুল হাইঃ *দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা কোষ*, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ·৫১৮

১৩৮। I. Frolov (ed.): *Dictionary of Philosophy*, Moscow, Progress Publishers, 1984, পৃ· ২৮৭

১৩৯। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ঃ *ভারতে বস্তুবাদ*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৩২–১৩৩। অবশ্য এখানে মাধবাচার্য আকস্মিকতাবাদকে অস্বীকার করেছেন।

১৪০। J. N. Sinha: *History*, Vol.1, পূর্বোক্ত, পৃ· ২৩৩–৩৪

১৪১। উদ্বৃতঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ঃ *ভারতে বস্তুবাদ*, পূর্বোক্ত, পৃ·১৩৭–১৩৮

১৪২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯

১৪৩। নত্বতদৃষ্টানিষ্টো জগদ্‌বৈচিত্র্যমাকস্মিকং স্যাদিতি চেৎ–ন তদ্‌ভদ্রম্। স্বভাবাদেব তদুপপতেঃ। মাধবাচার্যঃ *সর্বদর্শন সংগ্রহ*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৬। উল্লেখ্য, এখানে মাধবাচার্য স্বভাববাদকে স্বীকার করতে গিয়ে আকস্মিকতাকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর মতানুসরণ করে আমরা এখানে চার্বাকদের মতবাদে স্বভাববাদ ও আকস্মিকতাবাদ উভয়ের ইঙ্গিত খুঁজে পেয়েছি। দ্রষ্টব্যঃ চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা ও আকস্মিকতাবাদ।

১৪৪। মাধবাচার্যঃ *সর্বদর্শন সংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১১৩

১৪৫। উদ্ধৃত, দেবীপ্রসাদঃ *ভারতেবস্তুবাদ*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৩৬

১৪৬। উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত

১৪৭। পূর্বোক্ত

১৪৮। সিরাজুল ইসলাম, *Copula*, June, 1986, পূর্বোক্ত, পৃ· ৪৮

১৪৯। উদ্ধৃত, J. N. Sinha: *History*, Vol. 1. পূর্বোক্ত, পৃ· ২৩৩

১৫০। গৌতমঃ *ন্যায়সূত্র*, পূর্বোক্ত, ৪· ১· ২২ উদ্ধৃত, J. N. Sinha: *History*, Vol.1, পৃ· ২৩৩

১৫১। J. N. Sinha: *History*, Vol.1, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৩৩

১৫২। পূর্বোক্ত

১৫৩। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ঃ *ভারতে বস্তুবাদ*, পূর্বোক্ত, পৃ·১৩১–৪৩

১৫৪। দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীঃ *চার্বাক দর্শন*, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮২, পৃ, ১১২–১১৪

১৫৫। লতিকা চট্টোপাধ্যায়ঃ *চার্বাক দর্শন*, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স, প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৪, পৃ· ১

১৫৬। পূর্বোক্ত, পৃ· ৪৪

১৫৭। পূর্বোক্ত, পৃ· ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

১৫৮। S. Radhakrishnan: *Indian Philosophy*, Vol. 1, পূর্বোক্ত, পৃ· ৩৫৩

১৫৯। M. Winternitz: *A History of Indian Literatures*, Vol.1. 2nd ed. New Delhi, Oriental Books Reprint Corporation, 1972, পৃ· ২৬৬

১৬০। দেবীপ্রসাদচট্টোপাধ্যায়ঃ *ভারতেবস্তুবাদ*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৩

১৬১। S. Radhakrishnan (ed.): *History of Philosophy: Eastern and Western*, Vol.1, London, George Allen and Unwin Ltd., 1967, পৃ· ১৩৩

১৬২। কো, আন্তোনভা, গ্রি, বোন্‌গার্দ-লেভিন, প্রমুখঃ *ভারতেরইতিহাস*, মস্কো, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৬, পৃ· ৬৯

১৬৩। বাল্মীকিঃ *রামায়ণ*, অযোধ্যাকাণ্ড, মাদ্রাজ, রামরত্নম প্রকাশিত সংস্করণ, ১৯৫৮, ১০০ঃ ৩৮

১৬৪। Jawaharlal Nehru: *The Discovery of India*, পূর্বোক্ত পৃ·৯৯

১৬৫। সিরাজুল ইসলামঃ *Copula*, June, 1986, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৩ তুলনীয়ঃ S. Radhakrishnan (ed.): *History*, পূর্বোক্ত, পৃ·১৩৩

১৬৬। দ্রষ্টব্যঃ সুকুমারী ভট্টাচার্যঃ *ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য*, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১, পৃ·২৯-৩০

১৬৭। রাসবিহারী দত্তঃ *ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ খণ্ডন*, পূর্বোক্ত, পৃ· ২০৫

১৬৮। কো, আন্তোন ভা· প্রমুখঃ *ভারতবর্ষেরইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৫৫, ৫৬ #

১৬৯। সিরাজুল ইসলামঃ *Copula*, June, 1986, পূর্বোক্ত, পৃ· ৬৪- ৬৫

১৭০। পূর্বোক্ত

১৭১। দেবীপ্রসাদচট্টোপাধ্যায়ঃ *ভারতেবস্তুবাদ*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৩১

১৭২। সিরাজুল ইসলামঃ *Copula*, June, 1986, পূর্বোক্ত, পৃ· ৬৫- ৬৭

১৭৩। রাসবিহারী দত্তঃ *ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ খণ্ডন*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৯৬

১৭৪। দেবীপ্রসাদচট্টোপাধ্যায়ঃ *লোকায়ত দর্শন*, ১ম খণ্ড, পৃ· ৭৯

১৭৫। উপনিষদে উদ্দালক-বিরোচন সংবাদে, মীমাংসা প্রভাকর ও কুমারিল মতে, আদি বৌদ্ধদর্শনে, জৈন, বৈশেষিক, ন্যায় ও সাংখ্যদর্শনে ভাববাদ বিরোধী মতের জন্য রাসবিহারী দত্তঃ *ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ খণ্ডন*, পূর্বোক্ত, চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৭৬। মাধবাচার্যঃ *সর্বদর্শন সংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৪

১৭৭। রাসবিহারী দত্তঃ *ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ খণ্ডন*, পূর্বোক্ত, পৃ· ২০০

১৭৮। দেবীপ্রসাদচট্টোপাধ্যায়ঃ *ভারতেবস্তুবাদ*, পূর্বোক্ত, ৩য় পরিচ্ছেদ, দ্রষ্টব্য

১৭৯। পূর্বোক্ত, পৃ·১৩০-১৩১

১৮০। অধ্যক্ষ কবিরাজ শ্রীনিকেতন চক্রবর্তীঃ *আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ইতিহাস*, ঢাকা, আয়ুর্বেদ নিকেতন, ২৭/৮ উমেশদত্ত রোড, বক্‌শীবাজার, ১৯৯০, পৃ· ১৮

১৮১। দুলাল ভৌমিক (অনূদিত)ঃ *শতপথ ব্রাহ্মণঃ শুক্ল যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিন শাখা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯০, পৃ· ১৫

১৮২। পূর্বোক্ত, পৃ· ২৪

১৮৩। Profulla Chandra Roy: *History of Hindu Chemistry*, 2 Vols.1909, 3 & 1909. তুলনীয়ঃ দেবীপ্রসাদচট্টোপাধ্যায়ঃ *ভারতেবস্তুবাদ*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৫৬, ১৫৯ ও ১৬২

১৮৪। দেবীপ্রসাদচট্টোপাধ্যায়ঃ *ভারতে বস্তুবাদ*, পূর্বোক্ত, পৃ·১২৫-১২৬

১৮৫। উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৬৯

১৮৬। ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত কলিকাতা মেডিকেল কলেজের হিন্দু ছাত্ররা ধর্মীয় সংস্কার বিরুদ্ধ বলে শবব্যবচ্ছেদ শেখার জন্য লাশকাটা ঘরে প্রবেশ করত না।

১৮৭। *সুশ্রুতসংহিতা* (৩/১/১৭), উদ্ধৃত, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ঃ *ভারতেবস্তুবাদ*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৬৯ #

১৮৮। পূর্বোক্ত, পৃ· ১২১

১৮৯। দেবীপ্রসাদচট্টোপাধ্যায়ঃ *লোকায়তদর্শন*, অখণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ· ৬৪ #

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা

পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। প্রথম অধ্যায়ে ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার সময় একথা বলা হয়েছে যে, ভারতীয় দর্শনের নয়টি দার্শনিক সম্প্রদায়ই জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন যা পাশ্চাত্য দর্শনে দেখা যায় না। বরং বলা যায়, পাশ্চাত্য দর্শনের জ্ঞানবিদ্যাগত আলোচনা প্রাচীন ও মধ্যযুগের চেয়ে আধুনিক যুগে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে। সম্ভবত একারণেই ৬০০ খ্রিঃ পূঃ অব্দের গ্রীক দার্শনিক থেলিসের হাতে পাশ্চাত্য দর্শনের জন্ম হলেও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে প্রথম জ্ঞানবিদ্যাগত প্রশ্ন উথাপনের জন্য একশত বছর, অর্থাৎ সোফিষ্টদের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। প্রাক-সোফিষ্ট যুগের দার্শনিক আলোচনা ছিল মূলত বিশ্বতাত্ত্বিক। প্রাক-সোফিষ্ট দার্শনিকগণ জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা না করেই এটা ধরে নিয়েছিলেন যে, মানুষ বিশ্ব প্রকৃতিকে জানতে পারে। তাঁরা জ্ঞানের সম্ভাব্যতার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। এজন্য হিরাক্লিটাস ও পারমেনাইডিস প্রমুখ দার্শনিক জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা না করেই যথাক্রমে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করে বিচারবিযুক্তভাবে তাঁদের দার্শনিক মত প্রকাশ করেন। ৫০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে সোফিষ্টগণই প্রথম জ্ঞানের সম্ভাব্যতার ব্যাপারে সন্দেহের সূচনা করেন। তাঁরাই প্রথম এ প্রশ্ন তোলেন যে, আমরা প্রকৃতি সম্পর্কে যে জ্ঞান পাই তার কতটুকু ব্যক্তি নিরপেক্ষ ও কতটুকু আমাদের মনের ধারণা।১ অবশ্য পাশ্চাত্য দর্শনে যথার্থ অর্থে জ্ঞানবিদ্যার প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয় প্লেটোরহাতে।[২] কারণ, তিনিই প্রথম জ্ঞানবিদ্যার মূল প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। সুতরাং বলা যায়, জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় ভারতীয় দর্শনে পাশ্চাত্য দর্শনের চেয়ে বেশী মনোযোগ দেয়া হয়েছে।

পাশ্চাত্য দার্শনিকদের চেয়ে ভারতীয় দার্শনিকদের জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার প্রতি অধিকতর মনোযোগের কারণ হিসাবে যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্যভাবে কাজ করেছে বলে মনে হয় তা হল, প্রায় সকল ভারতীয় দার্শনিকই মানবজীবনকে দুঃখের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য মোক্ষ বা মুক্তিলাভের পথ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে দর্শন চর্চা করেছেন। তাই ভারতীয় প্রতিটি দার্শনিক সম্প্রদায় তাঁদের দার্শনিক মতকে নিজের জীবনে অনুশীলনও করেছেন। একথাও বলা যায় যে, প্রায় সবক'টি দার্শনিক মতই তাঁদের অনুসারী দার্শনিকদের ধর্মীয় মতের সাথে প্রায় অভিন্ন হয়ে গেছে। ভারতীয় দর্শনের প্রায় সবগুলো দার্শনিক গোষ্ঠীই এ ব্যাপারে একমত যে, অজ্ঞানতাই হল দুঃখ বা বন্ধনের কারণ। এই অজ্ঞানতার হাত থেকে মুক্তির জন্য সকলেই যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায় তথা প্রমাণতত্ত্বের আলোচনাকে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এক কথায়, ভারতীয় দর্শনকে প্রধানত জীবন দর্শন হিসাবে অভিহিত করে একথা বলা যায় যে, জীবন সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের লক্ষ্যে জ্ঞানবিদ্যার তথা প্রমাণতত্ত্বের আলোচনা এ দর্শনে একটি অপরিহার্য বিষয় হিসাবে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনের উদ্ভবের পেছনে জীবন সমস্যার সমাধানের চেয়ে বিশ্ব প্রকৃতিকে জানার প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আগ্রহই বেশী কাজ করেছে। তাই এক অর্থে বলা চলে বিশ্বতাত্ত্বিক প্রশ্ন থেকেই পাশ্চাত্য দর্শনের জন্ম। সুতরাং ভারতীয় দর্শনের মত প্রধানত জীবন সমস্যার সমাধান লক্ষ্যে নয় বরং মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞানস্পৃহার পরিতৃপ্তি লাভের উদ্দেশ্যেই পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার সূত্রপাত। তাই ভারতীয় দর্শনের মত পাশ্চাত্য দার্শনিকদের সকলেই জ্ঞানবিদ্যার আলোচনাকে সাধারণ বা আবশ্যিক বিষয় হিসাবে প্রাধান্য দিয়ে গ্রহণ করেন নি। বরং যে দার্শনিক তাঁর যুগ ও কালের প্রেক্ষিতে যে বিষয়ের আলোচনায় আগ্রহী ছিলেন সে বিষয়টিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রাক-সোফিষ্ট যুগে পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানবিদ্যাগত প্রশ্নের উৎপত্তি না হওয়ার মূলে এ বিষয়টিই একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে কাজ করেছে বলে মনে হয়।

সোফিষ্ট পরবর্তী প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনেক দার্শনিক জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকলেও আধুনিক যুগে এসেই পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা সবিশেষ গুরুত্ব পায় এবং আধুনিক দর্শন যথার্থ অর্থে জ্ঞানবিদ্যাকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। তবে, ভারতীয় দার্শনিকদের মত পাশ্চাত্য দর্শনের সকল দার্শনিক জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় মনোযোগ না দিলেও ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলোর ক্রমবিন্যাসের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটি দেখা যায় পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় সে সমস্যাটি অনুপস্থিত। কারণ, দর্শনের ইতিহাসে প্রাথমিক কাল থেকেই ইউরোপে একের পর এক দার্শনিকের আবির্ভাব হয়েছে এবং তাঁরা তাঁদের মতবাদ প্রচার করেছেন। এসব মতবাদকে কালের ক্রম অনুসারে সাজিয়ে একটি গোষ্ঠীর মতবাদ অন্য গোষ্ঠীকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে অথবা দার্শনিক চিন্তাধারায় এসব মতবাদ বিভিন্ন সময়ে সাধারণভাবে কি পরিবর্তন সাধন করেছে তা পর্যালোচনা করা সম্ভব। তাই এ অধ্যায়ের আলোচনায় আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ না করে পৃথক পদ্ধতি অনুসরণ করা হল। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাস দর্শনের একটি বিস্তৃত অধ্যায় হওয়ায় এখানে আলোচনার পরিসরকে সীমাবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে যে সব দার্শনিক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন সে সব প্রতিনিধিত্বকারী দার্শনিকদের মতবাদ আলোচনা করা হল। ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় যেমন প্রধানত প্রমাণতত্ত্বকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে তেমনি এ অধ্যায়েও প্রধানত জ্ঞানোৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদকে প্রাধান্য দিয়ে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের জ্ঞানবিদ্যা সংক্রান্ত মতবাদের আলোচনা করা হল। মূলত প্লেটো-এরিস্টটলের হাতে জ্ঞানবিদ্যার প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনার সূত্রপাত হলেও যেহেতু সোফিষ্ট দার্শনিকগণই প্রথম জ্ঞানবিদ্যাগত প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন সেহেতু সোফিষ্টদের জ্ঞানবিদ্যা দিয়েই পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার সূত্রপাত করা হল। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে হিউমের স্থান নির্ণয়ের লক্ষ্যেই এ অধ্যায়ের পরিকল্পনা। তাই প্রাচীন যুগের সোফিষ্টদের জ্ঞানবিদ্যা থেকে শুরু করে হিউম পূর্ববর্তী আধুনিক বৃটিশ দার্শনিক জর্জ বার্কলের জ্ঞানবিদ্যা পর্যন্ত প্রধান প্রধান দার্শনিকদের মতামত সম্পর্কে আলোচনার মধ্যেই এ অধ্যায়কে সীমাবদ্ধ রাখা হল। আলোচনার সুবিধার জন্য এ অধ্যায়কে ইতিহাসের ধারায় প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এ তিনটি যুগে বিভক্ত করে আলোচনা করা গেল।

৩.১ প্রাচীন যুগ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সোফিষ্টদের আগে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে জ্ঞানবিদ্যাসংক্রান্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নি। সোফিষ্টরাই প্রথম জ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে জ্ঞানবিদ্যাগত আলোচনার বীজ বপন করেন। তাই এখানে সোফিষ্টদের জ্ঞানবিদ্যা থেকে শুরু করে প্রাচীন যুগের প্রখ্যাত দার্শনিকবৃন্দ অর্থাৎ সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল এবং এরিস্টটল পরবর্তী জ্ঞানবিদ্যাগত ধারা সম্পর্কে আলোচনা করা গেল।

৩.১.১ সোফিষ্টদের জ্ঞানবিদ্যা

সোফিষ্টদের দর্শন ছিল মূলত সোফিষ্ট-পূর্ববর্তী দার্শনিকদের বিশ্বতাত্ত্বিক ও প্রকৃতিবাদী দর্শনের কূটাভাসমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ। গ্রীক প্রকৃতিবাদী দার্শনিকদের মতবৈচিত্রের কারণেই সোফিষ্টদের দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞানবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়।৩ তাঁরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মানুষের চিন্তাবৃত্তির সীমাবদ্ধতার কারণেই তাঁদের পূর্বসূরীগণ সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে একমত হতে পারেন নি। তাই, বিশ্বতাত্ত্বিক প্রশ্নের যথার্থ ও সর্বজনস্বীকৃত উত্তর খোঁজার আগে জ্ঞানবিদ্যাগত প্রশ্নের প্রতি নজর দেয়াকে তাঁরা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন।

সোফিষ্টদের মতে, জানার পদ্ধতির ক্ষেত্রে মানুষের মন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জ্ঞান, জ্ঞাতা নামক বিশেষ ব্যক্তির উপর নির্ভর করে এবং জ্ঞাতার কাছে যা সত্য বলে মনে হয় তাই সত্য। ব্যক্তিনিরপেক্ষ কোন সত্যের অস্তিত্বকে সোফিষ্টগণ অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে, সমস্ত জ্ঞানই ব্যক্তিসাপেক্ষ। জ্ঞানবিদ্যাগত এই দৃষ্টিভঙ্গি বিখ্যাত সোফিষ্ট দার্শনিক প্রোটাগোরাস (আনু: ৪৮০-৪১০ খ্রিঃপূঃ)এর প্রসিদ্ধ উক্তি – মানুষই সবকিছুর মাপকাঠি – এর মধ্যদিয়ে প্রকাশিত হয়। এতে সত্যতার সর্বজনীনতা অস্বীকৃত হয় এবং ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানোৎপত্তির একমাত্র উপায় হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। তবে, তিনি ব্যক্তি মানুষের সাধারণ জ্ঞানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, একজন পাণ্ডুগ্রস্থ রোগীর দৃষ্টির চেয়ে একজন স্বাভাবিক মানুষের দৃষ্টি বেশী নির্ভরযোগ্য। প্রোটাগোরাস এই জ্ঞানবিদ্যাগত ঘোষণার মাধ্যমে পূর্ববর্তী প্রকৃতিবাদী দার্শনিকদের মতবিরোধের সমাধান সম্ভব করে তোলেন। অর্থাৎ তাঁদের সকলের মতই সত্য। কারণ, সত্যতা ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়। তবে, কোন কোন দার্শনিকদের মত অন্যান্য দার্শনিকদের মতের চেয়ে বেশী স্বাভাবিক বলে তা বেশী নির্ভরযোগ্য।

প্রোটাগোরাসের পরবর্তী সোফিষ্ট দার্শনিক জর্জিয়াস প্রোটাগোরাসের জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদকে চরম রূপ দেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত তিনটি উক্তির মাধ্যমে নঞর্থক জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদের সূচনা করেন।৪ তাঁর এ উক্তি তিনটি হল, অস্তিত্বশীল বলে কোন কিছু নাই, এ ধরনের কিছু থেকে থাকলেও তাকে জানা যায় না, এবং জানা গেলেও এর জ্ঞান অন্যের মধ্যে সংক্রমন করা যায় না। জর্জিয়াসের এই মতের জন্যই সোফিষ্ট জ্ঞানতত্ত্বকে প্রধানত নঞর্থক ও সংশয়বাদী বলা হয়।

এককথায়, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে প্রাচীন যুগে সোফিষ্টরাই প্রথম জ্ঞানবিদ্যাগত প্রশ্নের সূচনা করেন এবং তাঁরা জ্ঞানের সর্বজনীনতা অস্বীকার করে ব্যক্তিসাপেক্ষ জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদ প্রচার করেন। জ্ঞান বলতে সোফিষ্টরা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষকেই বুঝে থাকেন এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার ভূমিকাকে অস্বীকার করেন।৫ ইন্দ্রিয়ানুভূতি যেহেতু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে স্বতন্ত্র সেহেতু বস্তুর যথার্থ স্বরূপ জানা যায় না এবং সর্বজনীন কোন জ্ঞান নাই। জ্ঞানমাত্রই আপেক্ষিক। সোফিষ্টদের এ মতবাদ অভিজ্ঞতাবাদ থেকে সংশয়বাদ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। সত্যতার মানদণ্ড হিসাবে সোফিষ্টরা প্রায়োগিক কার্যকারিতাকেই সমর্থন করেন। ব্যক্তি মানুষের সাধারণ জীবনে যে জ্ঞান ফলপ্রসূ তাই সত্য। তাঁদের এই সত্যতার মানদণ্ড বিশ শতকের প্রয়োগবাদীদের কথা স্বরণ করিয়ে দেয়।

সুতরাং দেখা যায়, সোফিষ্টগণ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে প্রথম জ্ঞানবিদ্যাগত প্রশ্নের উত্থাপন করেন এবং জ্ঞানকে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় নির্ভর আপেক্ষিক বিষয়ে পরিণত করে অভিজ্ঞতাবাদের বীজ বপন করেন। তবে সর্বজনীন জ্ঞানকে অস্বীকার এবং বস্তুর যথার্থ জ্ঞান অর্জনকে অসম্ভব হিসাবে ঘোষণা করায় সোফিষ্টদের জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদ নঞর্থক ধারার দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে, তাঁদের অভিজ্ঞতাবাদ ধ্বংসাত্মক বা নঞর্থক সংশয়বাদে রূপ নেয়। তবে, একথা বলা যায় যে, প্রাচীন যুগে সোফিষ্টগণ জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতাবাদী ধারার ভিত্তি স্থাপন করেন অধুনিক যুগের বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদী লক, বার্কলে, বিশেষত হিউমের জ্ঞানবিদ্যায়ও সে ধারার অনুরণন শোনা যায়। সোফিষ্টদের কাছে যে অভিজ্ঞতাবাদের ব্যাখ্যা ছিল অসম্পূর্ণ এবং যা ধ্বংসাত্মক সংশয়বাদের দিকে মোড় নিয়েছিল হিউমের হাতে সে অভিজ্ঞতাবাদই পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যাত হয় এবং ধ্বংসাত্মক সংশয়বাদ গঠনমূলক সংশয়বাদে রূপ নেয়।

৩.১.২ সক্রেটিসের জ্ঞানবিদ্যা

সোফিষ্টদের পরেই পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় প্রখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিস (৪৬৯–৩৯৯ খ্রিঃপূঃ) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। সক্রেটিস সোফিষ্টদের অভিজ্ঞতাবাদী এবং আপেক্ষিকতাবাদী জ্ঞানবিদ্যার বিরোধিতা করে জ্ঞানের জন্য প্রজ্ঞার ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে সর্বজনীন জ্ঞানবিদ্যাগত দৃষ্টিভঙ্গির গোড়াপত্তন করেন। মূলত সোফিষ্টদের জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই সক্রেটিসের জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদর সূচনা হয়।

সক্রেটিসের দর্শন মূলত নীতিতত্ত্বমূলক। সক্রেটিস মনে করতেন যে, মানুষের চরিত্রের উৎকর্ষ জ্ঞানের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই সক্রেটিসের নীতিতত্ত্ব তাঁর জ্ঞানবিদ্যার উপর নির্ভরশীল ছিল। তিনি তাঁর নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি হিসাবেই জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদ দিয়েছেন।

সোফিষ্টদের জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয়ীগততা ও আপেক্ষিকতাবাদ তাঁদের নীতিতত্ত্বকেও বিষয়ীগত ও আপেক্ষিকতাবাদে পরিণত করে এবং তাঁদের জ্ঞানবিদ্যাগত সংশয়বাদ নীতিবিদ্যাগত সংশয়বাদে রূপ নেয়। সোফিষ্টদের প্রচারিত ব্যক্তিসাপেক্ষ নৈতিকতার মানদণ্ড গ্রীক নগর রাষ্ট্র ও সর্বজনীন নৈতিকতার ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। ফলে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের পর্যায়ে নেমে যায়। সক্রেটিসের মূল সমস্যা ছিল গ্রীক নগর রাষ্ট্রের মানুষের নৈতিক চরিত্রকে উন্নত করার পথ নির্দেশ করা। তাই তিনি সর্বজনীন নৈতিক আদর্শের ভিত্তিরূপ সোফিষ্টদের ব্যক্তিসাপেক্ষ জ্ঞানবিদ্যাগত আদর্শের পরিবর্তে ব্যক্তিনিরপেক্ষ বা সর্বজনীন জ্ঞানবিদ্যাগত আদর্শের প্রচারে সচেষ্ট হন।

অভিজ্ঞতাবাদী সোফিষ্টগণ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষকেই একমাত্র জ্ঞানের যথার্থ উৎস হিসাবে অভিহিত করে সবকিছুকে বিষয়ীগত বলে মত প্রকাশ করেন। তাঁরা জগতের শুভ–অশুভ, ন্যায়–অন্যায় সবকিছুকে ব্যক্তি মানুষের সৃষ্টি বলে ঘোষণা করেন। এবং বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা নয় বরং সংবেদন, কামনা, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ ইত্যাদিকে মানুষের আসল রূপ হিসাবে অভিহিত করায় তাঁদের কাছে সবকিছু আপেক্ষিক বিষয়ে পরিণত হয়। সক্রেটিস এক্ষেত্রে সোফিষ্টদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি সম্প্রত্যয়কে জ্ঞানের উৎস হিসাবে স্বীকৃতি দেন। সম্প্রত্যয় বলতে তিনি মূলত সাধারণ ধারণাকে বুঝিয়েছেন। এই সাধারণ ধারণা বা সম্প্রত্যয় প্রজ্ঞার সাহায্যে গঠিত হয়। অভিজ্ঞতার সাহায্যে নয়। তাই তাঁর মতে, সার্বভৌম বা সার্বিক প্রজ্ঞাই জ্ঞানের যথার্থ উৎস। প্রজ্ঞার কল্যাণেই মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। সুতরাং প্রজ্ঞার সাহায্যেই জ্ঞানের প্রমাণ ও যথার্থতা যাচাই করতে হবে। তিনি সর্বজনীন জ্ঞানকেই সার্থক জ্ঞান বলে মনে করেন। এরূপ জ্ঞান ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্ন নয় বরং সর্বজনীন এবং সকল সংশয়ের উর্দ্ধে।

সোফিষ্টগণ যেখানে অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের উৎস হিসাবে আখ্যায়িত করেন এবং সার্বিক বা সর্বজনীন ও অপরিবর্তনীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য কোন জ্ঞানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে সংশয়বাদের প্রবর্তন করেন সক্রেটিস সেখানে সর্বজনস্বীকৃত অপরিবর্তনীয় সম্প্রত্যয়কে জ্ঞানের উৎস হিসাবে আখ্যায়িত করে বুদ্ধিবাদের প্রবর্তন করেন। এতে জ্ঞান সংশয়বাদের হাত থেকে রক্ষা পায়। সোফিষ্টদের জ্ঞানের ব্যক্তিসাপেক্ষ মানদণ্ড সক্রেটিসের হতে এসে ব্যক্তিনিরপেক্ষ মানদণ্ডে রূপলাভ করে। তৎকালীন এথেন্সের সামাজিক ও নৈতিক বিশৃঙ্খলা নিরসনের লক্ষ্যে সক্রেটিস সকলের জন্য একই রকম নৈতিক মানদণ্ড নির্মাণে আগ্রহী ছিলেন। মূলত ব্যবহারিক নৈতিকতার ব্যক্তিনিরপেক্ষ মানদণ্ড নির্মাণ ছিল তাঁর লক্ষ্য। এর উপায় হিসাবে তিনি জ্ঞানের ব্যক্তিনিরপেক্ষ মানদণ্ডের কথা বলেছেন। তাই তিনি জ্ঞানের খাতিরে জ্ঞান নয় বরং ন্যায় ও সুনীতি পরিচালিত যথার্থ জীবন যাপনের ব্যবহারিক প্রয়োজনেই জ্ঞানের অনুসন্ধান করেছেন এবং তাঁর ব্যবহারিক নীতিবিদ্যাকে জ্ঞানবিদ্যার উপর নির্ভরশীল করে জ্ঞানকে সদগুণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই জ্ঞান হল, তাঁর মতে, সর্বজনস্বীকৃত অপরিবর্তনীয় অপরিহার্য সার্বিক জ্ঞান।

Dhaka University Institutional Repository

এক কথায়, সক্রেটিস সোফিস্টদের অভিজ্ঞতাবাদ ও নঞর্থক সংশয়বাদী মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ করে জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার ভূমিকাকে প্রাধান্য দিয়ে একটি নতুন ধারা তথা বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদী ধারার প্রবর্তন করেন। এর ফলে সোফিস্টদের নঞর্থক সংশয়বাদের হাত থেকে জ্ঞানবিদ্যা মুক্তি পায়। এছাড়া সক্রেটিস সর্বজনস্বীকৃত সম্প্রত্যয়কে যথার্থ জ্ঞান হিসাবে আখ্যায়িত করে সত্তার যথার্থ জ্ঞানলাভ সম্ভব বলে ঘোষণা করায় পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে আদি যুগে একটি গঠনমূলক ধারা প্রবর্তিত হয়। এ ধারা পরবর্তীতে এরিস্টটল থেকে শুরু করে মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের চিন্তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আধুনিক যুগের দার্শনিকদের জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

৩.১.৩ প্লেটোর জ্ঞানবিদ্যা

সোফিস্ট এবং সক্রেটিসের জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদের আলোচনা থেকে এটা দেখা গেছে যে, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার প্রারম্ভিক যুগে সোফিস্টগণ যে অভিজ্ঞতাবাদী ও নঞর্থক সংশয়বাদী ধারার সূচনা করেন সক্রেটিস সে ধারার হাত থেকে জ্ঞানবিদ্যাকে রক্ষা করে জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার ভূমিকার স্বীকৃতি দিয়ে একটি নতুন ধারা প্রবর্তন করেন যাতে বুদ্ধিবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো মূলত সোফিস্টদের মতবাদকে খণ্ডন করে এবং সক্রেটিস প্রবর্তিত জ্ঞানবিদ্যাগত ধারাকে সমর্থন করেই তাঁর মতবাদপ্রদান করেন।

প্লেটোর জ্ঞানবিদ্যা তাঁর কোন একটি বিশেষ ডায়লগ-এ সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয় নি। বরং বিভিন্ন ডায়ালগ-এ প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছে। তাঁর জ্ঞানবিদ্যার দু'টো দিক। যথা, নঞর্থক ও সদর্থক। নঞর্থক দিকটিতে তিনি মূলত সোফিস্টদের অভিজ্ঞতাবাদী তথা সংশয়বাদী জ্ঞানবিদ্যার সমালোচনা করেন। সদর্থক দিকে তিনি জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কে নিজস্ব মতবাদ প্রদান করেন। প্লেটো তাঁর থিয়াটিটাস নামক গ্রন্থে জ্ঞান সম্পর্কিত জটিল ধ্যান ধারণা ব্যক্ত করেছেন।৬ তবে এ আলোচনা মূলত নঞর্থক। এভাবে সোফিস্টদের অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদকেই খণ্ডন করা হয়েছে। *থিয়াটিটাস*-এর পূর্ববর্তী বিখ্যাত রচনা *রিপাবলিক*-এ তিনি তাঁর জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কিত সদর্থক মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সুতরাং বলা যায়, প্লেটো জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর নঞর্থক মতবাদের আগেই সদর্থক মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকৃতি কি এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই তিনি অন্যান্য জ্ঞান সম্পর্কিত মতবাদেরসমালোচনাকরেছেন।৭

প্লেটোর দর্শনে প্রাক-প্লেটো গ্রীক দর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট। আয়োনীয় দার্শনিক হিরাক্লিটাসের জগৎ পরিবর্তনশীল-এ মত প্লেটো গ্রহণ করেন। তবে তিনি একে শুধুমাত্র দৃশ্যমান জগতের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখায় প্রয়াসী ছিলেন। এলিয়াটিক দার্শনিকদের সত্তার জগৎ অপরিবর্তনশীল-এ মতকেও প্লেটো গ্রহণ করেন। পারমেনাইডিসের অপরিবর্তনশীল সত্তার ধারণাকে তিনি শাশ্বত ধারণার জগতে প্রতিস্থাপিত করেন। পরমানুবাদীদের সাথে একমত হয়ে তিনি বলেন যে, জগৎ বৈচিত্র্যময়। কিন্তু পরমাণুর বহুত্বকে তিনি ধারণা বা আকারের বহুত্ব দ্বারা প্রতিস্থাপিত করেন। এ্যানাক্সোগোরাসের সাথে একমত হয়ে প্লেটো মন জগতের একটি শক্তিশালী উপাদান-একথা স্বীকার করেন এবং সকল সমসাময়িক গ্রীক দার্শনিকদের সাথে একাত্ম হয়ে তিনি যথার্থ সত্তাকে বৌদ্ধিক বলে মত প্রকাশ করেন। জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রেও প্লেটো তাঁর পূর্ববর্তী সোফিস্টদের সাথে এ বিষয়ে একমত যে, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সংশয়াত্মক। আবার সক্রেটিসের সাথে একমত হয়ে তিনি বলেন যে, যথার্থ জ্ঞান একমাত্র প্রত্যয় বা ধারণার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। এ কারণে পাশ্চাত্য দর্শনের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ফ্রাংক থিলি প্লেটোর দর্শনকে তাঁর পূর্ববর্তী গ্রীক দর্শনের পরিপক্ক ফল বলে আখ্যায়িত করেন।৮

প্লেটোর দর্শন, এমনকি জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদের উপর তাঁর সময়ের বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার প্রভাবও স্পষ্ট। প্লেটোর শিক্ষগুরু সক্রেটিসের সময়েই এথেন্সের গণতন্ত্রের মহান নায়ক পেরিক্লেশ-এর মৃত্যু হয়। এ সময়ে এথেন্সের গণতন্ত্রের যে অবক্ষয়ের সূচনা হয় সোফিস্ট দার্শনিকগণ তা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করেন। কিন্তু সোফিস্টদের ব্যক্তিসাপেক্ষ পরিবর্তনশীল জ্ঞানবিদ্যাগত ও নৈতিক মানদণ্ড এথেন্সের জন্য কোন সর্বজনীন স্থিতিশীল আদর্শ স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়। তাই সক্রেটিস সোফিস্টদের ব্যক্তিসাপেক্ষ জ্ঞানবিদ্যাগত ও নৈতিক মানদণ্ডের সমালোচনা করে ব্যক্তিনিরপেক্ষ সর্বজনীন জ্ঞানবিদ্যাগত ও নৈতিক মানদণ্ড প্রচার করেন। কিন্তু আজীবন নৈতিকতা ও জ্ঞানের অনুশীলনকারী এই অবিস্মরণীয় পণ্ডিতকে এথেন্সের তথাকথিত বিচার ব্যবস্থা মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। প্লেটোর উপর তাঁর শিক্ষাগুরু সক্রেটিসের শিক্ষা ও জীবনাবসানের গভীর প্রভাব পড়ে। প্লেটো যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁর জন্মভূমি এথেন্স প্রতিবেশী রাষ্ট্র স্পার্টার সাথে দীর্ঘকালীন যুদ্ধের পর পরাভূত এবং জাতীয় সংকটের সম্মুখীন। এই পরাজয়ের কারণ ছিল এথেন্সের তথাকথিত গণতন্ত্র। অচিরেই এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ঘটল এবং ক্রমান্বয়ে

Dhaka University Institutional Repository

পরপর আরও দু'টি সরকার পরিবর্তিত হল। কিন্তু এথেন্সের সামাজিক রাজনৈতিক ও নৈতিক সংকটের কোন পরিবর্তন ঘটল না। বরং এসব সরকারের হাতেই সক্রেটিসকে নির্যাতিত এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করতে হল। প্লেটো এ অবস্থা থেকে স্থায়ী মুক্তির লক্ষ্যে এথেন্সের জন্য একটি আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিকল্পনা করেন যাতে রাষ্ট্র পরিচালনার ভার থাকবে রাষ্ট্রের জ্ঞানী ব্যক্তির হাতে এবং এটি হবে একটি সুশৃঙ্খল নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা প্রদানকারী ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্র। এজন্যই তিনি তাঁর শিক্ষাগুরু সক্রেটিসের সাথে অভিন্নতা ঘোষণা করে, সোফিষ্টদের ব্যক্তিভিত্তিক ন্যায়পরায়ণতার সমালোচনা করে তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে সর্বজনীন ন্যায়পরায়ণতার মানদণ্ডকে সমর্থন করেন। প্লেটোর জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদেও তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের সর্বজনীনতার মূল আদর্শের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি রাষ্ট্রের মত জ্ঞানের ক্ষেত্রেও সর্বজনীনতার আদর্শকে সমর্থন করে ব্যক্তিভিত্তিক অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদকে অযথার্থ বলে মত প্রকাশ করেন। সুতরাং একথা বলা যায় যে, প্লেটোর জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদে তাঁর শিক্ষাগুরু সক্রেটিসের মতবাদের প্রভাব এবং তৎকালীন এথেন্সের রাষ্ট্রীয় সামাজিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট।

প্লেটোর মতে, কোন কিছুকে জ্ঞান হতে হলে তা অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে।(৯) সোফিষ্টগণ অভিজ্ঞতাকেই জ্ঞানোৎপত্তির মাধ্যম হিসাবে অভিহিত করে সর্বজনীন ও নিশ্চিত জ্ঞানকে অসম্ভব বলে সংশয়বাদের বীজ বপন করেছিলেন। কিন্তু প্লেটোর মতে, যেহেতু গণিতে নিশ্চিত জ্ঞান পাওয়া যায় সেহেতু নিশ্চিত জ্ঞান সম্ভব। সুতরাং সংশয়বাদীদের যুক্তি অভ্রান্ত নয়। তবে অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চিত জ্ঞান পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে তিনি দু'টি যুক্তির উল্লেখ করেন। প্রথমত, অভিজ্ঞতা কখনও নিশ্চিত জ্ঞান দিতে পারে না এবং দ্বিতীয়ত, গাণিতিক উক্তিতে যে জ্ঞান প্রকাশ করা হয় তা অভিজ্ঞতাজাত বস্তু সম্পর্কিত নয়।(১০) সুতরাং প্লেটোর মতে, মানুষের মনই হল জ্ঞানের অবস্থান কেন্দ্র। মানুষের দেহ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শুধুমাত্র বিভ্রান্তিকর ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা উৎপন্ন করে।

প্লেটো জগৎকে দু'ভাগে ভাগ করেন। যথা ধারণার জগৎ বা বৌদ্ধিক জগৎ এবং অবভাসের জগৎ বা বাস্তব জগৎ।(১১) ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু হিসাবে যেমন বাস্তব জগৎ তেমনি মানসিক অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু হিসাবে ধারণার জগৎ অস্তিত্বশীল। তাঁর মতে, ধারণার জগৎই যথার্থ সত্য বা সত্তার জগৎ। এই জগৎকে আকারের জগৎও বলা হয়। মন বিশুদ্ধ বুদ্ধির মাধ্যমে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে আকারের জগতের জ্ঞান পায়। তাই যথার্থ জ্ঞানের বিষয়বস্তু হল আকার, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় নয়। বুদ্ধি হল মনের সেই বৃত্তির নাম যার সাহায্যে মন আকারের জগতের জ্ঞান পেতে পারে। সুতরাং ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা শুধু বাস্তব জগতের জ্ঞান পায় যা অনিশ্চিত। কিন্তু বুদ্ধি আকার বা ধারণার জ্ঞান পায় যা নিশ্চিত। আকার শাশ্বত ও অপরিবর্তনশীল বলেই তা নিশ্চিত। উল্লেখ্য যে, প্লেটো আকার বা ধারণা বলতে বস্তুগত সার্বিক ধারণা বা আকারকে বুঝিয়েছেন। এই ধারণা বা আকার এক নয় বরং বহু। তা বিমূর্ত এবং বিশেষ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে মন-নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্বশীল। আকার বা ধারণা মানসিকও নয়, জড়ীয়ও নয়, তবে বাস্তব। আকার ও বিশেষের মধ্যে সম্পর্ক হল অংশ গ্রহণের সম্পর্ক। প্রতিটি বিশেষই তার অনুরূপ আকার বা ধারণায় অংশ গ্রহণকারী।(১২) প্লেটোর এ মতবাদকেই ধারণাবাদ বা আকারবাদ বলা হয় এবং এ মতবাদই তাঁর জ্ঞানবিদ্যার মূলসূত্র। তিনি তাঁর এ মতবাদের মাধ্যমে সোফিষ্টদের অভিজ্ঞতা নির্ভর সংশয়বাদী জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের হাত থেকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যাকে রক্ষা করেন এবং পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে বুদ্ধিবাদী ধারার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনিই প্রথম দার্শনিক যিনি তাঁর জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদের দ্বারা দর্শনের ইতিহাসে প্রথমবারের মত অভিমত বা বিশ্বাসকে জ্ঞান থেকে পৃথক করেন এবং একথা বলেন যে, অভিমত বা বিশ্বাস ইন্দ্রিয় নির্ভর তাই পরিবর্তনশীল এবং আপেক্ষিক। কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধি নির্ভর ও নিশ্চিত।(১৩) অবশ্য একথা সত্য যে, তিনি তাঁর জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদের জন্য সক্রেটিসসহ অন্যান্য পূর্ববর্তী দার্শনিকদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী ছিলেন। কারণ, প্লেটোর ধারণা সম্পর্কিত মতবাদের উপর তাঁর পূর্ববর্তী তিনটি উৎসের প্রভাব আছে বলে মনে হয়। এলিয়াটিক দার্শনিকদের কাছ থেকে তিনি পরমসত্তার ধারণা, হিরাক্লিটাসের কাছ থেকে পরিবর্তনের ধারণা, যা তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের উপর আরোপ করেন এবং সক্রেটিসের কাছ থেকে তিনি প্রত্যয় বা ধারণা সম্পর্কিত মতবাদের ধারণা গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়। তবে ফ্রাংক থিলির মতে, প্লেটোর ধারণা মতবাদ হল তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক দার্শনিক কৃতিত্ব। তাঁর মতে, যদিও পিথাগোরিয়ানদের সংখ্যা-মরমীবাদ, পারমেনাইডিসের শাশ্বত সত্তা, হিরাক্লিটীয় জ্ঞানজ-মতবাদ, এ্যানাক্সোগোরাসের গুণগত পরমাণুবাদ এবং সর্বোপরি, সক্রেটিসের ধারণা বা প্রত্যয় সম্পর্কিত মতবাদ দ্বারা প্লেটোর ধারণা মতবাদের পথ নির্মিত হয়েছিল তবুও সার্বিকতা সম্পর্কিত মতবাদকে পরিপূর্ণভাবে অধিবিদ্যক অবস্থানে অবস্থিত করার সমস্ত কৃতিত্বই প্লেটোর প্রাপ্য।(১৪)

প্লেটোর জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার ক্ষেত্রে যে দু'টি নতুন বিষয়ের দিক নির্দেশ করা হয় তার প্রথমটি হল, জ্ঞানের সংজ্ঞা দান। অর্থাৎ জ্ঞান থেকে অভিমতকে বা বিশ্বাসকে আলাদা করে অপরিবর্তনশীল আকারের জগতের বিষয়রূপে শুধুমাত্র নিশ্চিত ও সন্দেহাতীত অবধারণ বা উক্তির মধ্যে জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করা। দ্বিতীয়টি হল, এই সংজ্ঞানুসারে ইন্দ্রিয়

Dhaka University Institutional Repository

অভিজ্ঞতা যে শুধু অভিমত বা বিশ্বাসের উৎস হতে পারে, যথার্থ জ্ঞান দিতে পারে না তার ঘোষণা দেয়া।[১৫] এই ঘোষণার ফলেই জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা সংশয়বাদের হাত থেকে রক্ষা পায়। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার পরবর্তী বুদ্ধিবাদী ধারা প্লেটোর এ দু'টো বিষয় দ্বারা কোন না কোন অর্থে প্রভাবিত হয়েছে। আকারকে জানার জন্য মনের যে বৃত্তিকে প্লেটো বুদ্ধি বলেছেন সকল বুদ্ধিবাদী দার্শনিক একে স্বীকার করে নিয়েছেন। অন্যদিকে, অভিজ্ঞতাবাদী ধারা সব সময়ই প্লেটোর এ দু'টি বিষয়ের বিরোধিতা করেছে। বিশেষত, প্লেটোর বুদ্ধি নামক বৃত্তিকে অভিজ্ঞতাবাদীরা সর্বোতভাবে বর্জন করেছেন।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, প্লেটোই প্রথম দার্শনিক যিনি পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে জ্ঞানকে প্রথম নিশ্চিতির বিষয় হিসাবে ঘোষণা দেন এবং একথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন যে, মানুষ গণিতের জ্ঞানের মত নিশ্চিত এবং সর্বজনস্বীকৃত জ্ঞান পেতে পারে। জ্ঞান ও অভিমত বা বিশ্বাসের মধ্যে স্পষ্টভাবে তিনিই প্রথম পার্থক্য করেন এবং জ্ঞানকে নিশ্চিতির বিষয় হিসাবে আখ্যায়িত করে প্রথম বারের মত জ্ঞানের সংজ্ঞা দেন। এর ফলে যথার্থ ও অযথার্থ জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যকরণ সম্ভব হয়। এ ছাড়া, তিনিই প্রথম দার্শনিক যিনি স্পষ্টভাবে ইন্দ্রিয় দ্বারা যথার্থ জ্ঞান পাওয়া যায়না একথা ঘোষণা করেন এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধিকে যথার্থ জ্ঞানোৎপত্তির একমাত্র মাধ্যম হিসাবে আখ্যায়িত করার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে বুদ্ধিবাদের প্রবর্তন করেন।

৩.১.৪ এরিস্টটলের জ্ঞানবিদ্যা

প্লেটের জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় দেখা গেছে যে, প্লেটো তাঁর পূর্ববর্তী সোফিষ্টদের জ্ঞানবিদ্যাগত ধারার বিরোধিতা করে তাঁর গুরু সক্রেটিসের জ্ঞানবিদ্যাগত ধারার অনুসরণ করেন। এর ফলে জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে বুদ্ধিবাদী ও ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি স্থাপিত হয়। প্লেটোর ছাত্র এরিস্টটল (৩৮৪–৩২২ খ্রিঃপূঃ) তাঁর জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদ দিতে গিয়ে প্লেটোর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি মূলত প্লেটোর প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিবাদ ও ভাববাদের ত্রুটি নিরসন করে তাঁর মতবাদকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হন। এ কাজ করতে গিয়ে এরিস্টটল তাঁর জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদে অনেক ক্ষেত্রেই প্লেটোর মতের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

প্লেটোর মতই এরিস্টটল মনে করেন যে, জ্ঞান হল সার্বিক বা আকারের জ্ঞান। আমরা বিশেষ বস্তু সম্পর্কে যা জানি তা সার্বিকের দৃষ্টান্ত হিসাবে জানি। তবে তাঁর মতে, বিশেষের মধ্যেই আমরা সার্বিককে জানি। এরিস্টটলের সার্বিক বিশেষের মধ্যেই অন্তস্যূত।[১৬]

সার্বিকের জ্ঞানকে যথার্থ বলার পরও এরিষ্টটল প্লেটোর ধারণা বা আকারবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর মতে, প্লেটোর আকার বা ধারণাবাদে জাতি বা সার্বিক এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বা বিশেষের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে এদের সম্বন্ধ বোধগম্য হয় নি। প্লেটো ধারণা বা আকারকে ব্যক্তি বা বিশেষের অতিবর্তী বিমূর্ত সত্তা হিসাবে ঘোষণা দিয়ে বিশেষকে আকারের ছায়ামাত্র বলেছেন। কিন্তু এরিস্টটল জাতিকে ব্যক্তির মধ্যে অন্তস্যূত বা মূর্ত সত্তা বলে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ আকার বা সর্বজনীন বিশেষের মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে। প্লেটো আকার বা ধারণার জগতের যথার্থতা প্রচার করতে গিয়ে দৃশ্যমান বা পরিবর্তনশীল জগৎকে অবভাস বা অযথার্থ বলে উল্লেখ করেন। তিনি এই পরিবর্তনের জগতের জ্ঞানকে অভিমতের বা অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান এবং আকারের জ্ঞানকে ধারণাপ্রসূত জ্ঞান হিসাবে আখ্যায়িত করে প্রথম প্রকার জ্ঞানকে অযথার্থ এবং দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানকে যথার্থ জ্ঞান বলে অভিহিত করেন। কিন্তু সক্রেটিস প্লেটো কর্তৃক সম্পাদিত অভিমত বা অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান এবং ধারণা বা বুদ্ধিপ্রসূত জ্ঞানের এ পার্থক্যকে স্বীকার করেন না। তিনি অভিমত বা পরিবর্তনশীল জগতের অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞানের তাৎপর্যকে স্বীকার করে প্লেটোর একদেশদর্শিতার প্রতিবাদ করেন। তাঁর মতে, এই পরিবর্তনশীল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকেই সার্বিকের ধারণাকে খুঁজে পেতে হবে। অর্থাৎ প্লেটো যেখানে অভিজ্ঞতাপ্রসূত জগতের জ্ঞানকে ধারণা জগতের ছায়া মনে করেছেন এরিস্টটল সেখানে অভিজ্ঞতার জগতের মধ্যে সার্বিকের জগৎ অন্তস্যূত বলেছেন। তাই প্লেটো অভিজ্ঞতাকে বর্জন করে আকার বা ধারণাকে গ্রহণ করলেও এরিষ্টটল আকারের বা সার্বিকের জন্য অভিজ্ঞতার জগতের গুরুত্ব স্বীকার করেন। এ ছাড়া তিনি প্লেটোর মতের বিরোধিতা করে তথ্যসমৃদ্ধ অভিজ্ঞতাকেও জ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতি দেন।[১৭]

এরিস্টটল মানুষের দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানপদবাচ্য বিষয়গুলোকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। এ দু'টির একটি হল তত্ত্বগত বিজ্ঞান এবং অন্যটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান। তাঁর মতে, তত্ত্বগত বিজ্ঞানের জ্ঞান আবশ্যিক ভাবে মানুষের কামনা–বাসনা, আশা–আকাঙ্খা নিরপেক্ষভাবে সত্য। তত্ত্বগত বিজ্ঞানের সত্য উক্তি সবসময়ই সত্য। তত্ত্বগত বিজ্ঞানের জ্ঞানকে এরিষ্টটল নিশ্চিত এবং

Dhaka University Institutional Repository

স্বপ্রমাণিত নিয়মাবলী থেকে অনুসৃত বলে মনে করেন। এ জ্ঞানকে জানার জন্য কেউ সত্যিকার অর্থে আগ্রহী হলে এবং যথার্থ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করলে নিশ্চিত জ্ঞান তার পক্ষে জানা সম্ভব বলে এরিস্টটল মত প্রকাশ করেন। ফলে প্লেটোর মত এরিস্টটলও পূর্ণ সংশয়বাদকে প্রত্যাখ্যান করেন। সুতরাং এরিস্টটলের কাছে ব্যবহারিক বিজ্ঞান হল মানুষের অভিজ্ঞতার ফসল। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এবং অন্যান্য মানুষের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের মধ্য থেকে যে সাধারণ নিয়মাবলী পাওয়া যায় এগুলোই ব্যবহারিক বিজ্ঞানের জ্ঞান। এরিস্টটলের প্রথম প্রকার জ্ঞান বা তত্ত্বগত বিজ্ঞানের জ্ঞানের সীমার সাথে প্লেটো নির্দেশিত নিশ্চিত জ্ঞানের সীমার সাদৃশ্য বিদ্যমান। কিন্তু এরিস্টটলের ব্যবহারিক বিজ্ঞানের জ্ঞানকে প্লেটো যথার্থ জ্ঞান বলে স্বীকৃতি দেন নি। ফলে এরিস্টটলের হাতে প্লেটোর জ্ঞানের সীমা বিস্তৃতি লাভ করে এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানগুলোও যথার্থ জ্ঞান পদবাচ্য হয়। বর্তমান কালে জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সাহিত্য সমালোচনা বলতে যা বোঝানো হয় তা এরিস্টটলের ব্যবহারিক বিজ্ঞানপ্রসূত জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। এরিস্টটলই মানুষের জ্ঞানের এই ব্যবহারিক শাখাগুলোকে প্রথম বিজ্ঞান, বিশেষত যথার্থ জ্ঞানের বিষয় হিসাবে মূল্যায়িত করেন। জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে এটা তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান। এর ফলেই অধিবিদ্যার সাথে অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞান তথা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জ্ঞানকে যথার্থ স্বীকৃতি দেয়া হয়। এ বিষয়টি জ্ঞানের সীমা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও প্লেটোর সাথে এরিস্টটলের পার্থক্য সূচিত করে। প্লেটো যেখানে নিশ্চিত জ্ঞানের বিষয়কে আবশ্যিক ভাবেই অপরিবর্তনশীল হতে হবে বলে মনে করেন এরিস্টটল সেখানে ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে জ্ঞানের আওতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে পরিবতনশীল বিষয়েরও নিশ্চিত জ্ঞান পাওয়া সম্ভব বলে মত প্রকাশ করেন।

এখানে প্লেটোর সাথে এরিস্টটলের যে বিশেষ পার্থক্যটি উল্লেখযোগ্য তা হল, প্লেটোর জ্ঞানবিদ্যায় ধারণা বাস্তব জগতের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের বস্তু-নিরপেক্ষ ভাবে অস্তিত্বশীল ছিল। কিন্তু এরিস্টটলের জ্ঞানবিদ্যায় আকার বাস্তব জগতের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু-নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্বশীল নয়। তাই এরিস্টটলের মতে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিশেষ বিষয়ই একমাত্র অস্তিত্বশীল হয় এবং মানুষের সকল জ্ঞানই ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বিষয় অর্থাৎ এরিস্টটল যাকে মুখ্য দ্রব্য (Primary Substance) বলেছেন তার উপর নির্ভরশীল। কারণ, এই মুখ্য দ্রব্যগুলোই একমাত্র অস্তিত্বশীল এবং এগুলো অস্তিত্বশীল না হলে অন্য কিছুই অস্তিত্বশীল হতে পারত না।

এরিস্টটল প্লেটোর সাথে ভিন্নমত, এমনকি বিপরীত মত প্রকাশ করে যদিও পরিবর্তনশীল বাস্তব জগতের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুকে জ্ঞানের বিষয় হিসাবে গণ্য করেন তবুও ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাই যে জ্ঞান পদবাচ্য নয় এ ব্যাপারে তিনি প্লেটোর সাথে একমত। তিনি জ্ঞানকে উপলব্ধি করার এবং কোন বস্তু এ বস্তু কেন তা ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন। অর্থাৎ তাঁর মতে, কোন বস্তুর নিজের সম্পর্কিত জ্ঞানকে ঐ বস্তুর জ্ঞান বলা যায় না এবং বস্তুটির কারণ, নিয়ম ইত্যাদি যে সব বিষয় বস্তুটিকে এ বস্তুতে পরিণত করেছে সে সব বিষয়ের জ্ঞানই হল এ বস্তুর জ্ঞান।(১৮) তাই কোন কিছু সম্পর্কে জ্ঞান পেতে হলে তাকে জাতি বা কারণ ও উপজাতির অন্তর্ভুক্ত করে দেখতে হবে এর আবশ্যিক উপাদান বা বিভেদক লক্ষণ কি।(১৯) এভাবে জাতির বা কারণের অন্তর্ভুক্ত করে কোন বিশেষ বস্তুর সারসত্তা বা বিভেদক লক্ষণ খুঁজে বের করার অর্থ হল এর আদি কারণ থেকে বস্তুটির যে সারসত্তা নির্দেশিত হয় তা প্রতিপাদন করা। এরিস্টটলের মতে, এটাই বিজ্ঞানের কাজ। আদি কারণকে একমাত্র বুদ্ধির মাধ্যমে জানা যায় বলে এরিষ্টটল মনে করেন।(২০) এ কারণে তাকে বুদ্ধিবাদী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

সুতরাং এরিস্টটলীয় মতবাদ অনুসারে যদিও বিশেষ বা স্বতন্ত্র বস্তু, বা মুখ্য দ্রব্যই একমাত্র অস্তিত্বশীল তবুও জ্ঞান বলতে এসব স্বতন্ত্র মুখ্য দ্রব্যের জ্ঞান বুঝায় না। বরং জ্ঞান হল এদের মধ্যকার সে সব আবশ্যিক গুণাবলীর জ্ঞান যা একটি বিশেষ বস্তুকে অন্য বিশেষ বস্তুর সাথে সম্পর্কিত করে। প্লেটোর ধারণাবাদের সমস্যা ছিল ধারণা বা আকার হিসাবে 'লাল' কি ভাবে বিভিন্ন বিশিষ্ট লাল রংধারী বস্তুর সাথে সম্পর্কিত হবে। এরিস্টটলের হাতে এই সমস্যার সমাধান হয়। কারণ, এরিস্টটল বিভিন্ন বিশিষ্ট লাল বস্তুর মধ্য থেকেই 'লাল'-এর আকার বা সার্বিক ধারণা বা সারসত্তাকে গঠন করেন। এছাড়া, প্লেটো যেখানে সকল প্রকার পরিবর্তনকে জ্ঞানের জগতের বর্হিভূত রেখেছিলেন সেখানে এরিস্টটল বলেন যে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের বস্তুগুলো পরিবর্তিত হলেও এদের মধ্যে একটি অপরিবর্তনীয় বিষয় আছে যা হল এর বিভেদক লক্ষণ বা সারসত্তা। এটিই হল বস্তুগলোর আকার এবং এই আকার বা সারসত্তই জ্ঞানের বিষয়বস্তু। বস্তুর বাহ্যিক যে পরিবর্তন ঘটে তাহল বস্তুর অবান্তর লক্ষণের পরিবর্তন। এ পরিবর্তনের মধ্যেও বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞানের বিষয়বস্তু অর্থাৎ বিভেদক লক্ষণ বা আবশ্যিক গুণাবলী বা সারসত্তা অপরিবর্তনশীল। এ ভাবে এরিস্টটল একদিকে যেমন প্লেটো দ্বারা বর্জিত ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বিষয়কেও জ্ঞানের রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন অন্যদিকে তেমনি প্লেটোর সাথে একমত হয়ে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর জ্ঞানকে যথার্থ জ্ঞান না বলে এদের মধ্যকার আবশ্যিক গুণ বা আকারের জ্ঞানকে যথার্থ জ্ঞান বলেন। এ আকারই হল সার্বিক। এরিস্টটলের এই সার্বিকের সাথে আকারগত দিক থেকে প্লেটোর ধারণা বা আকারের মিল লক্ষণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, এরিস্টটল প্লেটোর দ্বারা নির্দেশিত জ্ঞানের সীমাকে ধারণার জগত থেকে বিশেষ বস্তুর জগতে নিয়ে আসেন এবং জ্ঞানের জন্য বিশেষ বস্তুর ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতাকে আবশ্যিক বলে ঘোষণা করেন। বিশেষ বস্তুর অন্তর্স্যূত সারসত্তা বা বিভেদক লক্ষণ থেকেই বিশেষ বস্তুর আকারকে পাওয়া যায়। এ আকার যে আদি কারণ থেকে নিসৃত হয় সে আদি কারণই হল এই বিশেষ বস্তুর মূল নীতিমালা এবং এই মূল নীতিমালার জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। বিশেষ বস্তুর জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পাওয়া গেলেও বিশেষ বস্তুর সারসত্তা বা আদি কারণ বা মূল নীতিমালার জ্ঞান পাওয়া যায় বুদ্ধির মাধ্যমে। এরিস্টটল বুদ্ধিকে যথার্থ জ্ঞানের উপায় বলে সক্রেটিস ও প্লেটো নির্দেশিত বুদ্ধিবাদী ধারারই প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আবার আকার বা সার্বিককে যথার্থ জ্ঞানের বিষয়বস্তু বলায় তিনি প্লেটোর মত ভাববাদী। সুতরাং বলা যায়, এরিস্টটল যদিও প্লেটো প্রদত্ত জ্ঞানের সীমাকে ধারণার জগৎ থেকে বাস্তব জগৎ পর্যন্ত বিস্তৃত করেন তবুও তিনি জ্ঞানবিদ্যার মূলনীতিতে প্লেটোর সাথে একমত হয়ে, এমন কি প্লেটোর মতের সংশোধন করে ভাববাদী ও বুদ্ধিবাদী জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদই প্রচার করেন।

৩.১.৫ এরিস্টটল পরবর্তী জ্ঞানবিদ্যা

সোফিষ্ট দার্শনিকগণ থেকে শুরু করে এরিস্টটল পর্যন্ত পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ঐতিহাসিক ধারার উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের একমাত্র উপায় হিসাবে ধরে নিয়েই সোফিষ্টগণ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে জ্ঞানবিদ্যাগত আলোচনার সূত্রপাত করেন। তাঁদের কাছে জ্ঞান ছিল আপেক্ষিক বিষয়, তাঁরা সর্বজনীন জ্ঞানের অস্বিত্ব স্বীকার করেননি, তাঁদের এই জ্ঞানতাত্ত্বিক আপেক্ষিকতাবাদ শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় পৌঁছায় যে, তাঁরা বস্তুর যথার্থ জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয় বলে মত প্রকাশ করেন এবং তাঁদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অভিজ্ঞতাবাদ চূড়ান্ত পর্যায়ে নঞর্থক সংশয়বাদে পরিণত হয়। এর ফলে জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে একটি নঞর্থক ভাবধারার সূচনা হয়। কিন্তু সোফিষ্ট পরবর্তী দার্শনিক সক্রেটিস নৈতিক অবক্ষয়গ্রস্ত গ্রীসে সর্বজনীন নৈতিকতার মানদণ্ড নির্ধারণের লক্ষ্যে সোফিষ্টদের আপেক্ষিকতাবাদী এবং অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যার বিরোধিতা করে জ্ঞানের জন্য প্রজ্ঞার ভূমিকার স্বীকৃতি দেন। ফলে জ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বজনীনতাবাদী এবং বুদ্ধিবাদী যে ধারার গোড়াপত্তন হয় সে ধারা প্লেটো ও এরিস্টটল কর্তৃক অনুসৃত ও পরিশোধিত হয়ে জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে বুদ্ধিবাদ নামক একটি গঠনমূলক ধারা জন্ম দেয়।

এরিস্টটলের পরবর্তীকালে যে দু'জন সমসাময়িক দার্শনিক প্রাচীন গ্রীক দর্শনে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তাঁরা হলেন এপিকিউরীয় দার্শনিক আন্দোলনের প্রবক্তা এপিকিউরিয়াস (৩৪১–২৭০ খ্রিঃ পূঃ) এবং স্টোয়িক দার্শনিক জেনো (৩৩৬–৩৬৪খ্রিঃ পূঃ)। তাঁরা সক্রেটিস–প্লেটো–এরিস্টটলের মত প্রধানত নীতিবিদ্যার সাথে সম্পর্কিত করে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা করেন। অর্থাৎ নৈতিকতার যৌক্তিক ভিত্তি আবিষ্কারের লক্ষ্যে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা করেন। স্টোয়িকগণ দর্শনকে এমন একটি জমি হিসাবে আখ্যায়িত করেন জ্ঞানবিদ্যা বা যুক্তিবিদ্যা যার বেড়া, পদার্থবিদ্যা যার ভূমি এবং নীতিবিদ্যা যার ফল।২১ এ দু'জন দার্শনিকই জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে সোফিষ্ট প্রবর্তিত ধারাকে অনুসরণ করেন এবং সক্রেটিস–প্লেটো–এরিস্টটলীয় ধারার বিরোধিতা করেন। সোফিষ্টদের মত এপিকিউরিয়াসও সংবেদনকেই একমাত্র জ্ঞানের উৎস হিসাবে অভিহিত করে অভিজ্ঞতাবাদী ধারার অনুসরণ করেণ। তবে, সোফিষ্টদের চেয়ে এপিকিউরীয় দার্শনিকগণ বিজ্ঞানের প্রতি বেশী আকৃষ্ট ছিলেন।২২ কারণ, এ সময়েই বিজ্ঞান ও গণিতের ক্ষেত্রে গ্রীক চিন্তাবিদগণ সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করেন। এপিকিউরীয়দের অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যা তথা জ্ঞানের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ নির্ভরতাকে তৎকালীন আলেকজান্দ্রিয়ার বিজ্ঞানের সাফল্যের প্রভাব হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য যে, এপিকিউরিয়াস জ্ঞানের ক্ষেত্রে সোফিষ্টদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেও তাঁর জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদে সোফিষ্টদের নঞর্থক সংশয়বাদের ইঙ্গিত ছিল না। কারণ, তিনি বিশেষ মূর্ত বস্তুকেই একমাত্র বাস্তব সত্তা বলে আখ্যায়িত করে বিশেষ বস্তুর সংবেদনকে যথার্থ জ্ঞান বলে অভিহিত করেন। শুধু তাই নয়, তিনি সংবেদনকে জ্ঞান ও সত্যতার মানদণ্ড হিসাবেও স্বীকৃতি দেন। তাঁর মতে, আমরা যা প্রত্যক্ষ করি তাই সত্য। ভ্রান্তি বা অধ্যাস ইন্দ্রিয়ের ত্রুটি নয় বরং সংবেদনের ভুল ব্যাখ্যা মাত্র। এছাড়া তিনি পর্যবেক্ষণের পুনরাবৃত্তি এবং অপরের পর্যবেক্ষণের সাথে নিজের পর্যবেক্ষণের তুলনা করে ভ্রান্ত অবধারণকে শুদ্ধ করে নেয়া যায় বলেও মত প্রকাশ করেন। এপিকিউরিয়াসের অভিজ্ঞতাবাদের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে একথা বলা যায় যে, সোফিষ্টগণ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার সূত্রপাত করার সাথে সাথে অভিজ্ঞতাবাদের বীজ বপন করলেও শেষ পর্যন্ত তাঁদের অভিজ্ঞতাবাদ নঞর্থক সংশয়বাদে পর্যবসিত হয়। সক্রেটিস–প্লেটো–এরিস্টটল মূলত এ ধারারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বুদ্ধিবাদী মতবাদ গড়ে তোলেন। কিন্তু এপিকিউরিয়াসই প্রথম এ ধ্বংসমূলক অভিজ্ঞতাবাদী ধারাকে গঠনমূলক খাতে প্রবাহিত করে অভিজ্ঞতাবাদের একটি সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দেন। অভিজ্ঞতাবাদের ক্ষেত্রে গঠনমূলক এ ভূমিকার জন্য ঐতিহাসিক ফ্রাংক থিলি এপিকিউরিয়াসকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাসে অভিজ্ঞতাবাদের প্রবর্তক হিসাবে অভিহিত করেন।২৩ এ ছাড়া এপিকিউরিয়াস সম্পর্কে এ কথাও বলা হয় যে, প্রাচীন জগতে যদি অভিজ্ঞতাবাদী বলে কেউ থেকে থাকেন তবে তিনি হলেন প্রখ্যাত গ্রীক পরমাণুবাদী এপিকিউরিয়াস।২৪

স্টোয়িক দার্শনিক জেনো এপিকিউরিয়াসকে সমর্থন করে অভিজ্ঞতাবাদকে আরও সুসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করেন। জন্মের সময় মন যে 'টেবুলে রাসা' অর্থাৎ সাদা কাগজের মত থাকে তা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন, যাকে আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক জন লক সরাসরি গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়। এছাড়া যখন তিনি ইন্দ্রিয়ছাপ এবং ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে স্মৃতি প্রতিরূপ গঠিত হওয়ার মাধ্যমেই জ্ঞান গঠনের পদ্ধতির কথা বলেন তখন হিউমের অভিজ্ঞতাবাদে জ্ঞান গঠন প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সর্বোপরি, অভিজ্ঞতাবাদের প্রতিনিধিত্ব করলেও জেনো বুদ্ধির উপাদানকে একেবারে বর্জন করেন নি। বরং আংশিকভাবে এরিস্টটলীয় ধারায় প্রভাবিত হয়ে জ্ঞানের জন্য অভিজ্ঞতালব্ধ উপাদানগুলো থেকে সক্রিয় চিন্তা পদ্ধতির দ্বারা সাধারণ বা সার্বিক ধারণা গঠনের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানের মূল উপাদান প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে বাহ্যজগত থেকেই সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু এসব উপাদান মনের বা প্রজ্ঞার সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া যথার্থ জ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না। জার্মান দার্শনিক কান্ট বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদকে সমন্বিত করে আধুনিক যুগে যে যুগান্তকারী বিচারবাদী মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন তার উপর স্টোয়িকদের উপরোক্ত প্রজ্ঞাস্বীকৃত অভিজ্ঞতাবাদের প্রভাব স্পষ্ট।

এপর্যন্ত আলোচনা থেকে প্রাচীন গ্রীক জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে সোফিষ্ট–এপিকিউরিয়াস–জেনো সমর্থিত অভিজ্ঞতাবাদী এবং সক্রেটিস–প্লেটো–এরিস্টটল সমর্থিত বুদ্ধিবাদী–এদু'টি মূল ধারা পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও এদু'টি ধারার পাশাপাশি সংশয়বাদ নামক অন্য একটি জ্ঞানবিদ্যাগত ধারার অস্তিত্বও প্রাচীন পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে দেখা যায়। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়

সক্রেটিস এবং সক্রেটিস–উত্তর যেসব দার্শনিক সোফিষ্টদের সংশয়বাদী আক্রমন থেকে জ্ঞানের ও সত্যের প্রতি মানুষের বিশ্বাসকে রক্ষা করেছিলেন তাঁদের দার্শনিক অনুসন্ধানের মূলে যে বিশ্বাসটি ক্রিয়াশীল ছিল তাহল, মানুষের বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার সত্য আবিষ্কারের ক্ষমতা আছে। মূলত এই দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে বিচার বিযুক্তবাদকে প্রতিষ্ঠিত করে। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে এপিকিউরীয় ও স্টোয়িক নীতিপ্রধান দর্শনের পাশাপাশি যে নতুন জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের উৎপত্তি হয় তাই জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে সংশয়বাদ নামে পরিচিত। এ মতবাদের মূল কথা ছিল পরমজ্ঞানের ভিত্তিকে অস্বীকার করা। নৈতিক পরমতার বিরুদ্ধেই প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে এ সংশয়বাদের উদ্ভব হয়। এর একটি সামাজিক কারণও ছিল। খ্রিষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতকে এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধের ফলস্বরূপ গ্রীস তার স্বাধীনতা হারায়। গ্রীক রাষ্ট্রগুলোর অন্তর্ঘাত যুদ্ধ ও দাস মালিকদের বিশ্বাসঘাতকতা ছিল এ পরাধীনতার কারণ। খ্রিষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতকে রোম মাকিদোনিয়ার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করে সে যুদ্ধে গ্রীসদেরকে স্বাধীনতা দেয়া হবে এই আশ্বাস দিয়ে রোম গ্রীসদের সাহায্য নেয়। কিন্তু যুদ্ধে জয়ের পর রোম অঙ্গীকার ভঙ্গ করে গ্রীসের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে। বিজিত দেশ রোম ধ্বংসলীলা ও দাসতন্ত্রের তাণ্ডব চালায়। এহেন সামাজিক অবস্থায় প্রচলিত নৈতিকতার উপর থেকে মানুষ আস্থা হারায় এবং তথাকথিত সর্বজনীন নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে সংশয়ের উদ্ভব হয়। ফলত নৈতিকতা ও জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে সংশয়বাদের জন্ম হয়।

গ্রীক সংশয়বাদকে তিনটি পৃথক পর্বে ভাগ করা যায়।২৫ প্রথম পর্বের উল্লেখযোগ্য সংশয়বাদী হলেন পাইরো (৩৬৫–২৭০ খ্রিঃপূঃ) এবং টাইমন (৩২০–২৩০ খ্রিঃপূঃ)। প্রধানত নৈতিক অনপেক্ষতার বিরুদ্ধেই ছিল এ সময়ের দার্শনিকদের সংগ্রাম। এপিকিউরিয়ানদের সুখবাদের সমর্থক পাইরো তাঁর পূর্ববর্তী পারমেনাইডিস, সোফিষ্ট ও সক্রেটিস প্রমুখ দার্শনিকদের সংশয়াত্মক মত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জ্ঞান ও সত্তার ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করে তত্ত্ববিদ্যা ও জ্ঞানবিদ্যা উভয় ক্ষেত্রে সংশয়বাদী মতবাদ প্রদান করেন। তাঁর শিষ্য টাইমনও পাইরোকে সমর্থন করে অনপেক্ষ সত্যকে অস্বীকার করেন। পাইরো প্রতিষ্ঠিত চরম সংশয়বাদ পরবর্তীতে পাইরোবাদ নামে অভিহিত হয় এবং একে সংশয়বাদের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করতেও দেখা যায়।

টাইমনের পরে প্লেটোর একাডেমীর নেতাদের হাতে গ্রীক সংশয়বাদের দ্বিতীয় পর্ব বিকশিত হয়। এ পর্বের সংশয়বাদ একাডেমীক সংশয়বাদ নামে খ্যাত। এ সময়কার প্রধান দার্শনিক হিসাবে আর্কোসিলাস (৩১৫–২৪১ খ্রিঃপূঃ) ও কার্নিয়াডিসের (২১৩–১২৯ খ্রিঃপূঃ) নাম উল্লেখযোগ্য। এসব দার্শনিক প্রধানত স্টোয়িকদের আক্রমণ করেন ও সম্ভাব্যতার ধারণাকে একটি মতবাদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। আরকোসিলাস সুনিশ্চিত জ্ঞানলাভ অসম্ভব বলে মনে করেন। তাঁর মতে, সত্য ও মিথ্যাজ্ঞানের পার্থক্যকরণের সুনির্দিষ্ট কোন মানদণ্ড নাই। সুতরাং সম্ভাব্যতাই জ্ঞানের ক্ষেত্রে একমাত্র আশ্রয়। তাঁর অনুসারী কার্নিয়াডিসও আরকোসিলাসকে সমর্থন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

খ্রিষ্ট পূর্ব তৃতীয়–দ্বিতীয় শতকে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল প্রাচীন বিশ্বের বিজ্ঞানের উন্নতির শীর্ষদেশ স্পর্শ করে। এ সময়ে সংশয়বাদের অন্য একটি ধারা আলেকজান্দ্রিয়া নগরীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উপর গুরুত্বারোপ এই সংশয়বাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এনেসিডেমাস (সম্ভঃ খ্রিঃ পূঃ প্রথম শতক) ও সেক্সটাস্ এম্পিরিকাস (২৩০ খ্রিঃ) ছিলেন এ ধারার অন্যতম দার্শনিক। এনেসিডেমাসের মতে, ইন্দ্রিয় সংবেদন এবং নৈতিক ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা সবই স্থান, কাল, পাত্রভেদে ভিন্ন অর্থাৎ আপেক্ষিক। সুতরাং জ্ঞানের কোন সর্বজনীন মানদণ্ড সম্ভব নয়। তিনিই প্রথম কার্যকারণের মধ্যকার সম্পর্ককে সন্দেহ করেন। তাঁর মতে, আধুনিক সংশয়বাদী হিউমের মতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এনেসিডেমাসের অনুসারী সেক্সটাস্ এম্পিরিকাস ছিলেন গ্রীক সংশয়বাদের সর্বশেষ দার্শনিক। তিনি এনেসিডেমাসের মতের উন্নয়ন সাধন করে আরোহ অনুমানের সার্বিক সিদ্ধান্তের সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং সকল সার্বিক নিয়ম ও সিদ্ধান্তকে আপেক্ষিক বলে মত প্রকাশ করেন। দেশ, কাল, এমন কি গণিত ও নীতিশাস্ত্র তার কাছে আপেক্ষিক বলে পরিগণিত হয়। হবে এ দু'জন দার্শনিকই চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রায়োগিক নিয়মাবলীর মতো জীবনের প্রায়োগিক নিয়মাবলী থেকে পাওয়া কাণ্ডজ্ঞানের মাধ্যমে জীবন পরিচালনার এবং সামাজিক রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার পরামর্শ দেন। সেক্সটাস এম্পিরিকাসের পর সংশয়বাদের আর কোন প্রখ্যাত চিন্তাবিদের উন্মেষ ঘটে নি এবং সংশয়বাদের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পায়। মধ্যযুগে ধর্মীয় প্রাধিকারবাদের প্রভাবে জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে সংশয়বাদের তেমন কোন ভূমিকা ছিল না বললেই চলে।

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার প্রাচীন যুগের উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, এ যুগে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে মূলত তিনটি ধারার উৎপত্তি হয়। এ তিনটি ধারা হল অভিজ্ঞতাবাদ, বুদ্ধিবাদ ও সংশয়বাদ। সোফিষ্ট দার্শনিকদের হাতে পাশ্চাত্য দর্শনের প্রাচীন যুগে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার সূত্রপাত লগ্নে জ্ঞানবিদ্যা ছিল অভিজ্ঞতাবাদী। কিন্তু সোফিষ্টদের অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যা জ্ঞানবিদ্যাগত আপেক্ষিকতাবাদের জন্ম দেয় এবং শেষ পর্যন্ত সোফিষ্টগণ যথার্থ জ্ঞান সম্ভব নয় একথা বলে তাঁদের অভিজ্ঞতাবাদকে নঞর্থক ধারার সংশয়বাদের দিকে নিয়ে যান। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে সর্বজনীনতাবাদী মানদণ্ড সরবরাহ করার লক্ষ্যে সক্রেটিস ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার পরিবর্তে প্রজ্ঞাকে প্রাধান্য দিয়ে বুদ্ধিবাদী ধারার সূচনা করেন। এ ধারা তাঁর শিষ্য প্লেটো এবং প্লেটোর শিষ্য এরিষ্টটল কর্তৃক সংশোধিত ও পরিশোধিত হয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে বুদ্ধিবাদের প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সোফিষ্টদের অভিজ্ঞতাবাদী ধারা লয়প্রাপ্ত হয়না। এরিষ্টটলের পরবর্তীকালে এপিকিউরীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এপিকিউরিয়াস এবং স্টোয়িক দার্শনিক জেনো সোফিষ্টদের অভিজ্ঞতাবাদী ধারার প্রতিনিধিত্ব করেন এবং একে নঞর্থক সংশয়বাদের হাত থেকে রক্ষা করে গঠনমূলক খাতে প্রবাহিত করেন। এর ফলে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদ প্রতিষ্ঠা পায়।

অভিজ্ঞতাবাদী ও বুদ্ধিবাদী এ দু'টি ধারার পাশাপাশি আরও যে, একটি শক্তিশালী ধারা পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহল সংশয়বাদ। খ্রিষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতকে পাইরোর হাতে এ ধারার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং তিনটি ভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রবাহিত হয়ে এ ধারা খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে সেক্সটাস এম্পিরিকাসের চিন্তায় পরিণতি লাভ করে।

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে প্রাচীন যুগে গড়ে উঠা অভিজ্ঞতাবাদী, বুদ্ধিবাদী ও সংশয়বাদী জ্ঞানবিদ্যার এ তিনটি ধারাই পরবর্তীকালের দার্শনিকদের চিন্তায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। প্রাচীন যুগের পাশ্চাত্য দর্শনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল মুক্তবুদ্ধির আলোকে দর্শন চর্চা। জ্ঞানবিদ্যাসহ দর্শনের বিভিন্ন শাখায় দার্শনিকগণ যে অবদান রেখেছেন স্বাধীন বা মুক্ত চিন্তাই ছিল তার ভিত্তি। মধ্যযুগের দার্শনিক চিন্তা ছিল ধর্মীয় প্রাধিকারবাদ নিয়ন্ত্রিত। এ সময়ে মুক্তবুদ্ধির চর্চার সুযোগ থাকে না। দার্শনিকগণ খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্বের আলোকে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ব্যাখ্যা করেন। ফলে মুক্তবুদ্ধির স্থলে প্রত্যাদেশই মধ্যযুগীয় দার্শনিক চিন্তার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। তাই এযুগে যথার্থ অর্থে জ্ঞানবিদ্যার চর্চা ছিল না বললেই চলে। তবে প্রাধিকারবাদ বা প্রত্যাদেশের আলোকেও এযুগে যে জ্ঞান চর্চা করা হয়েছে তাতে প্রথম দিকে প্রত্যাদেশ নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিবাদ এবং শেষ দিকে অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদেরই প্রতিফলন দেখা যায়। মধ্যযুগে সংশয়বাদী জ্ঞানবিদ্যাগত ধারার উল্লেখযোগ্য প্রভাব দেখা যায় না।

রেনেসাঁর মাধ্যমে আধুনিক যুগে মধ্যযুগীয় প্রাধিকারবাদের অবসান ঘটলে আবার দর্শন এমনকি জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে মুক্তবুদ্ধির চর্চা প্রাধান্য পায়। তখন জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে মূলত অভিজ্ঞতাবাদী, বুদ্ধিবাদী ও সংশয়বাদী এ তিনটি ধারার প্রভাবই পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক যুগে বৃটিশ দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন, জন লক, জর্জ বার্কলে ও ডেভিড হিউম যেমন অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যাগত ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান তেমনি ফরাসী দার্শনিক রেকার্ত, স্পিনোজা এবং জার্মান দার্শনিক লাইবনিজ বুদ্ধিবাদের প্রতিনিধিত্ব করেন। এছাড়া, আধুনিক বুদ্ধিবাদের জনক ডেকার্ত যেমন প্রারম্ভিক সংশয়বাদ দিয়ে তাঁর দর্শন শুরু করেন তেমনি বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদী ডেভিড হিউম তাঁর পূর্বসূরী জন লক ও জর্জ বার্কলে সমর্থিত অভিজ্ঞতাবাদকে সঙ্গতিপূর্ণ করতে গিয়ে সংশয়বাদের জন্ম দেন। আমরা পরবর্তীতে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় উপরোক্ত ধারাগুলোর প্রভাব লক্ষ্য করবো।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ মধ্যযুগ

প্রাচীন যুগের পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় এটা দেখা গেছে যে, প্রাচীন যুগে দার্শনিকগণ মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার আলোকে জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদের আলোচনা করেছেন এবং এর ফল হিসাবে সংবেদন নির্ভর অভিজ্ঞতাবাদ, প্রজ্ঞানির্ভর বুদ্ধিবাদ এবং এর পাশাপাশি সংশয়বাদী জ্ঞানবিদ্যাগত ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মধ্যযুগে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে দর্শনের আলোচনা শুরু হয়। এ সময়ের দর্শন মূলত খ্রিষ্টীয় দর্শন। এ সময় দর্শনকে প্রধানত খ্রিষ্টধর্মের বাহন বা ব্যাখ্যাকারী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তাই এ সময়ের দার্শনিকগণ মূলত ক্যাথলিক ধর্মের আচার অনুষ্ঠানকে সুদৃঢ় করার জন্য প্রমাণ উপস্থাপনের লক্ষ্যে দর্শন চর্চা করেন। প্রাচীন যুগে জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা তথা বিচারমূলক ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান তথা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ, এক কথায় অভিজ্ঞতার ও বিচার বুদ্ধির যে চর্চা ছিল মধ্যযুগের ধর্মীয় প্রাধিকারবাদের প্রভাবে তা বন্ধ হয়ে যায়। তখন জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে মূলত প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার উপর প্রত্যাদেশ ও বিশ্বাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্ব প্রভাবিত মধ্যযুগীয় দর্শনের আলোচনায় জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কে যে মূল কথাটি আলোচিত হয়েছে তা হল, যথার্থ জ্ঞান বলতে একমাত্র ঈশ্বর এবং আত্মার জ্ঞানকে বুঝায়। যুক্তিবিদ্যা, অধিবিদ্যা, নীতিবিদ্যাসহ জ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলো যতটুকু ঈশ্বরের জ্ঞান দিতে পারে ততটুকুই মূল্যবান।

খ্রিষ্টীয় দর্শনের শুরু হয় খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে। তখন থেকে শুরু করে নবম শতক পর্যন্ত মধ্যযুগীয় দর্শনে যে ভাবধারা ছিল তাকে প্রাচীন যাজকদের যুগ বলা হয়। সেন্ট অগাষ্টিন (৩৫৪–৪৩০ খ্রিঃ) ছিলেন এ যুগের অন্যতম প্রতিনিধি। খ্রিষ্টীয় নবম শতক থেকে শুরু করে পনেরো শতক পর্যন্ত বিস্তৃত যুগকে বলা হয় স্কলাষ্টিক যুগ। সেন্ট থমাস একুইনাস (১২২৫–১২৭৪ খ্রিঃ) এ যুগের অন্যতম প্রতিনিধি। এ দু'জন বিখ্যাত দার্শনিকের জ্ঞানবিদ্যা সংক্রান্ত মতবাদ এখানে আলোচনা করা গেল।

৩.২.১ সেন্ট অগাষ্টিনের জ্ঞানবিদ্যা

অগাষ্টিন জ্ঞান বলতে ঈশ্বরের জ্ঞানকে বুঝান এবং ঈশ্বরের জ্ঞানকেই একমাত্র সম্ভাব্য জ্ঞান বলে মনে করেন। *On the Trinity* গ্রন্থে তিনি জ্ঞানবিদ্যার মূলসূত্র প্রকাশ করে বলেনঃ "এমনভাবে বোঝ যাতে তুমি বিশ্বাস করতে পার এবং এমনভাবে বিশ্বাস কর যাতে তুমি বুঝতে পার। তাঁর মতে, কিছু জিনিষকে আমরা বিশ্বাস করিনা যতক্ষণ এগুলোকে বুঝতে পারি না। আবার অন্য কিছু জিনিষকে আমরা বুঝতে পারি না যতক্ষণ আমরা এগুলোকে বিশ্বাস করতে পারি না।"[২৬] এভাবে অগাষ্টিন বিশ্বাসের জন্য বোধ ও বোধের জন্য বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তার নীতিকে সমর্থন করেন। এতে বুদ্ধি ও বিশ্বাসের মধ্যে দ্বৈতবাদকে অস্বীকার করা হয়। বুদ্ধিই প্রথম সিদ্ধান্ত নেবে যে প্রত্যাদেশ সত্যিকার অর্থে ঘটেছে কি না। যদি বুদ্ধি প্রত্যাদেশ ঘটেছে বলে সমর্থন করে তবেই প্রত্যাদেশ বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসযোগ্য। একমাত্র এ অবস্থায়ই প্রত্যাদেশকে বিশ্বাস করা হবে এবং বুদ্ধিই তা বোঝার জন্য ব্যাখ্যা করবে। এ মূলসূত্রের সাহায্যে অগাষ্টিন বুদ্ধিকে বিশ্বাসের সাথে অভিন্ন হিসাবে আখ্যায়িত করে বুদ্ধিবাদের সমর্থন করেন। তবে তাঁর মতে আমরা সবকিছু বিশ্বাস বা বুদ্ধিদ্বারা বুঝতে পারবো এমন কোন কথা নাই। এ জন্যই তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি চার্চের উপর নির্ভর করতে বলেন।

সুতরাং দেখা যায়, অগাষ্টিন জ্ঞানের জন্য বুদ্ধি ও বিশ্বাস উভয়ের প্রয়োজন বোধ করেন। যা বিশ্বাস করা হয় তাকে বোঝার জন্য বুদ্ধি দরকার। অন্যদিকে বুদ্ধি যা বোঝে তাকে বিশ্বাস করার জন্য বিশ্বাস থাকা দরকার। তবে তিনি বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসহ সকল প্রকার বুদ্ধিকে ঈশ্বরের, অন্যকথায় ঈশ্বরের প্রতিনিধি চার্চের উপর নির্ভরশীল বলে মনে করেন। এর ফলে জ্ঞানবিদ্যায় সোফিষ্টদের প্রবর্তিত ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং প্লেটো–এরিষ্টটল প্রবর্তিত বুদ্ধিবাদ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের দ্বারা পরিশোধিত হয়ে ঈশ্বরের ধারণার সাথে একাত্ম হয়ে মিশে যায়। একারণেই সেন্ট অগাষ্টিনকে জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে যদিও বুদ্ধিবাদী হিসাবে আখ্যা দেয়া যায় তবুও তিনি প্রাচীন যুগের পাশ্চাত্য দার্শনিক তথা সক্রেটিস–প্লেটো–এরিষ্টটলের মত মুক্তবুদ্ধি তথা স্বাধীন বিচার বিবেচনা নির্ভর বুদ্ধিবাদের প্রতিনিধিত্ব করেন নি, বরং এর পরিবর্তে প্রত্যাদেশ নির্ভর বুদ্ধিবাদের প্রবর্তন করেন।

৩.২.২ সেন্ট থমাস একুইনাসের জ্ঞানবিদ্যা

সেন্ট অগাষ্টিনের মৃত্যুর পর দীর্ঘ বারশত বছর ধরে রাজনৈতিক কারণে পশ্চিম ইউরোপ অনেকটা অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। এ সময় চার্চই ছিল একটি স্থায়ী ও সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠান। তখনকার ইউরোপে এই চার্চীয় কর্তৃপক্ষই ছিল প্রাচীন জ্ঞান সংরক্ষণ ও নতুন জ্ঞান অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার একমাত্র ধারক ও বাহক। দীর্ঘদিন ধরে চার্চের এই ভূমিকার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ইউরোপে যে ধর্মকেন্দ্রিক বিশ্বাস ও যুক্তি প্রভাবিত মিশ্র দর্শন চর্চার সূচনা হয় তাকে স্কলাষ্টিক দর্শন বলা হয়। এই দর্শনও ধর্মযাজক এবং সন্যাসীদের দর্শন। প্রত্যাদেশের উপরই এ দর্শনের প্রতিষ্ঠা। তবে খ্রিষ্টীয় ধর্মমতকে অভ্রান্ত মনে করলেও যুক্তির সাহায্যে ধর্মমতকে ব্যাখ্যার চেষ্টা

Dhaka University Institutional Repository

স্কলাষ্টিক দার্শনিকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বাধীন চিন্তা বা মৌলিক চিন্তার স্থান এতে প্রাচীন যুগের মত ছিল না। ঈশ্বর, পরলোক, মানুষের অমরতা এসব অতীন্দ্রিয় বিষয়ই এ দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। গীর্জাই মানুষের জীবন ও চিন্তাকে নিয়ন্ত্রন করত। বস্তুর উৎপত্তি বা স্বরূপ ব্যাখ্যায় আপ্তবাক্যের উপরই নির্ভর করা হত। সেন্ট আন্‌সেল্‌ম (১০৬৩–১১০৯ খ্রিঃ) এ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা এবং সেন্ট থমাস একুইনাসের হাতে এ দর্শনের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়।

একুইনাস সেন্ট অগাষ্টিনের, এমনকি আন্‌সেল্‌মের সাথে দ্বিমত পোষণ করে প্রজ্ঞা ও বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। তিনি দর্শনকে যুক্তি বা প্রজ্ঞার বিষয় এবং ধর্মকে বিশ্বাসের বিষয় বলে মনে করেন। তবে দর্শন ও ধর্মের মধ্যে কোন বিরোধকে তিনি স্বীকার করেন নি। বরং তাঁর মতে, এদের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। কারণ, বিশ্বাসের মাধ্যমে পাওয়া সত্যকে প্রজ্ঞার আলোকে বোঝা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে তিনি এরিস্টটল দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হন। এরিস্টটলের মতই তিনি মনে করেন যে, ধারণাগত জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। কিন্তু এর ভিত্তি হল ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ। আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদী জন লক–এর মতে, বুদ্ধিতে এমন কিছু নাই যা পূর্বে অভিজ্ঞতায় ছিল না। একুইনাসের জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদে এ মতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনিও এ কথা বলেন যে, বুদ্ধির মধ্যে এমন কোন ধারণা নাই যা প্রথমে সংবেদনের মধ্যে ছিল না।[২৭] একুইনাসের মতে, আত্মার সংবেদন, সক্রিয় বুদ্ধি এবং সম্ভাব্য বুদ্ধি ইত্যাদি বৃত্তি আছে এবং যথার্থ জ্ঞানমাত্রই এসব বৃত্তির মিশ্রিত ক্রিয়ার ফলশ্রুতি। ইন্দ্রিয় সংবেদনের মাধ্যমেই আত্মা প্রথম বাহ্য বস্তুর সাথে সম্পর্কিত হয় এবং বিশেষ বস্তুর আকার বা অনুলিপি গ্রহণ করে। সংবেদনের সাহায্যে লাভ করা বিশেষ বস্তুর এই অনুলিপি বা উপকরণ সমূহের মধ্য থেকে অভিন্ন আবশ্যিক বৈশিষ্টগুলোকে পৃথক করে সক্রিয় বুদ্ধি একে একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য অনুলিপি, তাঁর ভাষায়, "বুদ্ধিগ্রাহ্য উপজাতি"–তে পরিণত করে। এ বুদ্ধিগ্রাহ্য উপজাতির মাধ্যমেই সম্ভাব্য বুদ্ধি বস্তুর সার্বিক ধারণাকে জানে। এ সার্বিক ধারণাই হল যথার্থ জ্ঞান। সুতরাং অভিজ্ঞতাই হল জ্ঞানের প্রাথমিক স্তর। অভিজ্ঞতার সাহায্যে যেমন আমরা বস্তু সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ ধারণা লাভ করি তেমনি সক্রিয় বুদ্ধির সাহায্যে আমরা জগতের পরাতাত্ত্বিক গঠন সম্পর্কে অবহিত হই।

উপরের আলোচনা থেকে এটা মনে হয় যে, একুইনাস জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে সেন্ট অগাষ্টিন ও সেন্ট আন্‌সেল্‌ম–এর জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদের চেয়ে এরিস্টটলীয় মতবাদ দ্বারা বেশী প্রভাবিত হয়ে প্রত্যাদেশ বা বিশ্বাসের পরিবর্তে অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে, যথার্থ জ্ঞানের ভিত্তি হল অভিজ্ঞতা এবং যার ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ হয় তাকেই আমরা জানতে পারি। এই অভিজ্ঞতালব্ধ উপাদান থেকে সারসত্তা নিয়েই বুদ্ধি জ্ঞানের উচ্চতর পর্যায় গঠন করে। এই সারসত্তার জ্ঞানই হল সত্তা বা তত্ত্ববিদ্যার জ্ঞান। সুতরাং দেখা যায় একুইনাস জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা উভয়ের ভূমিকা স্বীকার করেছেন। তবে বুদ্ধির ভূমিকাকে অস্বীকার না করলেও প্লেটোর মত মনে অভিজ্ঞতাপূর্ব কোন অন্তর্ধারণার অস্তিত্বকে তিনি স্বীকার করেন নি। বরং এরিস্টটলের মত ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বা অভিজ্ঞতাকেই যথার্থ জ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদী জন লক এবং বিচারবাদী কান্টের জ্ঞানবিদ্যার উপর তাঁর জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদের প্রভাব লক্ষিত হয়। যদিও লকের মত একুইনাস তাঁর মতবাদকে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন নি তবুও তাকে এই অর্থে অভিজ্ঞতাবাদী হিসাবে আখ্যায়িত করা যায় যে, জ্ঞানের সকল উপকরণই চূড়ান্ত অর্থে অভিজ্ঞতা থেকে আসে অন্য কোন উৎস থেকে নয় – একথা তিনি ঘোষণা করেছেন।[২৮] এটাই অভিজ্ঞতাবাদের সারকথা। এরিস্টটলের মত সার্বিক ও বিশেষ উভয়ের জ্ঞানকে স্বীকৃতি দিয়ে বিশেষের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার উপর সার্বিকের জ্ঞানকে নির্ভরশীল করে একুইনাস এরিস্টটল প্রভাবিত জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদ প্রদান করেন। তাই ত্রয়োদশ শতকে একুইনাসের আবির্ভাবকে জ্ঞান রাজ্যে এরিস্টলের পুনরাবির্ভাব হিসাবে ধরে নেয়া হয়।[২৯]

মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা সংক্রান্ত উপরের আলোচনা থেকে এ সময়ের জ্ঞানবিদ্যাগত আলোচনায় দু'টি স্বতন্ত্র ধারার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তার মধ্যে একটি হল প্রত্যাদেশ নির্ভর বুদ্ধিবাদী ধারা এবং অন্যটি প্রজ্ঞাস্বীকৃত অভিজ্ঞতাবাদী ধারা। মধ্যযুগের প্রথমাংশের অর্থাৎ প্রাচীন যাজকদের যুগের প্রতিনিধি সেন্ট অগাষ্টিন ছিলেন বিশুদ্ধভাবে প্রত্যাদেশের উপর নির্ভরশীল বুদ্ধিবাদী ধারার সমর্থক। তিনি প্রত্যাদেশ ও বুদ্ধিকে অভিন্ন হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। তাই, যদিও তাঁকে মধ্যযুগের বুদ্ধিবাদী বলা যায়। তবুও তিনি যে বুদ্ধির চর্চা করেছেন তা প্লেটো–এরিস্টটল নির্দেশিত স্বাধীন বিচারবুদ্ধি বা মুক্ত বুদ্ধি নয় বরং প্রত্যাদেশ নির্ভর বুদ্ধি। অন্যদিকে মধ্যযুগের দ্বিতীয়াংশের অর্থাৎ স্কলাষ্টিক দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক সেন্ট থমাস একুইনাস এরিস্টটল দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি যদিও প্রত্যাদেশ বা চার্চকেই সবকিছুর মানদণ্ড হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং ধারণাগত জ্ঞানকেই যথার্থ জ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন তথাপি জ্ঞানের প্রাথমিক উপাদানগুলো আহরণের জন্য তিনি ব্যক্তির ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার উপর

Dhaka University Institutional Repository

নির্ভরশীল হয়ে একথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে,অভিজ্ঞতায় যাকে পাওয়া যায় না তা বুদ্ধিতে থাকতে পারে না। তবে অভিজ্ঞতাই চূড়ান্ত জ্ঞান নয় বরং অভিজ্ঞতার উপাদানে সমৃদ্ধ ধারণাগত জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান পদবাচ্য। তাঁর জ্ঞানবিদ্যাগত বুদ্ধিস্বীকৃত অভিজ্ঞতাবাদে আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদী জন লক ও বিচারবাদী ইমানুয়েল কান্টের মতবাদের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগীয় প্রত্যাদেশ নির্ভর দার্শনিক আলোচনায় জ্ঞানবিদ্যাগত বুদ্ধিবাদী এবং অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদও প্রত্যাদেশের হাত থেকে মুক্তি পায় নি। পরবর্তীতে আধুনিক যুগের জ্ঞানবিদ্যার ধারা আলোচনাকালে আমরা দেখবো যে, রেনেসাঁর মাধ্যমে আধুনিক যুগের সূচনা হলে সে যুগের বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন বিচার বিবেচনা, যৌক্তিক ও মুক্তচিন্তা এবং বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩.৩ আধুনিক যুগ

মধ্যযুগের পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ধারা আলোচনাকালে দেখা গেছে যে, মধ্যযুগে জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে যদিও প্রাচীন যুগের মত বুদ্ধিবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী ধারা প্রবাহিত ছিল তবুও এ দু'টি ধারা স্বাধীন চিন্তা তথা মুক্তবুদ্ধির উপর নির্ভরশীল ছিল না। বরং তা ছিল প্রত্যাদেশ নির্ভর। যথার্থ জ্ঞানকে তখন খ্রিষ্টান ধর্ম বা চার্চের মানদণ্ডে মূল্যায়ন করা হত। চৌদ্দ শতকের শেষভাগে রেনেসাঁর এবং সপ্তদশ শতকের বিজ্ঞান বিপ্লবের মাধ্যমে মধ্যযুগীয় ধর্ম প্রভাবিত চিন্তাধারার হাত থেকে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা তথা দর্শনও মুক্তিলাভ করে। অতিপ্রাকৃত বিষয়াদির পরিবর্তে প্রকৃতিকে এবং প্রকৃতির বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকে জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ধর্মীয় প্রাধিকারবাদের পরিবর্তে মুক্তচিন্তা ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধি জ্ঞান চর্চার তথা দর্শন চর্চার মূলভিত্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এসময়ে জ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়। লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি (১৪৫২–১৫১৯ খ্রিঃ), কোপারনিকাস (১৪৭৩–১৫৪৩ খ্রিঃ), কেপলার (১৫৭১–১৬৩০ খ্রিঃ), গ্যালিলিও (১৫৬৪–১৬৪২ খ্রিঃ), নিউটন (১৫৪২–১৭২৭ খ্রিঃ) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী আবিষ্কার সম্ভব করেন। যার ফলে জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রচলিত মতের চেয়ে ব্যক্তির পর্যবেক্ষণ তথা অভিজ্ঞতাভিত্তিক আবিষ্কারের প্রাধান্য ঘোষিত হয়। বিজ্ঞানে তখন বিশুদ্ধ আরোহাত্মক পদ্ধতির ব্যবহার জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিজ্ঞানের এই নবজাগরণ দর্শনকেও প্রভাবিত করে। বিজ্ঞান বিপ্লবের ফলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি ও সাফল্য অর্জিত হলে প্রাকৃতিক সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা বিজ্ঞানের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, দর্শন কেন্দ্রীভূত হয় প্রধানত মানুষের জ্ঞান সম্পর্কিত অর্থাৎ জ্ঞানবিদ্যাগত আলোচনায়। তাই পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে আধুনিক যুগের দর্শন মূলত জ্ঞানবিদ্যা কেন্দ্রিক হয়ে উঠে।

এ সময়ের জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদের ধারা আলোচনায় প্রাচীন যুগের অভিজ্ঞতাবাদ, বুদ্ধিবাদ ও সংশয়বাদ এ তিনটি ধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকে এ যুগের স্বাতন্ত্র্য হল বিজ্ঞানমনস্কতা। বিজ্ঞানে আরোহ পদ্ধতি সফল পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় দার্শনিকগণও তাঁদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আরোহ পদ্ধতি তথা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণকে দর্শনের পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করতে প্রয়াসী হন। তবে সপ্তদশ শতকের আগে প্রখ্যাত দার্শনিকগন যেখানে বুদ্ধিবাদী ধারার প্রতিনিধিত্ব করেছেন সেখানে সপ্তদশ শতক থেকে অধিকাংশ প্রখ্যাত দার্শনিকই অভিজ্ঞতাবাদী ধারার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সপ্তদশ শতকের পূর্বে দর্শনের টেষ্ট কেস বা দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা হিসাবে গাণিতিক বা ধর্মীয় পদ্ধতিকে গ্রহণ করা হত। কিন্তু সপ্তদশ শতক থেকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে দর্শনের টেষ্ট কেস হিসাবে গ্রহণ করা হয়।[৩০] প্রথমোক্ত দু'টি পদ্ধতিকে টেষ্ট কেস হিসাবে গ্রহণ করলে যে কোন দার্শনিক চিন্তাই চূড়ান্ত পরিণতিতে বুদ্ধিবাদী হতে বাধ্য। কিন্তু সপ্তদশ শতক থেকে এর পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দর্শনের টেষ্ট কেস হিসাবে গৃহীত হওয়ায় দর্শনে পর্যবেক্ষণ তথা অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলত এ সময়ের জ্ঞানবিদ্যা প্রধানত অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যায় পরিণত হয়। এ ধারার সফল প্রতিনিধি ইংলণ্ডের দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন, জন লক, জর্জ বার্কলে ও ডেভিড হিউমের অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে হলেও পর্যবেক্ষণ অর্থাৎ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক পদ্ধতির ব্যবহার দেখা যায়। অন্যদিকে এর পাশাপাশি অন্য একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানবিদ্যাগত ধারাও আধুনিক যুগে গড়ে উঠে যার মধ্যে প্রাচীন যুগের সক্রেটিস–প্লেটো–এরিষ্টটল নির্দেশিত বুদ্ধিবাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে এ যুগের বুদ্ধিবাদী জ্ঞানবিদ্যার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, সুস্পষ্টভাবে অবরোহাত্মক পদ্ধতির ব্যবহার। আধুনিক যুগের বুদ্ধিবাদীরা অভিজ্ঞতাবাদীদের ব্যবহৃত আরোহাত্মক পদ্ধতির বিরোধিতা করে সুস্পষ্টভাবে বিশুদ্ধ অবরোহাত্মক পদ্ধতির ব্যবহার করেন। তাঁদের এ পদ্ধতির উপর মধ্যযুগীয় প্রাধিকারবাদের আংশিক প্রভাব এবং আধুনিক যুগের গণিতের উন্নতির প্রভাব লক্ষিত হয়।

আমরা এখানে অভিজ্ঞতাবাদী ধারার প্রতিনিধি হিসাবে বেকন, লক ও বার্কলের জ্ঞানবিদ্যা এবং বুদ্ধিবাদী ধারার অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে দেকার্তের জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদের আলোচনায় প্রয়াসী হব।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩.১ বেকনের জ্ঞানবিদ্যা

মধ্যযুগীয় স্কলাষ্টিক দর্শনের অবসান ঘটিয়ে সংস্কারধর্মী ও বাস্তববাদী মত প্রচার দ্বারা যেসব চিন্তাবিদ আধুনিক চিন্তার প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি ও প্রশংসা অর্জন করেছেন বৃটিশ দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন [১৫৬১–১৬২৬খিঃ] তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ইংলণ্ডে দর্শনের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে তাঁর নাম ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। রেনেসাঁর প্রভাবে মধ্যযুগীয় নির্বিচার বিশ্বাসের স্থলে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা জ্ঞানানুশীলনের যে নতুন প্রেরণা ও প্রচেষ্টার সূত্রপাত ঘটে বেকন ছিলেন এর মূর্ত প্রতীক।[৩১] সপ্তদশ শতকে নিউটনের *Principia* গ্রন্থটি সকল প্রকার দার্শনিক অনুধ্যানকে বর্জন করে ঘটনার অতিজ্ঞতাভিত্তিক পর্যবেক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। নিউটন এ পদ্ধতিকেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয়ী নিরপেক্ষ পদ্ধতি হিসাবে মনে করতেন।[৩২] বৈজ্ঞানিক অবধারণের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণকে টেষ্ট কেস হিসাবে গ্রহণ করাকে যেসব দার্শনিক পূর্বসংস্কার হিসাবে গ্রহণ করেন এবং অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যায় এর ব্যবহারের প্রয়াস নেন ফান্সিস বেকন তাঁদের অগ্রদূত। তিনি দর্শনকে ধর্মতত্ত্ব থেকে সম্পূর্ন স্বতন্ত্র থাকতে হবে বলে মত প্রকাশ করেন। তবে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার না করে বলেন যে, যুক্তি দ্বারাই এর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়। অতীতের বিজ্ঞান ও দর্শনের নিষ্ফলতার কারণ হিসাবে তিনি যথার্থ পদ্ধতির অভাবকে দায়ী করেন।[৩৩] তাই তিনি জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতির আবিষ্কার করেন। এ পদ্ধতি হল আরোহ পদ্ধতি। বেকনের কাছে জ্ঞানের উদ্দেশ্য তাত্ত্বিক নয় বরং প্রায়োগিক। অর্থাৎ, প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্য বিস্তারই জ্ঞানের উদ্দেশ্য। তাই তিনি তাঁর বিখ্যাত *Advancement of Learning* গ্রন্থে জ্ঞানকে শক্তি বলেছেন।[৩৪] এ শক্তি অর্জনের জন্য অর্থাৎ ভ্রান্তি বর্জিত যথার্থ জ্ঞান অর্জনের জন্য চার প্রকার পূর্ব সংস্কার, যথা, মানবীয় পূর্বসংস্কার অর্থাৎ স্বভাবগত বদ্ধমূল প্রত্যক্ষ ও চিন্তার অভ্যাস, ব্যক্তিগত পূর্বসংস্কার অর্থাৎ ব্যক্তির চরিত্র ও শিক্ষার পরিবেশজাত সংস্কার, জনশ্রুতিমূলক পূর্বসংস্কার অর্থাৎ ভাষার যথেচ্ছ ব্যবহারজাত সংস্কার এবং পরিকল্পিত পূর্ব সংস্কার অর্থাৎ ঐতিহ্যগত বিশ্বাস ও প্রাধিকারের প্রতি অন্ধ আনুগত্যজনিত সংস্কার বর্জন করতে হবে। তাঁর মতে, এসব পূর্বসংস্কার ভ্রান্তির কারণ হিসাবে কাজ করে। অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানার্জনের জন্য দরকার যথার্থ বা সংস্কার মুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তথা বিশুদ্ধ আরোহাত্মক পদ্ধতির সহায়তা। এরিস্টটলের সহানুমানিক যুক্তিবিদ্যা অবরোহ পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে এসব পূর্ব সংস্কারে আক্রান্ত হয়েছে বলে বেকন এরিস্টটলের যুক্তিবিদ্যাকে বন্ধ্যা বলেছেন। অবরোহ পদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ করে আরোহ পদ্ধতির প্রাধান্য ঘোষণা করে আধুনিক যুগের পরে যে বিজ্ঞানমনস্ক দীর্ঘ দার্শনিক ধারার সুচনা হয় বেকন ছিলেন সে ধারারই প্রথম দার্শনিক।[৩৫] তিনি যথার্থ আরোহ পদ্ধতিকে পূর্ণ গননামূলক আরোহ থেকে পৃথক করেন এবং পূর্ণ গননামূলক আরোহকে রূপক কাহিনী হিসাবে আখ্যায়িত করেন।

বেকনের মতে পৃথিবীর প্রতিটি ঘটনার একটি করে মূল নিয়ম বা কারণ রয়েছে। এ কারণ আবিষ্কার করতে পারলেই এ ঘটনার স্বরূপ আবিষ্কার করা যায়। এভাবে বিশেষ ঘটনার সাথে পরিচিত হয়ে আমাদের এমন একটি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কারেরই চেষ্টা করতে হবে যার কারণে ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করে এ থেকে সাধারণ নিয়ম আবিষ্কারই আরোহ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণই এ পদ্ধতির মুলভিত্তি। বেকনের দ্বারা ব্যবহার্য পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণভিত্তিক আরোহাত্মক পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে দর্শনের পদ্ধতি হিসাবে আত্মীকরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বেকন জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির লালন করেন। তাঁর মতে, প্রত্যাদেশ ব্যতীত আমাদের সকল জ্ঞানই সংবেদন থেকে আসে। তিনি এরিস্টটলের মত শুধু বিশেষ বস্তুরই অস্তিত্ব আছে বলে মনে করেন। মন বা বুদ্ধি ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিশোধিত বিশেষ বস্তুর উপরই কাজ করে। তাঁর মতে, জ্ঞান যেমন পরীক্ষামূলক তেমনি বৌদ্ধিক। কিন্তু বুদ্ধির নিজস্ব কোন সত্য নাই। অভিজ্ঞতা থেকেই বুদ্ধি তার সত্যগুলোকে সংগ্রহ করে। উল্লেখ্য যে, বেকন সকল জ্ঞানকে প্রাথমিকভাবে অভিজ্ঞতা নির্ভর মনে করে সকল প্রকার অন্তর্ধারণার অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও চিন্তার মত অভিজ্ঞতা–পূর্ব মানসিক বুদ্ধির অস্তিত্ব স্বীকার করেন।[৩৬]

বেকনের জ্ঞানবিদ্যা সংক্রান্ত উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, রেনেসাঁ যুগের প্রথম উল্লেখযোগ্য দার্শনিক হিসাবে তিনি জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রাচীন যুগের সোফিষ্ট–এপিকিউরিয়াস–জেনো এবং মধ্যযুগের সেন্ট থমাস একুইনাস প্রবর্তিত অভিজ্ঞতাবাদী ধারারই প্রতিনিধিত্ব করেন। তবে দার্শনিক আলোচনা, বিশেষত জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে কোন পদ্ধতির ব্যবহার, আরও বিশেষ করে বললে দর্শনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রায়োগিক আরোহাত্মক পদ্ধতির প্রয়োগ বেকনের উল্লেখযোগ্য অবদান। যদিও তাঁর হাতে অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদ সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে নি বা তাঁর ব্যবহৃত আরোহাত্মক পদ্ধতিও ছিল পূর্ব সংস্কারের মত অর্থাৎ পদ্ধতিটিকে যথেষ্ট বিচার ব্যাখ্যা না করেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন তবুও দর্শনের ক্ষেত্রে বেকন কর্তৃক আরোহ বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগই দর্শন ও বিজ্ঞানকে কাছাকাছি আসার পথ প্রশস্ত করে এবং পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দর্শন চর্চার নবযুগের সূচনা হয়। দার্শনিক আলোচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ যে সম্ভব একথা সম্ভবত

Dhaka University Institutional Repository

বেকনই প্রথম সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন। দর্শনের পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিই মধ্যযুগীয় ধর্মীয় প্রাধিকারবাদের দীর্ঘ রাজত্বের বিস্তৃত প্রভাব কাটিয়ে রেনেসাঁ তথা আধুনিক যুগের শুরুতে জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদ প্রচারে অনুপ্রাণিত করেছে বলে মনে হয়। এর মাধ্যমে যে বিষয়টির প্রতি তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা হল অভিজ্ঞতাবাদের মাধ্যমে সার্বিক জ্ঞান পেতে হলে আরোহ পদ্ধতির কোন বিকল্প নাই। পরবর্তী যে সব অভিজ্ঞতাবাদী অভিজ্ঞতা দ্বারা সার্বিক জ্ঞান পাওয়া যায় না বলে মত প্রকাশ করেন তাঁরা মূলত বেকনের গৃহীত পদ্ধতিকেই সমালোচনা করেছেন। অর্থাৎ তাঁরা এ পদ্ধতিকে পূর্ব সংস্কার বা স্বতসিদ্ধ হিসাবে গ্রহণ করেন নি। আধুনিক দর্শনের ইতিহাসে বেকনের গুরুত্ব স্বীকার করতে গিয়ে একথা বলা হয় যে, যদিও তাঁর দর্শন বিভিন্ন দিক থেকে সন্তোষজনক নয় তবুও আধুনিক আরোহ পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির যৌক্তিক শৃঙ্খলাবদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার পথ নির্দেশক হিসাবে বেকনের গুরুত্ব দর্শনের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করে আছে।[৩৭]

৩.৩.২ দেকার্তের জ্ঞানবিদ্যা

বেকনের জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, মধ্যযুগীয় প্রাধিকারবাদের প্রাধান্য থেকে মুক্ত করে জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি তথা আরোহ পদ্ধতির প্রবর্তনের মাধ্যমে বেকন আধুনিক যুগে অভিজ্ঞতাবাদের গোড়াপত্তন করেন। আধুনিক যুগে বেকন পরবর্তী যে দার্শনিক জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন তিনি হলেন ফরাসী দার্শনিক দেকার্ত (১৫৯৬–১৬৫০)। দেকার্ত বেকনের অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতির বিরোধিতা করেন। তিনি প্রাচীন যুগের সক্রেটিস–প্লেটো–এরিস্টটলীয় এবং মধ্যযুগের অগাষ্টিনীয় জ্ঞানবিদ্যাগত ধারারই আধুনিক যুগের প্রতিনিধি ছিলেন। দেকার্ত বেকনের আরোহ পদ্ধতির বিরোধিতা করে জ্ঞানের জন্য অবরোহ তথা গাণিতিক পদ্ধতির কথা বলে আধুনিক দর্শনে বুদ্ধিবাদী জ্ঞানবিদ্যাগত ধারা প্রবর্তন করেন। *Meditations* নামক গ্রন্থে দেকার্তের জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা পাওয়া যায়। স্কলাষ্টিক যুক্তিবিদ্যা ও অধিবিদ্যার উপর দেকার্তের ব্যাপক পড়াশুনা ছিল। অন্যদিকে নতুন যুগের প্রেরণায় তিনি তখনকার বিজ্ঞানে, বিশেষ করে গণিতে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। এছাড়া লিওনার্দো ও বেকনের মত নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সম্ভাবনাও তিনি দেখতে পান। এসব কারণে দেকার্ত দর্শনে এমন নিশ্চিত ও স্বতপ্রতীত জ্ঞান আবিষ্কারের চেষ্টা করেন যাকে সকল মানুষ যুক্তিতর্কের বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারে। তাঁর এ চিন্তার উপর অধিবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে তিনি নিশ্চিত জ্ঞানের পদ্ধতি হিসাবে যখন গণিতকেই আদর্শ হিসবে গ্রহণ করেন তখন তাঁর দর্শনের উপর তৎকালীন গণিতের উন্নতির প্রভাব লক্ষিত হয়। দেকার্ত প্লেটোর মত জ্ঞানকে নিশ্চয়তার জগতে সীমাবদ্ধ করেন। গণিতে স্বতসিদ্ধের মাধ্যমে নিশ্চিত জ্ঞান পাওয়া যায়। এজন্য তিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে বেকন প্রমুখ বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদী নির্দেশিত আরোহাত্মক পদ্ধতিকে বর্জন করে গাণিতিক বা আরোহ পদ্ধতিকে আদর্শ পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেন। অভিজ্ঞতাবাদ নির্দেশিত গণিত বিবর্জিত আরোহ পদ্ধতি নিশ্চিত ও স্বতপ্রমাণিত জ্ঞান দিতে পারে না বলেই তাঁর ধারণা।

সম্ভবত অধিবিদ্যা প্রীতির কারণেই দেকার্ত জ্ঞানের রাজ্যকে প্লেটোর মত নিশ্চয়তার জগতে সীমাবদ্ধ রাখেন এবং নিশ্চয়তা দিতে পারে না বলে ইন্দ্রিয় সংবেদন থেকে জ্ঞানোৎপত্তি সংক্রান্ত সকল অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদ বর্জন করেন। এছাড়া তিনি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনেও আগ্রহী ছিলেন। কারণ, বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানগুলো এই অর্থে সাধারণ বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল যে, সাধারণ বিজ্ঞানের সূত্রগুলো বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের জগতেও সত্য। তবে প্লেটো ও এরিস্টটলের সাথে তাঁর যথেষ্ট অমিলও লক্ষিত হয়। এ পার্থক্যগুলোই তাকে একজন স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিকের মর্যাদা দিয়েছে। প্লেটো ও এরিস্টটলের সাথে দেকার্তের মূল পার্থক্য হল, পূর্বোক্তরা যেখানে মানুষ জাতি কি জানতে পারে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন দেকার্ত সেখানে খুঁজেছেন একজন মানুষ অর্থাৎ ব্যক্তিমানুষ কি জানতে পারে তার উত্তর। মূলত তিনি ব্যক্তি হিসাবে একজন মানুষের চিন্তার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন।[৩৮] প্লেটো ও এরিস্টটলের সাথে দেকার্তের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল, প্লেটো ও এরিস্টটল তাঁদের জ্ঞানবিদ্যাগত আলোচনায় এটা ধরে নিয়েছিলেন যে, জ্ঞান আছে। তাই জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁরা সন্দেহাতীত জ্ঞান নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। কিন্তু দেকার্ত তাঁর আলোচনায় জ্ঞান যে আছে একথা প্রথমেই প্রমাণ করতে চান। তিনি জ্ঞান আছে বলে ধরে নেন নি। এজন্য তিনি সংশয় পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেন, যাকে প্রারম্ভিক বা পদ্ধতিগত সংশয়বাদ বলা হয়, এবং অনধ্যানের মাধ্যমে জ্ঞানবিদ্যার সিদ্ধান্তগুলোকে নিশ্চিত বলে প্রমাণ করেন। তাঁর এ প্রমাণ ও প্রমাণ পদ্ধতিতে যথেষ্ট ত্রুটি থাকা সত্বেও একথা স্বীকার করতেই হয় যে, বেকন প্রমুখ দার্শনিক যেমন বিজ্ঞানে ব্যবহৃত আরোহ বা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিকে বিনা বিচারে গ্রহণ করেছিলেন দেকার্ত তেমন করে তাঁর জ্ঞানবিদ্যাগত সিদ্ধান্তকে বিনা বিচারে গ্রহণ করেন নি তিনি ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির কষ্টিপাথরে এগুলোকে যাচাই করেছেন। ব্যক্তিমানুষের বিচারবুদ্ধির উপর গুরুত্ব প্রদানই রেনেসাঁ তথা আধুনিক যুগের দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য। দেকার্ত তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানবিদ্যাগত সিদ্ধান্ত প্রণয়নে প্রারম্ভিক বা পদ্ধতিগত সংশয়বাদের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ব্যক্তি হিসাবে একজন মানুষের চিন্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে ব্যক্তিমানুষের মুক্তবুদ্ধিরই প্রাধান্য ঘোষণা করেছেন। তাই সময়ের দিক থেকে বেকনের উত্তরসূরী হওয়া এবং জ্ঞানবিদ্যাগত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মুক্তবুদ্ধির উপর দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁকে আধুনিক দর্শনের জনক বলে অভিহিত করা হয়।

দেকার্ত গণিতের প্রভাবেই জ্ঞানের জগতে সর্বজন স্বীকৃত যুক্তিগ্রাহ্য নিশ্চিত সত্য আবিষ্কারে প্রয়াসী ছিলেন। কারণ, তিনি মনে করতেন এতে জ্ঞানের রাজ্যে এমন একটি নিশ্চিত ভিত্তি স্থাপিত হবে যা গণিতের জ্ঞানের মত সন্দেহাতীত ও ভ্রান্তিমুক্ত এবং যার ফলে দর্শনের সকল প্রকার বিতর্কের অবসান ঘটবে। তাই তিনি প্রচলিত সকল মতবাদকে সন্দেহ করে সকল প্রকার পূর্ব সংস্কারের হাত থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞানরাজ্যে এমন সার্বিক স্বতসিদ্ধ সত্য খুঁজে বের করতে প্রয়াসী হন যা থেকে অন্যান্য সকল জ্ঞান গাণিতিক বা অবরোহ পদ্ধতিতে নিসৃত হবে। তিনি তা আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছেন বলেও দাবী করেন। এ নিশ্চিত সত্যের ধারণা থেকে দেকার্ত এমন এক দর্শনের উন্নয়ন ঘটান যা বহু গাণিতিক, বৈজ্ঞানিক এবং ধর্মীয় উক্তিকে নিঃসন্দিগ্ধ সত্য হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।[৩৯] এই সন্দেহাতীত সত্য আবিষ্কারের সাথে সাথে তিনি জ্ঞান ও সত্যতার যে মানদণ্ড আবিষ্কার করেন তাহল স্পষ্টতা ও স্বতপ্রতীতি। যে জ্ঞান জ্ঞাতার কাছে স্পষ্ট ও স্বতপ্রতীত সে জ্ঞানই সত্য বা যথার্থ জ্ঞান। তাঁর আবিষ্কৃত জ্ঞানের এই মানদণ্ডের ক্ষেত্রেও একমাত্র ব্যক্তির বিচারবুদ্ধিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এই স্পষ্টতা ও স্বতপ্রতীতি ইউক্লিডের জ্যামিতির স্বতসিদ্ধের মত মানুষের জ্ঞানের অবরোহ পদ্ধতির ক্ষেত্রে স্বতসিদ্ধ হিসাবে কাজ করে।

দেকার্তের মতে, মানুষের মনে তিন প্রকার ধারণা আছে। সহজাত, আগন্তুক ও কৃত্রিম। সহজাত ধারণাগুলো অভিজ্ঞতাপূর্ব। আগন্তুক ও কৃত্রিম ধারণা অভিজ্ঞতাজাত। সহজাত ধারণাই জ্ঞানের সাধারণ ও সর্বজনীন সূত্র সরবরাহ করে। এ ধারণাই একমাত্র স্পষ্ট ও স্বতপ্রতীত। ঈশ্বর, নিত্যতা, অসীমতা, দ্রব্য ইত্যাদি হল সহজাত ধারণাজাত জ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞান। এসব জ্ঞান থেকে অবরোহাত্মক পদ্ধতিতে অন্যসব বিশেষ বস্তুর জ্ঞান আসে। এভাবে বেকনের আরোহ পদ্ধতির বিরোধিতা করে অভিজ্ঞতাপূর্ব সহজাত ধারণাকে জ্ঞানের স্বতসিদ্ধ বা মূল উৎস হিসাবে বর্ণনা করে এবং অবরোহ পদ্ধতিকে সমর্থন করে দেকার্ত আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যায় বুদ্ধিবাদের গোড়াপত্তন করেন। তবে পদ্ধতিগত সংশয়বাদের আশ্রয় নিয়েও বুদ্ধিকেই নিশ্চিত জ্ঞান উৎপাদনে সক্ষম বলে স্বীকার করায় তাঁকে বিচারবিযুক্তবাদী হিসাবে অভিহিত করা হয়।[৪০]

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, আধুনিক ফরাসী দার্শনিক দেকার্ত মূলত প্রাচীন কালের সক্রেটিস-প্লেটো-এরিস্টটল প্রবর্তিত এবং মধ্যযুগে অগাষ্টিন সমর্থিত জ্ঞানবিদ্যাগত বুদ্ধিবাদী ধারাকে আধুনিক যুগমানসে তথা ব্যক্তির স্বাধীন বিচার বুদ্ধির আলোকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি প্লেটোর মতই জ্ঞানকে নিশ্চয়তার জগতে সীমাবদ্ধ রেখে, অবরোহ বা গাণিতিক পদ্ধতিকে জ্ঞানের একমাত্র পদ্ধতি হিসাবে অভিহিত করে এবং একমাত্র সহজাত ধারণাকে যথার্থ জ্ঞান পদবাচ্য বলে প্রাচীন যুগে সোফিষ্ট, এপিকিউরিয়াস ও জেনো, মধ্যযুগে একুইনাস এবং আধুনিক যুগে বেকন সমর্থিত ধারার সাথে বিরুদ্ধমত পোষণ করেন। যার ফলে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে বুদ্ধিবাদের প্রবর্তন হয়। তাঁর এই জ্ঞানবিদ্যাগত সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য তিনি পদ্ধতিগত সংশয়ের আশ্রয় নিয়ে জ্ঞানের পদ্ধতি আবিষ্কারে বিশুদ্ধভাবে মুক্তবুদ্ধির অর্থাৎ ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধির প্রাধান্য ঘোষণা করেছেন যা তাঁর আগে কেউ করেন নি। মূলত এই দৃষ্টিভঙ্গিই আধুনিক যুগের জ্ঞানচর্চার যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি। তাই বার্টাণ্ড রাসেল তাঁকে আধুনিক যুগের দর্শনের জনক বলে অভিহিত করাকে যথার্থ বলে মন্তব্য করেন।[৪১] অন্যদিকে জাতি বা শ্রেণী হিসাবে নয় বরং ব্যক্তি হিসাবে চিন্তাশীল মানুষের উপর গুরুত্ব প্রদান করে তিনি যে জ্ঞানবিদ্যাগত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেন তার ফলে বুদ্ধিবাদী হওয়া সত্ত্বেও প্লেটোর সাথে তাঁর পার্থক্য সূচিত হয়। এই কৃতিত্বের কারণেই তাঁকে আধুনিক দর্শনের জনক হিসাবে মর্যাদা দেয়া হয় বলে রবার্ট এ্যাকারম্যান মনে করেন।[৪২] বস্তুতপক্ষে তিনি শুধু আধুনিক দর্শনেরই জনক নন বরং আধুনিক জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে বুদ্ধিবাদের জনক। তাঁর জ্ঞানবিদ্যাগত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, এমনকি তাঁর আলোচনার ধরনও কান্ট পর্যন্ত তাঁর পরবর্তী সকল বুদ্ধিবাদী দর্শনিকের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীতে হল্যাণ্ডের বুদ্ধিবাদী স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭ খ্রিঃ) এবং জার্মান বুদ্ধিবাদী লাইবনিজ (১৬৪৬-১৭১৬ খ্রিঃ) মূলত দেকার্তের বুদ্ধিবাদী ধারাকেই অনুসরণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩.৩ লকের জ্ঞানবিদ্যা

রেনেসাঁ পরবর্তীকালের জ্ঞানবিদ্যার ঐতিহাসিক ধারার আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, এ সময়ে বিজ্ঞানের মত দর্শনের জগতেও পদ্ধতি নির্মাণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার যথার্থ প্রতিনিধি বেকন ও দেকার্ত যথাক্রমে আরোহাত্মক এবং অবরোহাত্মক পদ্ধতিকে দর্শনের জন্য যথার্থ পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করে অভিজ্ঞতাবাদী ও বুদ্ধিবাদী মতবাদ দিয়েছেন। বেকনের পদ্ধতিতে যেমন তৎকালীন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রভাব লক্ষিত হয় তেমনি দেকার্তের পদ্ধতিতে তৎকালীন গণিতের উন্নতির প্রভাব পড়ে। সতেরো শতকের শেষদিকে দর্শনের ক্ষেত্রে এ ধরণের পদ্ধতি নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখা যায়। প্রাকৃতিক জগতের অধ্যয়নের আগে মানব প্রকৃতি সম্পর্কিত অধ্যয়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। তখন এ সত্য উপলব্ধি করা হয় যে, বেকন যেমন আরোহ পদ্ধতিকে বিনা বিচারে দর্শনের পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন তেমনি দেকার্তও তাঁর সংশয় পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানের সীমা, বিস্তৃতি ইত্যাদি অর্থাৎ জ্ঞানবিদ্যাগত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যথার্থ বিচারমূলক অনুসন্ধান করেন নি। তাঁদের উভয়ই পূর্বসংস্কার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। বেকন যেমন আক্রান্ত হয়েছেন বিজ্ঞানের ব্যক্তিনিরপেক্ষতার পূর্ব সংস্কার দ্বারা দেকার্ত তেমনি আক্রান্ত হয়েছেন অন্তর্ধারণার পূর্ব সংস্কার দ্বারা। তাই এসময়ে দর্শনে মুক্তভাবে অর্থৎ পূর্ব সংস্কারের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে মানব প্রকৃতির অধ্যয়ন বা জ্ঞানবিদ্যাগত প্রশ্নাবলীর যথার্থ অধ্যয়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। এ যুগকে আধুনিক দর্শনে মুক্ত জ্ঞানালোকের যুগ বলে। মানুষের জ্ঞানের সীমা নির্ধারণই এ যুগের চিন্তাবিদদের প্রধান লক্ষ্য। ১৬৯০ সালে জন লক (১৬৩২–১৭০৪) এর *Essay on Human Understanding* প্রকাশিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এ যুগের সূচনা হয় এবং ১৭৮৯ সালে কান্টের *Critique of Pure Reason* প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর অবসান ঘটে।[৪৩] লক, বার্কলে ও হিউম মূলত এ যুগেরই প্রধান দার্শনিক।

যদিও এযুগের দার্শনিকদের উপর পূর্ববর্তী রেনেসাঁ পর্বের দেকার্ত প্রমুখ বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের প্রভাব ছিল তবুও জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে এদের মূল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অভিজ্ঞতাবাদী। এসব দর্শনিকের প্রধান কাজ ছিল সংবেদনোপাত্ত থেকে প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া জ্ঞানকে অধিকার করা। এজন্যই এ যুগের দর্শন মনস্তত্ত্ব ও শারীরবিজ্ঞানের সাথে নিবিড় সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই অনুসন্ধান কার্য পরিচালনার জন্য অনুসন্ধানের সকল ক্ষেত্রেই চিন্তার, বলার ও প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রয়োজন হয়। তাই দার্শনিকগণ সকল প্রকার চার্চের কর্তৃত্ব ও বিশ্বাসের কর্তৃত্বকে বর্জন করেন। চিন্তার এই স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ১৬৮৮ সালের ইংরেজ বিপ্লব যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে।[৪৪] এতে ইংল্যাণ্ডে যে উদার মতবাদের প্রতিষ্ঠা হয় তার ফলেই ইংল্যাণ্ড উৎপীড়িত ও বিতাড়িত ধর্মীয় শরণার্থী এবং দার্শনিক সংশয়বাদীদের আশ্রয়স্থল হিসাবে পরিচিত হয়। এ ছাড়া একারণেই ইংল্যান্ডে লকের মত বাস্তববাদী দার্শনিকের পর বার্কলের মত উগ্র ভাববাদী এবং এরপর হিউমের মত সংশয়বাদী দার্শনিকের উদ্ভব ঘটে। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত তিনজন দার্শনিকই অধিবিদ্যার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রদান করলেও জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে সকলেই অভিজ্ঞতাবাদকে সমর্থন করেন এবং তাঁদেরকে দিয়েই আধুনিক বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদের গৌরবময় ঐতিহ্য গড়ে উঠে। জন লকই এ ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাই লককে ইংল্যাণ্ডের ১৬৮৮ সালের বিপ্লবের সবচেয়ে প্রগতিশীল ও সফল প্রচারক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। রাজনীতি ও দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাবের জন্য তাঁকে ইংল্যাণ্ডের দার্শনিক উদারতাবাদ ও জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাবাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ও অভিহিত করা হয়।[৪৫]

লক তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে দেকার্তের অন্তর্ধারণাকে খণ্ডন করে বুদ্ধিবাদের অসারতা প্রমাণ করেন। তিনি ধারণাগুলোর মধ্যে সংযোগ অর্থাৎ মিল বা অমিলকেই জ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন।[৪৬] ষ্টোয়িক দার্শনিক জেনোর মত লকও জন্মের সময় মন টেবুলে–রাসা বা অলিখিত সাদা কাগজের মত থাকে বলে মনে করেন। এতে কোন প্রকার ধারণা থাকে না। অভিজ্ঞতার সাহায্যেই জ্ঞানের উপাদানরূপ বাহ্য বস্তুর ধারণা নিষ্ক্রিয় মনে আসে। অভিজ্ঞতা বলতে লক বাহ্য বা মানস প্রত্যক্ষণকে বুঝান। তাই লক প্রত্যক্ষণকেই জ্ঞানের অভিমুখে প্রথম পদক্ষেপ বা প্রথম স্তর এবং জ্ঞানের সমস্ত উপাদানের একমাত্র পথ বলেছেন। প্লেটো তাঁর *Theaetetus* গ্রন্থে প্রত্যক্ষণের সাথে জ্ঞানের অভিন্নতা সম্পর্কিত মতকে খণ্ডন করেন। দেকার্ত, লাইবনিজ প্রমুখ দার্শনিক এ মতবাদের উপরই গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এই প্রেক্ষাপটে লকই প্রথম প্রত্যক্ষণকে জ্ঞানের একমাত্র উৎস বলায় তাঁর মতবাদকে একটি নতুন ও বিপ্লবাত্মক মতবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।[৪৭] মনের প্রাথমিক ক্ষমতা হল এসব সংবেদন ও অন্তদর্শনজাত ধারণাকে গ্রহণ করা। ধারণা বলতে তিনি মন যাকে সরাসরি অনুভব করে অর্থাৎ প্রত্যক্ষণ, চিন্তা ও বুদ্ধির সাক্ষাৎ বিষয়বস্তুকে বুঝান।[৪৮] লকের মতে, বস্তুর ধারণা বস্তুর অনুরূপ। ধারণার উৎপত্তির কারণ হিসাবে তিনি মনের নয় বরং জড় বস্তুরই বস্তুনিষ্ঠতা ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ ধারণার উৎপত্তির জন্য মনকে জড়ের উপরই নির্ভর করতে হয়। এজন্য তাকে আধুনিক জড়বাদের অগ্রদূতও বলা হয়।

ধারণাকে লক দু'ভাগে ভাগ করেন। সরল ও যৌগিক। সরল ধারণা বলতে তিনি বস্তুর সংবেদন ও অন্তদর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিচ্ছিন্ন ধারণাকে বুঝান। মন নিষ্ক্রিয়ভাবে এগুলোকে গ্রহণ করে। এগুলো মনে আসার পর মন সক্রিয় হয়ে উঠে এবং এসব সরল

Dhaka University Institutional Repository

ধারণার সাদৃশ্য ও বৈষম্য লক্ষ্য করে বিশেষ ধারণা থেকে সার্বিকীকরণের মাধ্যমে সার্বিক ধারণা গঠন করে। তাই তাঁর সুবিখ্যাত উক্তি, বুদ্ধিতে এমন কিছু নাই যা পূর্বে অভিজ্ঞতায় ছিল না। এভাবে তিনি দেখান যে; আরোহ পদ্ধতিতে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞানোৎপত্তি ঘটে। অবশ্য নিষ্ক্রিয় মন সক্রিয় হয়ে কিভাবে সার্বিক ধারণা গঠন করে এ সম্পর্কে লক বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা দেননি। পরবর্তীতে কান্টের বিচারবাদে ক্যাটাগরী ও দেশ কালের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যার প্রয়াস লক্ষিত হয়।

জ্ঞানের সীমা সম্পর্কে লকের মত হল, যেহেতু ধারণার মধ্যে মিল ও অমিল প্রত্যক্ষ করাই জ্ঞান সেহেতু অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণার আলোকে বস্তুকে যতটুকু জানা যায় ততটুকুর জ্ঞানই পাওয়া সম্ভব। অর্থাৎ জ্ঞানের একটা সীমা আছে। জ্ঞানের যথার্থতা সম্পর্কে তার মত হল, অভিজ্ঞতা জ্ঞানকে যতটুকু প্রমাণ করতে পারে জ্ঞান ততটুকুই প্রতিপাদনযোগ্য বা যথার্থ। অর্থাৎ বস্তু ও ধারণার মিল থাকলেই জ্ঞান যথার্থ, মিল না থাকলে জ্ঞান অযথার্থ। উল্লেখ্য যে, দেকার্ত অন্তর্ধারণাকে স্বতসিদ্ধ হিসাবে ঘোষণা করে জ্ঞানের সীমাকে অসীম করেছিলেন অর্থাৎ সব কিছুরই জ্ঞান পাওয়া সম্ভব হয়ে পড়েছিল। কিন্তু লক তাঁর *Essay* গ্রন্থের প্রথম পুস্তকে অন্তর্ধারণাকে খণ্ডন করেন এবং ধারণার মধ্যে মিল ও অমিল প্রত্যক্ষ করাকেই জ্ঞান হিসাবে আখ্যায়িত করে সংবেদনলব্ধ সরল ধারণার মধ্যে জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করার মাধ্যমে প্রথম বারের মত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এটি জ্ঞানের সীমার ক্ষেত্রে লকের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। পরবর্তীকালে হিউম জ্ঞান আদৌ সম্ভব কিনা বলে যে মৌলিক প্রশ্নটি উথাপন করেছেন লকই তার পটভূমি তৈরী করেন।[৪৯] তিনি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতার উপর নির্ভরশীল বলায় সংশয়বাদের পথ প্রশস্ত হয়। হিউমের দর্শনে লকের এ দিকটির প্রভাব দেখা যায়। তবে লক জ্ঞানের সীমা অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ, একথা বললেও তিনি সংশয়বাদী নন। কারণ তিনি দ্রব্য ঈশ্বর ও কার্যকারণ ইত্যাদিকে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, বস্তুর যে ক্ষমতা আমাদের মধ্যে ধারণা সৃষ্টি করে তাহল বস্তুর গুণ। এ গুণ দুই প্রকার। মুখ্য বা বস্তুনির্ভর, যেমন, বিস্তৃতি, ওজন, গতি ইত্যাদি এবং গৌণ বা মনোনির্ভর। যেমন রং, স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদি। লকের এই গৌণ গুণের ধারণার উপর আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। লকের মতে, এই মুখ্য ও গৌণ গুণের আধার হল দ্রব্য। এ দ্রব্য জড়ীয় ও আধ্যাত্মিক দুই প্রকার এবং এরা অজ্ঞেয়। এছাড়া লক ত্রিবিধ জ্ঞানের কথা স্বীকার করেছেন।[৫০] যথা, (ক) স্বজ্ঞামূলক, অর্থাৎ মন ধারণার সাহায্য ছাড়া সরাসরি দু'টো ধারণার মিল অমিল প্রত্যক্ষ করে যে জ্ঞান লাভ করে, (খ) প্রমাণমূলক, অর্থাৎ ধারণার সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ হয়। যেমন, ঈশ্বরের জ্ঞান, এবং (গ) সংবেদনমুলক বা অভিজ্ঞতাজাত। লকের মতে সজ্ঞামূলক ও প্রমাণমূলক জ্ঞানই নিশ্চিত। সংবেদনমূলক জ্ঞান হল সম্ভাব্য। সকল জ্ঞানই প্রাথমিকভাবে সংবেদন থেকে আসে একথা বলায় তাকে অভিজ্ঞতাবাদী হিসাবে আখ্যায়িত করা হলেও অভিজ্ঞতাজাত নয় এমন প্রমাণমূলক জ্ঞানকে নিশ্চিত বলে স্বীকার করায় এবং আধ্যাত্মিক দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করায় তাঁকে অনেকে সীমিত অর্থে অভিজ্ঞতাবাদী বলে মনে করেন।[৫১]

মূলত লকের মতবাদের কূটাভাষ ছিল বহির্জগৎ সম্পর্কিত জ্ঞান নিয়ে। ধারণার মধ্যে মিল ও অমিল লক্ষ্য করাই যদি জ্ঞান হয় তবে আমরা অন্য মানুষের বা বাহ্য জগতের অস্তিত্বের জ্ঞান পেতে পারি না। কারণ অস্তিত্ব মনের ধারণা নয়। সুতরাং জ্ঞান কেবল জ্ঞাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং বাহ্য জগতের সাথে সমস্ত সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। লক মূলত এই কূটাভাষের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য উপরোক্ত তিন প্রকার জ্ঞানের কথা বলেন। কিন্তু লকের এ মত তাঁর অভিজ্ঞতাবাদী পূর্ববর্তী মতের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। সংবেদনের কারণ আছে এবং এই কারণগুলো সংবেদনের অনুরূপ। লকের এই মত অভিজ্ঞতাবাদী নয় বরং অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ। এই অসঙ্গতির হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যই লক জ্ঞানের যথার্থতাকে ধারণা ও বস্তুর সঙ্গতির উপর নির্ভরশীল করে তোলেন এবং সকল প্রকার ধারণা বস্তুর অনুরূপ বলে মত প্রকাশ করেন।[৫২] রাসেল অভিজ্ঞতাবাদের এই অসঙ্গতিকে বর্তমান কাল পর্যন্ত একটি সমস্যা বলে মনে করেন। হিউম এই সমস্যা সমাধান করতে গিয়েই সংবেদনের বাহ্য কারণকে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এ মত তাঁর অভিজ্ঞতাবাদের মূল সূত্রের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ছাপ ছাড়া কোন ধারণার অস্তিত্ব নাই—এ মতের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। কারণ, ইন্দ্রিয়ছাপ শব্দটি বাহ্য কারণ নির্দেশ করে। সুতরাং হিউম লক সম্পাদিত কূটাভাষ থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করে নিজেই আবার কূটাভাষ সৃষ্টি করেছেন।[৫৩]

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, লকের মতবাদ যদিও ত্রুটিমুক্ত ছিল না তবুও তিনি প্রাচীন যুগের সোফিষ্ট–এপিকিউরিয়াস – জেনো, মধ্যযুগের সেন্ট থমাস একুইনাস এবং আধুনিক যুগের লক প্রবর্তিত অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যাগত ধারার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি আধুনিক প্লেটোনিক ধারার প্রভাবে প্রভাবিত অধুনিক বুদ্ধিবাদী দেকার্তের সহজাত ধারণাকে খণ্ডন করে বুদ্ধিবাদের ভিত দুর্বল করেন এবং অভিজ্ঞতালব্ধ সংবেদনের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তৃতিকে সীমাবদ্ধ করেন। এদু'টো বিষয়ই অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানতাত্ত্বিক ধারায় তাঁর নবতর সংযোজন। বেকন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেও এ পদ্ধতিকে তিনি

Dhaka University Institutional Repository

বিচারবিযুক্তভাবে গ্রহণ করেছিলেন। লক বেকনের এ ত্রুটি থেকে দর্শনকে মুক্ত করেন। তাই একথা বলা হয় যে, লকের অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদেই প্রথম আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি যথার্থ অর্থে সুবিচার করা হয়। তিনি দেকার্তের অন্তর্ধারণা খণ্ডন করে কেবল এটুকু প্রমাণ করেন যে, সাধারণের জ্ঞানের মধ্যেও অন্তর্ধারণাকে সন্দেহ করার পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়ে গেছে। এছাড়া তিনি এও দেখান যে, যেহেতু ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের জন্য আবশ্যিক সেহেতু যে কোন যথার্থ দার্শনিক জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আবশ্যিক ভিত্তি।[৫৪] পরবর্তীতে তাঁর অনুসারী বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদী জর্জ বার্কলে লক প্রবর্তিত মতবাদ থেকে দ্রব্যের অজ্ঞেয়তা ও বাহ্য বস্তুর জ্ঞান সম্পর্কিত সমস্যা দূরীকরণের প্রয়াস নেন যার ফলে লকের বস্তুবাদী জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ বার্কলের হতে ভাববাদে পরিণত হয়। অবশ্য এর পরবর্তীতে ডেভিড হিউম এ উভয় দার্শনিকের দ্বারা সম্পাদিত অভিজ্ঞতাবাদের সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে অভিজ্ঞতাবাদের সঙ্গতিপূর্ণ পরিণতি হিসাবে সংশয়বাদের জন্ম দেন।

৩.৩.৪ বার্কলের জ্ঞানবিদ্যা

লক দেকার্তের অন্তর্ধারণাকে খণ্ডন করে অভিজ্ঞতাবাদের গোড়াপত্তন করেন। বার্কলে লকের বিমূর্ত ধারণাকে অস্বীকার করে লকের অভিজ্ঞতাবাদের অগ্রগতি সাধন করেন।[৫৫] তবে তিনি সংবেদন ও অন্তদর্শনকে জ্ঞানের একমাত্র প্রাথমিক উপাদান হিসাবে আখ্যায়িত করেও সংবেদনের কারণ হিসাবে জড় এবং অন্তদর্শনের কারণ হিসাবে অধ্যাত্ম দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদে অসঙ্গতি সম্পাদন করেছেন। এছাড়া তিনি অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিকোন থেকে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য বস্তুকে বস্তুর ধারণার অনুরূপ বলেছেন। অভিজ্ঞতাবাদী হিসাবে একথাও তিনি বলতে পারেন না। কারণ, তিনি কেবল বস্তুর ধারণাকেই অভিজ্ঞতায় পান, বস্তুকে পান না। লক পরবর্তী বৃটিশ দার্শনিক জর্জ বার্কলে (১৬৮৫–১৭৫৩) লকের দ্বারা সম্পাদিত অভিজ্ঞতাবাদের এসব ত্রুটি নিরসন করে অভিজ্ঞতাবাদকে যৌক্তিক ও সুসংহত রূপ দেবার চেষ্টা করেন। বার্কলের দার্শনিক আলোচনার দু'টি উদ্দেশ্য। জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে লকের অভিজ্ঞতাবাদ থেকে অভিজ্ঞতা বহির্ভূত জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করা এবং অধিবিদ্যার ক্ষেত্রে লকের স্বীকৃত বস্তুবাদী মতবাদ বর্জন করে ঈশ্বরের একচ্ছত্র অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। লক বাহ্য জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করায় তাঁর মতবাদে বস্তুবাদ, নাস্তিকতাবাদ, সংশয়বাদ ও ধর্মহীনতার বীজ নিহিত ছিল। বিশপ বার্কলে এসব বীজ উৎপাটনে প্রয়াসী হন। তবে বার্কলের অধিবিদ্যাগত উদ্দেশ্যই তাঁর জ্ঞানবিদ্যাগত লক্ষ্য সাধনে বাধার সৃষ্টি করে, অর্থাৎ তাঁর অভিজ্ঞতাবাদকে অসঙ্গতিপূর্ণ করে। *Principles of Human Knowledge* এবং *Dialogue of Hylas and Philonous* গ্রন্থদ্বয়ে বার্কলের জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদ পাওয়া যায়। বার্কলে তাঁর জ্ঞান বিষয়ক মতবাদে লকের যেসব বিষয়ের সমালোচনা করেন সেগুলো হলঃ (১) সার্বিক ও বিমূর্ত ধারণার অস্তিত্ব, লক যাকে বিশেষ ধারণা থেকে গঠন করেন; (২) ধারণার মূলে জড়ীয় সত্তার অস্তিত্বের পূর্বধারণা; (৩) দ্রব্যের ধারণা; এবং (৪) মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যকার পার্থক্য।

বার্কলের মতে, লক বাহ্য জগতের মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করে তাঁর অভিজ্ঞতাবাদকে অসঙ্গতিপূর্ণ করেছেন। এই স্বীকৃতির কারণ হল, মনের বিমূর্ত ধারণা গঠনের ক্ষমতাকে স্বীকার করা। কিন্তু, অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস, লকের এ মতকে মেনে নিলে বিমূর্ত বা সার্বিক ধারণার জ্ঞানকে স্বীকার করা যায় না। কারণ, এর কোন অভিজ্ঞতা নেই। অভিজ্ঞতায় আমরা যা পাই তা হল সাদা, কালো, লাল রং এবং এসব রং–সম্পন্ন বিশেষ বস্তু। আমরা যেমন সাদাত্ব, কালোত্ব, লালত্বকে অভিজ্ঞতায় পাই না তেমনি বিশেষ বস্তুর সার্বিক অস্তিত্বও অভিজ্ঞতায় পাই না। তাই তিনি সার্বিক ধারণা সম্ভব নয় বলে মত প্রকাশ করেন।[৫৬] যেসব শব্দ দ্বারা বিমূর্ত ধারণা প্রকাশ করা হয় তা শুধুমাত্র এক একটি নাম। এই নামের অনুরূপ কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই। সার্বিক ধারণাকে নাম হিসাবে আখ্যায়িত করে বার্কলে যে মতবাদ দেন তাকে 'নামবাদ' বলা হয়।[৫৭] যেহেতু অভিজ্ঞতায় পাই না বলে কোন প্রকার সার্বিক ধারণার অস্তিত্ব নাই সেহেতু বাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ অস্তিত্বও স্বীকার্য নয় এবং ঠিক একই কারণে লকের মুখ্য ও গৌণ গুণের ভিত্তি অজ্ঞেয় দ্রব্যের অস্তিত্বকে স্বীকার করাও যুক্তিহীন বলে বার্কলে মনে করেন।[৫৮]

লক মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে পার্থক্য করে বলেছিলেন মুখ্য গুণ বস্তুগত এবং গৌণ গুণ মনোগত। কিন্তু বার্কলে এ পার্থক্যকে অস্বীকার করে বলেন, এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ, মুখ্য গুণগুলোও গৌণ গুণের মতই ইন্দ্রিয়–প্রত্যক্ষ নির্ভর ও ব্যক্তিভেদে ভিন্ন এবং এগুলোকে গৌণ গুণ থেকে আলাদা করে প্রত্যক্ষণ করা যায় না। সুতরাং এরা উভয়ই প্রত্যক্ষ নির্ভর। আর যা কিছু প্রত্যক্ষ নির্ভর তাই, বার্কলের মতে, মনের ধারণা। এভাবে বার্কলে লকের দুই প্রকার গুণের পার্থক্যকে অস্বীকার করে লক যাকে গুণ বলেছিলেন তাকে 'ধারণা'য় রূপান্তরিত করেন। তাঁর মতে, আমরা যাকে জড় বলে থাকি তা আসলে কতিপয় ইন্দ্রিয়লব্ধ গুণের সমষ্টি। এসব গুণের সবই মানসিক অবস্থা বা ধারণা মাত্র।[৫৯] লক বস্তুর ধারণাকে বস্তুর অনুরূপ বলেছিলেন। বার্কলের মতে,

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপ মানেই অভিন্ন। বস্তুই ধারণা। বস্তুই যেহেতু ধারণা আর ধারণাই যেহেতু প্রত্যক্ষিত হয় সেহেতু বার্কেলের সিদ্ধান্ত হল, জড় জগৎ বা বহির্জগৎ বলে কোন জগতের অস্তিত্ব নাই। যা কিছু আছে সবই আমাদের মনের ধারণা হিসাবেই আছে। সুতরাং একমাত্র মনের ধারণাই অস্তিত্বশীল। আর যা প্রত্যক্ষিত হয় তাই মনের ধারণা। এজন্য লক যেখানে বলেছিলেন, বুদ্ধিতে এমন কিছু নাই যা পূর্বে অভিজ্ঞতায় ছিল না সেখানে বার্কলের সিদ্ধান্ত হল, অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর। এটাই তাঁর মতবাদের সার সংক্ষেপ।[৬০] তাঁর এ সিদ্ধান্তের দু'টি দিক। প্রথমত, প্রত্যক্ষ ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা জ্ঞান পাই না। এ দিকটির জন্য তিনি লকের চেয়ে পরিশোধিত অভিজ্ঞতাবাদী। এবং দ্বিতীয়ত, বস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে। এ দিকটির জন্য তাঁর হাতে লকের বস্তুবাদ ভাববাদে রূপ নেয় এবং তিনি অভিজ্ঞতাবাদী ভাববাদী, ব্যক্তিগত ভাববাদী, আত্মগত ভাববাদী ইত্যাদি নামে খ্যাত হন।

অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর, বার্কলের এ সিদ্ধান্তের ফলে জ্ঞানবিদ্যা থেকে সংশয়বাদের ভিত ভেঙ্গে পড়ে। কারণ, এতে সংবেদনগুলো বাহ্য কোন বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করছে কি না এ প্রশ্নের অবকাশ থাকে না এবং জ্ঞান সম্ভব বলে বিবেচিত হয়। এ দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞানের নিশ্চয়তাও দান করে। কারণ, ধারণা ও বস্তু অভিন্ন বলে ভ্রান্ত জ্ঞানের সম্ভবনা থাকে না। এছাড়া এই মত সাধারণ জ্ঞানকেও সমর্থন করে। এসব সদর্থক দিক থাকা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর, বার্কলের এ সিদ্ধান্ত তাঁর মতবাদকে আত্মবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত করে। এথেকে মুক্তি পাবার জন্য বার্কলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে আমাদের প্রত্যক্ষকে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষের একটা অংশ হিসাবেই বর্ণনা করেন। তাঁর মতে, আমরা যখন কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করি তখন ঈশ্বরের প্রত্যক্ষের অংশ হিসাবেই তা প্রত্যক্ষ করি এবং আমরা যখন কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করি না তখন সার্বিক প্রত্যক্ষণ কর্তারূপ ঈশ্বরের প্রত্যক্ষের বিষয় হিসাবে বিষয়টি অস্তিত্বশীল থাকে। এভাবে ঈশ্বরের ধারণাকে টেনে এনে বার্কলে আত্মবাদের অভিযোগ থেকে তাঁর অভিজ্ঞতাবাদী ভাববাদকে রক্ষা করার প্রয়াস পেয়েছেন বলে মনে করা হয়।[৬১]

লক ধারণা উৎপত্তির ক্ষেত্রে মনের ক্ষমতাকে অস্বীকার করেছিলেন বলে বাহ্য বস্তুর অজ্ঞেয় অস্তিত্ব স্বীকার করে মুখ্য ও গৌণ গুণাবলীর কারণ নির্দেশ করেছিলেন। বার্কলে লকের প্রথমোক্ত কথাটিকে স্বীকার করেন অথচ বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। ফলে তাঁকে নতুন করে মনের ধারণার কারণ নির্দেশ করতে হয়। বার্কলের মতে, এর কারণ কোন জড় দ্রব্য নয় বরং অদৈহিক সক্রিয় দ্রব্য বা ভাব। এই ভাব হল একটি সরল অবিভক্ত সক্রিয় সত্তা। এই সক্রিয় সত্তাই অসীম বুদ্ধিময় সত্তা বা ঈশ্বর। তাঁর মতে, আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা যা কিছু শুনি, দেখি, অনুভব করি তার সবকিছুই হল ঈশ্বরের শক্তির কার্য বা ফল।[৬২] ঈশ্বরের দেয়া ধারণাবলীর সুসংহত সমষ্টিকেই আমরা প্রকৃতি বলি। যে নিয়মানুবর্তিতা ও পরম্পরার মাধ্যমে ঈশ্বর অসীম মনে সংবেদন সৃষ্টি করেন তাঁদেরকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলা হয়। আর এই প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে ঈশ্বরের অভিব্যক্তি জানাই হল দর্শনের লক্ষ্য।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, জর্জ বার্কলে জন লক সমর্থিত অভিজ্ঞতাবাদী ধারারই প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে লকের অভিজ্ঞাতাবাদের দোষত্রুটি সংশোধনের প্রয়াস নিয়েছেন। এর ফলে একদিকে যেমন লক সম্পাদিত সংবেদনের কারণরূপ বাহ্যজগতের জ্ঞান প্রাপ্তি সংক্রান্ত কূটাভাষ দূরীভূত হয়েছে, অজ্ঞেয় ও অভিজ্ঞতালব্ধ নয় এমন জড়দ্রব্যের ধারণা অনাবশ্যক বলে পরিগণিত হয়ে বর্জিত হয়েছে এবং জ্ঞানবিদ্যা থেকে সংশয়বাদের বীজ তিরোহিত করে নিশ্চিত জ্ঞান সম্ভব একথা ঘোষিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি অভিজ্ঞতাবাদ আত্মগত ভাববাদের কবলে পড়ে অসঙ্গতির মুখোমুখি হয়েছে। লকের জড় ও অধ্যাত্ম দ্রব্যের জগতে বার্কলের অধ্যাত্ম দ্রব্য এক সর্বগ্রাসী ভূমিকা পালন করেছে যা অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। লক যেমন জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে অভিজ্ঞতাবাদের অতিক্রম করেন বার্কলে তেমন অধ্যাত্ম দ্রব্যের সর্বময়তা ঘোষণা করে অভিজ্ঞতাবাদকে অতিক্রম করে যান। পরবর্তীকালে নিরপেক্ষ একত্ববাদ দ্বারা ধারণাই বস্তু অর্থাৎ বস্তু ও ধারণা অভিন্ন, বার্কলের এই মতকে খণ্ডন করা হয়।

সুতরাং দেখা যায়, লক ও বার্কলে উভয়ই অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদের সাথে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কিত ধারণার সামঞ্জস্যপূর্ণতা ব্যাখ্যার চেষ্টা করতে গিয়েই অভিজ্ঞতাবাদে ত্রুটি সম্পাদন করেছেন। লকের মতবাদে যদিও সংশয়বাদের বীজ নিহিত তবুও তিনি বেকন নির্দেশিত আরোহ পদ্ধতিতে সার্বিক ধারণার অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং বার্কলে সরাসরি নিশ্চিত জ্ঞানকে স্বীকার করে সংশয়বাদের হাত থেকে অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যাকে রক্ষার প্রচেষ্টা করেছেন। তাঁদের দর্শনে অভিজ্ঞতাবাদের অসঙ্গতির কারণ মূলত এই প্রচেষ্টার মধ্যেই নিহিত। আলোচনার অগ্রগতিতে আমরা দেখবো যে, বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদের অন্যতম প্রতিনিধি ডেভিড হিউম এ সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার আধুনিক যুগ সম্পর্কিত উপরের আলোচনা থেকে আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে মূলত দু'টি ধারার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তার একটি অভিজ্ঞতাবাদ অন্যটি বুদ্ধিবাদ। প্রাচীন যুগে সোফিষ্টদের হাতে সৃষ্ট অভিজ্ঞতাবাদী

Dhaka University Institutional Repository

ধারা এপিকিউরিয়াস ও জেনোর চিন্তায় লালিত ও পরিশোধিত হয়ে মধ্যযুগের সেন্ট থমাস একুইনাসের প্রতিনিধিত্বের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগে বেকনের হাতে পৌঁছায়। বেকন রেনেসাঁ উত্তর বিজ্ঞানের প্রভাবে এই অভিজ্ঞতাবাদকে আরোহ পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত করে এর যৌক্তিক ভিত্তি দেবার চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে সতেরো শতকের বৃটিশ দার্শনিক লক ও বার্কলে এই অভিজ্ঞতাবাদী ধারার প্রতিনিধিত্ব করলেও তাঁরা বেকনের মত দর্শনের ক্ষেত্রে পদ্ধতি নির্মাণের বিরোধিতা করেন। তাঁরা কোন পদ্ধতিকে পূর্ব স্বীকৃত হিসাবে ধরে না নিয়ে মুক্তভাবে বিচার বুদ্ধির মাধ্যমে জ্ঞানবিদ্যাগত আলোচনায় প্রয়াসী হন। পরবর্তীতে ডেভিড হিউম এ ধারারই সমর্থন ও পরিশোধন করে অভিজ্ঞতাবাদী ব্যাখ্যা দ্বারাই প্রমাণ করেন যে, আরোহাত্মক পদ্ধতি নিজেই সম্ভাব্য, নিশ্চিত নয়। তাঁর এ ব্যাখ্যা বিশ শতকের আপেক্ষিকতাবাদী পদার্থ বিজ্ঞানের তত্ত্বে সমর্থিত হয়েছে।

অন্যদিকে, আধুনিক দর্শনে আরেকটি জ্ঞানবিদ্যাগত ধারার অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। এ ধারাটি মূলত প্রাচীন যুগে এরিস্টটলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্লেটো এবং সক্রেটিস প্রমুখ দার্শনিক দ্বারা সমর্থিত ও পরিশোধিত হয়ে মধ্যযুগের দার্শনিক সেন্ট অগাষ্টিনের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে আধুনিক ফরাসী দার্শনিক রেনে দেকার্ত-এর কাছে পৌঁছায়। দেকার্ত গণিতের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এই বুদ্ধিবাদী ধারাটিকে অবরোহ পদ্ধতির উপর স্থাপন করেন এবং অন্তর বা সহজাত ধারণার কথা বলে বুদ্ধিবাদকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস নেন। পরবর্তীতে স্পিনোজা ও লাইবনিজ এ ধারাকেই আরও পরিশোধিত করেন। উল্লেখ্য যে, পরবর্তী আধুনিক জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট বুদ্ধিবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী এদু'টি পরস্পর বিরুদ্ধ ধারাকে সমন্বিত করে বিচারবাদ প্রতিষ্ঠা করলেও জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে এ দু'টি ধারার প্রভাব বিশ শতকের দর্শনেও প্রতীয়মান হয়। লক্ষণীয় বিষয় হল, আধুনিক যুগে রেনেসাঁ ও বিজ্ঞানের উন্নতির প্রভাবে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় প্রাচীন যুগের মত ব্যক্তির স্বাধীন বিচারবুদ্ধি প্রাধান্য পায় এবং জ্ঞানবিদ্যা মূলত মধ্যযুগীয় প্রত্যাদেশ নির্ভরতা থেকে মুক্ত হয়। জ্ঞানবিদ্যার এই বিজ্ঞান প্রভাবিত মুক্তবুদ্ধির ধারা আজ পর্যন্ত তার আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

৩.৩.৫ নির্যাস

এ অধ্যায়ে পাশ্চাত্য দর্শনের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের জ্ঞানবিদ্যার ধারা আলোচনা করতে গিয়ে প্রাচীন যুগে সোফিষ্ট, সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, এরিস্টটল পরবর্তী দার্শনিক হিসাবে এপিকিউরিয়াস ও জেনো এবং সংশয়বাদী জ্ঞানবিদ্যা, মধ্যযুগে সেন্ট অগাষ্টিন এবং সেন্ট থমাস একুইনাসের জ্ঞানবিদ্যা এবং আধুনিক যুগে বেকন, দেকার্ত, লক ও বার্কলের জ্ঞানবিদ্যা সংক্রান্ত মতবাদ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার ফলে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো লক্ষিত হয়।

১। পাশ্চাত্য দর্শনের সকল দার্শনিক জ্ঞানবিদ্যার আলোচনাকে একটি সাধারণ আলোচ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেন নি। বরং জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার সূত্রপাতের জন্য পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসকে একশত বছর অর্থাৎ সোফিষ্টদের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। প্রাক-সোফিষ্ট যুগে পাশ্চাত্য দর্শনের আলোচনা ছিল মূলত বিশ্বতাত্ত্বিক। এক্ষেত্রে ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার সাথে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার পার্থক্য স্পষ্ট। ভারতীয় দর্শনের প্রচলিত নয়টি সম্প্রদায়ই সাধারণভাবে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এই পার্থক্যের কারণ হিসাবে সম্ভবত একথা বলা যায় যে, মূলত জীবন সমস্যার সমাধানকল্পে ভারতীয় দর্শনের জন্ম হলেও বিশ্বতাত্ত্বিক প্রশ্ন থেকেই পাশ্চাত্য দর্শনের জন্ম। ভারতীয় দার্শনিকরা জীবন সমস্যার সমাধানের জন্য যথার্থ জ্ঞান পাবার উপায় সম্পর্কে আলোচনা অর্থাৎ জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা করেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন বিশ্বতাত্ত্বিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে। সম্ভবত ভারতীয় দার্শনিকদের মত পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা আবশ্যিক বিষয় হিসাবে গৃহীত না হওয়ার এটিই একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

২। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার আলোচনাকারী সকল দার্শনিকই জ্ঞানোৎপত্তির উপায় সম্পর্কিত আলোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁরা জ্ঞানের সীমা, সম্ভাবনা, সত্যতার মানদণ্ড ইত্যাদি সম্পর্কিত আলোচনায় মনোনিবেশ করলেও জ্ঞানোৎপত্তির উপায় সম্পর্কিত আলোচনা ছিল তাঁদের জ্ঞানবিদ্যাগত আলোচনার মুখ্য বিষয়। এ বৈশিষ্ট্যের সাথে ভারতীয় দার্শনিকদের প্রমাণতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনার মিল লক্ষিত হয়। ভারতীয় দর্শনের সকল সম্প্রদায়ই জ্ঞানবিদ্যাগত আলোচনা করতে গিয়ে মূলত প্রমাণতত্ত্ব তথা জ্ঞানোৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদের আলোচনার উপরই প্রাধান্য দিয়েছেন।

৩। প্রাচীন যুগে সোফিষ্টদের হাতে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার সূচনা হলেও প্রাচীন, মধ্য এমনকি আধুনিক যুগে বার্কলে পর্যন্ত কোন দার্শনিকই জ্ঞান বলতে কি বুঝায় তার সুস্পষ্ট উত্তর দেন নি। অর্থাৎ জ্ঞানের স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দান করেন নি। প্রাচীন যুগে প্লেটো জ্ঞানকে নিশ্চিতির বিষয় হিসাবে আখ্যায়িত করে এবং পরিবর্তনশীল বিষয় বা অভিমত থেকে আলাদা করে যদিও জ্ঞানের

Dhaka University Institutional Repository

একটি পরিচিতি দানের চেষ্টা করেছেন তবুও একে জ্ঞানের যথার্থ সংজ্ঞা বলা যায় না। এ দুর্বলতার কারণেই পরবর্তীতে আধুনিক জার্মান দার্শনিক কান্ট তাঁর পূর্ববর্তী জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসকে বিচারবিযুক্তবাদের ইতিহাস হিসাবে আখ্যায়িত করে প্রথম বারের মত জ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়ে সর্বজনীন ও আবশ্যিক অবধারণকে জ্ঞান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এক্ষেত্রে ভারতীয় দার্শনিকদের সাথে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের অমিল লক্ষণীয়। ভারতীয় দার্শনিকদের সকলেই প্রথম যথার্থ জ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। অতপর যথার্থ জ্ঞান পাবার উপায় তথা প্রমাণতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন।

৪। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার তিন যুগের দার্শনিকদের জ্ঞানোৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদের আলোচনায় প্রধানত দু'টি ধারা লক্ষিত হয়। এদু'টি ধারা হল অভিজ্ঞাতাবাদ ও বুদ্ধিবাদ। মূলত সোফিষ্টদের অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদ থেকেই পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার জন্ম। কিন্তু সোফিষ্টদের অভিজ্ঞতাবাদ নঞর্থক সংশয়বাদের দিকে মোড় নেয়। পরবর্তীতে এরিষ্টটল পরবর্তী দার্শনিক এপিকিউরিয়াস, জেনো প্রমুখ এ ধারণার প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সোফিষ্টদের অভিজ্ঞতাবাদের নঞর্থক সংশয়বাদী ধারাকে সদর্থক দিকে প্রবাহিত করেন। মধ্যযুগে যদিও প্রাচীন যুগের মত মুক্তবুদ্ধির মাধ্যমে জ্ঞানবিদ্যার চর্চা ছিল না তবুও মধ্যযুগের শেষাংশে সেন্ট থমাস একুইনাস সোফিষ্ট–এপিকিউরিয়াস–জেনো সমর্থিত এ ধারার প্রতিনিধিত্ব করেন। আধুনিক যুগের শুরুতে বেকনের হাতে এ ধারা আবারও নতুন রূপে আলোচিত হয়। বেকন অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যার পদ্ধতি হিসাব বিজ্ঞানে ব্যবহৃত আরোহ পদ্ধতিকে সংযোগ করেন। পরবর্তীতে লক ও বার্কলের হাতে এই ধারাই আরও সংশোধিত হয়ে হিউমের হাতে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। তিনি আরোহাত্মক পদ্ধতির পরিবর্তে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন এবং তাঁর মতবাদেই অভিজ্ঞতাবাদের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে সংশয়বাদের উদ্ভব হয়। যদিও এ সংশয়বাদ সোফিষ্টদের মত জ্ঞানকে অসম্ভব বলে নি বরং জ্ঞানকে সম্ভব্য বলে গঠনমূলক ও জীবনোপযোগী সংশয়বাদ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

অন্যদিকে সোফিষ্টদের অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যার নঞর্থক সংশয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিক্রিয়া হিসাবে জ্ঞানের সর্বজনীন মানদণ্ড আবিষ্কারের লক্ষ্যে প্রাচীন যুগে সক্রেটিস বুদ্ধিবাদী জ্ঞানবিদ্যাগত ধারার গোড়া পত্তন করেন যা প্লেটো ও এরিষ্টটলের চিন্তাধারার মধ্যদিয়ে সংশোধিত আকারে প্রবাহিত হয়। মধ্যযুগে সেন্ট অগাষ্টিন এ ধারারই প্রতিনিধিত্ব করেন যদিও তিনি প্রত্যাদেশ ও বুদ্ধিকে একীভূত করায় তাঁর মতবাদকে প্রত্যাদেশ–প্রভাবিত বুদ্ধিবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। আধুনিক যুগে ফরাসী দার্শনিক দেকার্ত এবং তাঁর অনুসারী স্পিনোজা ও লাইবনিজ এই বুদ্ধিবাদী ধারারই সফল প্রতিনিধি। দেকার্ত বুদ্ধিবাদকে অবরোহাত্মক পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত করে এবং সহজাত ধারণার কথা বলে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বুদ্ধিবাদী ধারাকেই মূলত সংশোধিত ও দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপন করেন।

সোফিষ্ট–এপিকিউরিয়াস–জেনো–একুইনাস–বেকন–লক–বার্কলে সমর্থিত অভিজ্ঞতাবাদী এবং সক্রেটিস–প্লেটো–এরিষ্টটল–অগাষ্টিন–দেকার্ত–স্পিনোজা–লাইবনিজ সমর্থিত বুদ্ধিবাদী ধারা ছাড়াও পাশ্চাত্য দর্শনে সংশয়বাদ নামক একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানবিদ্যাগত ধারার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তবে একথা ঠিক যে, অভিজ্ঞতাবাদী ও বুদ্ধিবাদী ধারাই পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে মূল ধারা হিসাবে পরিচিত। এক্ষেত্রে ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যাগত ধারার সাথে পাশ্চাত্য ধারার সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। ভারতীয় দর্শনে একমাত্র চার্বাক ছাড়া অন্য সবক'টি সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করায় তাঁদের কোনটিকেই বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতাবাদী বা বুদ্ধিবাদী হিসাবে অভিহিত করা যায় না। একমাত্র চার্বাক দার্শনিকদেরকেই বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতাদী হিসাবে পরিগণিত করা যায়।

৫। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যায় জ্ঞানের প্রামাণ্যের বিষয়টি একটি সাধারণ বিষয় হিসাবে আলোচিত হয় নি। অর্থাৎ সকল দার্শনিক আবশ্যিকভাবে প্রামাণ্যের বিষয়ে আলোচনা করেন নি। এক্ষেত্রে ভারতীয় দার্শনিকদের সাথে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় দর্শনের সকল দার্শনিকই জ্ঞানের প্রমাণ্যের বিষয়টিকে সাধারণ ও আবশ্যকীয় বিষয় হিসাবে আলোচনা করেছেন। এর কারণ সম্ভবত এই যে, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ জ্ঞান বলতে কেবল যথার্থ জ্ঞানকে বুঝিয়েছেন। ভ্রান্ত জ্ঞানকে তারা জ্ঞান পদবাচ্য বলে মনে করনে নি। তাই জ্ঞানের প্রামাণ্যের আলোচনা তাঁদের কাছে অত্যাবশ্যকীয় মনে হয় নি। কারণ প্রামাণ্য দ্বারা ভ্রান্ত জ্ঞান থেকে যথার্থ জ্ঞানকে আলাদা করা হয়। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে জ্ঞান বলতে যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা এবং অযথার্থ জ্ঞান বা অপ্রমা উভয়কে

Dhaka University Institutional Repository

বুঝানো হয়েছে। তাই যথার্থ জ্ঞান থেকে ভ্রান্ত জ্ঞানকে আলাদা করার জন্য জ্ঞানের প্রামাণ্যের বিষয়টি অত্যাবশ্যকীয় হিসাবে সকল ভারতীয় দার্শনিকের দ্বারা আলোচিত হয়েছে। এজন্যই ভারতীয় বিশিষ্ট পণ্ডিত শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী জ্ঞানের প্রামাণ্যের প্রশ্নটিকে ইউরোপীয় দর্শনের সমস্যা না বলে ভারতীয় দর্শনের সমস্যা বলেছেন।[৬৩]

৬। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে তাহল জ্ঞানবিদ্যার ঐতিহাসিক ধারার অগ্রগতি তথা কালিক অগ্রগতির সাথে জ্ঞানবিদ্যার বিশেষ ধারার আলোচনাও পরিশোধিত, সংশোধিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। যেমন, সোফিষ্টদের অভিজ্ঞতাবাদের তুলনায় এপিকিউরিয়াসের অভিজ্ঞতাবাদ বেশী ব্যাখ্যাত এবং এসব মতবাদের তুলনায় আধুনিক দার্শনিক লক ও বার্কলের অভিজ্ঞতাবাদ অধিকতর পরিশোধিত পরিমার্জিত ও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। বুদ্ধিবাদী ধারার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এছাড়া একথাও বলা যায় যে, পাশ্চাত্য দর্শনের আধুনিক যুগেই জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা অধিকতর গুরুত্ব বহন করে এবং এ সময়ের দর্শন মূলত জ্ঞানবিদ্যাকে কেন্দ্রিক হয়ে উঠে যা এর পূর্বে দেখা যায় নি। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় মধ্যযুগে একটি নিম্নগামী ধারা পরিলক্ষিত হয়। মধ্যযুগে সমস্ত দর্শন চর্চা ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হলে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় মুক্ত বুদ্ধির প্রয়োগ ব্যহত হয়। ফলে এ সময় জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা একটি নিম্নগামী বিচারবিযুক্ত অবস্থার দিকে মোড় নেয়।

ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার এই ক্রম পরিশোধনের ধারাটি অনুপস্থিত। কারণ ভারতীয় দর্শনের সবক'টি সম্প্রদায়ই সমান গুরুত্বসহ জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা করেছেন। তবে তাঁদের আলোচনা পদ্ধতি ছিল দ্বান্দ্বিক। অর্থাৎ পূর্বপক্ষ – পূর্বপক্ষ খণ্ডন–উত্তর পক্ষ। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় এ পদ্ধতি সর্বক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে উপস্থিত নয়।

একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূলত হিউমের জ্ঞানবিদ্যার প্রেক্ষাপট হিসাবে এ অধ্যায়ে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা করা হয়েছে। এ কারণেই এখানে হিউম পূর্ববর্তী দার্শনিক জন লক পর্যন্ত জ্ঞানবিদ্যার আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখা হল। আলোচনার অগ্রগতিতে হিউমের জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখবো যে, হিউম প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের অভিজ্ঞতাবাদী ধারারই প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদী লক ও বার্কলের অভিজ্ঞতাবাদ থেকে অসঙ্গতিমূলক উপাদান বর্জন করে অভিজ্ঞতাবাদকে সঙ্গতিপূর্ণ করতে গিয়ে আত্মা, দ্রব্য, কার্যকারণ ইত্যাদি সকল প্রকার অভিজ্ঞতা উর্দ্ধ ধারণার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন এবং অভিজ্ঞতাবাদকে সংশয়বাদে পরিণত করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, এটাই অভিজ্ঞতাবাদের সঙ্গতিপূর্ণ পরিণতি। তাঁর এ সংশয়বাদ, তাঁর মতে, নঞর্থক নয় বরং সদর্থক এবং একজন যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদীর পক্ষে এ মতবাদকে সমর্থন করা ছাড়া আর কোন বিকল্পও নাই বলে তিনি মনে করেন। তিনি তাঁর এ সংশয়বাদের নাম দিয়েছেন একাডেমিক সংশয়বাদ। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে হিউমের স্থান নির্ণয় করতে প্রয়াসী হব।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী

১। Paul Edwards (ed.): *The Encyclopedia of Philosophy*, New York, Macmillan Publishing Co. Inc. and The Free Press, 1972, Vol. 1, পৃ· ৯

২। Robert Ackermann: *Theories of Knowledge*, Bombay, Tata McGraw-Hill Publishing Co. Ltd., "Introduction" দ্রষ্টব্য। এছাড়া Paul Edwards (ed.): *The Encyclopedia of Philosophy*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৯ তে প্লেটোকে "real originator of epistemology" বলা হয়েছে।

৩। F. Thilly: *A History of Philosophy*, Allahabad, Central Book Depot., 1978, পৃ· ৫৬

৪। জর্জিয়াস তাঁর *On Nature or Nonexistent* গ্রন্থে এ তিনটি উক্তি করেন।

৫। আমিনুল ইসলাম: *প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৮১, পৃ· ১০৯

৬। R. Ackermann:*Theories*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৩১

৭। নীরদবরণ চক্রবর্তী: *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮, পৃ· ১০

৮। F. Thilly: *History*, পূর্বোক্ত, পৃ ·৭৩

৯। R. Ackermann: *Theories*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৫

১০। পূর্বোক্ত, পৃ· ১৬

১১। সরদার ফজলুল করিম (অনু) : *প্লেটোরিপাবলিক*, ঢাকা, বর্ণমিছিল, ১৯৭৪, ৬ষ্ঠ পুস্তক, ১৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য

১২। F. Thilly: *History* পূর্বোক্ত, পৃ· ৮১–৮২

১৩। সরদার ফজলুল করিম (অনু): *প্লেটোরিপাবলিক*, পূর্বোক্ত, ৫ম পুস্তক, ১৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য

১৪। F.Thilly: *History*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৮১

১৫। R. Ackermann: *Theories*, পূর্বোক্ত, পৃ· ২৪

১৬। Paul Edwards (ed.): *Encyclopedia*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১২

১৭। R. Ackermann: *Theories*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৫৭

১৮। পূর্বোক্ত, পৃ· ৭২

১৯। এরিস্টটল দর্শনের ক্ষেত্রে প্রথম যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি পাঁচ প্রকার বিধেয়কের কথা বলেন। সেগুলো হল সংজ্ঞা, জাতি, বিভেদক লক্ষণ, উপলক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণ। বিভেদক লক্ষণই হল বিশেষ বস্তুর সারসত্তা। অর্থাৎ একই জাতির অন্তর্ভুক্ত কোন একটি বিশেষ শ্রেণী বা উপজাতির অনিবার্য ও সাধারণ গুণ। এই বিভেদক লক্ষণের জ্ঞান ও জাতির জ্ঞান পেলেই বস্তুর যথার্থ জ্ঞান পাওয়া যায়। বস্তুর মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে তা হল বস্তুর অবান্তর লক্ষণের পরিবর্তন। এ পরিবর্তনের মধ্যেও বস্তুর বিভেদক লক্ষণ বা সারসত্তা অপরিবর্তিত থাকে। পরিবর্তনশীল বস্তুর ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তার সারসত্তার জ্ঞান পাওয়া যায়।

২০। Paul Edwards (ed.): *Encyclopedia*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৩

২১। F. Thilly: *History*. পূর্বোক্ত, পৃ· ১৩১

২২। পূর্বোক্ত, পৃ· ১৩২

২৩। পূর্বোক্ত

২৪। Paul Edwards (ed.): *Encyclopedia*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৩

২৫। আমিনুল ইসলাম : *প্রাচীন ও মধ্যযুগের*, পূর্বোক্ত, পৃ· ২৫৭

২৬। F. Thilly: *History*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৭৮

২৭। পূর্বোক্ত, পৃ· ২২৮

২৮। Paul Edwards (ed.): *Encyclopedia*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৫

২৯। পূর্বোক্ত

৩০। R. Ackermann: *Theories*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৩

৩১। আমিনুল ইসলাম: *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন* , ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪, পৃ· ৭৪

৩২। R. Ackermann: *Theories*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৪০ দ্রষ্টব্য

৩৩। F. Thilly: *History*, পূর্বোক্ত, পৃ·২৮৭

৩৪। B. Russell: *History of Western Philosophy*, London, George Allen and Unwin Ltd., 1961, পৃ· ৫২৭

Dhaka University Institutional Repository

৩৫। পূর্বোক্ত

৩৬। F. Thilly: *History*, পূর্বোক্ত, পৃ· ২৯২

৩৭। B. Russell: *History*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৫২৬

৩৮। R. Ackermann: *Theories*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১০১

৩৯। পূর্বোক্ত, পৃ· ১০২

৪০। F. Thilly: *History*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৩১৪

৪১। B. Russell: *History*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৫৪২

৪২। R. Ackermann: *Theories*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১০১

৪৩। W. K. Wright: *A History of Modern Philosophy*, New York, The Macmillan Co., 1965, পৃ·১৩৯

৪৪। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্র পুণঃপ্রতিষ্ঠিত হলে রাজা দ্বিতীয় চার্লস সিংহাসণারোহণ করেন। তার সময়ে ও তার পরবর্তীকালে তার ভ্রাতা দ্বিতীয় জেমস রাজা হলে স্বৈরতন্ত্র চরম আকার ধারণ করে এবং সমগ্র ইংল্যাণ্ডকে বাহুবলের সাহায্যে ক্যাথলিকবাদে পরিণত করার প্রয়াস চালানো হয়। এ স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্তির জন্য হুইগ ও টোরী নেতৃবৃন্দ সম্মিলিতভাবে ইংল্যাণ্ডকে মুক্ত করার জন্য উইলিয়াম অব অরেঞ্জকে আহবান জানান। ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে যুবরাজ উইলিয়াম ইংল্যাণ্ডে পদার্পন করলে পার্লামেন্ট, গীর্জা, সৈন্যবাহিনী সকলে তাঁকে ত্রাণকর্তা হিসাবে বরণ করেন এবং রাজা দ্বিতীয় জেমস পলায়ণ করেন। এ রক্তপাতহীন বিপ্লবের পটভূমিতেই জন লক তাঁর Essay গ্রন্থ রচনা করেন এবং মুক্ত জ্ঞানালোকের যুগের সূচনা হয়।

৪৫। B. Russell: *History*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৫৮৪

৪৬। John Locke: *An Essay Concerning Human Understanding*, ed. by A. Seth, Oxford, Pringle Pattison, 1924, Book IV, Chap. 1

৪৭। B. Russell: *History*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৫৯০

৪৮। John Locke: *Essay*, পূর্বোক্ত, Book II, Chap. VIII

৪৯। C. R. Morris: *Locke, Barkeley and Hume*, London, Oxford University Press, 1963, পৃ· ২১–২২

৫০। John Locke: *An Essay*, পূর্বোক্ত, Book IV, Chap. III

৫১। Paul Edwards (ed.): *Encyclopedia*, Vol. I - 2, পূর্বোক্ত, পৃ· ৫০২

৫২। B. Russell: *History*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৫৯১

৫৩। পূর্বোক্ত, পৃ· ৫৯১–৫৯২

৫৪। R. Ackermann: *Theories*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৪১–১৪২

৫৫। W. K. Wright: *A History*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৭৬

৫৬। R. Ackermann: *Theories*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৫২

৫৭। W. K. Wright: *A History*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৭৭ এবং R. Ackermann, *Theories*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৩৫৯–৬০

৫৮। পূর্বোক্ত, পৃ· ১৭৬ এবং F. Thilly, *History*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৩৫৯–৬০

৫৯। আমিনুল ইসলামঃ *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৯৯

৬০। R. Ackermann: *Theories*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৪৯

৬১। G. A. Johnston: *Development of Berkeley's Philosophy*, New York, Macmillan Publishing Co. Inc.' and The Free Press , 1923, পৃ· ২০৫

৬২। G. Berkeley: *Principles of Human Knowledge*, London, Every man's Libray, 1910, CXLVIII

৬৩। শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য শাস্ত্রীঃ *বেদান্ত দর্শন–অদ্বৈত বেদান্ত*, কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯, পৃ· ৩১৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

হিউমের জ্ঞানবিদ্যা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন যুগ থেকেই বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদ নামক দু'টি জ্ঞানবিদ্যাগত ধারা পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়। বলা যায়, কান্ট পূর্ববর্তী পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যায় এ দু'টি মতবাদেরই প্রতিফলন ঘটেছে। রেনেসাঁ ও বিজ্ঞান বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবিত আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য দর্শন প্রধানত জ্ঞানবিদ্যাকেন্দ্রিক হয়ে উঠে। সতেরো শতকের বৃটিশ দর্শনে এই জ্ঞানবিদ্যাকেন্দ্রিক ধারা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি নির্ভর অভিজ্ঞতাবাদে কেন্দ্রিভূত হয়। এর কারণ হিসাবে দর্শনের উপর সতেরো শতকের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির প্রভাবকে বিবেচনা করা যায়। আধুনিক বৃটিশ দার্শনিকদের হাতেই পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার অভিজ্ঞতাবাদী ধারা সুসংহত ও সমন্বিত রূপ লাভ করে। ডেভিড হিউমের অবদান এক্ষেত্রে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। বিশেষত লক ও বার্কলে স্বীকৃত প্রচলিত দ্রব্যের ধারণাকে খণ্ডন করে এর অভিজ্ঞতাবাদী ব্যাখ্যা দিয়ে হিউমই প্রথম অভিজ্ঞতাবাদের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিকে যথার্থ অর্থে প্রয়োগ করতে এবং অভিজ্ঞতাবাদ থেকে অপর্যবেক্ষণলব্ধ উপাদানকে বর্জন করতে প্রয়াসী হন। হিউমের এ অবদান পরবর্তী জ্ঞানবিদ্যাগত আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। কান্ট একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন যে, হিউমই তাঁকে নির্বিচার নিদ্রা অর্থাৎ বুদ্ধিবাদের একসূত্র প্রভাব থেকে জাগিয়েছেন। অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে এ অবদানই হিউমকে দর্শনের ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে চার্বাকগণ যেমন নিরঙ্কুশভাবে প্রত্যক্ষণের প্রাধান্য ঘোষণা করেছেন একইভাবে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যায় হিউমও প্রত্যক্ষণ এবং ইন্দ্রিয়ছাপকে জ্ঞানের একমাত্র প্রাথমিক উপাদান হিসাবে অভিহিত করে জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন। হিউমের দর্শনের মূল সমস্যাই হল জ্ঞানবিদ্যাগত সমস্যা। তিনি জ্ঞানবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়, যেমন জ্ঞানের উৎস, সীমা, নিশ্চিতি, ক্যাটাগরি সম্পর্কে আলোচনা করলেও জ্ঞানের উৎস সম্পর্কিত আলোচনাই তাঁর মূল আলোচ্য বিষয়।[১]

৪.১ ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণাতত্ত্ব

হিউম তাঁর *A Treatise of Human Nature* গ্রন্থের প্রথম পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে এবং *An Enquiry Concerning Human Understanding* গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে জ্ঞানের উৎস সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।[২] ইতিপূর্বে ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাস আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, একমাত্র চার্বাক দার্শনিকগণই শুধুমাত্র প্রত্যক্ষকে বৈধ জ্ঞানের উপায় বলে স্বীকার করে অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদ প্রদান করেছেন। তাই ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে একমাত্র চার্বাকগণই অভিজ্ঞতাবাদী বলে খ্যাত। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে বিশেষত আধুনিক যুগে লক ও বার্কলের মত হিউমও প্রত্যক্ষণকেই যথার্থ জ্ঞানোৎপাত্তির একমাত্র উপায় হিসাবে অভিহিত করে অভিজ্ঞতাবাদী অবস্থান নিয়েছেন। হিউমের অন্যতম সমালোচক এন কে স্মিথ–এর মতে, প্রত্যক্ষণ শব্দটিকে হিউম, হাচিনসন–এর কাছ থেকে গ্রহণ করেন।[৩]

হিউম প্রত্যক্ষণকে দু'ভাগে ভাগ করেনঃ ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা। তাঁর *Treatise* গ্রন্থের শুরুতেই তিনি বলেছেন, মানব মনের প্রত্যক্ষণগুলো স্পষ্ট দু'টি ভাগে বিভক্ত। এগুলো ইন্দ্রিয়ছাপ এবং ধারণা[৪]। হিউমের কাছে এই ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণাই হল জ্ঞানের একমাত্র উপাদান। এদু'টি উপাদান থেকেই আমাদের অত্যন্ত জটিল অভিজ্ঞতা গঠিত হয়।[৫] মনে প্রথম আগত সংবেদন, অতিরাগ এবং প্রচণ্ড আবেগকে হিউম ইন্দ্রিয়ছাপ নামে অভিহিত করেন। তাঁর মতে যেসব প্রত্যক্ষণ ভীষণ তীব্র ও প্রচণ্ড, তাদের নাম দেয়া যায় ইন্দ্রিয়ছাপ। মনে প্রথম আগত সংবেদন, অতিরাগ ও আবেগকে এ পর্যায়ে ফেলা যায়।[৬] অন্যদিকে ধারণা বলতে তিনি ইন্দ্রিয়ছাপের ক্ষীণপ্রতিরূপকে বুঝান[৭]। অর্থাৎ প্রত্যক্ষণকারী সরাসরি প্রত্যক্ষণের সময় বাহ্য বস্তুর সাথে ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে যে বাস্তব সংবেদন পায় তা হল ইন্দ্রিয়ছাপ। পরবর্তীতে ইন্দ্রিয়ছাপগুলোর অনুপস্থিতিতে সে যখন এগুলোকে নিয়ে চিন্তা করে তখন স্মৃতি বা কল্পনা দ্বারা অতীতে দেখা ইন্দ্রিয়ছাপগুলোর যে প্রতিরূপ তার মনে সৃষ্টি হয় তাই হল ধারণা। অর্থাৎ ধারণা ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে স্মৃতির ও কল্পনার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে ধারণার আবির্ভাব প্রসঙ্গে হিউম বলেনঃ

> ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে ধারণার এ আবির্ভাব দু'রকম হতে পারে। প্রথমত, নতুনভাবে আবির্ভূত হবার সময় ইন্দ্রিয়ছাপটির মৌলিক সজীবতার অনেকখানি অবশিষ্ট থেকে সেখানে ইন্দ্রিয়ছাপ ও পূর্ণাঙ্গ ধারণার মাঝামাঝি কিছু একটার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত, তার সজীবতা সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ ধারণা গঠিত হয়। যে মৌলিক মানসিক শক্তি দ্বারা প্রথম প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমরা ইন্দ্রিয়ছাপগুলোকে আবার সৃষ্টি করি তার নাম স্মৃতি এবং অপরটির নাম কল্পনা।– স্মৃতির ধারণাগুলো কল্পনার ধারণার চেয়ে অনেক বেশী সজীব ও শক্তিশালী।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার পরিচিতি দিতে গিয়ে হিউম Enquiry গ্রন্থে বলেনঃ

> ইন্দ্রিয়ছাপ বলতে আমি বুঝি আমাদের সব সজীবতর প্রত্যক্ষণ, যখন আমরা শুনি, দেখি, অনুভব করি, ভালবাসি, ঘৃণা করি, কামনা করি বা ইচ্ছা করি। ইন্দ্রিয়ছাপগুলো থেকে ভিন্ন ধারণাগুলো হল কম সজীব প্রত্যক্ষণ, যার সম্পর্কে আমরা যখন উপরোক্ত সংবেদনের কোন একটি সম্পর্কে চিন্তা করি তখন সচেতন হই।[৯]

সুতরাং দেখা যায়, বস্তুর সাথে ইন্দ্রিয়ের সরাসরি সম্পর্ক থেকে ইন্দ্রিয়ছাপ উৎপন্ন হয়। কিন্তু ধারণার উৎপত্তির জন্য বস্তুর সাথে ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক আবশ্যিক নয়। বস্তু যখন ইন্দ্রিয়ের সামনে থাকে তখন তা থেকে আমরা ইন্দ্রিয়ছাপ পাই। কিন্তু বস্তু যখন ইন্দ্রিয়ের সামনে থাকে না তখন যদি অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এর সম্পর্কে চিন্তা বা কল্পনা করি তবেই ধারণা পাই। সুতরাং ধারণা হল ইন্দ্রিয়ছাপের অনুলিপি।

হেণ্ডেল মনে করেন যে, ইন্দ্রিয়ছাপ শব্দটির জন্য হিউম মনটেগু এবং মালেব্রেঞ্চি এ দু'জনের কাছে ঋণী। কিন্তু এন· কে· স্মিথ–এর মতে, ইন্দ্রিছাপ শব্দটি হিউমের নিজের আবিষ্কার। এ শব্দটির মধ্যে অতিরাগ, আবেগ, সংবেদন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।[১০] এ সম্পর্কে হিউমের নিজস্ব বক্তব্য হলঃ

> আমি ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা শব্দ দু'টিকে তাদের প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করি নি। আশা করি এ শব্দটির এ দু'রকম বিশেষ ব্যবহারের স্বাধীনতা আমাকে দেয়া হবে। মিঃ লক ধারণা শব্দটিকে সব প্রত্যক্ষণের জন্য ব্যবহার করে এর মূল অর্থ বিকৃত করেছিলেন। এ শব্দটিকে তার আদি অর্থেই হয়ত আমাকে ব্যবহার করা উচিত। ইন্দ্রিয়ছাপ শব্দটি দিয়ে আমি, প্রত্যক্ষণগুলো মনে কি প্রক্রিয়া দ্বারা সৃষ্ট হয়–তা বুঝাচ্ছি না, এর দ্বারা আমি শুধু প্রত্যক্ষণকেই বুঝাচ্ছি। স্বয়ং প্রত্যক্ষণের জন্য ইংরেজী কিংবা আমার জানা ভাষাগুলোতে কোন নাম নেই।[১১]

সুতরাং, হিউমের নিজস্ব ব্যাখ্যা থেকে দেখা যায়, ইন্দ্রিয়ছাপ দ্বারা তিনি 'স্বয়ং প্রত্যক্ষণ'কেই বুঝাচ্ছেন। আর ধারণা শব্দটিকে তিনি এর মূল অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত ধারণা শব্দটির অর্থ তাঁর পূর্ববর্তী বৃটিশ দার্শনিক জন লক–এর দ্বারা ব্যবহৃত ধারণা শব্দটির অর্থ থেকে ভিন্ন। এখানে লক ও হিউমের ব্যবহৃত শব্দটির অর্থের পার্থক্য নির্ণয় করলে হিউমের ব্যবহৃত ধারণা শব্দটির অর্থ আরও স্পষ্ট হবে বলে মনে হয়।

ধারণা শব্দটিকে নিয়ে আধুনিক দর্শনের প্রারম্ভিক কাল থেকে আলোচনা হতে দেখা যায়। অবশ্য গ্রীক দার্শনিক প্লেটো দর্শনের ইতিহাসে প্রথম ধারণা শব্দটির ব্যবহার করেন। তিনি ধারণা বলতে বাস্তব জগতের সকল প্রকার বস্তু যে নিত্য বা শাশ্বত আদর্শের সম্পূর্ণ প্রতিরূপ সে আদর্শকে বুঝেছেন।[১২] আধুনিক যুগে রেনে দেকার্ত প্রথম ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁর মতে, মন যা নিয়ে চিন্তা করে তাই ধারণা। দেকার্ত ধারণাকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। আগন্তুক, কৃত্রিম ও সহজাত ধারণা। সংবেদনের মাধ্যমে যেসব ধারণা বাইরে থেকে আমাদের মনে আসে সেগুলো আগন্তুক ধারণা। যেমন, গোলাপ ফুলের ধারণা। এসব আগন্তুক ধারণা অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট। আমাদের মন বিভিন্ন ধারণাকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে যেসব ধারণা গঠন করে সেগুলো কৃত্রিম ধারণা। এগুলো আমাদের দ্বারা সৃষ্ট। যেমন মৎসকণ্যা, ডানাকাটা পরী। এসব ধারণা অলীক ও অসত্য। পক্ষান্তরে মন নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে অনিবার্যভাবে যেসব ধারণা সম্পর্কে চিন্তা করে সেগুলো হল অন্তর বা সহজাত ধারণা। এরা বাইরে থেকে আগত নয় আবার নিজেদের দ্বারা সৃষ্টও নয়। এগুলো সহজাত। যেমন অসীমতা, নিত্যতা, পূর্ণসত্তা ইত্যাদির ধারণা। অবশ্য দেকার্ত সহজাত ধারণাকে আমাদের জন্মের প্রারম্ভ থেকেই মনে উপস্থিত একথা বলতে চান নি বরং চিন্তাশীল দ্রব্যরূপে মনের অস্তিত্বের জন্য যেসব ধারণা আবশ্যিক তাদেরকেই সহজাত বলেছেন। এসব ধারণাই দেকার্তের মতে যথার্থ জ্ঞানের ভিত্তি।

দেকার্ত পরবর্তী দার্শনিক, আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদী ধারার প্রবক্তা, জন লকও ধারণা শব্দটির ব্যবহার করেছেন। তাঁর দর্শনেও ধারণা শব্দটির স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লক ধারণা শব্দটি দ্বারা মানুষের চিন্তার বিষয়বস্তু–কে বুঝিয়েছেন।[১৩] চিন্তা বলতে এখানে যেমন প্রত্যক্ষ, কল্পনা ও ইচ্ছাকে বুঝানো হয়েছে ঠিক তেমনি যথার্থ অর্থে জানার মধ্যে যে চিন্তা আছে তাকেও বুঝানো হয়েছে। তাই লকের কাছে চিন্তা থাকার অর্থই হল ধারণা থাকা। মূলত তিনি ধারণা বলতে চিন্তার উপাদানসমূহকে বুঝিয়েছেন।[১৪] ফলে লকের ধারণা কথাটির মধ্যে ইন্দ্রিয় উপাত্ত যেমন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তেমনি প্রত্যয় (concept) এবং সার্বিক ধারণাও অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। লকের অনুসারী বার্কলে ধারণা ও বস্তুকে অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু হিউম ধারণা শব্দটির অর্থ সম্পর্কে লক ও বার্কলের মতের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি ধারণা বলতে ইন্দ্রিয়ছাপের অবিকল প্রতিরূপকে বুঝিয়েছেন। হিউম মনের বিষয়বস্তু বলতে লকের মত ধারণাকে বুঝান নি বরং প্রত্যক্ষণকে বুঝিয়েছেন। তিনি প্রত্যক্ষণকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন ঃ ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা। ধারণাগুলো হল ইন্দ্রিয়ছাপের অবিকল প্রতিরূপ। হিউমও লকের মত মনকে সাদা কাগজ বলেছেন এই অর্থে যে, মনে কোন ধারণা

Dhaka University Institutional Repository

অস্তিত্বশীল থাকে না। মনের সব উপাদানই অভিজ্ঞতা থেকে আসে। এই অভিজ্ঞতা বা মনের উপাদানের সবটুকুকে লক ধারণা বলেছিলেন। হিউম একে দু'ভাগে ভাগ করেন। এ ভাগটি মূলত অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি এবং চিন্তা বা ন্যায়ক্রিয়ার (Reasoning) মধ্যকার প্রভেদ। চিন্তা বা ন্যায়ক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের মনে আগে থেকেই এর উপাদানগুলো অস্তিত্বশীল থাকে এবং মনের এসব উপাদান চূড়ান্ত অর্থে চিন্তা বা ন্যায়ক্রিয়ার বাইরে কোন কিছু, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে আসে। লকের দ্বারা এভাবে সংবেদন ও চিন্তাকে আলাদা করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং লক ও হিউম ধারণা শব্দটিকে এক অর্থে ব্যবহার করেন নি। লক যাকে ধারণা বলেছেন হিউম তাকে বলেছেন প্রত্যক্ষণ। এভাবে হিউম ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে ধারণাকে আলাদা করে এ শব্দটিকে অধিকতর সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করেছেন। এতে ইতিপূর্বে এ শব্দটির অর্থ সম্পর্কে যে দ্ব্যর্থবোধকতা ও বিকৃতি সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে শব্দটি কিছুটা মুক্তি পেয়েছে বলে মনে হয়। হিউম ধারণাশব্দটিকে ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে আলাদা করে এবং সংবেদন ও ধারণা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করে ধারণা শব্দটির অর্থের উন্নতি সাধন করেন। ধারণা ইন্দ্রিয়ছাপের তুলনায় সব সময়ই কম সজীব বা অস্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে হিউম তাঁর Enquiry গ্রন্থে বলেন, সবচেয়ে সজীব চিন্তন (ধারণা) সবচেয়ে নিস্তেজ সংবেদন (ইন্দ্রিয়ছাপ)–এর তুলনায় হীনতর।[১৫] সুতরাং ধারণা ও ইন্দ্রিয়ছাপ পরস্পর আলাদা। হিউমের মতে আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি হল ইন্দ্রিয়ছাপ, ধারণা নয়। কেননা ইন্দ্রিয়ছাপ না হলে ধারণার উৎপত্তি সম্ভব নয়। তিনি বলেন, আমাদের সব ধারণা বা ক্ষীণতর প্রত্যক্ষণ আমাদের ইন্দ্রিয়ছাপ বা সজীবতর প্রত্যক্ষণের প্রতিরূপ।[১৬]

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, হিউম পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক বার্কলে ঈশ্বরকে সর্বোচ্চ প্রত্যক্ষণকারী এবং আমাদের প্রত্যক্ষণকে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষণের অংশ হিসাবে অভিহিত করে জ্ঞানের সীমাকে অসীম করেছিলেন। কিন্তু হিউম ইন্দ্রিয়ছাপকে ধারণার ভিত্তি হিসাবে নির্দেশ করে আমাদের জ্ঞানের সীমা নির্দেশ করে দেন। এখানেই তাঁর অভিজ্ঞতাবাদ সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠে এবং সংশয়বাদের ভিত্তি রচিত হয়। কারণ, অভিজ্ঞতাবাদী হিসাবে হিউম ইন্দ্রিয়ছাপের বাইরে যেতে পারেন না। ইন্দ্রিয়ছাপ জ্ঞানোৎপত্তির মূল উৎস হলে সার্বিক জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, অভিজ্ঞতায় সার্বিকতাকে পাওয়া যায় না। সার্বিক জ্ঞানের জন্য বুদ্ধির আশ্রয় নিতে হয়। হিউম জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে বুদ্ধির অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না। তাই সার্বিক জ্ঞানলাভের হাতিয়ার না থাকায় তাঁর অভিজ্ঞতাবাদ সংশয়বাদে রূপ নেয়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, হিউম প্রত্যক্ষণকেই একমাত্র জ্ঞানোৎপত্তির উপায় বলে অভিহিত করেছেন। যদিও তিনি প্রত্যক্ষণকে ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা এ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন তবুও ইন্দ্রিয়ছাপকেই প্রাধান্য দিয়ে ধারণাকে ইন্দ্রিয়ছাপের অনুলিপি বলেছেন। অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির প্রাথমিক উপায় হল ইন্দ্রিয়ছাপ বা সরাসরি প্রত্যক্ষণ। একথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে একমাত্র চার্বাক দার্শনিকগণই প্রত্যক্ষকে বৈধ জ্ঞানোৎপত্তির একমাত্র উপায় বলে অভিহিত করেছিলেন। চার্বাকগণও প্রত্যক্ষণকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন : বাহ্যিক ও মানসিক। চার্বাকদের মতে, মানসিক প্রত্যক্ষ বাহ্যিক প্রত্যক্ষ নির্ভর। এদিক থেকে হিউমের ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার সাথে চার্বাকদের বাহ্যিক ও মানসিক প্রত্যক্ষের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

আমাদের সকল জ্ঞানই যে একমাত্র ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে আসে, অন্যকথায় আমাদের ধারণাগুলো যে ইন্দ্রিয়ছাপের প্রতিরূপ বা ইন্দ্রিয়ছাপের উপর নির্ভরশীল এ বিষয়টিকে প্রমাণ করার লক্ষ্যে হিউম ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণাকে সরল ও যৌগিক এ দু'টি ভাগে বিভক্ত করেন। তিনি এদের গঠনগত পার্থক্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার সম্পর্ক আবিষ্কারে প্রয়াসী হন।

হিউমের মতে, গঠনগত দিক থেকে ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা দু'ভাগে বিভক্ত : সরল ও যৌগিক। যে সব ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণাকে আর ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করা যায় না সে সব ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণাই হল সরল। অন্যদিকে, যে সব ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণাকে আরও ক্ষুদ্রতর বা একাধিক সরল ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণায় বিভক্ত করা যায় সে সব ইন্দ্রিয়ছাপ বা ধারণা হল যৌগিক। একাধিক সরল ইন্দ্রিয়ছাপ বা সরল ধারণার সমন্বয়েই যথাক্রমে যৌগিক ইন্দ্রিয়ছাপ বা যৌগিক ধারণা সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে হিউম বলেন,

> আমরা সহজেই লক্ষ্য করতে পারি যে, ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা এ দু'রকম প্রত্যক্ষণকেই আরও একরকম ভাবে বিভক্ত করা যায়। যেমন, সরল ও যৌগিক। সরল প্রত্যক্ষণকে, অর্থাৎ সরল ইন্দ্রিয়ছাপ ও সরল ধারণাকে আর কিছুতেই ভাগ বা পৃথক করা যায় না। যৌগিক প্রত্যক্ষণগুলো এর উল্টো, তাদেরকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা যায়।[১৭]

যৌগিক ইন্দ্রিয়ছাপের উদাহরণ দিতে গিয়ে হিউম একটি আপেলের মধ্যে যে রং, স্বাদ ও গন্ধের সমাবেশ হয় তাদেরকে বুঝিয়েছেন। আলাদাভাবে রং, স্বাদ ও গন্ধ হল সরল ইন্দ্রিয়ছাপ এবং তাদের মানসিক প্রতিরূপই হল যথাক্রমে যৌগিক ধারণা ও সরলধারণা।

Dhaka University Institutional Repository

হিউম ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার এই গঠনগত পার্থক্য নির্দেশ করার মাধ্যমে ধারণা ও ইন্দ্রিয়ছাপের সম্পর্ক বিশ্লেষণে প্রয়াসী হন। তিনি মনে করেন যে, যৌগিক ধারণাগুলো সব সময়ই আবশ্যিকভাবে যৌগিক ইন্দ্রিয়ছাপের অনুলিপি হবে এমন কোন কথা নাই। কেননা তাঁর মতে, অনেক যৌগিক ধারণার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাদের অনুরূপ কোন ইন্দ্রিয়ছাপ নাই। এছাড়া, অনেক যৌগিক ইন্দ্রিয়ছাপও ধারণারূপে অবিকল প্রতিকৃত হয় না। বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য উদাহরণ হিসাবে তিনি নতুন জেরুজালেম নামে একটি শহরের কল্পনা করা সম্ভব বলে মনে করেন যার ফুটপাত সোনা দিয়ে এবং প্রাচীরগুলো পদ্মরাগ মনি দিয়ে তৈরী, যদিও এসব জিনিস কখন দেখা যায় নি।[১৮] এথেকে বোঝা যায় যে, সোনা দিয়ে বাধানো ফুটপাত আর পদ্মরাগ মনি দিয়ে তৈরী প্রাচীরসম্পন্ন শহরের কোন যৌগিক ইন্দ্রিয়ছাপ না থাকলেও এমন যৌগিক ধারণা থাকা সম্ভব। অন্যদিকে, আমার এমন যৌগিক ইন্দ্রিয়ছাপও থাকা সম্ভব যার অবিকল প্রতিরূপ কোন যৌগিক ধারণা আমি গঠন করতে পারি না। হিউম বলেন, আমি প্যারিস শহর দেখেছি। কিন্তু আমি কি ঐ শহরের এমন কোন ধারণা সৃষ্টি করতে পারি যা তার রাস্তা ও বাড়ীগুলোকে তাদের যথার্থ সঙ্গতি বজায় রেখে মনের সামনে তুলে ধরবে?[১৯]

উপরের আলোচনা থেকে হিউম এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যদিও সাধারণত যৌগিক ইন্দ্রিয়ছাপের সাথে যৌগিক ধারণার বিরাট এক সাদৃশ্য রয়েছে, তবু তারা যে পরস্পরের প্রতিকৃতি এ সূত্রটিকে সার্বিকভাবে প্রয়োগ করা যায় না।[২০] সুতরাং যৌগিক ধারণাগুলো যে সব সময় আবশ্যিকভাবে যৌগিক ইন্দ্রিয়ছাপের অবিকল প্রতিরূপ হবে এমন কোন কথা নাই। অন্য কথায়, যৌগিক ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার সম্পর্ক অবিকল অনুরূপ নাও হতে পারে। কিন্তু, সরল ইন্দ্রিয়ছাপের সাথে সরল ধারণার সম্বন্ধ সম্পর্কে উপরের মত খাটে না। কারণ, যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে পরীক্ষা করে হিউম দেখতে পান যে, প্রতিটি সরল ধারণাই কোন না কোন সরল ইন্দ্রিয়ছাপের অনুলিপি। তাঁর মতে, , প্রত্যেক সরল ধারণাই কোননা কোন সরল ইন্দ্রিয়ছাপের প্রতিকৃতি। আর প্রত্যেক সরল ইন্দ্রিয়ছাপের অনুরূপ একটি ধারণা রয়েছে।[২১]

সরল ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার উপরোক্ত সম্পর্কটিকে হিউম সার্বিকভাবে প্রযোজ্য বলে মনে করেন। তাই তিনি মানব প্রকৃতি বিজ্ঞানে একে একটি সার্বিক সূত্রাকারে প্রয়োগ করেন। এ সূত্রটি হল, আমাদের সব সরল ধারণাই প্রথম আবির্ভাবের সময় তাদের সরল ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে উৎপন্ন হয় এবং এরা তাদের অবিকল প্রতিকৃতি।[২২] তিনি সূত্রটিকে আরও স্পষ্ট করে অন্যত্র বলেছেন, কিন্তু প্রাথমিক ধারণাগুলোকে যেমন ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে উৎপন্ন বলে মনে হয়, তেমনি এ কথাও সত্য যে, সরল ধারণাগুলো প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে তাদের প্রতিরূপ ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে উৎপন্ন হয়। তাঁর মতে, মানব প্রকৃতি বিজ্ঞানে এটিই তাঁর প্রথম সূত্র।[২৩] বলা যায়, এ সূত্রের মাধ্যমেই তিনি বুদ্ধিবাদের ভিত ভেঙ্গে দিয়ে অভিজ্ঞতাবাদের যুক্তিসঙ্গত ভিত রচনা করেন। এছাড়া, এ সূত্রের ভিত্তিতেই তিনি ধারণাগুলোর অর্থ নির্ণয়ের জন্য যে ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে ধারণাটি উৎপন্ন হয়েছে সে ধারণাটিকে পরীক্ষা করার কথা বলেন। *Enquiry* গ্রন্থে তিনি বলেন, কোন দার্শনিক শব্দ সম্পর্কে সংশয় জাগলে আমরা প্রশ্ন করবো কোন্ ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে ধারণাটি পাওয়া গেছে।[২৪] প্রশ্ন হল, এ সূত্রটি যে সার্বিকভাবে প্রযোজ্য তা হিউম কিভাবে নিশ্চিত করেন। অন্য কথায়, এ সূত্রটি সম্পর্কে সন্দেহ মুক্ত হওয়ার উপায় কি? হিউম এ ব্যাপারে একটি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। তাঁরমতে কেউ যদি এই সার্বিক সাদৃশ্যকে অস্বীকার করতে চান তবে তাকে অন্তত একটি সরল ইন্দ্রিয়ছাপের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে হবে যার কোন সদৃশ ধারণা নেই। অথবা এমন একটি সরল ধারণার দৃষ্টান্ত দিতে হবে যার কোন অনুরূপ ইন্দ্রিয়ছাপ নেই।[২৫]

কোন সার্বিক সূত্রের নিশ্চয়তার ব্যাপারে এরূপ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করায় হিউমের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে আরোহ পদ্ধতিতে বিশেষ বিশেষ ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করে সার্বিক সিদ্ধান্ত তথা বিজ্ঞানের স্বতসিদ্ধ বা সার্বিক নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিজ্ঞানী এ রকম নিয়মের চূড়ান্ত নিশ্চিতি দাবী করেন না বরং আপেক্ষিক নিশ্চিতি দাবী করেন। অর্থাৎ অন্য কোন বিজ্ঞানী এ নিয়মের ব্যতিক্রম না দেখানো পর্যন্ত এ নিয়ম দ্বারাই ঐ বিজ্ঞানের বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করা চলে। কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত টলেমীর ভূ-কেন্দ্রিক তত্ত্বই ছিল স্বতসিদ্ধ। এবং এর দ্বারা পদার্থ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করা হত। হিউমই মানুষের জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে সরল ইন্দ্রিয়ছাপকে প্রাথমিক উপাদান হিসাবে আখ্যায়িত করে প্রতিটি সরল ধারণাকে আবশ্যিকভাবে সরল ইন্দ্রিয়ছাপের অনুলিপি বলে আখ্যায়িত করার মাধ্যমে মানব প্রকৃতির বিজ্ঞানে একটি প্রাথমিক সূত্র প্রণয়ণ করেন। এবং তিনিই সম্ভবত প্রথম দার্শনিক যিনি তাঁর মানব প্রকৃতি বিজ্ঞানের প্রথম সূত্রটির সার্বিকতার প্রমাণ দিতে গিয়ে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মাধমে বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার উপরোক্ত সম্বন্ধের উপর ভিত্তি করেই হিউম অভিজ্ঞতাবাদের গোড়াপত্তন করেন। ধারণা যদি ইন্দ্রিয়ছাপ ছাড়া উৎপন্ন না হয় তবে লক যে অর্থে সহজাত ধারণাকে অস্বীকার করেছেন সে অর্থে এগুলোর অস্বীকৃতি অপরিহার্য। হিউম দার্শনিকদের স্বীকৃত সকল ধারণার পেছনেই ইন্দ্রিয়ছাপের অনুসন্ধান করেছেন এবং যেখানে ইন্দ্রিয়ছাপকে খুঁজে পান নি সেখানে ধারণাকে অস্বীকার করেছেন। এভাবে তিনি দ্রব্য, আত্মা, কার্যকারণ, ঈশ্বর প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ছাপহীন ধারণাকে বর্জন করে বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হেনেছেন। কারণ, বুদ্ধিবাদ অনুসারে ধারণার জন্য ইন্দ্রিয়ছাপ আবশ্যিক নয়। শুধুমাত্র বুদ্ধিজাত ধারণা বা অন্তর্ধারণাও সম্ভব। হিউমের মতবাদ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হিসাবে প্রতিভাত হয়। কান্টও একথা স্বীকার করেছেন যে, ইন্দ্রিয়ছাপ ছাড়া ধারণার উৎপত্তি হতে পারে না–একথা হিউমের যুগান্তকারী আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের ফলেই বুদ্ধিবাদের বক্তব্য যে বিচার ভিত্তিক নয় বা নির্বিচারবাদী তা প্রমাণিত হয়েছে। এজন্যই কান্ট একথা স্বীকার করেছেন যে, হিউম তাঁকে নির্বিচারবাদী নিদ্রা থেকে জাগিয়েছেন।

সরল ধারণা যে সরল ইন্দ্রিয়ছাপের প্রতিকৃতি তা প্রমাণ করার জন্য হিউম তাঁর Enquiry গ্রন্থে দু'টি যুক্তি দিয়েছেন। প্রথম যুক্তিতে তিনি যা দেখাতে চেয়েছেন তা হল, আমাদের যে কোন যৌগিক ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে এমন সব সরল ধারণাবলী পাওয়া যাবে যেগুলো অনুরূপ ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি ঈশ্বরের ধারণার কথা বলেন। তাঁর মতে, ঈশ্বর অসীম, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সৎ সত্তা বলে যে ধারণা আমাদের মনে রয়েছে সে ধারণাও মূলত আমাদের নিজেদের মধ্যে লক্ষিত গুণগুলো থেকে সৃষ্ট। আমরা সততা, জ্ঞান ও বিজ্ঞতারূপ যে গুণগুলো নিজেদের মধ্যে দেখতে পাই সেগুলোকেই সীমাহীনভাবে বর্ধিত করে ঈশ্বরের ধারণা গঠন করি। এভাবে যে কোন ধারণাকে পরীক্ষা করলেই আমরা দেখব যে তা অনুরূপ ইন্দ্রিয়ছাপের প্রতিরূপ।[২৬] দ্বিতীয় যুক্তিতে হিউম বলেন, কোন ব্যক্তি যদি তার ইন্দ্রিয়জনিত ত্রুটির জন্য কোন এক ধরণের ইন্দ্রিয়ছাপ লাভে ব্যর্থ হয় তবে সে ব্যক্তি সেরূপ ইন্দ্রিয়ছাপের ধারণা গঠন করতে পারবে না। যেমন একজন অন্ধ ব্যক্তি রং–এর কোন ধারণা এবং বধির ব্যক্তি শব্দের কোন ধারণা গঠন করতে পারে না।[২৭] এ প্রসঙ্গে *Treatise* গ্রন্থে তিনি বলেন, আনারসের স্বাদ কখনও না পেলে তার যথার্থ ধারণা গঠন করা সম্ভব নয়।[২৮] মানুষের আবেগের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি কার্যকর বলে হিউম মনে করেন। শান্ত আচরণে অভ্যস্ত ব্যক্তি প্রতিহিংসা বা নিষ্ঠুরতার ধারণা করতে পারে না। অবশ্য হিউম এ বিষয়টির একটি ব্যতিক্রমও স্বীকার করেন।[২৯] তবে হিউমের মতে, এ ব্যতিক্রমটি একটি বিশেষ ব্যতিক্রম মাত্র। এবং এজন্য 'ধারণা ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে উৎপন্ন হয়', এ সাধারণ সূত্রটির পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে না।[৩০]

এ ব্যতিক্রমটি ছাড়াও আরেকটি দিক থেকে ধারণার আগে ইন্দ্রিয়ছাপের আর্বিভাবের সূত্রটি সীমিত। সেটি হল, ধারণাগুলো যেমন ইন্দ্রিয়ছাপের প্রতিকৃতি তেমন মুখ্য ধারণার প্রতিকৃতিরূপে গৌণ ধারণার সৃষ্ট হতে পারে। এক্ষেত্রে গৌণ ধারণা অনুরূপ ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে জন্ম না নিয়ে বরং অনুরূপ মুখ্য ধারণা থেকে জন্ম নেয়। তবে একথা ঠিক যে, মুখ্য ধারণাগুলো সব সময়ই ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে উৎপন্ন হয় এবং সরল ধারণাগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের প্রতিরূপ ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে উৎপন্ন হয়।[৩১] হিউমের বিশিষ্ট সমালোচক ম্যাকনাব এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, হিউমের বিশেষ পর্যবেক্ষণলব্ধ সাধারণ বচনটি হল একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক বচন। বচনটি হল কোন শব্দ বা অন্য প্রতীকের অর্থ জানার জন্য আমাদেরকে প্রথমে এই শব্দের অভিজ্ঞতালব্ধ উপাদানের উপর মনযোগ দিতে হয়। অর্থাৎ, এ শব্দটি যে বস্তুর সাথে প্রথানুসারে সম্পর্কিত সে বস্তুকে জানতে হয়। কিন্তু কমলা শব্দটির অর্থ কি তা জানা আর কমলা কি তা জানা–এ বাক্য দু'টি পরস্পরের শব্দান্তর নয়। অথচ হিউম যখন একথা বলেছেন যে, প্রতিটি সরল ধারণা সরল ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে আসে এখন তিনি উপরোক্ত বাক্য দু'টিকে পরস্পরের শব্দান্তর বলে বর্ণনা করতে চেয়েছেন। সরল ধারণা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ম্যাকনাব বলেন, এটা মনে করা যেতে পারে যে, হিউম সরল ধারণা বলতে লাল রং, শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি জাতীয় শব্দের ধারণাকে বুঝিয়েছেন। এসব শব্দাবলীকে প্রদর্শীরূপে (Ostensibly) জানা যেতে পারে। এ শব্দগুলো অসজ্ঞায়ণযোগ্য। কারণ জি, ই, মূর–এর মতে, এসব শব্দ 'সরল ও অবিশ্লেষণযোগ্য গুণাবলী'কে নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়। লালকে কোন প্রকার বিশ্লেষণযোগ্য গুণাবলীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। লাল রং–এর উদাহরণ দিতে গেলে লাল রং–এর বস্তু প্রদর্শন করা এবং অ–লাল রং–এর বস্তুর সাথে এর পার্থক্য দেখানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এ অর্থে লাল জাতীয় শব্দগুলো সরল ধারণাকে নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়। তাই ম্যাকনাবের মতে, হিউমের সরল ও জটিল ধারণার ক্ষেত্রে অসজ্ঞায়নযোগ্য ও সজ্ঞায়নযোগ্য শব্দ দু'টি ব্যবহার করা উচিত এবং সকল সরল ধারণাই অনুরূপ ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে নির্দেশিত হয় একথা বলার পরিবর্তে সকল অসজ্ঞায়নযোগ্য শব্দকে প্রদর্শীরূপে অর্থাৎ যে অভিজ্ঞতাকে এ শব্দটি নির্দেশ করে সে অভিজ্ঞতার উল্লেখ করার মাধ্যমে ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে একথা বলা উচিৎ।[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

Enquiry গ্রন্থে দেয়া হিউমের পূর্বোক্ত যুক্তি ছাড়াও *Treatise* গ্রন্থে হিউম সরল ধারণাই সরল ইন্দ্রিয়ছাপের অনুলিপি–এ সূত্রটিকে প্রমাণ করার জন্য 'আরোহাত্মক' যুক্তি অবলম্বন করেন। তিনি বলেন, সর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সরল ইন্দ্রিয়ছাপগুলো তাদের অনুরূপ সরল ধারণার পূর্বগামী এবং এর উল্টোটি কখনো ঘটেনা।[৩৩] যেমন, কোন শিশুকে কোন রং বা দ্রব্যের ধারণা দিতে হলে তার কাছে প্রথমে এসব লক্ষিত বস্তু উপস্থাপন করা হয়। অর্থাৎ আগে ইন্দ্রিয়ছাপ সৃষ্টি করা হয়। কখনোই উল্টোভাবে প্রথম ধারণার সৃষ্টি করে তার সাহায্যে ইন্দ্রিয়ছাপ সৃষ্টি করা হয় না। এজন্যই তিনি কোন দর্শন বিষয়ক পদের অর্থ বা ধারণা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলে সন্দেহ নিরসনের জন্য যে ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে ধারণাটির সৃষ্টি সে ইন্দ্রিয়ছাপটিকে খুঁজে বের করার কথা বলেন। উপরোক্ত যুক্তিগুলো উপস্থাপনের মাধ্যমে হিউম এটা প্রমাণে প্রয়াসী হন যে, জ্ঞানের সরলতম উপাদান যে সরল ধারণা তার উৎপত্তি হয় অনুরূপ সরল ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ছাপ ছাড়া কোন ধারণার উৎপত্তি হতে পারে না। অন্য কথায়, যার ইন্দ্রিয়ছাপ নেই তার ধারণাও নেই।

প্রত্যক্ষণের শ্রেণী বিভাগ : হিউম *Treatise* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে প্রত্যক্ষণকে ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা এ দু'ভাগে ভাগ করেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি আলাদাভাবে ইন্দ্রিয়ছাপের বিভিন্ন প্রকারভেদ এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে ধারণার বিভিন্ন প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করেন।

ইন্দ্রিয়ছাপগুলোকে তিনি দু'ভাগে বিভিক্ত করেন ঃ সংবেদনজাত ইন্দ্রিয়ছাপ ও চিন্তাজাত বা অন্তর্দর্শনজাত ইন্দ্রিয়ছাপ। Treatise গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি ইন্দ্রিয়ছাপকে আরও দু'টি ভাগে বিভক্ত করেন। এ দু'টি ভাগ হল মৌল (Original) ও গৌণ (Secondary) ইন্দ্রিয়ছাপ। প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি যাকে সংবেদনজাত ইন্দ্রিয়ছাপ বলেছেন। মৌল ইন্দ্রিয়ছাপ বলতে তিনি সেই সংবেদনজাত ইন্দ্রিয়ছাপকেই বুঝিয়েছেন এবং গৌণ ইন্দ্রিয়ছাপ বলতে পূর্বোক্ত অন্তর্দর্শনজাত বা চিন্তাজাত ইন্দ্রিয়ছাপকেই বুঝিয়েছেন।[৩৪] সময়ের দিক থেকে চিন্তাজাত ইন্দ্রিয়ছাপ সংবেদনের ইন্দ্রিয়ছাপের পরে আসে। তাই চিন্তাজাত ইন্দ্রিয়ছাপগুলো গৌণ বা বুৎপত্তিলব্ধ (Derivative)। কিন্তু এগুলো কোন ইন্দ্রিয়ছাপের অনুলিপি নয় বলে মৌলিকভাবে অস্তিত্বশীল এবং এগুলোও ইন্দ্রিয়ছাপ।

সংবেদনজাত ইন্দ্রিয়ছাপের উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে হিউম বলেন, মূলত অজ্ঞাত কারণ থেকে এগুলো আত্মায় উৎপন্ন হয়।[৩৫] অর্থাৎ এগুলো কোন প্রকার পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষণ ছাড়াই দেহের গঠন, পাশব জীবনীশক্তি (Animal spirit) বা বাহ্যিক অঙ্গসমূহের সাথে বস্তুর সংযোগ থেকে উৎপন্ন হয়।[৩৬] ইন্দ্রিয়সমূহের সকল ইন্দ্রিয়ছাপ এবং সকল প্রকার দৈহিক বেদনা ও আনন্দ সংবেদজাত বা মৌল ইন্দ্রিয়ছাপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাঁর মতে, এগুলোর উৎপত্তির যথার্থ কারণ প্রাকৃতিক ও দৈহিক। তাই এগুলোর উৎপত্তি অনুসন্ধান করতে গেলে অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যা ও প্রাকৃতিক দর্শনের আলোচনা প্রয়োজন।[৩৭]

চিন্তাজাত বা গৌণ ইন্দ্রিয়ছাপগুলোর উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে, এগুলো মৌল ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে প্রত্যক্ষভাবে বা মৌল ইন্দ্রিয়ছাপের ধারণার মধ্যস্ততার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়।[৩৮] চিন্তাজাত ইন্দ্রিয়ছাপগুলো যে ক্রম অনুসারে সৃষ্টি হয় সে ক্রম সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হলঃ

> প্রথমে কোন ইন্দ্রিয়ছাপ আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর আঘাত হানে। এর ফলে আমরা কোন না কোন ধরণের গরম বা ঠাণ্ডা, পিপাসা বা ক্ষুধা, আনন্দ বা ব্যথা প্রত্যক্ষ করি। আমাদের মন ঐ ইন্দ্রিয়ছাপের একটি প্রতিরূপ গ্রহণ করে। ইন্দ্রিয়ছাপটি মুছে যাবার পরও প্রতিরূপটি থেকে যায়। একে আমরা ধারণা বলি। আনন্দ বা ব্যথার এ ধারণা আত্মায় আবির্ভূত হয়ে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা, আশা বা ভয় এসব নতুন ইন্দ্রিয়ছাপ সৃষ্টি করে। এ নতুন ইন্দ্রিয়ছাপগুলোকে চিন্তাজাত ইন্দ্রিয়ছাপ বলা যায়। কারণ, এগুলো চিন্তা থেকে উৎপন্ন হয়। আমাদের স্মৃতি ও কল্পনা দিয়ে আবার এদের প্রতিরূপ অর্জিত হয়। এভাবে এরা ধারণায় পরিণত হয়।[৩৯]

সুতরাং উৎপত্তির দিক থেকে চিন্তাজাত ইন্দ্রিয়ছাপগুলো একদিকে তাদের ধারণার পূর্ববর্তী অন্যদিকে এগুলো সংবেদনজাত ইন্দ্রিয়ছাপের পরবর্তী এবং এদের দ্বারা সৃষ্ট। চিন্তাজাত বা গৌণ ইন্দ্রিয়ছাপের মধ্যে অতিরাগগুলো এবং এ সদৃশ অন্যান্য সকল আবেগঅন্তর্ভুক্ত।

চিন্তজাত ইন্দ্রিয়ছাপগুলো সংবেদনের ইন্দ্রিয়ছাপ দ্বারা সৃষ্ট হলেও এগুলোর স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও সজীবতার জন্য হিউম এগুলোকেও মৌলিক বলেছেন। সংবেদনের ইন্দ্রিয়ছাপগুলো দু'অর্থে মৌলিক। যথা, প্রত্যক্ষণের অন্যান্য উপজাতির তুলনায় সময়ের বিচারে এগুলো সব সময় আগে ঘটে এবং এগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ। অর্থাৎ এগুলো প্রতিনিধিত্বমূলক, অনুলিপি নয়। চিন্তাজাত ইন্দ্রিয়ছাপগুলো দ্বিতীয় অর্থে মৌলিক, প্রথম অর্থে নয়। অর্থাৎ সময়ের বিচারে এগুলো সংবেদনের ইন্দ্রিয়ছাপের পরে উদ্ভূত হলেও এগুলো ইন্দ্রিয়ছাপের অনুলিপি মাত্র নয় বা প্রতিনিধিত্বকারী নয়। কেননা, তা কোনরূপ পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষণের উপর নির্ভরশীল নয়। এগুলো প্রধানত চিন্তাবেগ বাসনা ও ভাবাবেগের সমবায়ে গঠিত।[৪০]

Dhaka University Institutional Repository

হিউম চিন্তাজাত বা গৌণ ইন্দ্রিয়ছাপগুলোকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করেন : শান্ত (Calm) ও উগ্র (Violent) চিন্তাজাতইন্দ্রিয়ছাপ।[৪১] হিউমের মতে, প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ শান্ত ইন্দ্রিয়ছাপগুলোর মধ্যে সৌন্দর্যের অনুভূতি, কাজের বিকৃতি, শব্দ বা বাক্য গঠন এবং বাহ্য বস্তু অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ উগ্র চিন্তাজাত ইন্দ্রিয়ছাপগুলোতে আছে ভালবাসা ও ঘৃণার অতিরাগ, দুঃখ ও আনন্দ, গর্ব ও বিনয়।[৪২] এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে স্মিথ বলেন, উগ্র চিন্তাজাত ইন্দ্রিয়ছাপ বলতে হিউম সাধারণভাবে তথাকথিত অতিরাগ ও আবেগগুলোকে বুঝিয়েছেন এবং শান্ত চিন্তাজাত ইন্দ্রিয়ছাপ বলতে অনুমোদন ও অননুমোদন, নন্দনতাত্ত্বিক ও নৈতিকমনোভাবকে বুঝিয়েছেন।[৪৩] হিউম উগ্র চিন্তাজাত ইন্দ্রিয়ছাপ হিসাবে গণ্য অতিরাগগুলোকে আবার দু'ভাগে ভাগ করেন : প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ অতিরাগগুলো ভাল বা মন্দ, ব্যাথা বা আনন্দ থেকে প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্টি হয়। কামনা, বিরোধিতা, দুঃখ, আনন্দ, আশা, ভয়, হতাশা, নিরাপত্তা ইত্যাদি প্রত্যক্ষ অতিরাগ। অন্যদিকে, পরোক্ষ অতিরাগ বলতে তিনি সে সব অতিরাগকে বুঝান যেগুলো একই নিয়মে সৃষ্টি হয়। কিন্তু এগুলো অন্যান্য গুণাবলীর সাথে সংযুক্ত হয়ে উৎপত্তিলাভ করে। অহঙ্কার, বিনয়, উচ্চাকাঙ্খা, অসার দম্ভ, ভালবাসা, ঘৃণা, শত্রুতা, সৌহার্দ্য, বিদ্বেষ, ভদ্রতা ইত্যাদি হল পরোক্ষ অতিরাগ।[৪৪]

Treatise গ্রন্থে প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে হিউম উৎপত্তির দিক থেকে ধারণাকেও দু'ভাগে ভাগ করেন : স্মৃতির ধারণা ও কল্পনার ধারণা। তাঁর মতে, ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে ধারণার অবির্ভাব দু'রকম হতে পারে। প্রথমত, নতুনভাবে আবির্ভূত হওয়ার সময় ইন্দ্রিয়ছাপটিতে যে মৌলিক সজীবতা ছিল তার অনেকখানি অবশিষ্ট থেকে যায় এবং সেখানে ইন্দ্রিয়ছাপ ও পূর্ণাঙ্গ ধারণার মাঝামাঝি কিছু একটার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত, ইন্দ্রিয়ছাপটির সজীবতা সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণার সৃষ্টি করে। যে মৌলিক মানসিক শক্তিদ্বারা প্রথম প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমরা ইন্দ্রিয়ছাপগুলোকে আবার সৃষ্টি করি তার নাম স্মৃতি এবং অপরটির নাম কল্পনা।[৪৫] তাঁর মতে, স্মৃতির ধারণা কল্পনার ধারণা থেকে অধিকতর স্পষ্ট বা সজীব ও শক্তিশালী। সজীবতা ও স্পষ্টতার দিক থেকে স্মৃতির ধারণা ইন্দ্রিয়ছাপ ও পূর্ণাঙ্গ ধারণার মাঝামাঝি। কিন্তু কল্পনার ধারণা সজীবতা ও স্পষ্টতার দিক থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা।

সুতরাং দেখা যায় *Treatise* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হিউম শুধু ইন্দ্রিয়ছাপকে দু'ভাগে, সংবেদনজাত ও চিন্তাজাত এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে শুধু ধারণাকে দু'ভাগে, স্মৃতির ধারণা ও কল্পনার ধারণা, ভাগ করেন। ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার উৎপত্তির দিকে লক্ষ্য রেখেই এ বিভাজন করা হয়েছে। এ ছাড়া, প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা উভয়কে তাদের প্রকৃতিগত দিক থেকে আরও দু'টি ভাগে বিভক্ত করেন : সরল ও যৌগিক। যে সব ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণাকে বিভিন্ন ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায় সে সব ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা হল যৌগিক।[৪৬] মৌলিক ইন্দ্রিয়ছাপ দ্বারাই যৌগিক ইন্দ্রিয়ছাপ গঠিত হয়। হিউমের কাছে মৌলিক ইন্দ্রিয়ছাপ হল অভিজ্ঞতার পরমাণু বা মৌলিক উপাদান। এ অর্থেই এগুলো বিভাজ্য নয়। আর বিভাজ্য নয় বলেই হিউমের মতে, মৌলিক ইন্দ্রিয়ছাপগুলো সঞ্জায়নযোগ্যও নয়।[৪৭] মনোবিজ্ঞানের বিশ্লেষণের দ্বারাই হিউমের এই মৌলিক ইন্দ্রিয়ছাপ নামক অভিজ্ঞতার মৌলিক উপাদান বা পরমাণুকে পাওয়া যায় বলে এ মতবাদকে মনস্তাত্ত্বিক পরমাণুবাদ বলে অভিহিত করা হয়।

হিউম যৌগিক ধারণাগুলোকেও মোট তিন ভাগে বিভক্ত করেন : সম্বন্ধ, ধরন ও দ্রব্য। তাঁর মতে, যৌগিক ধারণাগুলোই হল চিন্তা ও ন্যায়ের সাধারণ বিষয়বস্তু। সাধারণত আমাদের সরল ধারণাগুলোর মধ্যে কোন না কোন বচনের সংযোগ থেকেই এদের উৎপত্তি হয়ে থাকে। এসব যৌগিক ধারণাকে সম্বন্ধ, অভিব্যক্তি বা ধরন এবং দ্রব্য–এ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।[৪৮]

প্রত্যক্ষণের উপরোক্ত শ্রেণী বিভাগকে সংক্ষেপে নিম্নোক্ত ছকের সাহায্যে দেখানো যায় :

হিউমের প্রত্যক্ষণের শ্রেণী বিভাগ

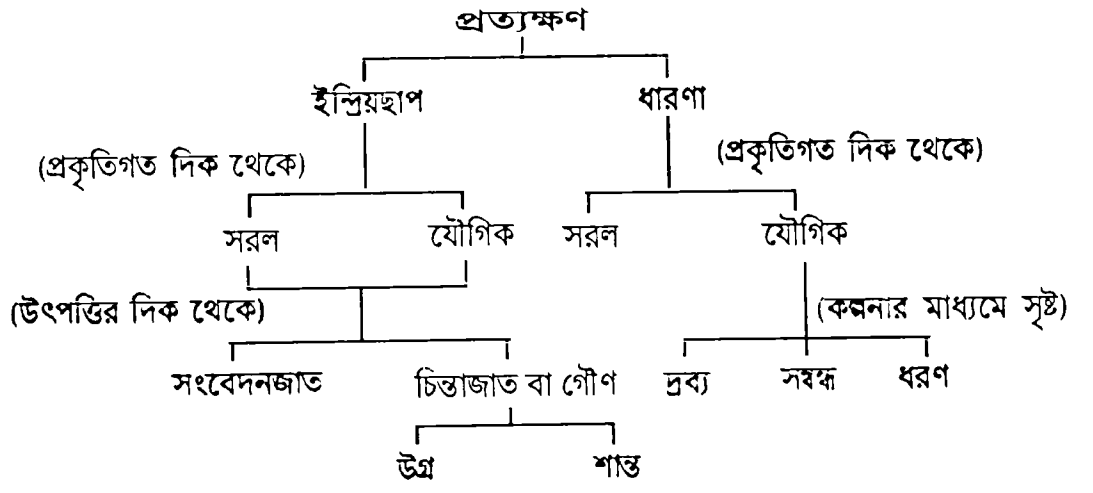

Dhaka University Institutional Repository

হিউমের প্রত্যক্ষণের বিভাজনের উপরের তালিকা থেকে প্রশ্ন জাগে কেন হিউম প্রত্যক্ষণকে এ ভাগে বিভক্ত করেছেন। এর উত্তরে বলা যায়, তিনি মূলত মানব প্রকৃতির স্বরূপ অন্বেষণ করতে গিয়ে তাঁর জ্ঞানবিদ্যাগত আলোচনায় জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্বের ভূমিকা নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। নিউটন যেমন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জন্য নতুন চিন্তা প্রণালী সরবরাহ করেছেন তেমনি হিউমও জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে চিন্তার নতুন প্রণালী আবিষ্কারের প্রয়াস নেন। তাই তিনি জ্ঞানোৎপত্তিতে চিন্তার বিভিন্ন স্তর ও প্রণালী নির্ণয় করতে গিয়ে প্রত্যক্ষণের এই বিভাজনে মনোনিবেশ করেন বলে মনে হয়।

হিউমকৃত প্রত্যক্ষণের এই বিভাজন–ছক থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হলেও উৎপত্তির দিক থেকে মূল বা প্রাথমিক উপাদান হল ইন্দ্রিয়ছাপ। একেই তিনি মানব প্রকৃতির প্রথম সূত্র বলে অভিহিত করেছেন। এছাড়া, আমাদের সকল ধারণা ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে উৎপন্ন হয়–একথা বলার মাধ্যমেই তিনি জ্ঞানোৎপত্তিতে মনস্তত্ত্বের ভূমিকা প্রমাণের প্রয়াস নেন। এখানেই পূর্ববর্তীঅভিজ্ঞতাবাদী লক ও বার্কলে থেকে তাঁর পার্থক্য ও বিশেষত্ব নির্দেশিত হয়। যদিও হিউম প্রত্যক্ষণকে প্রথমেই ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণায় বিভক্ত করেছেন তবু ধারণা বলতে স্মৃতি বা কল্পনার মাধ্যমে সৃষ্ট ইন্দ্রিয়ছাপের অনুলিপিকেই বুঝানো হয়েছে। এ সূত্রের মাধ্যমেই হিউম দেকার্তের অন্তর্ধারণা মতবাদকে খণ্ডন করে জ্ঞানোৎপত্তিতে অভিজ্ঞতার ভূমিকা যৌক্তিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং হিউমের কাছে অন্তর্ধারণা নয় ইন্দ্রিয়ছাপই হল জ্ঞানের বা প্রত্যক্ষণের একমাত্র প্রাথমিকউপাদান।

ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার পার্থক্য : ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হিউম এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। এ পার্থক্য নিয়ে তিনি খুব বেশী বিস্তৃত আলোচনা না করলেও তাঁর দ্বারা নির্ণীত ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার মধ্যেকার পার্থক্য থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, একমাত্র ইন্দ্রিয়ছাপই জ্ঞানের প্রাথমিক উপাদান। ইন্দ্রিয়ছাপ থেকেই ধারণার উৎপত্তি হয়। তিনি তাঁর *Treatise* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় এবং *Enquiry* গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধারণার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে খুব স্বল্প পরিসরে ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন।

হিউম ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার মধ্যে যে পার্থক্য নির্দেশ করেন তা হল তীব্রতার মাত্রাগত পার্থক্য। তাঁর মতে, যে পরিমাণ শক্তি ও সজীবতা নিয়ে এরা আমাদের মনে আঘাত করে এবং চিন্তা ও চেতনায় প্রবেশ করে তার তারতম্যের ওপর এদের পার্থক্য নির্ভরশীল।[৪৯] তিনি আরও বলেন, প্রথমেই যা আমার চোখে পড়ে তা হল শুধু শক্তি ও গভীরতার তারতম্য ছাড়া অন্যসব বিষয়ে ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার মধ্যে গভীর এক সাদৃশ্য।[৫০] যদিও তিনি এখানে 'প্রথমেই' শব্দটা ব্যবহার করেছেন তবুও অনুসন্ধানের শেষ পর্যায়েও তিনি এছাড়া কোন পার্থক্য নির্দেশ করেন নি। *Treatise* গ্রন্থে তিনি ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার পার্থক্যকে অনুভূতি ও চিন্তার মধ্যকার পার্থক্য বলে উল্লেখ করেছেন এবং ঠিক একই ভাবে *Enquiry* গ্রন্থেও তিনি এ পার্থক্যকে চিন্তা ও ধারণার মধ্যকার পার্থক্যবলেছেন।[৫১] এ পার্থক্য তীব্রতার মাত্রার। ঋভ্যলধরহ গ্রন্থে তিনি বলেন:

> যখন কোন ব্যক্তি প্রচণ্ড তাপের বেদনা অনুভব করে বা অসহনীয় উষ্ণতার অনুভূতি লাভ করে এবং পরবর্তীতে যখন সে এই সংবেদনের বিষয়টিকে স্মৃতিতে পুনরুদ্রেক করে বা কল্পনায় উপলব্ধি করে তখন তার মনের প্রত্যক্ষণগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে বলে সকলেই অনুভব করতে পারেন। মূল প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে যে শক্তি ও সজীবতার উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে স্মৃতি এবং কল্পনা সে শক্তি ও সজীবতাকে কখনও জাগিয়ে তুলতে পারে না।[৫২]

অর্থাৎ মূল প্রত্যক্ষণ বা ইন্দ্রিয়ছাপ এবং চিন্তা অর্থাৎ স্মৃতি বা কল্পনাজাত ধারণার মধ্যে পার্থক্য হল, সজীবতার মাত্রার। অবশ্য হিউম একথা স্বীকার করেন যে, কল্পনায় ইন্দ্রিয়ছাপের ক্ষীণ প্রতিবিম্বগুলো কোন কোন সময় এমন সজীবতা প্রাপ্ত হয় যে তখন এগুলোকে আর কল্পনা বলে মনে হয় না। বরং মনে প্রথম আগত সংবেদন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ছাপের মতই মনে হয়। নিদ্রা, জ্বর বা বিকারে অথবা মনে কোন প্রবল আবেগ উৎপন্ন হলে এরূপ মনে হতে পারে। অন্যদিকে, কোন কোন সময় আমাদের ইন্দ্রিয়ছাপগুলোও তীব্রতার দিক থেকে এত অস্পষ্ট বা ক্ষীণ থাকে যে, তখন তাদেরকে ধারণার মতই মনে হয়। কিন্তু হিউমের মতে, এসব সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার মধ্যকার মাত্রাগত তারতম্যটি এত স্পষ্ট যে, ধারণা যত স্পষ্টই হোক না কেন তা কখনোই ইন্দ্রিয়ছাপের মত সজীব ও স্পষ্ট হতে পারে না। তাই তিনি তাঁর *Enquiry* গ্রন্থে বলেন, সবচেয়ে সজীব বা প্রাণবন্ত চিন্তন সবচেয়ে নিস্তেজ সংবেদনের তুলনায়হীনতর।[৫৩]

Dhaka University Institutional Repository

হিউম এই পার্থক্যের বিষয়টিকে বুঝাতে গিয়ে অনেকগুলো উদাহরণের উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, মনের যে কোন প্রত্যক্ষণের দিকে লক্ষ্য করলেই তীব্রতার মাত্রার এ পার্থক্যটি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। যেমন, কোন ব্যক্তি যিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন তার মধ্যে যে সক্রিয়তা বিদ্যমান যিনি কেবল ক্রোধের কথা চিন্তা করছেন তার মধ্যে সে সক্রিয়তা থাকবে না। অথবা কোন ব্যক্তি প্রেমে পড়েছেন একথা কেউ বললে তার কথার অর্থ আমরা বুঝি এবং সে ব্যক্তির অবস্থাও আমরা ধারণা করতে পারি। কিন্তু বাস্তবে প্রেমরূপ আবেগ যে মানসিক উত্তেজনা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে তার সাথে পূর্ববর্তী ধারণা এক নয়। এখানে হিউম দেখাতে চেয়েছেন যে, চিন্তন বিশস্ত দর্পণের মত কাজ করতে পারে। অর্থাৎ চিন্তন অবিকৃতভাবে প্রত্যক্ষিত ঘটনার যথাযথ অনুলিপি উপস্থাপন করতে পারে। কিন্তু চিন্তন প্রত্যক্ষিত যথার্থ মূল ঘটনাটিকে উপস্থাপিত করতে পারে না। অর্থাৎ চিন্তন দ্বারা উপস্থাপিত প্রতিকৃতি ও মূল ঘটনার মধ্যে যে পার্থক্য থাকে তা হল এই যে, প্রতিকৃতি মূল ঘটনা থেকে ক্ষীণ, অস্পষ্ট বা নিস্তেজ। সুতরাং বলা যায়, ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার মূল পার্থক্য মাত্রাগত বা পরিমাণগত, প্রকৃতিগত নয়। হিউমের উদাহরণে এ বিষয়টি স্পষ্ট। তিনি তাঁর *Treatise* গ্রন্থে বলেন, অন্ধকারে লাল রং-এর যে ধারণা আমরা তৈরী করি এবং সূর্য কিরণে তার যে ইন্দ্রিয়ছাপ আমাদের চোখে পড়ে তাদের মধ্যে পার্থক্যটি পরিমাণগত, প্রকৃতিগত নয়।[৫৪] অর্থাৎ তাদের আকার, গঠন, বৈশিষ্ট্যাবলী অভিন্ন, কেবল সজীবতার ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান। এজন্য *Enquiry* গ্রন্থে হিউম ধারণা ও ইন্দ্রিয়ছাপের পরিচয় দিতে গিয়ে যেগুলো কম স্পষ্ট ও সজীব সেগুলোকে সাধারণভাবে ধারণা এবং অপর সবগুলো প্রত্যক্ষণকে ইন্দ্রিয়ছাপ বলেছেন।[৫৫] সুতরাং এদের মধ্যকার পার্থক্য সজীবতা বা স্পষ্টতার মাত্রার অর্থাৎ পরিমাণগত, প্রকৃতিগত নয়।

অবশ্য হিউমের আলোচনা থেকে ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার মধ্যে আরও কিছু পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। সেগুলো হল, ধারণা সর্বদাই ইন্দ্রিয়ছাপের অনুগামী, পূর্বগামী নয়। অর্থাৎ সময়ের দিক থেকে ধারণার আর্বিভাব সব সময়ই ইন্দ্রিয়ছাপের পরে ঘটে, কখনও আগে নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর *Treatise* গ্রন্থে বলেন, সব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সরল ইন্দ্রিয়ছাপগুলো তাদের অনুরূপ সরল ধারণার পূর্বগামী, এর উল্টোটি কখনও ঘটে না।[৫৬] অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার উৎপত্তিক্ষণে পার্থক্য বিদ্যমান। সময়ের দিক থেকে ধারণা ইন্দ্রিয়ছাপের পরে আসে। যদিও অন্তর্দর্শনের ইন্দ্রিয়ছাপের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ছাপ ধারণার পরে আসে তবু এ ধারণার আগেও কোন না কোন ইন্দ্রিয়ছাপ অবশ্যই থাকে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়ছাপ ধারণার পূর্বেই অস্তিত্বশীল থাকে।[৫৭] এ থেকে ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার যে আরেকটি পার্থক্য অনুসৃত হয় তা হল, প্রাথমিকভাবে সর্বদাই ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে ধারণার উৎপত্তি ঘটে, কখনও ধারণা থেকে ইন্দ্রিয়ছাপের উৎপত্তি ঘটে না। এপ্রসঙ্গে হিউম তাঁর *Treatise* গ্রন্থে বলেন, আমাদের সব ধারণাই প্রথম আবির্ভাবের সময় তাদের সদৃশ্য ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে উৎপন্ন হয় এবং এরা তাদের অবিকল প্রতিকৃতি।[৫৮] অন্যদিক থেকে বলতে গেলে, ইন্দ্রিয়ছাপ ধারণার কারণ। ধারণা ইন্দ্রিয়ছাপের কারণ নয়। হিউম এ প্রসঙ্গে বলেন, দুইরকমের সদৃশ প্রত্যক্ষণের সতত সংযোগ থেকে নিশ্চিত প্রমাণ হয় যে, একটি অন্যটির কারণ এবং এদের মাঝে ইন্দ্রিয় পূর্ববর্তিতা একইভাবে প্রমাণ করে যে, ইন্দ্রিয়ছাপ ধারণার কারণ। ধারণা ইন্দ্রিয়ছাপের কারণ নয়।[৫৯]

হিউম বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয়ছাপ ও বিভিন্ন প্রকার ধারণার মধ্যেও পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। তিনি ইন্দ্রিয়ছাপকে সংবেদনজাত ও চিন্তাজাত এ দু'ভাগে ভাগ করেন। এ দুই প্রকার ইন্দ্রিয়ছাপের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, সংবেদনজাত ইন্দ্রিয়ছাপগুলো উৎপত্তির দিক থেকে চিন্তাজাত ইন্দ্রিয়ছাপের পূর্ববর্তী। কারণ, সংবেদনজাত ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে যে ধারণার জন্ম নেয় তা "আত্মায় আর্বিভূত হয়ে" চিন্তাজাত ইন্দ্রিয়ছাপ গঠিত হয়। এদিক থেকে বিচার করলে সংবেদনজাত ইন্দ্রিয়ছাপগুলো শুধু সময়ের দিক থেকেই চিন্তাজাত ইন্দ্রিয়ছাপের পূর্বগামী নয় বরং চিন্তাজাত ইন্দ্রিয়ছাপের কারণও। এছাড়া, সংবেদনজাত ইন্দ্রিয়ছাপগুলো হল মূল বা আদি। কারণ, উৎপত্তির দিক থেকে এরাই প্রথম ইন্দ্রিয়ছাপ। অন্যদিক থেকে এরা মৌলিক। কেননা, এরা অন্য কিছুর নকল বা প্রতিলিপি নয়। চিন্তাজাত ইন্দ্রিয়ছাপগুলো উপরোক্ত অর্থে কেবল মৌলিকতার দাবীদার। কিন্তু এগুলো আদি বা মূল নয়। কেননা, উৎপত্তির দিক থেকে এরা সংবেদনজাত ইন্দ্রিয়ছাপগুলোর পরে আসে এবং এগুলোর উপর নির্ভরশীল।

Treatise গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে হিউম ধারণাকে স্মৃতি ও কল্পনার ধারণায় বিভক্ত করেন। এ দুই প্রকার ধারণার মধ্যে পার্থক্য হল শক্তি ও সজীবতার। স্মৃতির ধারণা কল্পনার ধারণা থেকে বেশী সজীব। স্মৃতির ধারণার অবস্থা সজীবতার দিক থেকে ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার মাঝামাঝি। কিন্তু কল্পনার ধারণা একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা। এর সজীবতা যে কোন ধারণার সজীবতার মত, এর বেশী নয়। তিনি বলেন, স্মৃতির ধারণাগুলো কল্পনার ধারণার চেয়ে অনেক বেশী সজীব ও শক্তিশালী।[৬০] তিনি স্মৃতি ও কল্পনার ধারণার মধ্যে আরও একটি পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, স্মৃতি নিজের বিশেষ ধর্ম অনুযায়ী এর ধারণাগুলোর মৌলিক অবস্থান ও বিন্যাসকে রক্ষা করে। কিন্তু কল্পনা ধারণাগুলোকে এবং এগুলোর বিন্যাসকে

Dhaka University Institutional Repository

ইচ্ছামত পরিবর্তিত করে।[৬১] তবে হিউম একথা স্বীকার করেন যে, স্মৃতি ও কল্পনার ক্রিয়াকর্মের সময় এদের ভিন্নতা বুঝে উঠার জন্য এই পার্থক্য যথেষ্ট নয়। কারণ, অতীত ইন্দ্রিয়ছাপগুলোকে বর্তমান ধারণা সমূহের সাথে তুলনা করার জন্য তাদেরকে স্মরণ করে তাদের বিন্যাস একইভাবে রয়েছে কি না তা বিবেচনা করে দেখা অসম্ভব। সুতরাং স্মৃতি ও কল্পনার ধারণার মূল যে পার্থক্যটি আমাদের চোখে পড়ে তা হল, স্মৃতির ধারণা কল্পনার ধারণার চেয়ে অধিকতর সজীব। পক্ষান্তরে, কল্পনার ধারণা স্মৃতির ধারণার চেয়ে কম স্পষ্ট বা কম সজীব। ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার পার্থক্য বিষয়ে উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, হিউম শুধু এদের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্যের কথা বলেছেন। এদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য নাই। এছাড়াও হিউমের আলোচনা থেকে এ দু'য়ের মধ্যে যে পার্থক্য পাওয়া যায় তা হল, ইন্দ্রিয়ছাপ ধারণার পূর্বগামী এবং সর্বক্ষেত্রেই প্রাথমিকভাবে ইন্দ্রিয়ছাপ ধারণার কারণ। অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে ইন্দ্রিয়ছাপ না থাকলে ধারণার উৎপত্তি সম্ভব নয়। এখানেই হিউম মানুষের চিন্তার ক্ষমতার সীমারেখা টেনে দিয়ে তাঁর জ্ঞানোৎপত্তিসংক্রান্ত মতবাদকে চরম অভিজ্ঞতাবাদে পরিণত করেছেন। তাঁর এ পার্থক্যকরণ মূলত–'ইন্দ্রিয়ছাপই জ্ঞানের একমাত্র প্রাথমিক উপাদান এবং ইন্দ্রিয়ছাপ ছাড়া ধারণার উৎপত্তি হতে পারে না'–তাঁর জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদের এ মূল সুরকেই দৃঢ়তরকরে।

হিউমের প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত উপরের আলোচনাকে সংক্ষেপে হিউমের অন্যতম সমালোচক বেরী ষ্টাউভের ভাষায় নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়ঃ[৬২]

১। মনে কোন প্রত্যক্ষণ যদি পূর্ব থেকে না থাকে তবে কোন চিন্তার বা মানসিক ক্রিয়ার উৎপত্তি হতে পারে না।

২। প্রতিটি প্রত্যক্ষণই হয় একটি ইন্দ্রিয়ছাপ নয়ত ধারণা।

৩। প্রতিটি প্রত্যক্ষণই হয় সরল নয়ত জটিল।

৪। প্রতিটি সরল প্রত্যক্ষণ অনিবার্যভাবে সরল প্রত্যক্ষণ দ্বারা গঠিত।

৫। প্রতিটি সরল ধারণার অনুরূপ একটি সরল ইন্দ্রিয়ছাপ আছে।

৬। প্রতিটি সরল ধারণাই তার অনুরূপ সরল ইন্দ্রিয়ছাপের কার্য হিসাবে মনে উৎপন্ন হয়।

৭। সংবেদনজাত ইন্দ্রিয়ছাপ ছাড়া চিন্তাজাত ইন্দ্রিয়ছাপ উৎপন্ন হতে পারে না।

৮। সুতরাং, সংবেদনজাত ইন্দ্রিয়ছাপ ছাড়া চিন্তা বা মানসিক প্রক্রিয়া উৎপন্ন হতে পারে না।

ষ্টাউভ–এর মতে, উক্ত বক্তব্যগুলো হিউমের দর্শনের পদ্ধতিগত ঘোষণা ও বাস্তবে অনুসারিত পদ্ধতির পটভূমি নির্মাণ করে। হিউম মনে করেন যে, মানুষের মনকে বোঝার জন্য এবং আমরা যে উপায়ে চিন্তা করি সে উপায়ে কেন চিন্তা করি তা বোঝার জন্য আমাদের অবশ্যই চিন্তার উপায়গুলোর মূল বা আদি উৎস আবিষ্কার করতে হবে। অর্থাৎ যতদূর সম্ভব চিন্তার ধরনগুলোর উদ্ভবসংক্রান্ত বা বিকাশসংক্রান্ত ব্যাখ্যা দিতে হবে। হিউম সাদৃশ্যমূলক উদাহরণ দিয়ে বলেন, ব্যাধিকে আমরা যেভাবে কারণ আবিষ্কারের মাধ্যমে বুঝার চেষ্টা করি মানব মনের আচরণ ও ক্রিয়াপরতাকেও সেভাবে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। সুতরাং মানব মনের যথার্থ অধ্যয়ন বলতে মানব মনের উপাদানরূপ প্রত্যক্ষণগুলো কিভাবে প্রথমে মনের মধ্যে আসে এবং কেন তারা সেখানে তখন প্রতিভাত হয়–এ বিষয়ের অধ্যয়নকেই বুঝায়। হিউমের মতবাদের উপরোক্ত আটটি রূপরেখা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যক্ষণগুলো আমাদের মনে আবির্ভূত হওয়ার নূন্যতম কারণ হল, সংবেদনের ইন্দ্রিয়ছাপগুলো আমাদের মনে আসা। তাই আমাদের মনে যেসব ধারণার অস্তিত্ব আমরা দেখি সেগুলোর উৎপত্তিস্থল হল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা। এ সত্য আবিষ্কার করার পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে হিউমের মানব মন সম্পর্কিত পরীক্ষা কার্য শুরু হয়।

সুতরাং দেখা যায় হিউমের মতে, সংবেদনজাত ইন্দ্রিয়ছাপ যা প্রত্যক্ষণের প্রাথমিক উপাদান তাই জ্ঞানোৎপত্তির একমাত্র উৎস। যার ইন্দ্রিয়ছাপ নাই তার জ্ঞান পাওয়া যায় না–এটাই হল হিউমের জ্ঞানবিদ্যার মূল সূত্র বা একমাত্র মানদণ্ড। এ মানদণ্ডের ভিত্তিতেই তিনি দার্শনিক সমস্যাবলী, যেমন কার্যকারণ, ঈশ্বর, দ্রব্য, আত্মা ইত্যাদি ধারণাকে পর্যালোচনা করে খণ্ডন করেন ও এসবের নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রদান করেন। হিউম তাঁর দর্শনের এই মানদণ্ড সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, মানব প্রকৃতি বিজ্ঞানে এটাই আমার প্রথম সূত্র।[৬৩] এই মানদণ্ডই হিউমের জ্ঞানবিদ্যার অন্যতম আবিষ্কার। ম্যাকনাব মনে করেন যে, হিউমের ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা মতবাদ দ্বারা অভিজ্ঞতাবাদী অবস্থানকে নতুন এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী উপায়ে উপস্থাপনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।[৬৪] এ মতবাদ দ্বারাই তিনি কার্তেজীয় বুদ্ধিবাদের মূল ভিত্তি সহজাত ধারণার অভিজ্ঞতাবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সহজাত ধারণার অভিজ্ঞতাবাদী ব্যাখ্যা : জ্ঞানের উৎস সম্পর্কিত হিউম প্রদত্ত সূত্রটি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ছাপ ছাড়া কোন ধারণার সৃষ্টি হতে পারে না–এ সূত্রটি কার্তেজীয় বুদ্ধিবাদের মূল ভিত্তি সহজাত ধারণাকে খণ্ডন করে। তবে হিউম নিজে সহজাত ধারণা কথাটিকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু প্রচলিত অর্থে নয়, বরং নতুন অর্থে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অন্তর বা সহজাত শব্দটি যদি স্বাভাবিকতার সাথে সমার্থক হয় তাহলে মনের সব প্রত্যক্ষণ বা ধারণাকে অবশ্যই সহজাত বা স্বাভাবিক বলতে হবে। কিন্তু যদি অন্তর বা সহজাত বলতে 'আমাদের জন্মের সমসাময়িক' অর্থে বুঝি তবে বিতর্কের ব্যাপারটি হবে অসার। এ ছাড়া আমাদের চিন্তনক্রিয়া কখন থেকে শুরু হয়– জন্মের পূর্বে, জন্মের সময় বা জন্মের পরে – তা অনুসন্ধান করাও গুরুত্বহীন।[৬৫] লকের অন্তর্ধারণা খণ্ডনকে হিউম প্রশংসা করেন। কিন্তু হিউমের পূর্ববর্তী অন্যান্য দার্শনিক, বিশেষত লক ধারণা কথাটিকে যেভাবে গ্রহণ করেছেন হিউম তার সাথে একমত নন। কারণ হিউমের মতে, লক ও অন্যান্য দার্শনিক ধারণা বলতে প্রত্যক্ষণ, সংবেদন, আবেগ এবং এর সাথে চিন্তনকেও বুঝিয়েছেন। এ অর্থে কোন আঘাতের ফলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ বা স্ত্রী–পুরুষের আসক্তিও সহজাত বা অন্তর্ধারণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। অথচ তারা এসবকে অন্তর্ধারণা বলেন নি। লক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণগুলোকে কখনও ধারণা বলেছেন আবার কখনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণগুলোর ধারণার কথা বলেছেন। তিনি ধারণা কথাটিকে ইন্দ্রিয় উপাত্তরূপে যেমন ব্যবহার করেছেন তেমনি প্রত্যয় এবং সামান্য ধারণারূপেও ব্যবহার করেছে। আবার বার্কলে ধারণা ও বস্তুকে একই অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাই হিউমের মতে, তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ ধারণা শব্দটিকে অনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করেছেন।[৬৬] তিনি ধারণাকে ইন্দ্রিয়ছাপের অনুলিপি হিসাবে সুনির্দিষ্ট অর্থে গ্রহণ করেন এবং অন্তর বা সহজাত ধারণাকে কার্তেজীয় অর্থে অর্থাৎ পূর্ববর্তী কোন প্রত্যক্ষণের প্রতিরূপ নয় – এ অর্থে গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নেন যে, আমাদের সব ইন্দ্রিয়ছাপ হল অন্তর বা সহজাত অর্থাৎ মৌলিক। এরা কোনকিছুর অনুলিপি নয়। কিন্তু এ অর্থে আমাদের ধারণাগুলো অন্তর বা সহজাত নয়, কারণ, এরা মৌলিক নয় বরং প্রতিকৃতি মাত্র। হিউম তাঁর *Enquiry* গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষ পাদটীকায় বলেনঃ

> কিন্তু ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণাকে উপরে ব্যাখ্যাত অর্থে গ্রহণ করে এবং অন্তর বা সহজাত শব্দটিকে মৌলিক বা পূর্ববর্তী কোন প্রত্যক্ষণের অনুলিপি নয় এ অর্থে বুঝে নিয়ে আমরা ঘোষণা করতে পারি যে, আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ছাপই অন্তর বা সহজাত এবং আমাদের ধারণা সহজাত নয়।[৬৭]

অর্থাৎ কার্তেজীয় মতকে গ্রহণ করলে মৌলিকতার কারনে ধারণাগুলোকে নয় বরং ইন্দ্রিয়ছাপগুলোকেই অন্তর বা সহজাত বলতে হয়। এভাবে হিউম কার্তেজীয় সহজাত ধারণার অভিজ্ঞতাপূর্ব অস্তিত্ব খণ্ডন করে এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাবাদী নতুন তত্ত্ব দেন।

লক্ষণীয় বিষয় হল, অন্তর্ধারণাকে অমৌলিক হিসাবে প্রমাণ করে ইন্দ্রিয়ছাপকেই জ্ঞানের একমাত্র উৎস হিসাবে প্রমাণ করার মাধ্যমে হিউম জ্ঞানের সীমাও নির্দেশ করে দিয়েছেন। যেহেতু ইন্দ্রিয়ছাপ ছাড়া কোন ধারণা আমাদের মনে থাকতে পারে না অর্থাৎ সব ধারণারই অনুরূপ ইন্দ্রিয়ছাপ আছে এবং কার্তেজীয় অর্থে কোন ধারণারই অস্তিত্ব নাই সেহেতু আমরা ইন্দ্রিয়ছাপে যা পাই শুধু তারই জ্ঞান পেতে পারি। এর চেয়ে বেশী কিছুর নয়। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, লক মুখ্য ও গৌণ গুণের আধাররূপ অজ্ঞাত জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেছিলেন, বার্কলে লকের জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও প্রত্যক্ষণকারী হিসাবে মানসিক দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে জ্ঞানের সীমাকে অসীম করে দিয়েছিলেন। কিন্তু হিউম জড় ও মানসিক উভয় প্রকার দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করে ইন্দ্রিয়ছাপকেই জ্ঞানোৎপত্তির প্রাথমিক, মূল ও একমাত্র উৎস হিসাবে চিহ্নিত করে জ্ঞানের সীমারেখা নির্ণীত করেছেন। এখানেই তাঁর অভিজ্ঞতাবাদ তাঁর পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাবাদীদের দ্বারা সম্পাদিত অসঙ্গতি কাটিয়ে উঠে চরম অভিজ্ঞতাবাদে রূপলাভ করে। পূর্ববর্তী অসঙ্গতি কাটিয়ে সঙ্গতিলাভ করতে গিয়েই হিউমের জ্ঞানবিদ্যায় এটা প্রমাণিত হয় যে, অভিজ্ঞতাবাদের চরম বা সঙ্গতিপূর্ণ পরিণতি সংশয়বাদে। অবশ্য হিউমের মতে, এ সংশয়বাদ ধ্বংসমূলক অর্থে নয়, গঠনমূলক অর্থে। অর্থাৎ যুক্তিনির্ভর অভিজ্ঞতাবাদীর হাতে এ ছাড়া আর কোন উপায়ও থাকে না। তাই রাসেল হিউমের জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে হিউমকে গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিকদের মধ্যে একজন হিসাবে আখ্যায়িত করেন। রাসেলের মতে, হিউম লক ও বার্কলের অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনের যৌক্তিক সিদ্ধান্ত টেনে অভিজ্ঞতাবাদকে সঙ্গতিপূর্ণ করার মাধ্যমে অবিশ্বাস্য হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন। একটি নির্দিষ্ট অর্থে তিনি এর সর্বশেষ প্রতিনিধি। কারণ, তাঁর গতিপথে আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।[৬৮]

উপরোক্ত ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা এবং সহজাত ধারণা সম্পর্কিত নতুন তত্ত্ব থেকে সংক্ষেপে একথা বলা যায় যে, হিউম প্রত্যক্ষণকেই জ্ঞানের একমাত্র উৎস হিসাবে আখ্যায়িত করে সকল প্রকার ধারণাকে ইন্দ্রিয়ছাপের উপর নির্ভরশীল বলে প্রমাণ করেন। ফলে, ইন্দ্রিয়ছাপই জ্ঞানের একমাত্র প্রাথমিক উপাদান হিসাবে পরিগণিত হয়। তিনি দেকার্তের অন্তর্ধারণা বা সহজাত ধারণার অভিজ্ঞতাপূর্ব প্রকৃতিকে অস্বীকার করেন। কারণ, জন্মের সময় থেকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ছাপের পূর্বে কোন ধারণার অস্তিত্ব

Dhaka University Institutional Repository

থাকতে পারে না। তিনি দেকার্তের সহজাত ধারণাকে মৌলিক ধারণা অর্থে গ্রহণ করেন এবং এর অভিজ্ঞতাবাদী ব্যাখ্যা দিয়ে সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ছাপকেই অন্তর বা সহজাত বলেন। হিউম সকল ধারণাকে ইন্দ্রিয়ছাপের অনুলিপি হিসাবে গ্রহণ করায় জ্ঞানের সীমা ইন্দ্রিয়ছাপের মধ্যে নির্দিষ্ট হয় এবং অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যা থেকে লক ও বার্কলের দ্বারা স্বীকৃত দ্রব্যের অস্তিত্বের ধারণা হিউম দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। উল্লেখ্য যে, হিউম ইন্দ্রিয়ছাপকে জ্ঞানের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে, দেকার্তের দ্বারা স্বীকৃত অন্তধারণাকে অস্বীকার করে, সকল প্রকার ধারণাকে ইন্দ্রিয়ছাপের অনুলিপি হিসাবে চিহ্নিত করলেও তাঁর হাতে ধারণা শব্দটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান লাভ করে। তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ ধারণা শব্দটিকে যেভাবে অনির্দিষ্ট এবং বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেন হিউম এই অনির্দিষ্ট অর্থের হাত থেকে ধারণা শব্দটিকে মুক্তি দিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ছাপের অনুলিপি অর্থে ব্যবহার করেন। যার ফলে ধারণা শব্দটি দর্শনের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

আলোচনার অগ্রগতিতে আমরা দেখবো যে, তিনি ধারণার শুধু নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করেই ক্ষান্ত হন নি বরং ভ্রান্ত জ্ঞানের উৎস হিসাবে ধারণার অনুসঙ্গ নিয়ম নিয়ে আলোচনা করেন এবং অভিব্যক্তি বা ধরন, দ্রব্য এবং সম্বন্ধ ইত্যাদি যৌগিক ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে ধারণার অনুসঙ্গের গুরুত্ব নির্ণয় করে লক ও বার্কলের দ্বারা স্বীকৃত দ্রব্য সংক্রান্ত সমস্যার অভিজ্ঞতাবাদী সমাধানে প্রয়াসী হন। এর ফলে ধারণার অনুসঙ্গ সম্পর্কিত আলোচনা তাঁর জ্ঞানবিদ্যায় একটি বিশেষ স্থান দখল করে।

৪.২ ধারণার অনুসঙ্গ

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, চরম অভিজ্ঞতাবাদী হিউম অভিজ্ঞতাকেই জ্ঞানের একমাত্র উৎস বলেছেন। ইন্দ্রিয়ছাপই হল অভিজ্ঞতার মৌল উপাদান। সুতরাং, আমাদের জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রশ্ন হল, যে সব ধারণার সাথে আমাদের ইন্দ্রিয়ছাপের সরাসরি সম্পর্ক নাই অর্থাৎ যে সব ধারণা আমাদের অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে যায় যে মন দ্রব্য, আত্মা, সেসব ধারণা আমরা কিভাবে পাই। এর উত্তরে হিউম ধারণার অনুসঙ্গ নিয়মের কথা বলেন। এছাড়া, তিনি এই ধারণার অনুসঙ্গকে সকল প্রকার ভ্রমাত্মক জ্ঞানের কারণ হিসাবেও দায়ী করেন।

Treatise গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে এবং *Enquiry* গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি ধারণার অনুসঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ পরিচ্ছেদগুলোতে তিনি যা বলতে চেয়েছেন সংক্ষেপে তা হল এই যে, দু'ভাবে ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে ধারণার উৎপত্তি হতে পারে। স্মৃতির মাধ্যমে ও কল্পনার মাধ্যমে। স্মৃতির ধারণাগুলো কল্পনার ধারণা থেকে অনেক বেশী সজীব ও শক্তিশালী। এছাড়া, স্মৃতির ধারণা তাঁদের মূল ইন্দ্রিয়ছাপের ক্রমকে অনুসরণ করে উৎপত্তিলাভ করে। কিন্তু কল্পনার ধারণার সাথে মূল ইন্দ্রিয়ছাপের ক্রমের অনুরূপতা বজায় থাকে না। অন্যদিকে, স্মৃতির ক্ষেত্রে ধারণার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্তমান। কিন্তু কল্পনার ক্ষেত্রে ধারণার মধ্যে এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক অনুপস্থিত। অর্থাৎ কল্পনার ধারণাগুলো স্বাধীন ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কহীন। তবে এই স্বাধীনতা এবং অসংলগ্নতা সীমাহীন বা অবাধ নয়। আমাদের সবচেয়ে অবাধ কল্পনা ও অসংলগ্ন ধারণার মধ্যেও একটি যোগসূত্র বর্তমান। কল্পনা থেকে একটি বিশেষ সময়ে একটি বিশেষ ধারণার উৎপত্তি হয় এবং তা একটি নিয়ম মেনে চলে। স্বাধীন কল্পনাকেও ধারণার উৎপত্তির সময় এ নিয়ম মেনে চলতে হয়। এভাবে মনের এক ধারণা অন্য ধারণার সাথে যুক্ত হয়, এক ধারণা অন্য ধারণার কথা মনে করিয়ে দেয়। হিউম একে কোন আকস্মিক ঘটনা বলে মনে না করে বরং এর পেছনে একটি সার্বিক নিয়মের কথা বলেন। এ নিয়মই হল অনুসঙ্গ নিয়ম। অন্যকথায়, সরল ধারণাগুলো বিভিন্ন নিয়মে সংযুক্ত হয়ে সম্বন্ধ অভিব্যক্তি বা ধরন এবং দ্রব্য এই তিন প্রকার যৌগিক অভিজ্ঞতাতীত ধারণার সৃষ্টি করে। কল্পনাই বিভিন্ন ধারণার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে এসব যৌগিক ধারণা সৃষ্টি করে। স্মৃতির তুলনায় কল্পনাকে বাহ্যিক দিক থেকে স্বাধীন বলে মনে হলেও কল্পনার ধারণার স্বাধীনতাকে সীমাহীন বলা যায় না। আমাদের সবচেয়ে অবাধ কল্পনামূলক চিন্তা, স্বপ্ন, অসংলগ্ন স্বাধীন কথাবার্তার ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে, বিভিন্ন ধারণার মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। কতগুলো নির্দিষ্ট নিয়মে এগুলো নিয়ন্ত্রিত হয়। সরল ধারণার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী কল্পনার এসব নিয়মকেই হিউম অনুসঙ্গ নিয়ম হিসাবে আখ্যায়িত করেন। রবার্ট একারম্যান হিউমের অনুসঙ্গ নিয়ম সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, কিভাবে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ছাপ বিশ্লেষিত ও একত্রিত হয়ে ধারণার সৃষ্টি করে তা দেখাতে গিয়েই হিউম ধারণার অনুসঙ্গের কথা বলেন। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ছাপ একত্রিত হয়ে ধারণার সৃষ্টি করতে পারে এবং ধারণাগুলো আবার একত্রিত হয়ে জটিল ধারণার সৃষ্টি করতে পারে।[৬৯]

Dhaka University Institutional Repository

কল্পনার অনুসঙ্গ নিয়মটি তিনভাবে কাজ করে বলে হিউম মনে করেন। তা হল সাদৃশ্য, দেশ–কাল সান্নিধ্য ও কার্যকারণ। হিউমের মতে, যেসব গুণাগুণের সাহায্যে এই অনুসঙ্গ গঠিত হয় এবং যেগুলো মনকে এক ধারণা থেকে অন্য ধারণায় নিয়ে যায় সেগুলো তিন রকম ঃ সাদৃশ্য, কাল ও দেশে সান্নিধ্য এবং কার্যকারণ।[৭০] উল্লেখ্য যে, *Treatise* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার সম্বন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি মনের তিনটি গুণের কথা বলেন। এর প্রথমটি হল ধারণার অনুসঙ্গ, দ্বিতীয়টি ইন্দ্রিয়ছাপের অনুসঙ্গ এবং তৃতীয়টি এই উভয় শ্রেণীর অনুসঙ্গ। তাঁর মতে, মনের তৃতীয় গুণ হিসাবে এ উভয় শ্রেণীর অনুসঙ্গ পরস্পরকে সাহায্য করে এবং একে অপরের দিকে এগিয়ে যায়। যেখানে একই বস্তুতে এই উভয় অনুসঙ্গ ঘটে সেখানে তাদের মধ্যকার আদান প্রদান অতি সহজে ঘটে থাকে। এ পরিচ্ছেদে ধারণার অনুসঙ্গ নামক মনের প্রথম গুণটির কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, যখন একটি ধারণা কল্পনায় উপস্থিত হয় তখন এসব সম্বন্ধ [সাদৃশ্য, দেশ–কাল সান্নিধ্য ও কার্যকারণ] দ্বারা সংযুক্ত অন্য যে কোন ধারণা ঐ ধারণাকে [কল্পনায় উপস্থিত ধারণাটিকে] অনুসরণ করে।[৭১]

মনের দ্বিতীয় গুণ হিসাবে ইন্দ্রিয়ছাপের অনুসঙ্গের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে, ইন্দ্রিয়ছাপের অনুসঙ্গ হল ধারণার অনুসঙ্গের মত মনের দ্বিতীয় গুণ। তাঁর মতে, সকল সাদৃশ্যমূলক ইন্দ্রিয়ছাপ একত্রে সংযুক্ত হয় এবং একটি মনে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথেই অন্যটি তাকে অনুসরণ করে। উদাহরণস্বরূপ, দুঃখ হতাশা ও ক্রোধের উদ্রেক করে। ক্রোধ থেকে ঈর্ষার উৎপত্তি হয়, ঈর্ষা থেকে বিদ্বেষ এবং বিদ্বেষ থেকে আবার দুঃখের উৎপত্তি হয়। এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই অনুক্রম শেষ না হয় ততক্ষণ একটি ইন্দ্রিয়ছাপ সদৃশ ইন্দ্রিয়ছাপের জন্ম দেয়। তবে হিউম মনের উপরোক্ত দু'টো গুণের অর্থাৎ ধারণার অনুসঙ্গের সাথে ইন্দ্রিয়ছাপের অনুসঙ্গের পার্থক্য করেন। তাঁর মতে, এদের পার্থক্য হল এই যে, ধারণা সাদৃশ্য, দেশ–কাল সান্নিধ্য ও কার্যকারণ এই তিনটি নিয়মে অনুসঙ্গবদ্ধ হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ছাপ কেবলমাত্র একটি নিয়মে অনুসঙ্গবদ্ধ হয়। এ নিয়মটি হল সাদৃশ্য নিয়ম।[৭২]

ধারণার অনুসঙ্গ নিয়মের উদাহরণ দিতে গিয়ে হিউম তাঁর *Enquiry* গ্রন্থে বলেন, কোন একটি প্রতিকৃতি, প্রতিকৃতিটি যার সেই মূল বস্তুর দিকে আমাদের চিন্তাকে চালিত করে। এটি সাদৃশ্য নিয়মের উদাহরণ। কোন দালানের একটি কক্ষের উল্লেখ করা হলে অন্যান্য কক্ষগুলোর আলোচনাও এসে পড়ে। এটি সান্নিধ্য নিয়মের উদাহরণ। আবার কোন আঘাতের কথা চিন্তা করলে সে আঘাতের ফলে উদ্ভূত বেদনার কথা চিন্তা না করে আমরা পারি না। এটি হল কার্যকারণ নিয়মের উদাহরণ। তবে এ তিনটি নীতির বাইরে অন্যকোন নীতি অনুসঙ্গের ক্ষেত্রে কাজ করে কি না এ বিষয়টি সঠিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয় বলে হিউম মনে করেন।

এটা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে ধারণার উৎপত্তির বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য তিনি অভিজ্ঞতাবাদী পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতির সমর্থন করে বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দেন। অনুসঙ্গের তিনটি নিয়ম প্রমাণ করার ক্ষেত্রেও তিনি উক্ত পদ্ধতিকে অনুসরণ করে অধিকতর দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করে দেখতে বলেন। তাঁর মতে, ব্যতিক্রমহীনভাবে পরীক্ষিত দৃষ্টান্তের সংখ্যা যত বেশী হবে নিয়মটি তত বেশী ব্যাপকতর বলে প্রমাণিত হবে। এ প্রসঙ্গে *Enquiry* গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে দীর্ঘ পরীক্ষা–নিরীক্ষার পর শেষ ছত্রে হিউম যে মন্তব্য করেন তা হল, আমাদের জন্য বর্তমানে এই সিদ্ধান্তে আসাই যথেষ্ট হবে যে, মনের সকল ধারণার সংযুক্তির নিয়ম হল তিনটিঃ সম্বন্ধ–সাদৃশ্য, সান্নিধ্য ও কার্যকারণ।[৭৩]

অনুসঙ্গ নিয়মের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হিউম একে একটি 'শান্ত শক্তি' বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁর মতে, অনুসঙ্গ নিয়মগুলো একটি সঙ্গতিবিধানকারী সার্বিক সূত্র।[৭৪] উল্লেখ্য যে, এ নিয়মগুলো ধারণাবলীর অনিবার্য কিংবা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের নির্দেশক নয়। এগুলো অভিজ্ঞতামূলক সার্বিকীকরণ মাত্র।[৭৫] অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা শুধু দেখতে পাই যে, অনুসঙ্গ নিয়মগুলোর মাধ্যমে কল্পনা ধারণার মধ্যে সংযুক্তি ঘটায়। অর্থাৎ একটি ধারণা অপর একটি ধারণার সদৃশ কিংবা দেশ কালের দিক থেকে কাছাকাছি অথবা একটি সংগঠিত হলে অপরটি সংগঠিত হয়। এ থেকে এদের একটির সাথে অপরটির সম্পর্ক আছে বলে আমরা মনে করি। তবে এ সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য নয়। এ· এন· বেসন হিউমের ধারণার অনুসঙ্গ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, চিন্তন এমন কি কল্পনাও কি ভাবে কমবেশী একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ পারম্পর্য অনুসরণ করে হিউম তাই অনুসঙ্গের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তাঁর চরম লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য এর প্রয়োজন ছিল বলে বেসন মনে করেন। কেননা, এ ব্যাখ্যাটি বুদ্ধিবাদীদের দ্বারা ব্যাখ্যাত মনের বৌদ্ধিক বৃত্তির অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। তিনি ঘোষণা করেন যে, ধারণার মধ্যে সংযোগের ফলই হল শৃঙ্খলা। এই শৃঙ্খলাকেই অনুসঙ্গ বলা হয়। এ শৃঙ্খলা বৌদ্ধিক নয় বরং অভিজ্ঞতাভিত্তিক। বেসনের মতে, হিউমের অনুসঙ্গ নীতির মাধ্যমে অন্য যে আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে তা হল, হিউম একজন পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণবাদী নন। কেননা, কোন ধারণা অন্যকোন্ ধারণাকে পূনরুদ্রেক করবে তা অনুসঙ্গ দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না। যদিও হিউম স্মৃতি ও কল্পনা উভয়কে অনুসঙ্গ নীতির অধীনস্ত মনে করেন তবুও একথা সত্য যে, অনুসঙ্গ নীতির মাধ্যমে হিউম আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রে কিছুটা স্বাধীনতা রক্ষা করতে চান।[৭৬] এন· কে· স্মিথ এ প্রসঙ্গে বলেন, অনুসঙ্গ হল মাধ্যাকর্ষণের মত ক্রিয়া করতে পারে এমন একটি শান্ত ও মৃদু শক্তি। তবে অনুসঙ্গ এ ক্রিয়া তখনই করতে পারে যখন পর্যাপ্ত পরিমাণ বিরুদ্ধ শক্তিসম্পন্ন কোন কারণ উপস্থিত না থাকে। এ শক্তি তিনটি ভিন্ন নীতির মাধ্যমে ক্রিয়া করতে পারে। এসব নীতি কখনও স্বতন্ত্রভাবে আবার কখনও কখনও একে অপরের দ্বারা শক্তিশালী হয়।[৭৭]

Dhaka University Institutional Repository

✓ হিউমের ধারণার অনুসঙ্গের আলোচনায় একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, ধারণার মধ্যে কেন অনুসঙ্গ স্থাপিত হয় সে সম্পর্কে হিউম কিছু বলেন নি। এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সি· আর· মরিস বলেন, অনুসঙ্গবদ্ধ ধারণাগুলোর নির্দিষ্ট গুণাবলীর উপরই ধারণার অনুসঙ্গ নির্ভর করে বলে মনে হয়। কিন্তু হিউম কোথাও একথা বলেন নি যে, ধারণার মধ্যকার নির্দিষ্ট গুণাবলী মনের দ্বারা বোধগম্য হওয়ার উপরই অনুসঙ্গের সম্ভাবনা নির্ভর করে। হিউমের পরবর্তীতে কান্ট একথা বলেছিলেন যে, কোন এক সক্রিয় মনের অনুপস্থিতিতে ধারণাগুলোর মধ্যে অনুসঙ্গ স্থাপিত হতে পারে না। কিন্তু হিউম এমন কোন ইঙ্গিত দেন নি। এমনকি কিভাবে তিনটি নীতিতে অনুসঙ্গ স্থাপিত হয় তাও হিউম ব্যাখ্যা করতি যান নি । মরিস–এর মতে, হিউম এ ব্যাপারে নীরব থাকার কারণ সম্ভবত এই যে, অভিজ্ঞতাবাদী হিসাবে হিউমের কাছে এ বিষয়টির অভিজ্ঞতাজাত কোন প্রমাণ উপস্থিত ছিলনা।৭৮ একারম্যানও এ ব্যাপারে একই মত পোষণ করেন। তাঁর মতে, হিউম অনুসঙ্গ নিয়মের কারণ ব্যাখ্যা করা থেকে বিরত থেকেছেন। আমাদের সামনে একাধিক ধারণার পারম্পর্য হলে তার মধ্যে যে অনুক্রম থাকে সে অনুক্রম এই তিন প্রকার প্রাকৃতিক সম্পর্কের যে কোন একটির দ্বারা হতে পারে। আমাদের সামনে যে ধারণাটি উপস্থিত হয়েছে তার সাথে এর পরে যে ধারণাটি আবির্ভূত হবে সে ধারণাটি তিনটি সম্পর্কের কোন্‌টি দ্বারা সম্পর্কিত হবে তা বলা সম্ভব নয়। তাই অনুসঙ্গ যৌক্তিকভাবে আবশ্যিক নয়। বরং তা প্রথা বা অভ্যাসের ফল। একারম্যানের মতে, হিউম এটা মনে করেছেন যে, দার্শনিকদের কাজ হল এ সম্বন্ধকে পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনা করা। কখন এগুলো ঘটে তা বৈধভাবে ব্যাখ্যা করা দার্শনিকদের কাজ নয়। কারণ, তা সম্ভব নয়। তাই হিউম অনুসঙ্গকে একটি পর্যবেক্ষণলব্ধ ঘটনা হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং কি কি বিশেষ নিয়মে অনুসঙ্গ ঘটে বলে দেখা যায় শুধু তাই তিনি বলেছেন। একারম্যানের মতে, অনুসঙ্গের বৈধ কারণ ব্যাখ্যা না করায় হিউমের এ মতবাদকে পূর্ণাঙ্গ মতবাদ হিসাবে অভিহিত করার ক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ থাকে। কিন্তু এটা ঠিক যে, অভিজ্ঞতাবাদী হিসাবে হিউম কখনও যৌক্তিকভাবে পর্যবেক্ষণের বাইরে পা বাড়াতে পারেন না। অনুসঙ্গ নিয়মের ক্ষেত্রেও তিনি এ নীতিকে সচেতন ভাবে পালন করেছেন বলে মনে হয়।৭৯ এ প্রসঙ্গে সি· আর· মরিসের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, হিউমের এ ব্যাখ্যা পূর্ণাঙ্গ হোক বা না হোক এটা সত্য যে, শেষ পর্যন্তও তিনি তার পদ্ধতি (পর্যবেক্ষণ) দৃঢ়ভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছেন।৮০

আঠারো ও উনিশ শতকের বৃটিশ দর্শন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতির প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। একথা অনুমান করা অমূলক হবে না যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির প্রভাবেই বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ জ্ঞানের জন্য পর্যবেক্ষণের বাইরে যেতে রাজী ছিলেন না। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বর্ণনামূলক। একটি ঘটনা কেন ঘটে তা ব্যাখ্যা করা নয় বরং একটি ঘটনা কিভাবে ঘটে তা ব্যাখ্যা করা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রধান কাজ। হিউম অনুসঙ্গনীতি কিভাবে ঘটে কেবল তাই ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু কেন ঘটে তা ব্যাখ্যা করেন নি। এ সম্ভবত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেরই প্রত্যক্ষ প্রভাব। একারম্যান হিউমের অনুসঙ্গ সম্পর্কে এরূপ মতই পোষণ করেন। তাঁর মতে, হিউম নিউটনের মত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছিলেন বলেই অনুসঙ্গের কারণ ব্যাখ্যা তাঁর কাছে অসম্ভব ছিল।৮১ সি· আর· মরিসও একারম্যানের সাথে একমত পোষণ করে বলেন, হিউম নিউটন প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করছেন এবং পর্যবেক্ষণযোগ্যতার বাইরের কিছু সম্পর্কে কথা বলেন নি।৮২ নিউটন কেন বস্তু পৃথিবীতে পড়ে তা ব্যাখ্যা করেন নি বরং কিভাবে পড়ে তা ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ তিনি নির্দিষ্ট অবস্থায় বস্তুর পতনের হার এবং দিক ইত্যাদি ব্যাখ্যা করেছেন। এভাবে হিউমও কেন ধারণার অনুসঙ্গ স্থাপিত হয় তা ব্যাখ্যা না করে বরং কিভাবে স্থাপিত হয় তা ব্যাখ্যা করেছেন। একারম্যানের মতে, হিউমের জ্ঞান সম্পর্কিত মতবাদের আদি অব্যাখ্যাত শব্দ "অনুসঙ্গ" নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ মতবাদের আদি অব্যাখ্যাত শব্দ 'মাধ্যাকর্ষণ'–এর অনুরূপ। মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা কিভাবে বস্তুর পতন হয় তা ব্যাখ্যাত হয়েছে। এদিকে, অনুসঙ্গ দ্বারা কিভাবে ধারণাগুলোর মধ্যে অনুসঙ্গ স্থাপিত হয় তা ব্যাখ্যাত হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই 'কেন' সম্পর্কিত প্রশ্নটি গুরুত্ব পায় নি বরং 'কিভাবে' সম্পর্কিত প্রশ্নটি গুরুত্ব পেয়েছে। একারম্যানের মন্তব্য হল, হিউম ও নিউটনের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি সাম্প্রতিক কালের অভিজ্ঞতাবাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পর্যবেক্ষণের উপর আস্থা স্থাপন করাই হল এ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি। এর ফলস্বরূপ সাধারণ অভিজ্ঞতা ও যথার্থ পরীক্ষণাত্মক পর্যবেক্ষণই যে কোন প্রকার সার্বিকীকরণের উপায় হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং পর্যবেক্ষণলব্ধ নয় বলে অধিবিদ্যাও বর্জিত হয়েছে।৮৩ মরিসও এটা মনে করেন যে, ধারণার অনুসঙ্গ নীতিকে হিউম পদার্থবিদ্যার সার্বিক আকর্ষণের সাথে তুলনা করেছেন। এর প্রকাশ যেমন বিভিন্নমুখী এর কারণ ও ক্রিয়ার ধরন তেমনি অজ্ঞেয়। কেবল পর্যবেক্ষণ থেকেই এর অস্তিত্বের প্রমাণ নিতে হবে।৮৪ এ প্রসঙ্গে হিউমের নিজস্ব বক্তব্য হল, এসব সংযোগকারী বা অসঙ্গক সূত্র সরল ধারণার মধ্যে সংযোগ ঘটায়। এসব যোগসূত্র এমন এক আকর্ষণ সৃষ্টি করে যা প্রাকৃতিক ও মানসিক উভয় জগতেই সমভাবে প্রভাবশালী। বিভিন্নরূপে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। সর্বক্ষেত্রেই ক্রিয়াগুলো সুস্পষ্ট। কিন্তু এর কারণগুলো প্রায়ই অজ্ঞাত থাকে।৮৫ এই অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

কারণগুলোকে শেষ বিচারে মানব প্রকৃতির মৌলিক গুণ হিসাবে বিশ্লেষণ করতে হবে বলে হিউম মত প্রকাশ করেন।৮৬/এর দ্বারা হিউম মানব মনের একটি বিজ্ঞান নির্মাণ করেছেন যার সাথে পদার্থ বিজ্ঞানের যথেষ্ট মিল দেখা যায়। এ বিজ্ঞান একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষককে মানব প্রকৃতির যথাযথ ক্রিয়াশীল নীতিকে সনাক্ত করতে পরিচালিত করে, যদিও এই নীতিটি কিভাবে কাজ করে তা সে বুঝতে পারে না। এসব বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হিউম অনুসঙ্গ নিয়মের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিতহয়েছেন।

জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে হিউমের তিনটি অনুসঙ্গ নিয়মের ভূমিকা কি এ প্রশ্ন অত্যন্ত স্বাভাবিক। অনুসঙ্গ নিয়মগুলো ধারণার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে জ্ঞানের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রশ্ন হল এদের দ্বারা প্রসারিত জ্ঞানের ক্ষেত্র কতটুকু নির্ভরযোগ্য বা যথার্থ। এছাড়া, এ প্রসঙ্গে অন্য যে প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক তা হল, ধারণার অনুসঙ্গ জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করে যথার্থ জ্ঞান উৎপাদনে সক্ষম হলে হিউমের চরম অভিজ্ঞতাবাদী নীতির জন্য তা ক্ষতিকর কি না। হিউমের *Treatise* গ্রন্থের প্রথম পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া যায়। এখানে হিউম যা বলতে চেয়েছেন তার মূলকথা হল, ধারণার অনুসঙ্গ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান নিশ্চিত নয়। তাঁর মতে, সাদৃশ্য সান্নিধ্য ও কার্যকারণ নিয়ম তিনটি যখন ধারণাসমূহকে একত্রীকরণের জন্য কাজ করে তখন এরা ভ্রান্তি উৎপন্ন করতে পারে। মন ধারণাগুলোকে ভুল সনাক্ত করার মাধ্যমে যেখানে দু'টো ধারণার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সেখানে একটার ক্ষেত্রে অন্যটাকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে। তিনি এই অনুসঙ্গ তিনটির মধ্যে সাদৃশ্যকে ভ্রান্তির সর্বাপেক্ষা উর্বর উৎস বলে অভিহিত করে বলেন যে, চিন্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে যে সব ভ্রান্তি দেখা যায় তার খুব কম সংখ্যক ভ্রান্তিই আছে যাদের উৎস সাদৃশ্য নিয়ম নয়। কারণ, সাদৃশ্যমূলক ধারণাগুলো কেবল তাদের পরস্পরকে সম্পর্কযুক্তই করে না বরং মনের যে সব ক্রিয়া দ্বারা আমরা এগুলোকে বিবেচনা করি সে সব ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য এত কম যে, এদের একটি থেকে অন্যটিকে আলাদা করা সম্ভব হয়ে উঠে না। এজন্যই ভ্রান্তির উৎপত্তি হয়। এ ভ্রান্তি দূরীকরণের উপায় হিসাবে তিনি ধারণাগুলোর উৎপত্তি অনুসন্ধান করতে বলেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও তিনি তাঁর চরম অভিজ্ঞতাবাদী নীতিতে ফিরে গিয়ে যে ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে ধারণাগুলোর উৎপত্তি হয়েছে সে ধারণাগুলোকে বিচার করে দেখতে বলেন। তাঁর মতে সাদৃশ্য, সান্নিধ্য ও কার্যকারণ এ তিনটি নিয়মকে এদের কারণ সম্পর্কে পরীক্ষা না করেই ধারণার একত্রকরণের নিয়মাবলী হিসাবে গ্রহণ করা হলে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই অভিজ্ঞতার আধেয়–এর উপর নির্ভর করতে হয়।

সুতরাং দেখা যায়, হিউমের অনুসঙ্গ নীতিগুলো সরল ধারণাবলীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে অভিজ্ঞতালব্ধ নয় এমন সব যৌগিক ধারণার জ্ঞান উৎপন্ন করার মাধ্যমে জ্ঞানের পরিধির বিস্তৃতির ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে একথা নিশ্চিত। তবে, যেহেতু ধারণার অনুসঙ্গ ইন্দ্রিয়ছাপ নির্ভর নয় সেহেতু এর দ্বারা বিস্তৃত জ্ঞানে ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে এবং এর নিশ্চিতি পরীক্ষার জন্য হিউমের অভিজ্ঞতাবাদী সূত্র অনুসারে এদের অনুরূপ ইন্দ্রিয়ছাপকে যাচাই করে দেখতে হয়। এভাবে ধারণার অনুসঙ্গ আলোচনার মাধ্যমে হিউম কল্পনার স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা এবং কল্পনার কার্যকাণ্ডের অভিজ্ঞতাবাদী পর্যবেক্ষণলব্ধ সূত্রের নির্দেশ করেন। ফলে বুদ্ধিবাদীদের অভিজ্ঞতাপূর্ব অন্তর্ধারণার অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় এবং অভিজ্ঞতাবাদের ভিত মজবুত হয়। হিউমের অনুসঙ্গ নীতির এ ব্যাখ্যায় দর্শনের উপর সতেরো শতকের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তথা নিউটনীয় বিজ্ঞানের প্রভাবও স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়।

উপরোক্ত ধারণার অনুসঙ্গ সম্পর্কিত আলোচনা থেকে সংক্ষেপে একথা বলা যায় যে, অভিজ্ঞতার উর্দ্ধে যে সব ধারণার অস্তিত্ব আমাদের মনে থাকে ধারণার অনুসঙ্গ নিয়মত্রয় অর্থাৎ সাদৃশ্য, দেশ কালের সান্নিধ্য ও কার্যকারণ –এ তিনটি সম্বন্ধ বা অনুসঙ্গ নিয়ম এ সব ধারণার কারণ। এতিনটি সম্বন্ধের ফলে স্মৃতি ও কল্পনার মাধ্যমে আমরা অভিজ্ঞতা বহির্ভূত ধারণাগুলো পাই। হিউম স্পষ্ট ভাষায় একথা বলেছেন যে, এসব সম্বন্ধ থেকে প্রাপ্ত ধারণা আবশ্যিকভাবে নিশ্চিত নয় বরং এরাই সকল প্রকার ভ্রান্তির উৎস। এ সব ধারণার নিশ্চিত পরীক্ষার জন্য তিনি এদের উৎসরূপে যে ইন্দ্রিয়ছাপ বর্তমান তার অনুসন্ধান করতে বলেছেন। হিউমের এই আলোচনা থেকে যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয়েছে সেগুলো হলঃ

১। অনুসঙ্গ নিয়ম অর্থাৎ সাদৃশ্য, সান্নিধ্য ও কার্যকারণই অভিজ্ঞতা–উর্দ্ধ সকল প্রকার ধারণা এবং সকল প্রকার ভ্রান্ত জ্ঞানের উৎস। এতে তাঁর মতবাদে ভ্রান্ত জ্ঞানের ব্যাখ্যা সংযোজিত হয়েছে।

২। স্মৃতি ও কল্পনা দ্বারা যে আবশ্যিকভাবে যথার্থ জ্ঞান পাওয়া যায় না বরং এগুলো ভ্রমাত্মক জ্ঞানের কারণরূপে কাজ করে এ তথ্য নির্দেশিত হওয়ার সাথে সাথে স্মৃতি এবং কল্পনার ক্ষমতা অর্থাৎ সীমাও নির্দেশিত হয়েছে। সাধারণত কল্পনাকে অবাধ মনে করা হলেও আসলে কল্পনা ও স্মৃতি উভয়েরই সীমা যে ইন্দ্রিয়ছাপের সীমা দ্বারা নির্ণিত হয় তাও প্রতীয়মান হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩। সর্বোপরি, যথার্থ জ্ঞানের ক্ষেত্রে সকল প্রকার অভিজ্ঞতাপূর্ব ধারণার প্রভাব অস্বীকৃত হয়ে একমাত্র ইন্দ্রিয়ছাপই যে যথার্থ এবং অভ্রান্ত জ্ঞানের উৎস তা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এ তিনটি বিষয় স্পষ্টভাবে নির্দেশিত হওয়ায় জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে বুদ্ধিবাদীদের সহজাত ধারণার গুরুত্বের দাবী খণ্ডিত হয়ে এক্ষেত্রে বিজ্ঞান প্রভাবিত পদ্ধতি তথা অভিজ্ঞতাবাদী পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির গুরুত্ব স্বীকৃত হয় যা হিউমের ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা সম্পর্কিত মতবাদকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াতে সাহায্য করেছে।

হিউম-পূর্ব বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদী জন লক ও জর্জ বার্কলে অভিজ্ঞতাবাদকে সমর্থন করা সত্ত্বেও তাঁদের অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের পরিপূরক হিসাবেই আত্মা বা দ্রব্যের ধারণাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। হিউম তাঁর ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার অভিজ্ঞতাবাদী মানদণ্ডে সকল প্রকার দ্রব্য তথা শাশ্বত আত্মার ধারণাকে খণ্ডন করে ব্যক্তি অভিন্নতাকে ধারণার অনুসঙ্গ দ্বারা ব্যাখ্যা দেন এবং একে আরোপিত মানসিক প্রবণতাজাত ভ্রান্তি হিসাবে প্রতিপন্ন করেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানতাত্ত্বিক মতের পরিপূরক হিসাবে দ্রব্য বা আত্মার ধারণার অস্তিত্ব স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। এখানেই লক ও বার্কলের অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদ থেকে হিউমের অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদের অভিনবত্ব। তাই শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব খণ্ডন সম্পর্কিত আলোচনা হিউমের জ্ঞানবিদ্যার অপরিহার্য এবং গুরুত্বপুর্ণ অঙ্গ। এটিই আমাদের পরবর্তী অলোচ্য বিষয়।

৪.৩ হিউমের জ্ঞানবিদ্যা ও শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব খণ্ডন

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, হিউম ইন্দ্রিয়ছাপকেই জ্ঞানের একমাত্র উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করে অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না এমন সব ধারণাকে অনুসঙ্গ নিয়মের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছেন এবং এসব ধারণাকে ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর এ পদক্ষেপ অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যাগত অবস্থানের ক্ষেত্রে এক বিশেষ অবদান। আধুনিক বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদী লক দেকার্তের অন্তর্ধারণাকে খণ্ডন করেন এবং মনকে সাদা কাগজের সাথে তুলনা করে অভিজ্ঞতাবাদের গোড়াপত্তন করেন। কিন্তু তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক বা প্রতীকী বাস্তববাদী তত্ত্ববিদ্যাকে অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করতে গিয়ে জড় ও অধ্যাত্ম দ্রব্যের অস্তিত্বকে স্বীকার করেন। কারণ, সংবেদন ও অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞেয় বস্তুর মুখ্য ও গৌণ গুণের আধার হিসাবে দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা তাঁর জন্য আবশ্যিক হয়ে পড়ে। বার্কলে লক সমর্থিত বাস্তববাদকে অস্বীকার করে ভাববাদকে স্বীকৃতি দেয়ায় তাঁর ক্ষেত্রে জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করা সম্ভব হয়। তবে তাঁর অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদকে আত্মকেন্দ্রিকতার হাত থেকে মুক্তি দিতে গিয়ে তিনি মানসিক দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। অর্থাৎ লক ও বার্কলে তাঁদের জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদ ব্যাখ্যার পরিপূরক হিসাবেই শাশ্বত আত্মা বা দ্রব্যের অস্তিত্বকে স্বীকার করেন। কিন্তু হিউম এক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে একথা প্রমাণ করেন যে, সঙ্গতিপূর্ণ অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ ব্যাখ্যার জন্য প্রচলিত দ্রব্য বা শাশ্বত আত্মার অস্তিত্বের স্বীকৃতি অনিবার্য নয়। বরং একে খণ্ডন করে এর অভিজ্ঞতাবাদী ব্যাখ্যা দেয়াই সঙ্গত। মূলত এ বিষয়টি লক ও বার্কলের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে বলেই তাঁদের অভিজ্ঞতাবাদে অসঙ্গতি সম্পাদিত হয়েছে। এ কারণেই হিউম প্রচলিত শাশ্বত আত্মার ধারণাকে খণ্ডন করতে এবং আত্মা সম্পর্কে অভিজ্ঞতাবাদী ব্যাখ্যা দিতে প্রয়াসী হন।

হিউম তাঁর আত্মা সম্পর্কিত মতবাদ দিতে গিয়ে প্রথমে তথাকথিত দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করার মাধ্যমে আত্মা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে খণ্ডন করেন। তাঁর এ প্রয়াসকে তাঁর মতবাদের নঞর্থক দিক বলা হয়। আত্মা সম্পর্কিত প্রচলিত মতকে অসার প্রতিপন্ন করার পর তিনি আত্মার অবিনশ্বরতা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মত প্রদান করেন। এ অংশকে তাঁর মতবাদের সদর্থক দিক বলা হয়।

হিউম আত্মা সম্পর্কিত প্রচলিত মতকে খণ্ডন করতে গিয়ে প্রথম দ্রব্যের অস্তিত্বকে খণ্ডন করতে প্রয়াসী হন। কারণ, প্রচলিত মত অনুযায়ী আত্মা হল একটি আধ্যাত্মিক দ্রব্য। লক মুখ্য ও গৌণ গুণের আধার হিসাবে অজ্ঞেয় একটি দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেছিলেন। তাঁর মতে, আমরা জড় দ্রব্যের সংবেদনমূলক জ্ঞান ও অধ্যাত্ম দ্রব্যের সাক্ষাৎ অনুভবমূলক জ্ঞান লাভ করতে পারি। বার্কলে লক-এর জড় দ্রব্যের ধারণাকে অজ্ঞাত ধারণা বলে এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। তবে তিনি আধ্যাত্ম দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু হিউম বার্কলের সাথে একমত হয়ে জড় দ্রব্যের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা ছাড়াও বার্কলের স্বীকৃত আধ্যাত্ম দ্রব্যের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করেন। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, চরম অভিজ্ঞতাবাদী হিউম-এর কাছে আমাদের মনের ধারণাগুলোর উৎপত্তি সম্পর্কিত সূত্র হল, কোন বস্তুর এমন কোন গুণের ধারণা আমাদের নেই যা কোন ইন্দ্রিয়ছাপের কোন গুণকে প্রতিকৃত করে না বা তার মত নয়। এর কারণ হল, আমাদের সব ধারণাই ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে গৃহীত। তাই, দ্রব্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর মত হল, দ্রব্য

Dhaka University Institutional Repository

কতগুলো সরল ধারণার সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নয়। এসব সরল ধারণা কল্পনার সাহায্যে একত্রিত হয়। নিজেদের এবং অন্যদের স্মরণ রাখার সুবিধার জন্য ঐ সব সমষ্টির বিশেষ নাম দেয়া হয়ে থাকে।[৮৭]

লক মুখ্য ও গৌণ গুণের অজ্ঞাত আধারকে স্বীকার করেন। বার্কলে সে আধারকে অস্বীকার করে বলেন, অস্তিত্বপ্রত্যক্ষ নির্ভর। তবে বিপদমুক্ত হওয়ার জন্য তিনি আমার ছাড়াও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষণকে স্বীকার করে নেন। কিন্তু হিউম এ মতকে আরও চরম পর্যায়ে নিয়ে যান। লক ধারণা ও দ্রব্যকে পৃথক করেন এবং প্রত্যক্ষণ বা ধারণার অধিষ্ঠানকেই দ্রব্য হিসাবে অভিহিত করেন। হিউমও একথা স্বীকার করেন যে প্রত্যক্ষণ ও দ্রব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং প্রত্যক্ষণের অস্তিত্বকে ধারণ করার জন্য অন্য কিছুর মাঝে এর অধিষ্ঠান করা আবশ্যক বলে মনে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এমন কোন দ্রব্যকে স্বীকার করতে নারাজ। তাঁর মতে, অধিষ্ঠান সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা নেই। তাই দ্রব্য সম্পর্কেও আমাদের কোন ধারণা থাকার কথা নয়।

ধর্মতাত্ত্বিকগণ প্রত্যক্ষণের অবস্তুগত বা আত্মিক আধারকে স্বীকার করেন। কিন্তু হিউম প্রত্যক্ষণের বস্তুগত ও অবস্তুগত উভয় প্রকার আধারকে অস্বীকার করেন। ধর্মতাত্ত্বিকদের মতে, বস্তু বিস্তৃতি সম্পন্ন এবং একে বিভক্ত করা যায়। কিন্তু চিন্তা বা প্রত্যক্ষণের বিস্তৃতি নাই। তাই এদেরকে বিভক্ত করা যায় না। হিউমের মতে, যদি এ যুক্তি যথার্থ হয় তবে প্রত্যক্ষণ কোন বস্তুগত আধারে অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না। এমনকি তার সাথে সংযুক্তও থাকতে পারে না। কারণ, চিন্তা ও বিস্তৃতি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রকৃতির গুণ এবং এগুলো কখনও একটি বিষয়ের মধ্যে একত্রে সম্মিলিত অবস্থায় থাকতে পারে না।

প্রত্যক্ষণের অবস্তুগত অধিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তি হল, ব্যাপ্ত ও বিভাজ্য প্রত্যক্ষণ কোন বিপরীতধর্মী সরল অবিভাজ্য অধ্যাত্ম দ্রব্যে বা আত্মায় অধিষ্ঠান করতে পারে না। প্রত্যক্ষণ বিভাজ্যতা ও ব্যাপ্তির সাথে জড়িত। সুতরাং এগুলো বিভাজ্য ও ব্যাপ্ত। তাই ব্যাপ্ত ও বিভাজ্য প্রত্যক্ষণ অবিভাজ্য অবস্তুগত অধিষ্ঠানে অবস্থান করতে পারে না।

আধুনিক দর্শনের ইতিহাসে স্পিনোজাই দ্রব্য সম্পর্কিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী মতের প্রবক্তা হলেও হিউম স্পিনোজার দ্রব্য সম্পর্কিত ধারণাকে খণ্ডন করেন। স্পিনোজার মতে, জগতের মাঝে মাত্র একটি দ্রব্যই রয়েছে এবং এ দ্রব্যটি সম্পূর্ণ সরল, অযৌগিক এবং অবিভাজ্য। হিউমের মতে, স্পিনোজার এ মতের সাথে ধর্মতাত্ত্বিকদের মতের অভিন্নতা আছে। তাই হিউম এখানেও অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর যুক্তি প্রয়োগ করেন। তিনি সকল ধারণাকেই ইন্দ্রিয়ছাপের প্রতিরূপ হিসাবে মূল্যায়িত করেন তাই বাহ্য যা কিছুকে আমরা সংবেদন দ্বারা আবিষ্কার করি এবং অভ্যন্তরীণ যা কিছুকে চিন্তা দ্বারা অনুভব করি হিউম তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখতে পান না। এগুলো সবই, তাঁর মতে, একটি বস্তুকে প্রত্যক্ষণের বা ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার মাধ্যমে প্রাপ্ত গুণ। হিউম এভাবে প্রত্যক্ষণের আধাররূপ দ্রব্যের তথাকথিত অস্তিত্বকে অস্বীকার করে শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকারের ভিত্তিভূমি নির্মাণ করেন। তিনি বলেন

> দেখা যাচ্ছে যে, ধারণাসমূহের আদি উৎপত্তি বিবেচনা করে কিংবা কোন সঙ্গার সাহায্য নিয়ে আমরা দ্রব্যের সন্তোষজনক কোন ধারণায় পৌঁছতে পারি না। আমার মনে হয়, আত্মার অবস্তুত্ব কিংবা বস্তুত্ব সম্পর্কে বিতর্কটিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করার স্বপক্ষে এটা একটি শক্তিশালী যুক্তি। এজন্য প্রশ্নটিই আমার কাছে অর্থহীন মনে হয়।[৮৮]

তাঁর মতে, স্থায়ী বা অপরিবর্তনশীল মন বা আত্মা বলতে যাকে বুঝানো হয় তা আসলে ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়ছাপ ও অনুভূতি ছাড়া আর কিছু নয়। এগুলোকে সাদৃশ্য ও কার্যকারণ নিয়মের মাধ্যমে একত্রিত করা হয় এবং স্থির ও অপরিবর্তনশীল মনে করা হয়। এ ধরনের কাল্পনিক একত্র করণের মাধ্যমে মূলত ধারণাগুলোর মধ্যেই মানসিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। যথার্থ ইন্দ্রিয়ছাপগুলোর মধ্যে কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। হিউম আত্মাকে অস্বীকার করার পক্ষে যে সব যুক্তি দাঁড় করান সেগুলোকে নিম্নরূপে সাজানো যায়ঃ

ক) প্রত্যক্ষণের বাইরে কোন ধারণার অস্তিত্ব নাই,

খ) কোন স্থায়ী ইন্দ্রিয়ছাপ নাই,

গ) প্রত্যক্ষণগুলো পরস্পর সংযুক্ত নয়,

ঘ) প্রত্যক্ষণগুলোর কোন ক্রমিক স্থায়িত্ব নাই,

ঙ) প্রত্যক্ষণগুলোর কোন অধিষ্ঠানের প্রয়োজন নাই, এবং

চ) প্রত্যক্ষণগুলোর বাইরে কোন অস্তিত্ব নাই।

Dhaka University Institutional Repository

ক) হিউম ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা মতবাদ অনুসারে বলেন যে, প্রত্যেক বাস্তব ধারণাই কোন না কোন ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে উৎপন্ন হয়। কিন্তু আত্মা বা ব্যক্তি কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়ছাপ নয়।[৮৯] তাই প্রত্যক্ষণের বাইরে কোন আত্মার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এরকম কোন আত্মা থাকলে তার ধারণা ইন্দ্রিয়ছাপের মাধ্যমে পাওয়া যেত।

খ) ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা মতবাদ অনুযায়ী আত্মার কোন ধারণা থাকলে তা অবশ্যই অনুরূপ ইন্দ্রিয়ছাপের প্রতিকৃতি। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী আত্মা অপরিবর্তনীয় ও স্থির। কিন্তু হিউমের মতে এমন কোন ইন্দ্রিয়ছাপ নাই যা অপরিবর্তনীয় ও স্থির। তাই এমন কোন ধারণাও আমাদের থাকতে পারে না। তাঁর মতে, আত্মার মধ্যে এমন কোন শক্তি নেই যা অন্তত এক মুহূর্তের জন্যও অপরিবর্তিত থাকে।[৯০] তিনি সময়ের সাথে অভিন্ন কোন অপরিবর্তনশীল আত্মার অস্তিত্বকে অসম্ভব বলে মনে করেন। কারণ, সময় নিজেই পরিবর্তনশীল। সি, ডি, ব্রড হিউম-এর এ মতের সাথে একমত পোষণ করে বলেন যে, কোন অপরিবর্তনশীল বা অবিচল আত্মার ধারণা ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে আসতে পারেনা। যদি এমন কোন আত্মাকে "আমাদের গোটা জীবন ধরে" অবস্থান করতে হয় তবে, তাঁর মতে, বিশুদ্ধ আত্মা অন্তর্দর্শী অবস্থায় বস্তুনিষ্ঠ অবিচলতা বজায় রাখতে পারে না। কেননা, একটি অন্তর্দর্শী অবস্থায় সময়কাল শুধুমাত্র ক'টি সেকেণ্ড বা মিনিট।[৯১] অবশ্য তিনি ঐ বিশেষ মুহূর্তের জন্য আমরা আত্মাকে সরাসরি জানি বলে স্বীকার করেন এবং এ থেকেই একটা স্থায়ী আত্মার অস্তিত্বের অনুমান করি বলেই তাঁর ধারণা। কিন্তু, হিউম এরকম ধারণাকে (তাঁর ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা মতবাদ অনুসারে) সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।

গ) হিউমের মতে, যেসব ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষণ নিয়ে মন গঠিত হয়, সেগুলো প্রত্যেকটিই ভিন্ন ভিন্ন সত্তা এবং প্রত্যেকটিই অন্য যে কোন সমসাময়িক বা ক্রমিক প্রত্যক্ষণ থেকে ভিন্ন ভিন্ন ও প্রভেদনীয়। বুদ্ধি কখনই বস্তুগুলোর মধ্যে কোন বাস্তব বন্ধন লক্ষ্য করে না। হিউম এখানে বাস্তব বন্ধন কথাটির দ্বারা আবশ্যিকতাকেই বুঝিয়েছেন।

ঘ) আত্মার প্রচলিত ধারণা অনুসারে সংবেদনগুলোর ধারক হিসাবে এক অপরিবর্তিত মনের অস্তিত্ব কল্পনা করা হয় এবং সংবেদনগুলোর মধ্যে সারল্য ও অভিন্নতার ধারণা করা হয়। কিন্তু হিউম প্রত্যক্ষণগুলোর কোন প্রকার ক্রমিক স্থায়িত্বকে অস্বীকার করেন। তাঁর মতেঃ

> মন হল এক ধরণের রঙ্গমঞ্চ। সেখানে বহু প্রত্যক্ষণ ক্রমান্বয়ে আবির্ভূত হয়, ধীরে ধীরে চলে যায় এবং অসংখ্য বিভিন্ন ভঙ্গিমায় মিশ্রিত হয়। এর মধ্যে কোন একটি সময়ে যথার্থ কোন সারল্যই নাই এবং বিভিন্ন সময়ের মধ্যে কোন অভিন্নতাও বজায় থাকে না।[৯২]

তাঁর মতে, আমরা যে সারল্য ও অভিন্নতার কথা কল্পনা করি তা প্রবণতাজাত। রঙ্গমঞ্চের তুলনাটি থেকে মনকে যাতে স্থায়ী মনে করে ভুল করে না বসা হয় এজন্য তিনি সাবধান করে দিয়েছেন।

ঙ) হিউম দ্রব্যের কার্তেজীও সংজ্ঞা অনুসারে একথা বলেন যে, কার্তেজীয় দ্রব্যের সংজ্ঞাকে মেনে নিলে আমাদের প্রত্যক্ষণগুলো নিজেরাই দ্রব্য। প্রত্যক্ষণের জন্য কোন অধিষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। তিনি দু'টি সূত্রের[৯৩] সাহায্যে প্রত্যক্ষণকে দ্রব্যরূপে প্রমাণ করেন। তাঁর মতেঃ

> যেহেতু আমাদের প্রত্যক্ষণগুলো পরস্পর হতে ভিন্ন এবং জগতের অন্য সব কিছু হতে ভিন্ন; তাই সেগুলোও ভিন্ন ও প্রভেদনীয় এবং এগুলোকে পৃথকভাবে অস্তিত্বশীল বলে বিবেচনা করা যায়। তারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থান করতে পারে এবং তাদের অস্তিত্বকে বজায় রাখার জন্য অন্য কিছুর প্রয়োজনও হয় না। তাহলে এই সংজ্ঞানুসারে সেগুলো হচ্ছে দ্রব্য।[৯৪] সুতরাং এদের অধিষ্ঠান হিসাবে অন্য কোন দ্রব্যের অস্তিত্ব নিষ্প্রয়োজন।

চ) কোন কোন দার্শনিক অস্তিত্বকে স্থায়ী, অবিনশ্বর বলেছেন। কিন্তু হিউম "আমিত্ব" বলতে ক্রমিক প্রত্যক্ষণগুলোকেই বুঝান। তিনি স্পষ্ট বলেছেনঃ

> আমি কোন প্রত্যক্ষণ ছাড়া 'আমি'কে ধরতে পারি না। ... যখন আমার প্রত্যক্ষণগুলোকে কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে নেয়া হয়, যেমন নিদ্রায়, তখন আমি আমার সম্পর্কে অচেতন থাকি। যথার্থ ভাবেই বলা যায়, আমি তখন আর অস্তিত্বশীল থাকি না।[৯৫]

তাঁর মতে, ভৌত বস্তুর ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। সেখানেও আমরা শুধু কতকগুলো প্রত্যক্ষণকেই খুঁজে পাই।

এভাবে হিউম প্রমাণ করতে প্রয়াসী হন যে, বাহ্যিক ও অন্তর্দর্শনগত- উভয় দিক থেকে বিচার করেও প্রত্যক্ষণের বাইরে আর কোনকিছু সম্বন্ধে তিনি সচেতন হতে পারছেন না। অন্যদিকে, প্রত্যক্ষণের জন্য কোন আধারও নিষ্প্রয়োজন। তারা নিজেরাই দ্রব্য। সুতরাং প্রত্যক্ষণের বাইরে আর কোন অপরিবর্তনশীল আমিত্ব বা আত্মার ধারণা থাকেনা। আত্মা সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাকে

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণমূলক যুক্তিতে খণ্ডন করার পর হিউম এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেন, তাহলে সর্বমোট আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি হল যে, আত্মিক দ্রব্য সম্পর্কিত প্রশ্নটি সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য।৯৬

আত্মার অস্তিত্বকে খণ্ডন করার পর হিউম অভিজ্ঞতাবাদী অর্থে আত্মার ব্যাখ্যা দেন, যাকে তাঁর মতবাদের গঠনমূলক দিক বলা হয়। হিউম প্রত্যক্ষণের বাইরে আর কিছুকে স্বীকার করতে নারাজ। তাই তাঁর মতে, আত্মা প্রত্যক্ষণের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। এ সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত উক্তি হল, আমি আমার আমিত্ব বলতে যা বুঝাই তার মধ্যে যখন অত্যন্ত নিবিড়ভাবে প্রবেশ করি, তখন আমি কোন না কোন বিশেষ প্রত্যক্ষণের উপর, গরম বা ঠাণ্ডার উপর, আলো বা ছায়ার উপর ভালাবাসা বা ঘৃণার উপর, বেদনা বা আনন্দের উপর হোচট খাই।৯৭ তিনি মানব মন বা আত্মাকে তাই প্রত্যক্ষণের সমষ্টি হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেনঃ

> মানবজাতি সম্পর্কে বলতে পারি যে, তাঁরা বিভিন্ন প্রত্যক্ষণের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এসব প্রত্যক্ষণ ধারণাতীত দ্রুততার সাথে পরস্পরকে অনুসরণ করে। এগুলো সব সময়ই পরিবর্তিত হতে থাকে। সব সময়ই এরা গতিশীল।৯৮

হিউমের উক্তি থেকে আত্মা সম্পর্কে তাঁর আলোচনার গঠনমূলক দিক সম্পর্কে যে তিনটি সূত্র পাওয়া যায় সেগুলো হল,

ক) মন বা আত্মা বিভিন্ন স্বতন্ত্র প্রত্যক্ষণের সমষ্টি বা পুঞ্জ ছাড়া আর কিছুই নয়।

খ) এসব প্রত্যক্ষণ ধারণাতীত দ্রুততার সাথে পরস্পরকে অনুসরণ করে।

গ) প্রত্যক্ষণগুলো সবসময়ই পরিবর্তিত হতে থাকে এবং এরা গতিশীল। একারণেই হিউমের আত্মা সম্পর্কিত মতবাদকে পুঞ্জবাদ (Bundle Theory), আত্মার ধারাবাহিকতাবাদ (Serial Theory), আত্মার অনুষঙ্গবাদ (Association Theory), যৌক্তিক গঠনবাদ (Logical Construction Theory) ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। হিউমের এ মতের সাথে জে এস· মিল প্রমুখের মতের মিল পাওয়া যায়। বার্ট্রাণ্ড রাসেলও মন কি, এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এটা অতি স্পষ্ট যে, মন অবশ্যই মানসিক ঘটনার সমষ্টি বা পুঞ্জ।৯৯ আবার অন্যত্র তিনি বলেছেন, একজন ব্যক্তি হল, অভিজ্ঞতার একটি নির্দিষ্ট অনুক্রম।১০০

প্রশ্ন হল, শাশ্বত আত্মা বলতে যদি কিছু না থাকে এবং মন যদি বিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষণের সমষ্টিমাত্র হয় তবে হিউম ব্যক্তি অভিন্নতাকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করবেন। ব্যক্তির অভিন্নতা তা হলে কি? এর উত্তরে হিউম ব্যক্তি অভিন্নতাকে এক প্রকার আরোপিত মানসিক প্রবণতাজাত ভ্রান্তি হিসাবে পরিগণিত করেন এবং বলেন যে, অনুষঙ্গ নিয়মের দ্বারাই বিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষণগুলো সংযোজিত হয় এবং ব্যক্তি অভিন্নতা নামক ভ্রান্তিটি প্রতিপাদিত হয়। এ ভ্রান্তিটি, তাঁর মতে, সম্পূর্ণরূপে মনস্তাত্ত্বিক কারণে ঘটে থাকে।

হিউম ব্যক্তি অভিন্নতা এবং বস্তুগত বা উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর অভিন্নতাকে অভিন্ন মনে করেন। তাঁর মতে, এসবগুলো থেকেই আমরা একই ধরনের ভ্রান্তি সম্পাদন করি। অভিন্নতার সংজ্ঞা দিয়ে তিনি বলেন, লক্ষিত বস্তু সম্পর্কে আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা রয়েছে যা সময়ের কোন অনুমিত পরিবর্তনের মাঝেও অপরিবর্তিত ও অব্যাহত থাকে। এই ধারণাকে অভিন্নতা বা অনুরূপতা বলে থাকি।১০১

এই অভিন্নতার কারণ সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যা হল এরকম যে, আমাদের প্রতিটি প্রত্যক্ষণ পর্যায়ক্রমে আনুক্রমিকভাবে আমাদের মনে উদিত হয়। যদিও প্রতিটি প্রত্যক্ষণ আলাদা তবুও এদের পারম্পর্য বা ক্রমের মধ্যে যে ফাঁক থাকে তা আমরা লক্ষ্য করি না। উপরন্তু এর উপর অভিন্নতা ও বিরামহীন অস্তিত্ব আরোপ করি।১০১

আনুক্রমিক প্রত্যক্ষণগুলোর উপর মনের এই বিরামহীনতা আরোপের কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, তারা ঐ রকম তখনই হয় যখন তারা সদৃশ্য, সংলগ্নতা অথবা কার্য করণের সম্বন্ধ দ্বারা সংযুক্ত অংশগুলোর পারম্পর্য দিয়ে গঠিত হয়। তিনি বলেনঃ

> সুতরাং সাদৃশ্য, সংলগ্নতা ও কার্যকারণ – এই তিনটি সম্বন্ধের কোন না কোনটির উপর অভিন্নতা নির্ভর করে। এবং ..... উপরোক্ত সূত্রগুলো অনুসারে সংযুক্ত সম্বন্ধসমূহের মধ্য দিয়ে চিন্তার সাবলীল ও অব্যাহত গতি থেকেই ব্যক্তির অভিন্নতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা জন্মে।১০২

এ তিনটি অনুষঙ্গ নিয়ম দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত প্রত্যক্ষণগুলোর ধারণা এবং অভিন্নতার ধারণা—এ দু'টি ধারণা যদিও পরস্পর থেকে পৃথক তবুও আমরা আমাদের সাধারণ চিন্তার ক্ষেত্রে এদের পরস্পরের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলি বলে হিউম মনে করেন। আর এজন্যই বস্তুগুলোর মধ্যকার সম্বন্ধের ধারণার পরিবর্তে আমরা অভিন্নতার ধারণা করে বসি। বেরী স্ট্রাউড হিউমের এই মতকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। তাঁর মতে, এটা হিউমের একটা স্পষ্ট আবিকার। বস্তুগুলোর ক্ষেত্রে যখন আমরা এদের সত্তাকে অবিরাম অভিন্নতা বলে মনে করি তখন তা আসলে সাদৃশ্য, সংলগ্নতা ও কার্যকারণের দ্বারা সংযুক্ত অংশগুলোর পারম্পর্য ছাড়া আর কিছু নয়।১০৩

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে এন· কে· স্মিথের বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, হিউমের আত্মার ধারণাকে বুঝতে হলে একমাত্র প্রত্যক্ষণগুলোর মধ্যকার সম্বন্ধ দিয়েই বুঝতে হবে। তিনি বলেন, আত্মা তার নিজস্ব ভিন্নতা ও জটিলতার মধ্যে বোধগম্য হয় একমাত্র সম্বন্ধের ধারণার মাধ্যমেই। আর তাই স্মিথের মতে, হিউমের বিবাদ হল তাদের সাথে, যারা এর (আত্মার) ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে পরিবর্তনশীল জটিল চরিত্রকে অভিন্নতা শব্দটির দ্বারা ব্যাখ্যা করতে চান।[১০৪]

সুতরাং দেখা যায়, হিউমের ব্যাখ্যানুসারে অভিন্নতা (তা ব্যক্তি, বস্তু, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু যারই হোক না কেন) সকল ক্ষেত্রেই একটা আরোপিত মানসিক প্রবণতা মাত্র। ব্যক্তি অভিন্নতার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষণই অন্তত কালিক দিক থেকে পরস্পর থেকে আলাদা। এই আলাদা প্রত্যক্ষণগুলো সাদৃশ্য, সান্নিধ্য বা কার্যকারণ—এদের যে কোন একটি সম্বন্ধ দ্বারা একটির সাথে অন্যটি সম্পর্কিত হওয়ার দাবী করতে পারে, কিন্তু এখানে অভিন্নতার দাবী কল্পিত। তাই হিউম বলেছেন, অভিন্নতাকে আমরা মানুষের মনের ক্ষেত্রে যেভাবে ব্যাখ্যা করি আসলে তা কল্পিত। এ প্রসঙ্গে জন লেয়ার্ড-এর বক্তব্য স্মরণযোগ্য। তিনিও অভিন্নতাকে একটি কল্পিত বিষয় বলে মনে করেন। তিনি প্রশ্ন করেন অভিন্নতা কি এমন কিছু যা সত্যিকার অর্থে আমাদের বিভিন্ন প্রত্যক্ষণগুলোকে একত্রিত করে, নাকি এ শুধুমাত্র কল্পনায় তাদের ধারণার মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপন করে। এ প্রশ্নের উত্তর হিসাবে তিনি শেষোক্তটিকেই গ্রহণ করেন। তিনি বলেন,ব্যক্তি অভিন্নতা চেতনা থেকে উদ্ভূত হয় এবং চেতনা প্রত্যক্ষণের একটি প্রতিফলিত চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয়।[১০৫]

সুতরাং এক কথায় বলা যায়, বিভিন্ন প্রত্যক্ষণের মধ্যে সহজ সম্বন্ধের ধারণাগুলো যে সহজ সংক্রমণ ঘটায় তা থেকেই অভিন্নতার সৃষ্টি হয়। তাই, এটা এক প্রকার আরোপিত মানসিক প্রবণতাজাত ভ্রান্তি মাত্র। এটা ভ্রমাত্মক ও কল্পিত। ব্যক্তি অভিন্নতার এ আলোচনা থেকে হিউম যে সিদ্ধান্ত নেন তা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ব্যক্তি অভিন্নতা সম্পর্কিত প্রশ্নটিকে দার্শনিক সমস্যা না বলে ব্যাকরণিক সমস্যা অর্থাৎ বাচনিক সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করতে আগ্রহী। তিনি বলেনঃ

> এই গোটা মতবাদটি আমাদেরকে এমন একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয় যা বর্তমান বিষয়টির জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সিদ্ধান্তটি হচ্ছে যে, ব্যক্তির অভিন্নতা সম্পর্কিত সুন্দর ও সূক্ষ প্রশ্নগুলোকে সম্ভবত কখনো মীমাংসা করা যাবে না এবং এগুলোকে দার্শনিক সমস্যারূপে বিবেচনা না করে বরং ব্যাকরণিক সমস্যারূপে বিবেচনা করা উচিৎ। অভিন্নতার ধারণাগুলোর সম্বন্ধসমূহের ওপর নির্ভরশীল এই সম্বন্ধগুলো যে সহজ সংক্রমণ ঘটায় তা দিয়ে তারা অভিন্নতা সৃষ্টি করে। কিন্তু সম্বন্ধগুলোর এবং সংক্রমণের স্বাভাবিকতা ক্রমে ক্রমে অনুভবহীন মাত্রায় হ্রাস পেতে থাকতে পারে। তাই তারা কখন যে অভিন্ন নাম ধারণ করার অধিকার লাভ করে, কখন যে সে অধিকার তাদের হারিয়ে যায় সে সম্পর্কে কোন বিবাদ মীমাংসা করার যথার্থ কোন মানদণ্ড আমাদের কাছে নাই। অংশগুলোর সম্বন্ধ থেকে যে কল্পিত যোগসূত্র উৎপন্ন হয়,তা বাদ দিলে সংযুক্ত বস্তুগুলোর অভিন্নতা সম্পর্কে সব বিবাদই বাচনিক মাত্র।(১০৬)

এখন প্রশ্ন হল, যদি সাদৃশ্য, সংলগ্নতা অথবা কার্যকারণ এই সম্বন্ধ তিনটির কারণেই অভিন্নতা সম্পর্কিত ভ্রান্তিটি সম্পাদিত হয়, তবে কোন স্থায়ী আত্মা না থাকলে এই সম্বন্ধগুলো পর্যবেক্ষণ বা ধারন করবে কে। এর উত্তরে হিউম স্মৃতিকেই এই সম্বন্ধগুলোর কারণ হিসাবে আখ্যায়িত করেন। স্মৃতি পূর্ববর্তী ধারণাকে আমাদের মনে সংরক্ষণ করে বলেই আমরা পরবর্তী ধারণার সাথে এ সম্বন্ধ আবিষ্কার করতে পারি। সুতরাং দেখা যায়, অভিন্নতার ভিত্তি হিসাবে যে সম্বন্ধের ধারণাগুলো কাজ করে সেগুলো স্মৃতির উপর নির্ভরশীল। তাই হিউম বলেন, প্রধানত এ জন্যেই স্মৃতিকে ব্যক্তি অভিন্নতার উৎসরূপে বিবেচনা করতে হবে। আমাদের যদি স্মৃতি না থাকতো, তা হলে কার্যকারণ সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা থাকতো না। ফলে কারণ ও ক্রিয়াগুলোর যে শৃংখল দিয়ে আমাদের আত্মা বা ব্যক্তিরূপ গঠিত হয় সে সম্পর্কেও আমাদের কোন ধারণা থাকতো না।[১০৭] হিউম যেভাবে স্মৃতিকে অভিন্নতার কারণ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন,আত্মা সম্পর্কিত পুঞ্জ মতবাদে সর্বত্রই এই অবস্থা দেখা যায়। যেমন এইচ· পি· গ্রিস রাসেল· এ· জে, এয়ার প্রমুখ ব্যক্তি অভিন্নতার জন্য স্মৃতিকেই দায়ী করেন।[১০৮]

হিউমের আত্মা সম্পর্কিত মতবাদ সম্পর্কে উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হিউম তাঁর ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা সম্পর্কিত মতবাদের মাধ্যমে প্রচলিত সকল প্রকার দ্রব্যের ধারণাকে খণ্ডন করেছেন। ফলে দর্শনে স্বীকৃত এবং বহুল আলোচিত স্থায়ী আত্মার ধারণাও অস্বীকৃত হয়। তিনি আত্মা সম্পর্কে নতুন মতবাদ প্রদান করে আত্মাকে প্রত্যক্ষণের সমষ্টি হিসাবে আখ্যায়িত করেন। এ মতবাদকে আত্মা সম্পর্কিত পুঞ্জবাদ বলা হয়। এ ছাড়া তিনি ব্যক্তি অভিন্নতাসহ সকল প্রকার অভিন্নতার ধারণাকেও আরোপিত মানসিক প্রবণতাজাত ভ্রান্তি হিসাবে আখ্যায়িত করে স্মৃতিকে এ ভ্রান্তির কারণ বলে অভিহিত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এর ফলে দ্রাব্যিক আত্মার ধারণা একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার হয়ে পড়ে। তাই হিউম এ সমস্যাকে দার্শনিক সমগ না বলে ব্যাকরণিক সমস্যা বলেছেন। এর ফলে দর্শনের ইতিহাসে চিরায়ত শাশ্বত আত্মার ধারণা প্রত্যাখ্যাত হয় এবং আত্মার ধারণা একটি সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতাবাদী ব্যাখ্যা পায়। হিউমের ব্যাখ্যায় আত্মা সম্পর্কিত ধারণার যেমন একটি নতুন দিক নির্দেশ করা হয়েছে তেমনি এ ব্যাখ্যা তাঁর অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদকেও সঙ্গতিসম্পন্ন করার ক্ষেত্রে পরিপূরক হিসাবে কাজ করেছে। এর ফলে অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক লক ও বার্কলে আত্মার ধারণাকে স্বীকার করে অভিজ্ঞতাবাদের যে অসঙ্গতি সম্পাদন করেছিলেন হিউমের হাতে তা তিরোহিত হয়। ফলে একথা বলা যায় যে, হিউমের জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদে তাঁর আত্মা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। হিউমের ব্যাখ্যায় দর্শনের ইতিহাসে আত্মা সম্পর্কিত চিরায়ত ধারণা প্রত্যাখ্যাত হয় এবং আত্মার ধারণা সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতাবাদী ব্যাখ্যা পায়।

হিউম আত্মা সম্পর্কিত ধারণার অভিজ্ঞতাবাদী ব্যাখ্যা দেয়ার সাথে সাথে কার্যকারণের আবশ্যিকতা সম্পর্কিত ধারণারও অভিজ্ঞতাবাদী ব্যাখ্যা দেন। ফলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসহ সকল প্রকার বাস্তব ঘটনা সম্পর্কিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে আবশ্যিকতার সম্পর্ক অস্বীকৃত হয়। ফলে এসব বিষয়ের জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা ও সর্বজনীনতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং অভিজ্ঞতাবাদ সংশয়বাদে পর্যবসিত হয়। কার্যকারণ প্রসঙ্গে হিউমের এ ব্যাখ্যাই আমাদের পরবর্তী আলোচ্য বিষয়।

৪.৪ হিউমের জ্ঞানবিদ্যা ও কার্যকারণের আবশ্যিকতা খণ্ডন

উপরের আলোচনা থেকে দেখা গেছে যে হিউম তাঁর অভিজ্ঞতাবাদী তথা ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা মতবাদ দ্বারা শাশ্বত আত্মার অস্তিত্বের ধারনাকে খণ্ডন করে আত্মাকে প্রত্যক্ষণের পুঞ্জ হিসাবে অভিহিত করে অভিজ্ঞতাবাদ থেকে লক বার্কলেকৃত অসঙ্গগতি নিরসন করেন। কিন্তু এ পর্যন্ত এসেই হিউম থেমে যান নি। তাঁর সমসাময়িক যুগের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিউটনীয় নিশ্চয়তাবাদী ধারণা তাঁর জ্ঞানবিদ্যাগত সূক্ষ দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। যার ফলে তিনি নিউটনীয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূলভিত্তি কার্যকারণ নিয়ম সম্পর্কে অভিজ্ঞতাবাদী বিশ্লেষণ করেণ এবং দর্শন ও বিজ্ঞানে স্বীকৃত কার্যকারণের মধ্যকার আবশ্যিক বা অনিবার্য সম্পর্কের ধারণাকে ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা মতবাদের মানদণ্ডে বিচার করে দেখতে প্রবৃত্ত হন। তাঁর কার্যকারণ সম্পর্কিত আলোচনা দর্শনের ইতিহাসে যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে।

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে হিউমই সর্বপ্রথম দার্শনিক যিনি দর্শন ও বিজ্ঞানে স্বীকৃত ও বহুল প্রচলিত কার্যকারণের মধ্যকার অনিবার্য সম্পর্কের ধারণার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করেন। মূলত তাঁর এ প্রতিবাদ থেকেই কার্যকারণ সম্পর্কে প্রসঙ্গ আধুনিক দার্শনিক আলোচনা শুরু হয়।[১০৯] কিন্তু, হিউম তাঁর *A Treatise of Human Nature* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের ষোলটি পরিচ্ছেদে কার্যকারণ প্রসঙ্গে যে আলোচনা করেছেন তাকে অত্যন্ত দীর্ঘ ও জটিল বলে মনে করা হয়।[১১০] কিন্তু তাঁর পরবর্তী রচনা *An Enquiry Concerning Human Understanding* নামক গ্রন্থের *Of the Idea of Necessary Connection* শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়ে তিনি তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থের বক্তব্যকে গুছিয়ে স্পষ্টতরভাবে প্রকাশ করেছেন।

অভিজ্ঞতাবাদী হিসাবে হিউমের লক্ষ্য হল কারণ ও কার্যের মধ্যে অনিবার্য বা আবশ্যিক সম্বন্ধ বর্তমান–একথা খণ্ডন করা এবং কারণ ও কার্যের মধ্যে এই তথাকথিত আবশ্যিক সম্বন্ধের অভিজ্ঞতাবাদী ব্যাখ্যা দেয়া। প্রথম অংশকে তাঁর মতবাদের নঞর্থক দিক এবং দ্বিতীয় অংশকে সদর্থক দিক বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

হিউম কার্যকারণের মধ্যকার তথাকথিত অনিবার্য সম্পর্কের ধারণাকে খণ্ডন করতে গিয়ে প্রথম এর উৎপত্তি অনুসন্ধান করেন। তাঁর পূর্বসূরী জন লক ও জর্জ বার্কলের আদর্শ অনুসরণ করে তিনি বলেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরে কোন কিছুর ধারণা আমরা পেতে পারি না। লক অভিজ্ঞতাকে বলেছিলেন 'ধারণা' হিউম একে বলেন 'প্রত্যক্ষণ'। তাঁর মতে প্রত্যক্ষণ দু'ভাগে বিভক্ত ক) ইন্দ্রিয়ছাপ ও খ) ধারণা। যার ইন্দ্রিয়ছাপ নাই তার ধারণা থাকতে পারে না। একারণেই হিউমের জ্ঞানবিদ্যার মূলসূত্র হল, কোন ধারণা সম্পর্কে সন্দেহ হলে এ ধারণার মূল উৎস যে ইন্দ্রিয়ছাপ তাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।[১১১]

কার্যকারণের মধ্যকার অনিবার্য সম্পর্কের ধারণাটিকে পরীক্ষার জন্য তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাবাদী সূত্র অনুসরণে কোন ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে অনিবার্য ধারণার উৎপত্তি তা বিচার করতে প্রয়াসী হন। এ ছাড়াও, তিনি অভিজ্ঞতা ছাড়া বুদ্ধি থেকে অনিবার্য ধারণা পাওয়া যায় কি না তাও বিচার করে দেখেন।

Dhaka University Institutional Repository

অভিজ্ঞতায় কার্যকারণের অনিবার্য সম্পর্ককে খুঁজে পাওয়া যায় কি না এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে হিউম দেখেন যে, বাহ্য জগৎ থেকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনিবার্য সম্পর্ক বা ক্ষমতার ধারণাকে পাওয়া যায় না। আমরা আমাদের চারপাশের বাহ্যবস্তুর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যা প্রত্যক্ষ করি তাহল একটি বস্তু অন্যটিকে অনুগমন করে মাত্র।[১১২]

অনিবার্যতার ধারণার উৎসরূপ ইন্দ্রিয়ছাপকে খুঁজে পাবার জন্য হিউম যে সমস্ত বস্তুর মধ্যে অনিবার্যতার ধারণা নিহিত আছে বলে মনে করা হয় সেগুলোকেও বিচার করে দেখেন। সাধারণত কারণ ও ক্রিয়ার মধ্যে অনিবার্যতাকে আরোপ করা হয়। কিন্তু এদু'টি ধারণাকে পরীক্ষা করেও হিউম সংলগ্নতা ও পূর্ববর্তীতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না। বর্তমানে দৃষ্ট দু'টি বস্তু বা ঘটনাকে কার্য ও কারণ বলে অভিহিত করার জন্য পূর্ব প্রত্যক্ষিত একাধিক দৃষ্টান্তের সমর্থন প্রয়োজন। অর্থাৎ, বলা যায়, অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা এ রকম অনুমানের উৎস খুঁজে পাই। কিন্তু, অভিজ্ঞতা থেকে 'অনিবার্য বা আবশ্যিক সম্পর্ক'–কে আবিষ্কার করা যায় না। অভিজ্ঞতা থেকে 'পারম্পর্য' ও 'সংলগ্নতা'র বাইরে যা পাওয়া যায় তাহল, 'সতত সংযোজন'। এ জন্যই হিউম বলেন বিগত কোন ইন্দ্রিয়ছাপের অনন্ত পুনরাবৃত্তি থেকেও অনিবার্য সম্পর্কের কোন নতুন মৌলিক ধারণা উৎপন্ন হবে না।[১১৩]

সুতরাং তাঁর মতে, অভিজ্ঞতায় কার্যকারণের বহু দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে আমরা দু'টি ঘটনার মধ্যে পারম্পর্য সংলগ্নতা ও সতত সংযোজন দেখতে পাই। আর এই সতত সংযোজনের জন্যই ধারণা করি যে সংলগ্ন ঘটনা দু'টি আবশ্যিক বা আদি সংযোগে সংযুক্ত। হিউম এরূপ অনুমানে একটি যৌক্তিক অনুপপত্তি ঘটে বলে মনে করেন। তিনি বলেনঃ

> অস্তিত্ব বিষয়ক সব ন্যায় ক্রিয়া কার্যকারণ সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কার্যকারণ সম্পর্কের জ্ঞান অভিজ্ঞতালব্ধ। আমাদের সব পরীক্ষণমূলক সিদ্ধান্ত যে অনুমানের উপর নির্ভর করে অগ্রসর হয় তা হল ভবিষ্যৎ অতীতের মত হবে। এই শেষের অনুমানটিকে সম্ভাব্য যুক্তির বা অস্তিত্ব বিষয়ক যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করার প্রচেষ্টা হবে চক্রক দোষে দুষ্ট। এই দোষ হল, যাকে প্রমাণ করতে হবে তাকে প্রথমেই স্বীকার করে নেয়া।[১১৪]

হিউম নির্দেশিত কার্যকারণের মধ্যকার অনিবার্য সম্পর্কের এই দার্শনিক সমস্যাকেই ঐতিহ্যগতভাবে আরোহনুমানের সমস্যা বলা হয়। অর্থাৎ, সকল জানা ক হয় খ এ বচন থেকে সকল ক হয় খ এ বচনকে প্রমাণ করার সমস্যা। এ. জে. এয়ার–এর মতে, হিউমই তার *Treatise* গ্রন্থে এ সমস্যাকে প্রথমবারের মত স্পষ্টভাবে উত্থাপন করেন।[১১৫]

আরোহ অনুমান সম্পর্কে হিউমের এ সমালোচনা দর্শনের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। কারণ, আরোহানুমানযে প্রতিপাদনমূলক নয় তা হিউমই প্রথম নির্ণয় করেছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ স্পষ্টভাবে আরোহ ও অবরোহের এ পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন নি।[১১৬]

জন লক প্রমুখ অভিজ্ঞতাবাদীগণ এটা মনে করতেন যে, প্রতিটি কারণের মধ্যেই তার ফলোৎপাদনের গোপন শক্তি নিহিত আছে। এ মতবাদকে কার্যকারণের অনিবার্য সম্বন্ধ সম্পর্কিত শক্তিতত্ত্ব বলা হয়। তাঁদের মতে, এ শক্তি পদার্থের অজ্ঞাত গুণ। কিন্তু হিউমের যুক্তি হল যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ শক্তির ক্রিয়াকে কতগুলো দৃষ্টান্তে প্রত্যক্ষ না করা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ শক্তি বা ক্ষমতার কোন ধারণা আমাদের থাকতে পারে না।[১১৭]

এশক্তিকে প্রত্যক্ষ করার কোন দৃষ্টান্ত বস্তুর মধ্যে আবিষ্কারে ব্যর্থ হয়েই দেকার্তপন্থীরা তাঁদের সহজাত ধারণার সূত্রের উপর নির্ভর করে উপলক্ষবাদের[১১৮] প্রবর্তন করেন। তাঁরা ঈশ্বরকে সব ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে চিহ্নিত করে তাকেই বিশ্বের একমাত্র ক্রিয়াশীল সত্তা এবং কার্য ও কারণ নামক দু'টি বস্তুর চিরন্তন সংযোগকে তাঁর প্রত্যক্ষ ইচ্ছার কার্য বলে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু দর্শনের ইতিহাসে সহজাত ধারণার সূত্রটি জন লক কর্তৃক ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া, হিউমের মতে, ঈশ্বরকে প্রতিটি পরিবর্তনের কারণ বলে গণ্য করারও কোন অর্থ হয় না। কারণ, ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা মতবাদ অনুসারে প্রত্যেক ধারণাই যদি ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে উৎপন্ন হয় তবে ঈশ্বরের ধারণাও নিশ্চয়ই একই উৎস থেকে উৎপন্ন হবে। সংবেদনজাত ও চিন্তাজাত কোন রকম ইন্দ্রিয়ছাপ থেকেই যদি শক্তি বা ক্ষমতার ধারণা নির্দেশিত না হয় তবে এমন কোন সক্রিয় সূত্রকে ঈশ্বরের মধ্যে আবিষ্কার করা, এমন কি কল্পনা করাও একইভাবে অসম্ভব। হিউম দু'টি পৃথক যুক্তির সাহায্যে উপলক্ষবাদকে সমালোচনা করেন।[১১৯] সংক্ষেপে যুক্তিগুলো হলঃ

ক) যে ব্যক্তি–মানুষের বিচার ক্ষমতার দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে জ্ঞাত তার কাছে এ মতবাদ বিশ্বাসযোগ্য নয়' এবং

খ) অচেতন বস্তু বা মানুষের ইচ্ছা কি ভাবে ক্রিয়া করে তা যেমন আমাদের কাছে অজ্ঞাত ঠিক তেমনি পরমসত্তার ক্রিয়াও আমাদের কাছে অজ্ঞাত।

Dhaka University Institutional Repository

এক কথায় শক্তিতত্ত্বের বিরুদ্ধে হিউমের বক্তব্য হল শক্তি কিংবা ক্ষমতার কোন ইন্দ্রিয়ছাপ আমাদের নাই। তাই আমাদের কখন কোন শক্তির ধারণাও থাকতে পারে না।[১২০]

কার্যকারণের মধ্যকার অনিবার্যতাকে খণ্ডন করতে গিয়ে হিউম কার্যের জন্য কারণের উপস্থিতির আবশ্যিকতাকেও খণ্ডন করেন। প্রত্যক কার্যেরই একটি কারণ রয়েছে, অন্য কথায় যে কোন অস্তিত্বশীল বস্তুরই একটি কারণ রয়েছে বলে দর্শনে একটি ধারণা প্রচলিত আছে। এবং এই কারণের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে যাতে সীমাহীন অনুক্রমে পতিত হতে না হয় সেজন্য গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল থেকে শুরু করে যেসব দার্শনিক কার্যকারণকে স্বীকার করেছেন তাঁরা সকলেই একটি আদি কারণ বা কারণহীন কারণকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। হিউম এই বহুল পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। তাঁর মতে, কারণের আবশ্যিকতা বা অনিবার্যতা সম্পর্কিত দর্শনে প্রচলিত ধারণা ভ্রান্ত এবং একে প্রতিষ্ঠিত করার সব প্রচেষ্টাই ভ্রমাত্মক ও কুযুক্তিপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে তিনি কারণের আবশ্যিকতার পক্ষে যে যুক্তিগুলো দেয়া হয় সেগুলোকেও খণ্ডন করেন।[১২১] কারণের আবশ্যিকতার পক্ষের সবক'টি প্রধান যুক্তি খণ্ডন করে হিউম একথা প্রমাণ করেন যে, যে বস্তুর অস্তিত্বের আরম্ভ রয়েছে তার কোন না কোন কারণ থাকাও আবশ্যিক– একথা বলার কোন যুক্তি নেই। অন্য কথায়, কারণের আবশ্যিকতা সম্পর্কিত যুক্তি ভ্রান্ত।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, হিউম তাঁর ধারণার উৎপত্তি সংক্রান্ত ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা মতবাদ দ্বারা প্রমাণ করেন যে, অভিজ্ঞতা থেকে কার্যকারণের মধ্যকার অনিবার্যতাকে পাওয়া যায় না। একই যুক্তিতে তিনি কার্যকারণের অনিবার্যতা সম্পর্কিত শক্তিতত্ত্ব– কারণের মধ্যেই ফলোৎপাদনের শক্তি থাকে, এবং উপলক্ষবাদ–কার্যকারণের সম্পর্ক পরমসত্তার ইচ্ছা–কে খণ্ডন করেন। এছাড়াও তিনি কার্যের জন্য কারণের আবশ্যিকতা সম্পর্কিত মতবাদের পক্ষের প্রধান যুক্তিগুলোতে ভ্রমাত্মক বলে প্রমাণ করেন। এ পর্যন্ত এসেই তিনি থেমে থাকেন নি, বরং তিনি এও প্রমাণ করেন যে, অভিজ্ঞতা থেকেতো নয়ই,বুদ্ধি থেকেও কার্যকারণের মধ্যকার অনিবার্যতাকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

কোন ধারণা পূর্বতসিদ্ধ হলেই তাকে বুদ্ধি দ্বারা আবিষ্কার করা যায়। এরূপ ধারণা অভিজ্ঞতা ছাড়াই আবিষ্কারযোগ্য। অন্য কথায়, ধারণাটি সংশ্লেষক নয়, বিশ্লেষক। কার্যকারণের অনিবার্যতার ধারণা পূর্বতসিদ্ধ বা বিশ্লেষক হলে কোন একটি কার্য নামক ঘটনাকে দেখার পরই এর কারণ কি তা বলা যেত। এর জন্য যেসব দৃষ্টান্তে কার্য ও কারণ নামক ঘটনাদ্বয় ঘটেছে সেসব দৃষ্টান্তের পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন হত না। অন্য কথায়, অভিজ্ঞতার সাহায্য ছাড়াই, বিশ্লেষণের মাধ্যমে, কার্য থেকে কারণ ও কারণ থেকে কার্য সম্পর্কে ধারণ পাওয়া যেত। কিন্তু তা সম্ভব হয়না। এছাড়াও, হিউমের মতে প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি দ্বারা যদি আদি সংযোগকে ব্যাখ্যা করা যেত তবে ব্যাপারটি একটি সূত্রের উপর নির্ভর করত। সূত্রটি নিম্নরূপঃ

যেসব দৃষ্টান্ত সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা নাই সেগুলো ঐ সব দৃষ্টান্তের সদৃশ হবে, যাদের সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে। আর প্রকৃতির কার্যধারা সর্বদা একইভাবে চলতে থাকে।[১২২]

কিন্তু যেসব দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতা নেই সে সব দৃষ্টান্ত অভিজ্ঞতজাত দৃষ্টান্তগুলোর সদৃশ, একথা কোন প্রতিপাদনযোগ্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যায়না। প্রকৃতির কার্যধারা সব সময় একইভাবে চলতে থাকবে, একথাও ঠিক নয়। কারণ এ মধ্যে কোন না কোন রকম পরিবর্তনের ধারণার যৌক্তিকভাবে অসম্ভব বা স্ববিরোধী নয়। সুতরাং বলা যায়, প্রজ্ঞা দ্বারা কার্যকারণের আদি সংযোগ ব্যাখ্যা করা যায় না। অর্থাৎ এ ধারণাটি পূর্বতসিদ্ধ নয়।

কার্যকারণ প্রসঙ্গে হিউমের মতের নঞর্থক দিক আলোচনার সার সংক্ষেপ হল, কার্যকারণের ধারণা যে অনিবার্যতার ইঙ্গিত বহন করে তা যুক্তিবিদ্যার পূর্বতসিদ্ধ অনিবার্যতা নয় আবার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গঠিত কোন পরতসাধ্য অনুমানও নয়। ধারণার সম্বন্ধ ও বাস্তব ঘটনা– জ্ঞানের এ দু'টি উপায়ের কোনটির সাহায্যেই কার্যকারণ সম্বন্ধের অনিবার্যতাকে খুঁজে পাওয়া যায় না তবে অনিবার্যতা সম্বন্ধে কোন কিছু জানতে না পারলেও অভিজ্ঞততা থেকে কি করে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অনিবার্য সম্বন্ধের অনুভূতি জাগে তা আমরা বুঝতে পারি।

হিউম কার্যকারণের মধ্যকার অনিবার্যতা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা খণ্ডন করার পর এ সম্পর্কিত তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা দেন। তাঁর মতে, বিদ্যুৎ চমকালেই আমরা মেঘের গর্জন শুনতে পাই এবং প্রায় সবগুলো বিদ্যুৎ চমকানোর ঘটনাতেই মেঘের গর্জন উপস্থিত থাকে। এ থেকে আমরা ধরে নেই যে মেঘের গর্জন ও বিদ্যুৎ চমকানো একটি অপরটির কারণ বা কার্য এবং এদু'টি ঘটনা আবশ্যিক সম্পর্কে সম্পর্কিত। এ অবস্থায় আমরা একটি থেকে অন্যটিকে অনুমান করি। অথচ, এদেরকে পৃথক পৃথকভাবে বিচার করলে যদিও ঘটনা দু'টিকে সবসময় সংযুক্ত দেখা যায় তবুও এদের সংযুক্তির ধারণাকে পাওয়া যায়না। তাই *Enquiry* গ্রন্থের

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে হিউম বলেন তাহলে দেখা যাচ্ছে ঘটনার মধ্যে অনিবার্য সম্পর্কের ধারণাটি একাধিক অনুরূপ দৃষ্টান্তে এই ঘটনাগুলোর নিয়ত সংযোগ থেকেই উৎপন্ন হয়।[১২৩]

হিউমের মতে এটিই হল একটি মাত্র দৃষ্টান্ত ও একাধিক দৃষ্টান্তের মধ্যে পার্থক্য। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত থেকে সম্বন্ধ বা সম্পর্কের ধারণা পাওয়া যায় না কিন্তু একাধিক দৃষ্টান্ত থেকে পাওয়া যায়। মূলত একাধিক সদৃশ দৃষ্টান্ত থেকে শুধু সাদৃশ্যকেই খুঁজে পাওয়া যায়, কোন রকম সংযুক্তিকে নয়। হিউমের মতে, সদৃশ বস্তুগুলোর এই বহুতাই শক্তি বা সংযুক্তির সারসত্তা গঠন করে এবং এটাই আবশ্যিক সংযোগের ধারণার উৎস। সংযোজন বা শক্তির ধারণা কোন একটি দৃষ্টান্তে থেকে নয় বরং দৃষ্টান্তের পুনরাবৃত্তি থেকে আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু দৃষ্টান্তের পুনরাবৃত্তি কোন নতুন মৌলিক ধারণা গঠন করতে পারে একথা যৌক্তিকভাবে বলা যায় না। এর যে তিনটি কারণ হিউম নির্দেশ করেন সেগুলো হল (১) দৃষ্টান্তের পুনর বৃত্তি থেকে এমন কোন মৌলিক ধারণা সৃষ্টি হলে তাকে বিশেষ দৃষ্টান্তেও খুঁজে পাওয়া যেত, (২) দৃষ্টান্তের পুনরাবৃত্তির সময় এ সন কোন ধারণার ইন্দ্রিয়ছাপকে পাওয়া যেত। কিন্তু এমন কোন ইন্দ্রিয়ছাপকে পাওয়া যায় না, এবং (৩) সদৃশ কারণ ও ক্রিয়ার সংযোজনগুলোর দৃষ্টান্ত পরস্পর স্বকীয়ভাবে পরস্পর থেকে ভিন্ন।

উপরোক্ত যুক্তিত্রয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, শুধুমাত্র পুনরাবৃত্তি থেকে সংযোগের ধারণাটি গঠিত হয় না বরং এথেকে এমন কিছু গঠিত হয় যা সংযোগের ধারণার উৎস। এই 'এমন কিছু'–ই হল নতুন ইন্দ্রিয়ছাপ। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়ছাপটি প্রত্যক্ষণজাত নয় বরং সদৃশ বস্তুর পর্যবেক্ষণ দ্বারা আমাদের মনের মধ্যে গঠিত। এ প্রসঙ্গে হিউম তার *Treatise* গ্রন্থে বলেনঃ

> যথেষ্ট সংখ্যক দৃষ্টান্তে সাদৃশ্যটিকে লক্ষ্য করার পর আমরা একটি বস্তু থেকে তার সচরাচর সহগামীটিতে সংক্রমণ করার ও ঐ সম্বন্ধের জন্য তাকে আরো স্পষ্ট ভাবে ধারণা করার মনের এক প্রবণতাকে অনুভব করি। এই প্রবণতাই সাদৃশ্যের একমাত্র ক্রিয়া। সুতরাং ,এই প্রবণতাটিই হল শক্তি বা ক্ষমতার ধারণা যা আমরা সাদৃশ্য থেকে লাভ করে থাকি।[১২৪]

তিনি আরও বলেনঃ

> এসব দৃষ্টান্ত (যাদের পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে) স্বকীয়ভাবে পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, যে মন তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করে সে মনের মাঝেই এদের সংযোগ ঘটে। সুতরাং, আবশ্যিকতা এই পর্যবেক্ষণেরই ফলাফল এবং মনের এক অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ছাপ বা কোন একটি লক্ষিত বস্তু থেকে অন্য একটিতে আমাদের চিন্তাকে সংক্রমন করানোর প্রবণতা ছাড়া আর কিছুইনয়।[১২৫]

তিনি এই প্রবণতাকে অভ্যাস থেকে সৃষ্ট বলে মনে করেন।[১২৬] লক্ষণীয় যে, তিনি 'মনের অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ছাপ' বলতে ' চিন্তাকে সংক্রমণকরানোরপ্রবণতাকে'বুঝিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে *Enquiry* গ্রন্থে হিউম কার্যকারণের অনিবার্য সম্পর্ককে অভিজ্ঞতাজাত ধারণা এবং সকল অভিজ্ঞতাজাত ধারণাকেই ন্যায় ক্রিয়ার ফল নয় বরং অভ্যাসের ফল বলেছেন।[১২৭] এদিকে *Treatise* গ্রন্থেও তিনি অনিবার্য সম্বন্ধ বা আবশ্যিক সংযোজন ও অভ্যাসজাত সংযুক্তিকে আসলে একই ব্যাপার বলে উল্লেখ করেন। কারণ, এক জাতীয় দৃষ্টান্তের পুনরাবৃত্তির একটি ঘটনার আবির্ভাব ঘটলে তার পর মন অভ্যাসবশত স্বাভাবিক অনুগামীটিকে প্রত্যাশা করে এবং বিশ্বাস করে যে এটি অস্তিত্বশীল হবে। এ বিশ্বাসই আবশ্যিকতা। কিন্তু বিশ্বাস করা ও ধারণা থাকা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। এদের একটির অস্তিত্ব যৌক্তিকভাবে অন্যটির অস্তিত্ব নির্দেশ করে না। এরা পরস্পর স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল হতে পারে। এ কারণেই বেরী ষ্টাউভ মনে করেন যে হিউমই প্রথম দার্শনিক যিনি সরল ধারণা ও বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে সক্ষম হয়েছেন।[১২৮]

হিউমের কার্যকারণ সম্পর্কিত সদর্থক আলোচনার সারসংক্ষেপ করে বলা যায় যে, কারণ ও ক্রিয়ার মধ্যকার আবশ্যিক সংযোজনের যে দাবী করা হয় হিউমের প্রমাণ অনুসারে সে দাবী মূলত অভ্যাসজনিত কারণেই ঘটে থাকে। লক্ষিত বস্তুগুলো অনিবার্যভাবে সংযুক্ত থাকে না বরং আমাদের মনের ধারণাগুলো অনুষঙ্গের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়। অভ্যাসের প্রত্যক্ষণ থেকেই এই অনুষঙ্গের উৎপত্তি অর্থাৎ, এই সংযোজনকে কারণ ও কার্যের মধ্যে অনুসন্ধান নাকরে অনুসন্ধান করতে হবে অভ্যাসজাত মানসিক প্রবণতার মধ্যে তথা মনের মধ্যে। এ কারণেই হিউম কার্যকারণ নির্ভর সকল বাস্তব ঘটনাকে অভ্যাসের ফল হিসাবে আখ্যায়িত করে তাঁর *Treatise* গ্রন্থে বলেন, কিন্তু বাস্তব বিষয় সম্পর্কিত সব ন্যায় ক্রিয়াই শুধু অভ্যাস থেকে গঠিত হয়ে থাকে। আর অভ্যাস হল কিছুকে বারবার প্রত্যক্ষণ করার ফল।[১২৯] *Enquiry* গ্রন্থে বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে তিনি বলেন

> বাস্তব ঘটনা বা বাস্তব অস্তিত্ব সম্বন্ধে সব বিশ্বাসই স্মৃতি বা ইন্দ্রিয়ের কাছে উপস্থিত নিছক কোন বস্তু এবং সেই বস্তু বা অন্য কোন বস্তুর অভ্যাসগত সংযোগের বিষয় থেকে উদ্ভূত।[১৩০]

Dhaka University Institutional Repository

স্মরণ করা যেতে পারে যে, হিউম তার *Treatise* গ্রন্থে (১ম খণ্ড, ৩য় অধ্যায়, ১ম পরিচ্ছেদ) দার্শনিক সম্বন্ধগুলোকে সাত ভাগে ভাগ করেন। এগুলো আবার দুই প্রকার। ফ্রেডরিক কপলেস্টোন প্রথম প্রকার সম্বন্ধকে **অপরিবর্তনশীল** ও দ্বিতীয় প্রকার সম্বন্ধকে **পরিবর্তনশীল সম্বন্ধ** নামে আখ্যায়িত করেছেন।১৩১ প্রথম শ্রেণীর সম্বন্ধগুলো থেকে অভিজ্ঞতাপূর্ব প্রমাণের মাধ্যমে নিশ্চিত জ্ঞান পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধগুলো হল সাদৃশ্য, বৈপরীত্য, গুণগত মাত্রা এবং সংখ্যাগত ও পরিমাণগত মাত্রা। দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্বন্ধগুলোর সত্যতা পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা নির্ণিত হয়। সুতরাং এগুলো সম্ভাব্য। এগুলো হল, অভিন্নতা, দেশ– কালের সম্বন্ধ ও কার্যকারণ সম্বন্ধ। সুতরাং কার্যকারণ সম্ভাব্য শ্রেণীর অন্তর্গত সম্বন্ধ।

হিউমের কার্যকারণ সম্পর্কিত মতবাদের উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর ব্যাখ্যা প্রচলিত বুদ্ধিবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী উভয় ব্যাখ্যা থেকে স্বতন্ত্র। যেসব বুদ্ধিবাদীরা মনে করেন কারণের প্রকৃতির বিচারবুদ্ধিসম্মত বিশ্লেষণ দ্বারা কার্যকে আবিষ্কার করা যায় হিউমের মতবাদ সেসব বুদ্ধিবাদীকে মতের বিরোধী। আবার লক প্রমুখ অভিজ্ঞতাবাদীরা মনে করেন, বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করলেই কার্যকারণের আবশ্যিক সম্পর্ককে আবিষ্কার করা যায়, হিউমের মত সে মতেরও বিরোধী। এজন্যই হিউম একশত সংখ্যক কার্যের পক্ষে একটি কারণকে অনুসরণ করা সম্ভব বলে মনে করেন।১৩২

প্রচলিত কার্যকারণের ধারণাকে পরিহার করে এর মধ্যকার আবশ্যিক সংযোজনের ধারণাকে ব্যক্তির অভ্যাসজাত মানসিক প্রবণতা বলে হিউম কার্যকারণের যে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা দর্শনের ইতিহাসে কার্যকারণ আলোচনায় এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত ঘটায়। তাঁর এ মতবাদকে আবশ্যিকতা সম্পর্কিত মানসিক প্রবণতা মতবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

আবশ্যিকতা সম্পর্কিত মানসিক প্রবণতা মতবাদের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে কার্যকারণ সম্পর্ক তার বিষয়গত বা সর্বজনীন রূপ হারিয়ে বিষয়ীগত হয়ে পড়ে এবং সঙ্গত কারণেই তা সম্ভাব্য জ্ঞানের বিষয়ে পরিণত হয়। এছাড়া, কার্যকারণ নির্ভর বাস্তব তথ্য সম্পর্কিত সকল প্রকার জ্ঞানও সর্বজনীনতা হারিয়ে বিষয়ীগত ও সম্ভাব্য হয়ে পড়ে। বাস্তব তথ্যের সর্বজনীন জ্ঞানলাভ অসম্ভব হওয়ায় হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকে সংশয়বাদে রূপ নেয়। হিউম-পূর্ব অভিজ্ঞতাবাদী জন লক ও জর্জ বার্কলে অভিজ্ঞতাবাদী হওয়া সত্ত্বেও কার্যকারণের আবশ্যিকতাকে স্বীকার করেছিলেন। ফলে, তাঁদের হাতে জ্ঞানের নিশ্চয়তার ভিত্তি ধ্বংস প্রাপ্ত না হলেও অভিজ্ঞতাবাদ অসঙ্গতির হাত থেকে রক্ষা পায় নি। হিউমের হাতে অভিজ্ঞাবাদের এ ত্রুটির নিরসন হয়। এজন্য বার্ট্রান্ড রাসেল হিউমকে দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম একজন হিসাবে আখ্যায়িত করেন।১৩৩

কার্যকারণের আবশ্যিকতা সম্পর্কিত মানসিক প্রবণতা মতবাদ দ্বারা হিউম কার্যকারণের মধ্যকার প্রচলিত আবশ্যিক সম্পর্কের ধারণাকে বর্জন করায় কারণের প্রচলিত সংজ্ঞা অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় হিউম কারণের নতুন সংজ্ঞা দেন এবং কার্য ও কারণের মধ্যকার আবশ্যিক সম্পর্কের ধারণাকে পরিহার করে পারম্পর্য, সংলগ্নতা ও সতত সংযোজন দ্বারা এদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন। তিনি কারণের দু'টি সংজ্ঞা প্রদান করেন।

সংজ্ঞা (১) কারণ এমন একটি লক্ষিত বস্তু যা অন্য একটি লক্ষিত বস্তুর পূর্ববর্তী ও সংলগ্ন এবং যেসব লক্ষিত বস্তু পূর্ববর্তী বস্তুটির সদৃশ সেগুলোর সবই পরবর্তী বস্তুটির সদৃশ বস্তুগুলোর সাথে পূর্ববর্তীতা ও সংলগ্নতার সম্পর্কে সম্পর্কিত।

সংজ্ঞা (২) কারণ এমন একটি লক্ষিত বস্তু যা অন্য কোন লক্ষিত বস্তুর পূর্ববর্তী ও সংলগ্ন এবং এর (পূর্ববর্তীটির) সাথে এমনভাবে সংযুক্ত যে, একটি ধারণা উপস্থিত থাকলে মন অন্যটির ধারণা গঠন করতে এবং একটির ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে অন্যটির আর সজীব ধারণা গঠন করতে নির্ধারিত হয়।

কারণের এ দু'টি সংজ্ঞার মধ্যে হিউম কোন পার্থক্য আছে বলে মনে করেন নি। সংজ্ঞা দু'টিতে মূলত একই বিষয়কে ভিন্ন দিক থেকে ব্যক্ত করা হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। প্রশ্ন হল, হিউমের পক্ষে কার্যকারণ সম্পর্কের দু'টি সংজ্ঞা প্রদানের কারণ কি? এর কারণ বুঝতে হলে হিউম নির্দেশিত দার্শনিক সম্বন্ধ ও প্রাকৃতিকসম্বন্ধ১৩৪ এ দু'টি সম্বন্ধের ধারণাকে বোঝা প্রয়োজন।

দু'টি বস্তুর মধ্যকার যে কোন প্রকার তুলনা থেকে যে সম্বন্ধ সৃষ্টি হয় তাই দার্শনিক সম্বন্ধ। অন্যদিকে, যখন একটি বস্তুর চিন্তা মনের মধ্যে অন্য একটি বস্তুর চিন্তার উদ্ভব ঘটায় তখনই এ দু'টি বস্তুর মধ্যকার সম্পর্ককে প্রাকৃতিক সম্পর্ক বলে। সাদৃশ্য, পারম্পর্য ও কার্যকারণ, অন্যকথায়, অনুসঙ্গ নিয়মই হল প্রাকৃতিক সম্পর্কের ভিত্তি অন্যদিকে, সকল প্রকার সম্পর্কই যেহেতু দার্শনিক সম্বন্ধ সেহেতু যে দু'টি ঘটনা বা বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য, পারম্পর্য বা কার্যকারণের সম্পর্ক আছে সে দু'টি ঘটনা বা বস্তু দার্শনিক সম্পর্কেও সম্পর্কিত। সুতরাং বলা যায়, সাদৃশ্য, সান্নিধ্য ও কার্যকারণ এই তিন শ্রেণীর সম্পর্ককে, হিউমের সংজ্ঞানুসারে দার্শনিক ও প্রাকৃতিক উভয় প্রকার সম্পর্ক বলা যায়। তাই সংজ্ঞা (১) এ হিউম কার্যকারণ সম্পর্ককে দার্শনিক সম্পর্ক হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। অন্যদিকে, সংজ্ঞা (২) এ হিউম কার্যকারণকে প্রাকৃতিক সম্পর্ক হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যায়, হিউম কার্যকারণ সম্পর্ককে দার্শনিক ও প্রাকৃতিক উভয় শ্রেণীর সম্পর্কের মধ্যে গণ্য করেছেন। এজন্যই তার নির্দেশিত কার্যকারণ সহক্কের দু'টি সংজ্ঞা একই অর্থ বহন করে এবং এর একটি অপরটিকে নির্দেশ করে বলে তিনি মনে করেন। উপরোক্ত দু'টি সংজ্ঞানুসারে কার্যকারণের মধ্যকার সম্পর্ককে দার্শনিক বা প্রাকৃতিক সম্পর্ক হিসাবে, অন্য কথায়, দু'টি ধারণার মধ্যে তুলনা হিসাবে বা দু'টি ধারণার মধ্যে অনুসঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করাই সঠিক হবে, আবশ্যিক সম্পর্ক হিসাবে নয়। হিউমের কার্যকারণ সম্পর্কিত নতুন সংজ্ঞায় কার্যকারণকে পূর্ববর্তীতা ও সংলগ্নতা দ্বারা সংজ্ঞায়িত করে প্রত্যেক অস্তিত্বের আরম্ভের কোন না কোন কারণের আবশ্যিকতাকে যেমন অস্বীকার করা হয়েছে তেমনি কারণ কোন শক্তির দ্বারা কার্য উৎপন্ন করে, এ ধারণাকেও বর্জন করা হয়েছে। ফলত এ ব্যাখ্যা কার্যকারণ সম্পর্কে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে। হিউমের এই আক্রমন থেকে কার্যকারণ নিয়মকে রক্ষা করা ছিল পরবর্তী কালের দার্শনিকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক সমস্যা।[১৩৫]

কার্যকারণ সম্পর্কে হিউমের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর জ্ঞানবিদ্যাকে সংশবাদের দিকে নিয়ে যায়। এ বিষয়েই আমাদের পবরবর্তীআলোচনা।

৪.৫ হিউমের জ্ঞানবিদ্যা ও সংশয়বাদ

দর্শনের ইতিহাসে সংশয়বাদ হল জ্ঞানের বিশ্বস্ততা বা যথার্থতা সম্পর্কিত একটি বিচারমূলক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। জ্ঞানের প্রশ্নে গ্রীক দেশে এ মতবাদের উদ্ভব হয়। ব্যক্তি নিরপেক্ষ জ্ঞানলাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়–এটাই সংশয়বাদের মূলকথা। প্রাচীন কালে গ্রীকদেশে এ মতবাদের জন্ম হলেও দর্শনের ইতিহাসে এ মতবাদের একটি ধারা দেখতে পাওয়া যায়। যদিও মধ্যযুগে ধর্ম প্রভাবিত বিশ্বাস নির্ভর দর্শন চর্চায় সংশয়বাদ প্রাচীন যুগের মত প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি তবু রেনেসাঁ পরবর্তী আধুনিক দর্শনের মুক্ত চিন্তাভিত্তিক দর্শন চর্চায় সংশয়বাদের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। আধুনিক যুগের বৃটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউম তার অন্যতম নিদর্শন। তার সংশয়বাদকে বৃটিশ অভিজ্ঞতাবদের চরম পরিণতি হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়। একথা মনে করা হয় যে, জন লকের *Essay Concerning Human Understanding* প্রকাশের মধ্য দিয়ে যে বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদের সূচনা ডেভিড হিউমের হাতে তাই যুক্তিসঙ্গত পরিণতি লাভ করে।[১৩৬] এ কথাও বলা হয় যে, কোন যুক্তিসঙ্গত অভিজ্ঞতাবাদীর পক্ষেই হিউমের সংশয়বাদকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।[১৩৭] সুতরাং অভিজ্ঞতাবাদের যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হিসাবে হিউমের সংশয়বাদকে উপলব্ধি করার জন্য বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদী দর্শন তথা জন লক ও জর্জ বার্কলের অভিজ্ঞতাবাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রাসঙ্গিক।

জন লক থেকে ডেভিড হিউম পর্যন্ত জ্ঞানবিদ্যার যে আলোচনা হয়েছে তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষের জ্ঞানের সীমা ও বিস্তৃতি কতটুকু তা অনুসন্ধান করা। জন লক দেকার্তের তথা কার্তেজীয় বুদ্ধিবাদকে সমালোচনা করেই তাঁর অভিজ্ঞতাবদী মতবাদ প্রদান করেন। দেকার্ত অভিজ্ঞতাপূর্ব সহজাত বা অন্তর্ধারণাকে ভিত্তি হিসাবে ধরে নিয়ে অবরোহ পদ্ধতিকে জ্ঞানের পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেন এবং বুদ্ধিবাদী জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে ঈশ্বর, দ্রব্য, কার্যকারণ প্রভৃতির সার্বিক জ্ঞান সহজাত ধারণা হিসাবে আমাদের মনে থাকে এবং এথেকে অবরোহ পদ্ধতিতে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যায়। ঈশ্বর দ্রব্য কার্যকারণ প্রভৃতি সার্বিক বিষয়ের জ্ঞান সহজাত ধারণার মাধ্যমে পাই, একথা বলায় দেকার্তের হাতে জ্ঞানের বিস্তৃতি হয়ে পড়ে সীমাহীন। অর্থাৎ সকল কিছুরই জ্ঞান পাওয়া সম্ভব বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু জন লক তার *Essay Concerning Human Understanding* নামক বিখ্যাত গ্রন্থের প্রথম পুস্তকে দেকার্তের অন্তর্ধারণা মতবাদকে খণ্ডন করে যে বিষয়টির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তা হল, সব কিছুরই জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয়। জ্ঞানের একটা সীমা আছে। সি আর মরিস লকের এই অবদানকে জ্ঞানের সীমার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে মনে করেন। তাঁর মতে, পরবর্তীকালে হিউম জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞান আদৌ সম্ভব কিনা বলে যে মৌলিক প্রশ্নটি করেছেন লক–ই তার পটভূমি তৈরী করেছিলেন।[১৩৮]

লক ও বার্কলের অভিজ্ঞতাবাদী মতদবাদে দেখা যায় তাঁরা উভয়েই এ বিষয়ে একমত যে, অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। তবে লক অভিজ্ঞতার কারণ হিসাবে জড় ও মানসিক উভয় প্রকার দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এবং এসব দ্রব্যকে অজ্ঞেয় হিসাবে আখ্যায়িত করে জ্ঞানের সীমা নির্ণয় করে দেন। যার ফলে সংশয়বাদের পথ প্রশস্ত হয়। কিন্তু বার্কলে লকের অভিজ্ঞতাবাদ দ্বারাই লকের অজ্ঞেয় জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব খণ্ডন করেন এবং লকের প্রতীকবাদকে ধারণাবাদে রূপান্তরিত করে শুধু মানসিক দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বার্কলের হাতে লকের জ্ঞানের সীমা অসীম হয়ে যায় এবং নিশ্চিত জ্ঞান সম্ভব বলে ঘোষিত হয়। হিউম লক ও বার্কলের দর্শনের অভিজ্ঞতাবাদী যৌক্তিক উপাদানগুলো গ্রহণ এবং অযৌক্তিক উপাদানগুলো খণ্ডন করে তার মতবাদ দেন। বার্কলে যে যুক্তিতে লক কে সমালোচনা করেছিলেন হিউম একই যুক্তিতে বার্কলের মানসিক দ্রব্যের অস্তিত্বের ধারণাকে খণ্ডন করে বার্কলের

Dhaka University Institutional Repository

বার্কলের মতবাদকে পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট বলে মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, অভিজ্ঞতাবাদী হিসাবে কালের মধ্যে জড় বস্তুর অভিন্নতা রক্ষার জন্য যেমন আমাদের লকের জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই তেমনি, কালের মধ্যে মনের অভিন্নতা রক্ষার জন্য বার্কলে স্বীকৃত মনের অস্তিত্বকে স্বীকার করার পক্ষেও তেমন কোন যুক্তি নাই। সুতরাং হিউমের হাতে লকের অজ্ঞেয় জড়ীয় ও মানসিক দ্রব্য ও বার্কলের জ্ঞেয় ও নিশ্চিত মানসিক দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয়। ফলে তার কাছে শুধু আভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। এ ছাড়াও লক ও বার্কলে কারণিক সম্পর্ককে স্বীকার করে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে শুধু পার্থক্য ছিল এই যে, লক কারণিক সম্পর্ককে পদার্থের অংশগুলোর মধ্যকার শক্তির সম্পর্ক হিসাবে এবং বার্কলে একে মানসিক সম্পর্ক হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু হিউম কার্যকারণের মধ্যকার অ বশ্যিক সম্পর্ককে অস্বীকার করে একে অতিকথা (myth) হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। জড় ও মানসিক উভয় প্রকার দ্রব্যসহ কার্যকারণের মধ্যকার আবশ্যিক সম্পর্ক অস্বীকৃত হওয়ায় হিউমের হাতে বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদ থেকে লক ও বার্কলে স্বীকৃত অঙ্গতিপূর্ণ উপাদান বর্জিত হয়। তবে এর পরিণতি হিসাবে জ্ঞান অনিশ্চিত হয়ে পড়ে অর্থাৎ সংশয়বাদের জন্ম হয়।

পূর্ববর্তী আলোচনায় এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে, হিউম একমাত্র ইন্দ্রিয়ছাপকেই জ্ঞানের প্রাথমিক উপাদান বলেছেন। যার ইন্দ্রিয়ছাপ নাই তার ধারণাও নাই। আর ইন্দ্রিয়ছাপ নাই বলে দ্রব্য আত্মা ও কার্যকারণের আবশ্যিক সম্পর্কের ধারণার অস্তিত্বকেও তিনি অস্বীকার করেছেন।

হিউম তাঁর *An Enquiry Concerning Human Understanding* নামক গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম অংশে দু'ধরণের জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করেন। এদু'টি বিষয় হল ধারণার সম্বন্ধ (Relations of ideas) এবং বাস্তব ঘটনা (Matter of Facts)। তিনি বলেন, মানুষের বিচারবুদ্ধি বা অনুসন্ধানের সব বস্তুকে স্বাভাবিকভাবে দু'রকম ভাবে ভাগ করা যেতে পারে ধারণার সম্বন্ধ এবং বাস্তব ঘটনা [১৩৯]

প্রথম ধরনের বিষয় নিয়ে যেসব বিজ্ঞান আলোচনা করে সেসব বিজ্ঞানের উদাহরণ দিতে গিয়ে হিউম জ্যামিতি পাটিগণিত ও বীজগণিতের কথা বলেন। এসব বিজ্ঞানে যা ঘোষণা করা হয় তার স্বজ্ঞামূলক (intutional) অথবা প্রমাণমূলক (demonstrative) নিশ্চয়তা আছে।[১৪০] শুধুমাত্র চিন্তন ক্রিয়ার দ্বারাই এ ধরণের বচনগুলোকে আবিষ্কার করা যায়। তাদের জন্য অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হয়না। এ ধরণের বচনকে অস্বীকার করতে গেলে স্ববিরোধ দেখা দেয়। অন্যকথায়, এ ধরণের বচনের বিপরীত বচন কল্পনা করা অসম্ভব। গণিতের সম্বন্ধকে আবশ্যিক সম্বন্ধ বলায় কপলেস্টোন হিউমের গণিত বিষয়ক জ্ঞানকে অভিজ্ঞতাবাদী না বলে বুদ্ধিবাদী বলেছেন [১৪১] স্মরণ করা যেতে পারে যে, *Treatise* গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে হিউম পাটিগণিত ও বীজগণিতকেই একমাত্র সুনির্দিষ্টতা ও সুনিশ্চয়তার বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বিজ্ঞান বলে আখ্যায়িত করে জ্যামিতির এ বৈশিষ্ট্য নাই বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু *Enquiry* গ্রন্থে তিনি জ্যামিতিকেও পাটিগণিত ও বীজগণিতের সমমর্যাদা দান করেন [১৪২]

অন্যদিকে, দ্বিতীয় ধরনের বিষয় অর্থাৎ বাস্তব ঘটনা নিয়ে যেসব বচন আলোচনা করে তাদের স্বজ্ঞামূলক বা প্রমাণমূলক নিশ্চয়তা নাই বলে হিউম উল্লেখ করেন। শুধুমাত্র চিন্তনক্রিয়ার মাধ্যমে এসব বচনকে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। তার জন্য অভিজ্ঞাতার সাহায্য নেয়া প্রয়োজন। বাস্তব ঘটনা সম্পর্কিত বচনের স্ববিরোধী বচনের কল্পনা করা সম্ভব। অন্য কথায় এ ধরনের বচনকে চিন্তার ক্ষেত্রে অস্বীকার করা সম্ভব। এমনকি বাস্তবেও এসব ঘটনার বিপরীত ঘটনা ঘটা সম্ভব। অর্থাৎ ধারণার সম্বন্ধগুলোর যে চূড়ান্ত নিশ্চয়তা আছে বাস্তব ঘটনা সম্পর্কিত বচনের সেরূপ নিশ্চয়তা নাই বা থাকতে পারে না। এগুলো সম্ভাব্য মাত্র। এন্টনী ফ্লু হিউমের এই শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রথম শ্রেণীর বচনকে অভিজ্ঞতাপূর্ব এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বচনকে অভিজ্ঞতাপ্রসূত বলে উল্লেখ করেন। ফ্লু বলেন,

> যখন হিউম বলেছেন যে, প্রথম ধরনের বচনকে শুধুমাত্র চিন্তন প্রক্রিয়ার দ্বারাই আবিষ্কার করা যায় বাস্তব জগতে কোন কিছু অস্তিত্বশীল কিনা তার দিকে খেয়াল করার প্রয়োজন হয় না তখন বস্তুত তিনি অভিজ্ঞতাপূর্ব বচনেরই সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করেছেন। আর যখন তিনি বলেছেন যে দ্বিতীয় ধরনের বচনকে শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা যায় তখন তিনি অভিজ্ঞতাপ্রসূতকেই বোঝাতে চেয়েছেন।[১৪৩]

হিউম অবশ্য অভিজ্ঞতাপূর্ব বলতে বিশ্লেষক এবং অভিজ্ঞতাপ্রসূত বলতে সংশ্লেষক বচনকে বুঝাচ্ছেন কিনা এমন কিছু নিজে স্পষ্ট করে বলেন নি। তবে আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদী এ. জে. এয়ার, বেসন, এন. কে. স্মিথ[১৪৪] ম্যাকনাব,[১৪৫] প্রমুখ মনে করেন

Dhaka University Institutional Repository

হিউমের সম্বন্ধ বিষয়ক সত্যতা বিশ্লেষক এবং বাস্তব ঘটনা বিষয়ক সত্যতা সংশ্লেষক। কান্টও তাঁদের সাথে একমত। এটনি ফ্লু এ মতের বিরোধিতা করেন।[১৪৬] এ প্রসঙ্গে কপলেস্টোনের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, হিউম যেসব বচনকে ধারণার সম্বন্ধ বলেছেন সেসব বচনকে বর্তমানে সাধারণভাবে বিশ্লেষক বচন এবং যেসব বচনকে বাস্তব ঘটনা সম্পর্কিত বলেছেন সে সব বচনকে সংশ্লেষক বচন নামে অভিহিত করা হয়। তাঁর মতে, অভিজ্ঞতাপূর্ব বচন অর্থাৎ যেসব বচনের সত্যতা শুধুমাত্র তাদের প্রতীকের অর্থের উপর নির্ভর করে সেসব বচনকে বিশ্লেষক বচন হিসাবে আখ্যায়িত করা আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদীদেরই অবদান। তারাই এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করেছেন যে, কোন সংশ্লেষক বচনেরই অভিজ্ঞতাপূর্ব হওয়ার যোগ্যতা নাই। এগুলো শুধু অভিজ্ঞতামূলক প্রকল্প মাত্র। সুতরাং এসব বচনের শুধু কম বা বেশী পরিমাণে সম্ভাব্যতা আছে। কোন প্রকার নিশ্চয়তা নাই। অভিজ্ঞতাবাদীদের এই অবদানের ফলে অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক বচন কান্ট যে বচনের কথা পরবর্তীতে বলেছেন) অর্থাৎ যেসব বচন বাস্তব ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে অথচ চরমভাবে নিশ্চিত এরকম বচনের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয়েছে. কপলেস্টোন আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদীদের এই অবদানকে হিউমের মতেরই উন্নয়ন হিসাবে মূল্যায়ন করেন।[১৪৭] এ প্রসঙ্গে ম্যাকনাবের অভিমত কপলেস্টোনের মতের সাথে অভিন্ন। ম্যাকনারে মতে, বুদ্ধিবাদী অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে আধুনিক অভিজ্ঞতবাদীদের ব্যবহৃত সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র হল অভিজ্ঞতাপূর্ব বচন সংশ্লেষক হতে পারেনা এবং এটি হিউমেরই আবিষ্কার[১৪৮] রাসেলের মতে, হিউম অনিশ্চিত জ্ঞান বলতে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে বুঝিয়েছেন. এজ্ঞান প্রমাণমূলক নয়। এছাড়া এধরনের জ্ঞান অতীত ও বর্তমান সম্পর্কিত জ্ঞানের অপরিবেক্ষিত অংশকে এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত জ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করে। বস্তুতপক্ষে, এরূপ জ্ঞান প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ, যুক্তিবিদ্যা ও গণিত ছাড়া অন্য সকল কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাঁর মতে এ ধরনের সম্ভাব্য জ্ঞানের বিশ্লেষণ হিউমকে এমন একটি নির্দিষ্ট সংশয়বাদী সিদ্ধান্তে উপনীত করে যা একাধারে গ্রহণ করা ও বর্জন করা উভয়ই সমানভাবে কষ্টকর। এধরনের সিদ্ধান্ত দার্শনিকদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে প্রতিভাত হয়, যে চ্যালেঞ্জের উত্তর আজ পর্যন্ত যথার্থভাবে দেয়া সম্ভব হয় নি।[১৪৯]

হিউম প্রদত্ত জ্ঞানের বিষয়ের উপরে শ্রেণী বিভাগ থেকে দেখা যায় যে, ধারণার সম্বন্ধ সম্পর্কিত বচনের নিশ্চয়তা চিন্তামূলক তথা অভিজ্ঞতাপূর্ব। কিন্তু প্রশ্ন হল, বাস্তব ঘটনা সম্পর্কিত বচনের নিশ্চয়তার প্রমাণ কি? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই হিউমের মতবাদ সংশয়বাদে পর্যবসিত হয়। কেননা হিউম এটা মনে করেন যে বাস্তব ঘটনা সম্পর্কিত বচন সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য আমরা যে সব ন্যায় ক্রিয়া ব্যবহার করি সবগুলোই কার্যকারণ সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে আমাদের সুনিশ্চিত করে যে সাক্ষ্য প্রমাণ তার প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হতে গেলে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে কিভাবে আমরা কার্যকারণের জ্ঞান লাভ করি।[১৫০]

কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্কিত পূর্বোক্ত আলোচনায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, কার্যকারণের মধ্যকার আবশ্যিক সম্পর্ককে হিউম ব্যক্তির মনোগত ব্যাপার বলেছেন। কারণ, এটা ব্যক্তির অভ্যাসজনিত প্রবণতার ফল। অর্থাৎ এর কোন সর্বজনীন মানদণ্ড নাই। এর মানদণ্ড ব্যক্তিসাপেক্ষ সুতরাং সম্ভাব্য কার্যকারণের এরূপ ব্যাখ্যার ফলস্বরূপ হিউমের কাছে বাস্তব ঘটনা সম্পর্কিত সকল বিষয়ই কার্যকারণের মত ব্যক্তির অভ্যাসের ফল তথা ব্যক্তিসাপেক্ষ ও সম্ভাব্য বিষয়ে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর *Treatise* গ্রন্থে বলেন, কিন্তু বাস্তব বিষয় সম্পর্কিত সব ন্যায় ক্রিয়াই শুধু অভ্যাস হতে গঠিত হয়ে থাকে। আর অভ্যাস হল কোন কিছুকে বার বার প্রত্যক্ষণ করার ফল।[১৫১]

Enquiry গ্রন্থে বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে তিনি বলেন, বাস্তব ঘটনা বা বাস্তব অস্তিত্ব (real existence) সম্বন্ধে সব বিশ্বাসই স্মৃতি বা ইন্দ্রিয়ের কাছে উপস্থিত নিছক কোন বস্তু এবং সেই বস্তু বা অন্য কোন বস্তুর অভ্যাসগত সংযোগের (customary conjunction) বিষয় থেকে উদ্ভূত।[১৫২] তিনি এই অভ্যাসকে উপকার পেলে অপরের প্রতি যে ভালবাসা এবং ক্ষতি হলে যে ঘৃণার ভাব আমাদের মনে জেগে উঠে সেই মানসিক স্বাভাবিক (natural) প্রবৃত্তির সাথে তুলনা করেন। তাঁর মতে, কোন ন্যায় ক্রিয়া অথবা চিন্তা পদ্ধতি অথবা বোধক্রিয়া এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে উৎপন্নও করতে পারে না আবার বাধাও দিতে পারে না। এটা হল এক বিশেষ অবস্থায় মনকে স্থাপন করার অনিবার্য পরিণতি। এক কথায়, হিউম মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বাস্তব ঘটনা সম্পর্কিত আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[১৫৩] এর ফলে বস্তুব ঘটনা সম্পর্কিত জ্ঞানের সর্বজনীনতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

লক বাহ্য বস্তু সম্পর্কে প্রতীকবাদী বাস্তববাদ প্রচার করে একথা বলেছিলেন যে, বস্তুকে আমরা তার মুখ্য ও গৌণ গুণের মাধ্যমে জানি। তিনি মুখ্য ও গৌণ গুণের দ্বারা সৃষ্ট বস্তুর ধারনাকে বস্তুর অনুরূপ বলে মত প্রকাশ করেন. বার্কলে মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যকার পার্থক্য অস্বীকার করতে গিয়ে মূলত সকল গুণকেই গৌণ গুণ বলেন। কারণ, তিনি বস্তুর গুণ থেকে বস্তুর ধারণাকে

Dhaka University Institutional Repository

আলাদা না করে বলেন, বস্তু ও বস্তুর ধারণা অভিন্ন। আর ধারণা মানেই মনের ধারণা। সুতরাং বাহ্য বস্তু হল মনের ধারণা। এতে তার মতবাদ আত্মগত ভাববাদে রূপ নেয়। হিউম লকের প্রতীকবাদ ও বার্কলের আত্মগত ভাববাদ এ-মতবাদকে বর্জন করে বাহ্য বস্তু ও প্রত্যক্ষণকে অভিন্ন বলে ঘোষ না করেন। তিনি লকের সমালোচনা করে যেমন একথা বলেন যে, প্রত্যক্ষণগুলো এর সদৃশ কোন বাহ্যবস্তু দ্বারা উৎপন্ন হয় একথা যেমন অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে না তেমনি বার্কলের সমালোচনা করে বলেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সব গুণ মনে অবস্থিত বস্তুতে নয় এ ধারণা জড়ের ধ্বংস সাধন করে। এ অবস্থায় জড় অজ্ঞাত অব্যাখ্যাত কিছু হয়ে পড়ে। সুতরাং এ ধারণাও ত্রুটিপূর্ণ।[১৫৪]

বাহ্যবস্তুর বিরামহীন অস্তিত্ব সম্পর্কে হিউম গঠনমূলক যে ব্যাখ্যা দেন সে ব্যাখ্যাও কার্যকারণের আবশ্যিক সম্পর্কের মত। তিনি বাহ্য বস্তুর বিরামহীন অস্তিত্বের ধারণাকে ধারণার স্বন্ধ নয় বরং বস্তুর ঘটনা সম্পর্কিত বিষয় বলে মনে করেন। সুতরাং এ ধারণাও সম্ভাব্য। এ ধারণা ব্যক্তি নিরপেক্ষ বা বস্তুগত নয় বরং জ্ঞাতার মনোগত। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর পূর্বসূরী লক-বার্কলে প্রদত্ত বাহ্য বস্তু সংক্রান্ত ব্যাখ্যারও ত্রুটি নির্দেশ করেন। তাই লক ও বার্কলে প্রদত্ত বাহ্যবস্তুর ধারণা বর্জন করে তিনি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য প্রতিরূপ বা প্রত্যক্ষণকেই বাহ্য বস্তু হিসাবে আখ্যায়িত করেন এবং এ কথা বলেন যে, সরাসরি প্রত্যক্ষণের বাইরে প্রত্যক্ষণের কারণরূপ কোন বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করা অসম্ভব। কারণ তাঁর মতে, মনের কাছে বস্তুর প্রত্যক্ষণ ছাড়া আর কিছুই উপস্থিত থাকেনা এবং বস্তুর সাথে তাদের সম্পর্কের কোন অভিজ্ঞতা মন লাভ করতে পারে না। প্রত্যক্ষণগুলো তাদের কোন সদৃশ বাহ্যবস্তু দ্বারা সৃষ্টি হয় কি না এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা নির্বাক।[১৫৫] হিউম তাঁর Treatise গ্রন্থে যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে এ মত প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হন যে, সব প্রত্যক্ষণই আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর এবং আমাদের স্নায়ুতন্ত্র ও মেজাজের প্রবণতার উপর নির্ভরশীল। এদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষণগুলোর যেমন কোন স্বাধীন সত্তা নেই তেমনি এদের কোন বিরামহীন সত্তাও নাই।[১৫৬] বাহ্যজগতের বিরামহীন অস্তিত্বের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি কার্যকারণ সম্পর্কের মত এক্ষেত্রেও মানুষের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি বা পূর্ব সংস্কারকে এজন্য দায়ী করেন। তাঁর মতে, মানুষ তার প্রকৃতিগত প্রবৃত্তির কারণেই ইন্দ্রিয়ের উপর আস্থা স্থাপন করে এবং কোন যুক্তির ব্যবহার না করেই বাহ্য জগৎ এবং এর বিরামহীন অস্তিত্ব অনুমান করে।[১৫৭] তার মতে, আমরা যে পৃথিবীকে বাস্তব ও স্থিতিশীল বলে মনে করে এসেছি এবং আমার প্রত্যক্ষণের কাছে অনুপস্থিত থাকার সময়েও তাকে অস্তিত্বশীল মনে করেছি এটা এক স্বাভাবিক (natural) বিবেচনারকল্পপ্রসূতি।[১৫৮]

কার্যকারণ সম্পর্কের মধ্যকার ব্যক্তি নিরপেক্ষ আবশ্যিক সম্পর্ক এবং এ সাথে বাহ্যবস্তুর ব্যক্তি নিরপেক্ষ বিরামহীন অস্তিত্ব অস্বীকার করায় হিউমের কাছে বাস্তব ঘটনা সম্পর্কিত জ্ঞানের সর্বজনীনতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসহ সকল বিজ্ঞানের জ্ঞান হয়ে পড়ে অনিশ্চিত ও ব্যক্তি সাপেক্ষ। এ অবস্থায়ই তাঁর মতবাদ সংশয়বাদে রূপ নেয়।

প্রশ্ন হল হিউমের সংশয়বাদের প্রকৃতি কি অর্থাৎ তাঁকে কি রূপ সংশয়বাদী বলা যায়। হিউম তাঁর *Treatise* ও *Enquiry* উভয় গ্রন্থেই সংশয়বাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তবে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নিজের অনুসারিত মত সম্পর্কে বলেন নি। *Treatise* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি একথা বলেছেন যে

> আমাকে হয়তো জিজ্ঞেস করা হবে — আমি কি সত্যিই এমন একজন সংশয়বাদী যিনি মনে করেন যে সবকিছুই অনিশ্চিত এবং কোন বিষয়েই আমাদের বিচার সত্যমিথ্যার ধার ধারে না। এর উত্তরে আমি বলবো যে, প্রশ্নটি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক এবং আমি কিংবা অন্য কেউ কখনো এই মত আন্তরিকভাবে সব সময় পোষণ করি নি।[১৫৯]

অর্থাৎ যে সংশয়বাদী জ্ঞানের সম্ভাবনাকেই অস্বীকার করেন হিউম এমন চূড়ান্ত অর্থে সংশয়বাদী নয়। এ ছাড়া তিনি তাঁর *Enquiry* গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে দু'ধরনের সংশয়বাদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এদের একটিকে তিনি প্রারম্ভিক সংশয়বাদ এবং অন্যটিকে সিদ্ধান্তগত সংশয়বাদ হিসাবে নামকরণ করেছেন। উল্লেখ্য যে, তিনি তাঁর *Treatise* গ্রন্থে সংশয়বাদের মধ্যে এরকম কোন পার্থক্য করেন নি।

প্রারম্ভিক সংশয়বাদ বলতে তিনি দেকার্তের সংশয়বাদকেই বুঝিয়েছেন। দ্বিতীয় প্রকারের সংশয়বাদ অর্থাৎ সিদ্ধান্তগত সংশয়বাদ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে হিউম বলেন যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি ও বৌদ্ধিক বৃত্তি সম্পর্কে চিন্তন থেকে যে সংশয়ের সূচনা হয় তাই সিদ্ধান্তগত সংশয়বাদ। যখন মানুষ বিচার বুদ্ধির সাহায্যে এটা আবিষ্কার করে যে, তাঁর মানসিক বৃত্তিগুলো এবং ইন্দ্রিয় কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে অক্ষম তখন এ জাতীয় সংশয়ের সূচনা হয়। হিউম নিজেই এধরনের সংশয় পদ্ধতির অনুশীলন করেছেন বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ তিনি আমাদের বৃত্তিগুলো পরীক্ষার মাধ্যমে আমাদের জ্ঞানের সুনিশ্চয়তা ও ব্যাপকতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

হিউম পাইরোবাদের মত চরম সংশয়বাদকে স্বীকার করে নিতে নারাজ। তাঁর মতে, চরম সংশয়বাদ যখন তার পূর্ণ শক্তিসহ নিজেকে প্রকাশ করে তখন তা স্থায়ী হয় না এবং এ থেকে কোন কল্যাণ কখনও লাভ করা যায় না।[১৬০] এটিই হল পাইরোবাদের সীমাবদ্ধতা। তাই তিনি মানুষের জন্য কল্যাণকর ও স্থায়ী এক প্রকার সংযত সংশয়বাদের কথা বলেন। এই সংশয়বাদ যা বলতে চায় তা হল, পর্যাপ্ত প্রমাণের উপর যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত নয় তা থেকে যেন আমরা সতর্ক থাকি। সংযত সংশয়বাদকে হিউম একাডেমিক দর্শন নামেও অভিহিত করেন।[১৬১] মানুষের জ্ঞানের ক্ষমতাকে কিছুটা সংশয় করার জন্য এধরনের সংশয়বাদ উৎসাহ দান করে। কিন্তু ততখানিই উৎসাহ দেয় যাতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনধারা ব্যাহত না হয়। এ ধরনের সংশয়বাদ দার্শনিক অনুসন্ধান কার্যকে সে সব বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় যেগুলোর আলোচনা করার জন্য মানুষের বোধশক্তি উপযুক্ত। এভাবে সীমারেখা আরোপের ফলে দর্শন সাধারণ জীবন সম্পর্কে সুবিন্যস্ত ও সংশোধিত চিন্তন হিসাবে রূপ নেয়।

পরিমাণ ও সংখ্যা সম্পর্কিত বিজ্ঞান ছাড়া জ্ঞানের আর সব শাখাতে যে সব সহানুমান ব্যবহৃত হয় সেগুলো আপাতদৃষ্টে সহানুমান হলেও যথার্থ সহানুমান নয় এবং তাদের সকলের ক্ষেত্রে একই অবস্থা দৃষ্ট হয়। পরিমাণ ও সংখ্যা সম্পর্কিত বিজ্ঞানই শুধুমাত্র জ্ঞানের ও প্রমাণের যথাযথ বিষয়। মানুষের অন্যান্য অনুসন্ধান কার্য শুধুমাত্র বাস্তব ঘটনা ও অস্তিত্ব সম্পর্কিত এবং এগুলো প্রমাণের যোগ্য নয়। যা হয় না তাও হতে পারে।[১৬২]

সুতরাং দেখা যায়, হিউমের সংযত সংশয়বাদ মূলত বস্তুর ঘটনা তথা বাহ্য জগৎ সম্পর্কে সংশয়। তিনি সকল জ্ঞানের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেছেন এমন নয় বরং বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব বা বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে অনিবার্য জ্ঞানের যৌক্তিক সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেছেন।

হিউমের এ বক্তব্য থেকে মনে হয় যে, তিনি তাঁর সংযত সংশয়বাদ বা একাডেমিক দর্শনকে বিচারবুদ্ধিপ্রবণ মানুষের ন্যায় ক্রিয়ার যৌক্তিক সিদ্ধান্ত হিসাবে গণ্য করতে এবং এর দ্বারা দর্শন ও সাধারণ জীবনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে দর্শনকে জীবনোপযোগী করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। এ ছাড়াও তিনি সাধারণ জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে নিশ্চিত সত্য অনুসন্ধানে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে দার্শনিকদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সজাগ করে দিয়ে দর্শনের জগৎ থেকে তত্ত্ববিদ্যাগত বিতর্ককে যেমন পরিহার করেছেন তেমনি জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে বার্কলে নির্দেশিত মানুষের জ্ঞানলাভের অসীম ক্ষমতার সীমারেখা টেনে একে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন। অন্যদিকে, পরিমাণ ও সংখ্যা সম্পর্কিত অমূর্ত বিজ্ঞানকে বাস্তব ঘটনা বা বাহ্য বিষয় থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা করে তিনিই প্রথম বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুর মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করেন। শুধু অভিজ্ঞাতার বিষয় সম্পর্কে তাঁর এই সংযত সংশয়বাদ দর্শনের ইতিহাসে এক নতুন সংযোজন। এর আগে কোন সংশয়বাদী জ্ঞানের জগৎ থেকে সংশয়যোগ্য জ্ঞানের বিষয়কে এত স্পষ্টভাবে আলাদা করতে সক্ষম হয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয় না।

সংক্ষিপ্তসার : হিউমের জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কিত উপরের আলোচনা থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষিত হয়ঃ

১। হিউম প্রাচীন–মধ্য আধুনিক যুগের চলমান অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যাগত ধারণার একজন প্রতিনিধি। তিনি সোফিস্ট–এপিকিউরিয়াস–জেনো–সেন্ট থমাস একুইনাস–বেকন–লক–বার্কলে সমর্থিত জ্ঞানবিদ্যাগত ধারার প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং অভিজ্ঞতাবাদকে সুসমন্বিতরূপে উপস্থিত করেছেন। অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ভূমিকার স্বীকৃতি দিয়ে হিউম জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে থেকে অভিজ্ঞতাপূর্ব সকল রকম উপাদানকে নৃভাবে বর্জন করেছেন। ইন্দ্রিয়ছাপই জ্ঞানের একমাত্র প্রাথমিক উপাদান এবং সকল প্রকার ধারণার উৎপত্তির জন্য অনুরূপ ইন্দ্রিয়ছাপের উপস্থিতি অনিবার্য বলে হিউম যে ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণাতত্ত্ব প্রণয় করেন তার ফলে তার মতবাদ চরম অভিজ্ঞতাবাদে রূপলাভ করেছে। তিনি প্রত্যক্ষণকে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করে, ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করে মূলত যে কথাটিকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন তা হল, একমাত্র ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাই সকল প্রকার জ্ঞানের উৎস। বুদ্ধিবাদীদের স্বীকৃত সহজাত ধারণার নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বুদ্ধিবাদের ধারণা শব্দটির অর্থ সুস্পষ্ট করে দ্ব্যর্থবোধকতা ও শূন্যগর্ভ ব্যবহারের হাত থেকে এ শব্দটিকে মুক্ত করেছেন এবং অত্যন্ত বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার মাধ্যমে তার চরম অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদকে প্রকাশ করেছেন যার মূলকথা হল, সরল ইন্দ্রিয়ছাপই জ্ঞানোৎপত্তির মূলভিত্তি। নিউটন যেমন পদার্থবিজ্ঞানের মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেন হিউমও তেমনি মানব প্রকৃতি বিজ্ঞানে ইন্দ্রিয়ছাপ ধারণা সূত্রের আবিষ্কার করেন। তাঁর এ মতবাদের সাথে চার্বাক দার্শনিকদের জ্ঞানোৎপত্তি সংক্রান্ত মতের মিল দেখা যায়।

২। অভিজ্ঞতার উর্ধ্বে যেসব ধারণার অস্তিত্ব আমাদের মনে আছে সেগুলোর উৎপত্তির কারণ হিসাবে হিউম ধারণার অনুসঙ্গ নিয়ম অর্থাৎ দেশকালের সান্নিধ্য, সাদৃশ্য ও কার্যকারণ এ তিনটি সম্বন্ধকে আবিষ্কার করেছেন। এ তিনটি সম্বন্ধের ফলে মনস্তাত্ত্বিক

Dhaka University Institutional Repository

কারণে আমরা অভিজ্ঞতাউর্দ্ধ বিষয়গুলোর ধারণা গঠন করি। এ অনুসঙ্গ তিনটির ভিত্তি হল স্মৃতি ও কল্পনা। অনুসঙ্গজাত ধারণাগুলো যে নিশ্চিত জ্ঞান দিতে পারে না এটা হিউম স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেন। এতে তাঁর জ্ঞানবিদ্যায় ভ্রান্ত জ্ঞানের ব্যাখ্যাও সংযোজিত হয়েছে। এ সাথে তিনি এও দেখাতে সমর্থ হয়েছেন যে, স্মৃতি ও কল্পনার সীমা ইন্দ্রিয়ছাপের সীমা দ্বারাই নির্দেশিত হয়। এর ফলে বার্কলের হাতে জ্ঞানের যে সীমা অসীম হয়ে গিয়েছিল হিউমের হাতে এসে তা অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়, জ্ঞানের মধ্য থেকে অভিজ্ঞতাউর্দ্ধ উপাদান বর্জিত হয় এবং অভিজ্ঞতাউর্দ্ধ ধারণাবলীরও একটি অভিজ্ঞতাবাদী ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

৩। হিউম তাঁর ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা মতবাদের দ্বারা অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ দ্রব্য আত্মা, কার্যকারণ সম্পর্ক ইত্যাদি ধারণাকে খণ্ডন করেন। তাছাড়া তিনি এসব ধারণাকে খণ্ডন করার সাথে সাথে অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এদের নতুন ব্যাখ্যাও প্রদান করেন। দ্রব্য বা আত্মা সম্পর্কিত তাঁর এ ব্যাখ্যাকে পুঞ্জবাদ এবং কার্যকারণ সম্পর্কিত ব্যাখ্যাকে আকস্মিকতাবাদ হিসাবে বর্ণনা করা হয়। তাঁর এ নতুন ব্যাখ্যার মূলভিত্তি ছিল মনস্তত্ত্ব। লক, বার্কলে অভিজ্ঞতাবাদী হওয়া সত্ত্বেও দ্রব্য, আত্মা ও কার্যকারণ সম্পর্ককে স্বীকার করে অভিজ্ঞতাবাদের ক্ষেত্রে যে অসঙ্গতি সম্পাদন করেছিলেন হিউমের হাতে এ অসঙ্গতির নিরসন হয়। হিউম কার্যকারণের আবশ্যিক সম্পর্ককে আরোপিত মানসিক প্রবণতা হিসাবে আখ্যায়িত করে যে আকস্মিকতাবাদী মতবাদ প্রদান করেন তা তাঁর অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যা তথা সামগ্রিক দর্শনকে ঐতিহাসিক মর্যাদা দান করে। এতে নিউটনীয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ভিত্তি আবেহনুমানের নিশ্চয়তা সম্পর্কে প্রশ্নের উদ্রেক হয় এবং আবেহ নির্ভর কার্যকারণ তথা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জ্ঞান আকস্মিক বলে পরিগণিত হয়। এ ড়াও, হিউমের জ্ঞানবিদ্যা শেষ পর্যন্ত সংশয়বাদে রূপ নেয়। এর মাধ্যমে তিনি যে দিকটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তা হল, একজন সঙ্গতিপূর্ণ অভিজ্ঞতাবাদীর পক্ষে সংশয়বাদকে এড়িয়ে যাবার উপায় নাই। তাঁর এ আকস্মিকতাবাদ আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদী তত্ত্ব দ্বারা সমর্থিত হয়। মূলত হিউম তাঁর কার্যকারণ সংক্রান্ত মতবাদের মাধ্যমে অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের জন্য একটি নতুন ধারার সূচনা করেন এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ রেখে যান। হিউমের আত্মা সম্পর্কিত পুঞ্জবাদের সাথে চার্বাকদের দেহাত্মবাদের মিল থাকলেও কার্যকারণ সম্পর্কিত আকস্মিকতাবাদের সাথে চার্বাকদের কার্যকারণ খণ্ডনের যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়।

৪। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে হিউমই সম্ভবত প্রথম দার্শনিক যিনি তার সংশয়বাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে সংশয়ের বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করেন। তিনি ধারণার সম্পর্ককে নিশ্চিত জ্ঞানের বিষয় এবং তথ্যগত বিষয়কে সম্ভাব্য জ্ঞানের বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করার ফলে একদিকে জ্ঞানের জগৎ থেকে সংশয়ের জগৎ যেমন স্পষ্ট আলাদা হয় তেমনি হিউমের সংশয়বাদও পূর্ববর্তী সকল সংশয়বাদের চেয়ে যৌক্তিক তথা উন্নত রূপ লাভ করে। হিউমের ব্যাখ্যায় সংশয়বাদের ধ্বংসাত্মক রূপ বর্জিত হয় এবং সংশয়বাদ একটি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করে। তিনি একথা প্রমাণ করেন যে, তথ্যগত বিষয়ের জ্ঞানের ক্ষেত্রে একজন যৌক্তিক অনুসন্ধানকারীর সম্ভাব্যতার উপর নির্ভর করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নাই। তাঁর এ আবিষ্কার দর্শন ও বিজ্ঞানের জগতে একটি মাইল ফলক।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, হিউম যদিও আধুনিক যুগে দর্শনের একটি অতি প্রাচীন ধারা অভিজ্ঞতাবাদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তবুও তাঁর হাতে অভিজ্ঞতাবাদ একটি সুসমন্বিত ও যৌক্তিক রূপ লাভ করে। তিনি প্রত্যক্ষণ, ইন্দ্রিয়ছাপ, ধারণা ইত্যাদি অভিজ্ঞতাবাদীদের ব্যবহৃত বিভিন্ন ধারণার বিশ্লেষণ করে যেমন এগুলোর সঠিক ও সুনির্দিষ্ট অর্থ খুঁজে পাবার প্রয়াস নেন তেমনি অভিজ্ঞতাবাদ থেকে সকল প্রকার অভিজ্ঞতাবহির্ভূত ধারণাকে দৃঢ়ভাবে বর্জন করেন ও এদের অভিজ্ঞতাবাদী ব্যাখ্যা দেন। এ ছাড়াও, তিনি অভিজ্ঞতাবাদের যৌক্তিক পরিণতির প্রতিও দিক নির্দেশ করেন। এ জন্য একজন সঙ্গতিপূর্ণ অভিজ্ঞতাবাদী হিসাবে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে হিউমের নাম চিরস্মরণীয়। তাঁর মতবাদ দর্শন ও বিজ্ঞানের ভিতকে নাড়া দেয়। বিশ শতকের যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী ও উপযোগীবাদী দার্শনিক মতবাদে এবং আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদী বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে হিউমের অভিজ্ঞতাবাদী চিন্তার যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। প্রখ্যাত জ্ঞানতাত্ত্বিক জার্মান দার্শনিক কান্ট তাঁর বুদ্ধিবাদের বিচারবিযুক্ত মোহনিদ্রা থেকে মুক্তির ক্ষেত্রে হিউমের অবদানকে নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন। এ জন্য একথা বলা যায়, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে হিউমের ভূমিকা অনন্য ও উল্লেখযোগ্য।

আলোচনার অগ্রগতিতে আমরা অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের প্রখ্যাত বৃটিশ প্রতিনিধি হিসাবে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে হিউমের স্থান নির্ণয়ের প্রয়াসী হব।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৬ পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যায় হিউমের অবস্থান

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে ডেভিড হিউম একটি উল্লেখযোগ্য নাম। জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁর সমর্থিত মতবাদ বা অভিজ্ঞতাবাদ কোন নতুন মতবাদ নয়। এর ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তশত অব্দেরও পূর্বে ভারতীয় দার্শনিক চার্বাকদের হাতে সর্ব প্রথম এ মতবাদের সূচনা এবং পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে প্রাচীন যুগের দার্শনিক সোফিষ্টদের হাতে এ মতবাদের প্রাতিষ্ঠানিক গোড়াপত্তন হয়। হিউম এ মতবাদের আধুনিক যুগের প্রতিনিধি। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বিচার করলেও হিউমের পূর্বে অভিজ্ঞতাবাদের এক হাজারও বছরের বেশী সময়ের ইতিহাস পাওয়া যায়। তথাপিও একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, অভিজ্ঞতাবাদের ইতিহাসে হিউমের মতবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। কেননা, তাঁর মতবাদেই অভিজ্ঞতাবাদের সুদীর্ঘ ইতিহাস একটি চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। সতেরো শতকের দার্শনিক হিসাবে হিউম তাঁর ইতিহাস নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁর পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাবাদীদের বিচারবুদ্ধির আলোকে যাচাই করে এর ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা দেন, যার উপর তাঁর সমকার জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি দর্শনকে জ্ঞানের অন্যতম শাখা বিজ্ঞান থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করে দেখেন নি এবং বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে তাঁর মতবাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি মূলত বিজ্ঞানেরও দার্শনিকীকরণ করেন। তাই, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যায় হিউমের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য তাঁর দর্শনচর্চার প্রেক্ষাপট এবং তাঁর কালকে বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন।

হিউমের কালের উপর প্রধানত পূর্ববর্তী চারটি চিন্তাধারার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দর্শনের ইতিহাসে প্রাচীনকালে প্লেটো, এরিস্টটল এবং মধ্যযুগে সেন্ট অগাষ্টিন সমর্থিত বুদ্ধিবাদী যে ধারার পরিচয় পাওয়া যায় রেনেসাঁ পরবর্তী দর্শনের ইতিহাসে সে ধারা একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করে। রেনেসাঁ পরবর্তী সময়ে এ ধারার সমর্থকদের মধ্যে হবস, দেকার্ত, লাইবনিজ, স্পিনোজা, প্রমুখ দার্শনিক উল্লেখযোগ্য। এসব দার্শনিক অবরোহ পদ্ধতির সমর্থক ছিলেন। তাঁরাই প্রথম দর্শনে সুষ্ঠুভাবে অবরোহ পদ্ধতির প্রয়োগ করেন এবং প্রধানত ঈশ্বর, আত্মা, বিশ্বজগৎ ইত্যাদি বিষয়কে স্বতসিদ্ধ হিসাবে গ্রহণ করে এ থেকে অবরোহাত্মকভাবে বিশেষ ঘটনার সত্যতা যাচাই করেন। এদের সকলেই জ্ঞানোৎপত্তির উপায় হিসাবে অভিজ্ঞতার অবদানকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে অভিজ্ঞতাপূর্ব বুদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বুদ্ধিবাদকে জ্ঞানোৎপত্তির একমাত্র মতবাদ হিসাবে স্বীকৃতি দেন।

হিউমের কালের উপর দ্বিতীয় যে চিন্তাধারার প্রভাব ছিল তা হল অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক ধারা। প্রাচীন যুগের সোফিষ্ট–এপিকিউরিয়াস–জেনো– এবং মধ্যযুগে সেন্ট থমাস একুইনাস সমর্থিত অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যাগত ধারা রেনেসাঁ পরবর্তী বিজ্ঞান বিপ্লবের প্রভাবে আধুনিক বৃটিশ দর্শনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করে। আধুনিক দর্শনে প্রধানত বেকন, লক ও বার্কলে এ ধারার অন্যতম সমর্থক। এসব দার্শনিক বুদ্ধিবাদীদের সমর্থিত মতবাদ খণ্ডন করে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভাবে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবরোহাত্মক পদ্ধতির স্থলে আরোহ পদ্ধতির প্রচলন করেন। তাঁরা জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে আরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে বিশেষ থেকে সার্বিক জ্ঞানলাভ সম্ভব বলে দাবী করেন। ফলে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাপূর্ব উপাদানের গুরুত্ব অস্বীকৃত হয়।

হিউম পূর্ববর্তী দর্শনের ইতিহাসে তৃতীয় যে প্রভাবশালী দার্শনিক ধারা লক্ষ্য করা যায় তাহল সংশয়বাদ। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের গ্রীক দার্শনিক পাইরোর হাতে দার্শনিক পদ্ধতি হিসাবে সংশয়বাদ প্রথম পূর্ণাঙ্গ রূপলাভ করে। হিরাক্লিটাস থেকে শুরু করে সক্রেটিস পর্যন্ত যেসব দার্শনিকের মতবাদে সংশয়বাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায় পাইরোর সংশয়বাদেই এর পূর্ণাঙ্গ আত্মপ্রকাশ ঘটে। অতপর টাইমন–আর্কেসিলাস–কার্নিয়াডিস–এনাসিডেমাস এবং সেক্সটাস এম্পিরিকাসের চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে এ ধারাটি প্রবাহিত হয়। মধ্যযুগে সেন্ট অগাষ্টিন ও উইলিয়াম অব অকাম এ ধারার প্রতিনিধিত্ব করেন। রেনেসাঁ যুগের বিখ্যাত খ্রিষ্টান চিন্তাবিদ ইরাসমাস এবং মার্টিন লুথারের ধর্মীয় বিতর্কে খ্রিষ্টীয় সংশয়বাদের পুনর্জাগরণ ঘটে। ষোল শতকে ফ্রান্সে মাইকেল ডি, মন্টেইন, পাইরে সারণ, সতেরো শতকে পেরী গেসেণ্ডি, রেনে দেকার্ত এবং পিয়ারে বাইল এ ধারাটির অন্যতম ধারক। অবশ্য দেকার্তের সংশয়বাদ যদিও সিদ্ধান্তগত সংশয়বাদে রূপলাভ করেনি তবুও তাঁর সমর্থক পিয়ারে বাইল সংশয়বাদের একজন জোর সমর্থক হিসাবে প্রতিভাত হন। উল্লেখ্য যে, বাইল ছিলেন হিউমের একজন প্রিয় লেখক।[১৬৩]

Dhaka University Institutional Repository

হিউমের যুগের উপর প্রভাব বিস্তারকারী অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নবজাগরণ। যে সব বিজ্ঞানীর অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগ বিজ্ঞানের নবজাগরণ সূচিত করে তাঁদের মধ্যে কোপার্নিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও এবং নিউটন উল্লেখযোগ্য। এ সব বিজ্ঞানীর উল্লেখযোগ্য অবদানের ফলেই মধ্যযুগীয় ধর্মীয় প্রাধিকারবাদ থেকে দর্শন মুক্তিলাভ করতে সমর্থ হয় এবং দর্শনে ব্যক্তিমানুষের পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানলব্ধ জ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকৃতি পায়। এ সময়ের অনেক দার্শনিক জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে শুরু করেন।[১৬৪] নিউটনের প্রভাব ছিল এ যুগের উপর অত্যন্ত গভীর। তিনি প্রাকৃতিক জগৎ থেকে অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে আরোহাত্মক পদ্ধতিতে সত্যতা নিরূপণের অনুসারী ছিলেন। তাঁর এ পদ্ধতিকে লক, বার্কলে প্রমুখ অভিজ্ঞতাবাদী প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, নিউটনের তত্ত্ব যখন এডেনবার্গে পড়ানো হয় তখন হিউম ছিলেন সেখানকার ছাত্র।

উপরের আলোচানা থেকে একথা বলা যায় যে, বুদ্ধিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, সংশয়বাদ ও নিউটনীয় বিজ্ঞান-–এ চারটি চিন্তাধারার উপস্থিতি হিউমের দর্শনের প্রেক্ষাপট নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। হিউম বুদ্ধিবাদী ধারাটিকে বর্জন করে অভিজ্ঞতাবদী ধারার প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ অভিজ্ঞতাবাদের ক্ষেত্রে যেসব ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পাদন করেছিলেন হিউম তা থেকে অভিজ্ঞতাবাদকে মুক্ত করতে প্রয়াসী হন। এর ফলে, শেষ পর্যন্ত তাঁর হাতে অভিজ্ঞতাবাদের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে সংশয়বাদে। তবে, তাঁর এ সংশয়বাদ পাইরোবাদী সংশয়বাদ বা চূড়ান্ত সংশয়বাদ ছিল না। বরং তাঁর সংশয়বাদ গঠনমূলক, জীবনধর্মী ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত হয়। তাঁর মতবাদের আগাগোড়াই তিনি নিউটনীয় বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিকে একমাত্র পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি মূলত যে কাজটি করতে প্রয়াসী হন তা হল, বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদের উপর নিউটনের অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করে মানব মনের চিন্তার ক্ষমতা ও সূত্রাবলী আবিষ্কার করা। নিউটন যেমন পদার্থবিজ্ঞানে সকল প্রকার প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য প্রাকৃতিক জগতে একমাত্র কেন্দ্রীয় নিয়ম মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেন হিউমও তেমনি মানব-প্রকৃতি-বিজ্ঞানে তথা মানব মনের চিন্তার ক্ষমতা ও সূত্রাবলী ব্যাখ্যার লক্ষ্যে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ম আবিষ্কার করতে আগ্রহী হন, যে নিয়মটি হবে বিজ্ঞানের মত বিশুদ্ধ পরীক্ষণাত্মক এবং যার কষ্টিপাথরে বুদ্ধিবাদী অধিবিদ্যার প্রবন্ধগুলো যাচাই করা যায়। তাঁর আবিস্কৃত এই নিয়মটিই হল তাঁর ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণাতত্ত্ব। এর মূল কথা হল, প্রতিটি সরল ধারণাই সরল ইন্দ্রিয়ছাপের অনুলিপি। তিনি নিজেই একে মানব প্রকৃতি বিজ্ঞানের প্রথম সূত্র বলেছেন। দর্শনের ইতিহাসে তাঁর সূত্রকে হিউমের অনুবীক্ষণ, হিউমের ক্ষুর, হিউমের কাটাচামচ ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়।[১৬৫]

হিউমপূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাবাদের প্রেক্ষিতে হিউমের অভিজ্ঞতাবাদের বিশেষত্ব নির্ণয় করতে হলে উপরোক্ত সূত্রটির আবিষ্কারকে একটি অন্যতম আবিষ্কার হিসাবে গণ্য করা যায়। কেননা, এ সূত্রের সাহায্যেই তিনি তাঁর পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদ থেকে সকল অসঙ্গতিপূর্ণ উপাদান বর্জনে সক্ষম হয়েছেন.

ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণাতত্ত্বের দ্বারা তিনি তিনদিক থেকে পূর্ববর্তী লক ও বার্কলের অভিজ্ঞতাবাদের উন্নতি সাধন করেন। প্রথমত, শব্দগত দিক থেকে। লকের ব্যবহৃত সংবেদন ও অন্তর্দর্শন শব্দ দু'টিকে তিনি ইন্দ্রিয়ছাপ নামে অভিহিত করেন এবং ধারণা শব্দটিকে প্রতিরূপ অর্থে গ্রহণ করেন। হিউমের হাতেই ধারণা শব্দটি একটি সঠিক ও নির্দিষ্ট অর্থ লাভ করে। দ্বিতীয়ত, ধারণাকে ইন্দ্রিয়ছাপের উপর নির্ভরশীল করে তিনি সুষ্ঠুভাবে বুদ্ধির বিষয়কে অভিজ্ঞতার অনুবর্তী করেন, যা লক, বার্কলের দর্শনে এত সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে নি। তৃতীয়ত, তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে তাঁর, ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণাতত্ত্বের অবস্থান নেন। লক বার্কলে উভয়ই অভিজ্ঞতাবাদী হওয়া সত্ত্বেও আধিবিদ্যক ধারণাগুলোকে স্বীকার করে চূড়ান্ত পর্যায়ে অভিজ্ঞতাবাদ থেকে সরে গিয়েছিলেন, যা হিউমের ক্ষেত্রে ঘটে নি।

হিউমের অভিজ্ঞতাবাদকে মাত্র দু'টি বচনে সংক্ষেপিত করা যায়। যথা, (১) সকল ধারণাই ইন্দ্রিয়ছাপের অনুলিপি, এবং (২) বস্তুর তথ্যকে কখনোই প্রাকসিদ্ধ উপায়ে প্রমাণ করা যায় না একে অবশ্যই অভিজ্ঞতা থেকে আবিষ্কার বা অনুমান করতে হয়। এ দু'টি বচন থেকে প্রমাণিত হয় যে, আধিবিদ্যক শব্দসমূহ, যা ঈশ্বর, আদি কারণ, অতীন্দ্রিয় সত্তা ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান দেয় তা অর্থহীন। এমন কি, যদিও এগুলো থেকে থাকে তবুও এদেরকে যথার্থ বলে প্রমাণ করা যায় না এর ফলে, প্লেটো থেকে শুরু করে দেকার্ত পর্যন্ত বুদ্ধিবাদীদের দ্বারা স্বীকৃত তত্ত্ববিদ্যাগত ধারণা বর্জিত হয়। পরবর্তীতে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের অধিবিদ্যার অর্থহীনতা প্রতিপাদন সম্পর্কিত মতবাদে হিউমের এ ধারণারই অনুরণন শোনা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানের বিষয়কে ধারণার সম্পর্ক ও বস্তুর বিষয়---এ দু'ভাগে বিভক্ত করে হিউম দর্শনের ইতিহাসে প্রথম বারের মত বুদ্ধিজাত জ্ঞান থেকে অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞানকে স্পষ্টভাবে আলাদা করেন। এ বিষয়টি তাঁর জ্ঞানবিদ্যাকে অভূতপূর্ব মর্যাদা দান করে। তিনি ধারণার সম্বন্ধকে নিশ্চিত এবং বস্তুর তথ্যকে সম্ভাব্য হিসাবে চিহ্নিত করেন। এ থেকে তাঁর দর্শনের যে দু'টি বিশেষ দিক পাওয়া যায় তা হল, (১) কার্যকারণের আবশ্যিক সম্পর্কের প্রকৃতি সম্পর্কিত বিশেষত্ব এবং (২) অস্তিত্বমূলক বচন সম্পর্কিত বিশেষত্ব।

কার্যকারণের ক্ষেত্রে তাঁর আবিষ্কার হল কার্যকারণের মধ্যকার সম্পর্ককে কোনভাবেই বাস্তব তথ্যের অভিজ্ঞতা দ্বারা আবিষ্কার সম্ভব নয়। তাই এ সম্পর্ক সম্ভাব্য। হিউমের এই আবিষ্কার কার্যকারণ সম্পর্কের নিশ্চিতি সম্পর্কিত পূর্ববর্তী বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের, এমনকি অভিজ্ঞতাবাদী লক ও বার্কলের মতবাদকে খণ্ডন করে। এ ছাড়া, এ মতবাদ প্রভাব সৃষ্টিকারী সমকালীন নিউটনীয় বৈজ্ঞানিক সূত্রকেও চ্যালেঞ্জ করে। কারণ, নিউটনীয় বিজ্ঞানের আরোহাত্মক পদ্ধতি ছিল কার্যকারণের আবশ্যিকতা নির্ভর। নিউটন কার্যকারণ নির্ভর আরোহ পদ্ধতিতে নিশ্চিত জ্ঞান পাওয়া যায় বলে মনে করতেন।

অন্যদিকে, অস্তিত্বমূলক বচন সম্পর্কে তাঁর আবিষ্কার হল, প্রতিটি অস্তিত্বমূলক বচনই তথ্যগত বিষয় সম্পর্কিত। এর সত্যতা অবশ্যই অভিজ্ঞতার যাচাইযোগ্য হবে। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্বসহ অন্যান্য অধিবিদ্যক সত্তার অস্তিত্বের ধারণা প্রাকসিদ্ধ পদ্ধতিতেপ্রমাণিতনয়।[১৬৬] ফলে, তাঁর হাতে অধিবিদ্যা অত্যন্ত সহজভাবে বর্জিত হয়।

হিউমের ধারণার সম্বন্ধ ও তথ্যগত বিষয়ের এই পৃথিকীকরণই তাঁর হাতে সংশয়বাদের এমন এক অস্ত্র তুলে দেয় যা দ্বারা তিনি সংখ্যা ও পরিমাণ সম্পর্কিত বিমূর্ত চিন্তন এবং বস্তুর বিষয় সম্পর্কিত পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান ছাড়া অন্য সব কিছুকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে বলে অধিবিদ্যাকে বর্জন করতে সমর্থ হন, যা লক ও বার্কলের দ্বারা সম্ভব হয় নি। পরবর্তীকালের দার্শনিক মতবাদে সংশ্লেষণী ও বিশ্লেষণী, অভিজ্ঞতাপূর্ব ও অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণার মধ্যে পার্থক্যকরণের যে শক্তিশালী ধারাটি গড়ে উঠে তা হিউমের মতবাদেরইস্বীকৃতি।

এই পার্থক্যকরণের ফলে হিউমের সংশয়বাদ পাইরোবাদী সংশয়বাদের চেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করে। হিউম কার্যকারণ নির্ভর আরোহের মাধ্যমে সার্বিক জ্ঞানলাভ অসম্ভব বলে ঘোষণা করে তথ্যগত বচনের জগতকে সম্ভাব্য জগতে পরিণত করেন। তিনি নিশ্চিতিকে শুধু ধারণার সম্বন্ধ অর্থাৎ গণিত ও যুক্তিবিদ্যার জগতে স্থান দেন। এতে অভিজ্ঞতালব্ধ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্ভাব্য হয়ে পড়ে। ফলত, তাঁর অভিজ্ঞতাবাদ সংশয়বাদে পর্যবসিত হয়। কিন্তু এ সংশয়বাদ পূর্ববর্তী সংশয়বাদ থেকে আলাদা। কারণ, তা অভিজ্ঞতার জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ জন্যই তিনি এ মতবাদকে সংযত বা একাডেমিক সংশয়বাদ বলে আখ্যা দেন। সংশয়বাদকে তিনি সকল প্রকার বিচারবিযুক্তবাদ এবং অতিনিশ্চয়তাবাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। তবে সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে বা দৈনন্দিন জীবনে তিনি সংশয়বাদকে ব্যবহার করেন নি। প্রকৃতিবাদ অন্য কথায়, দৈনন্দিন জীবনের প্রকৃতিগত মনোভাবকে স্বীকার করে নিয়েই তিনি আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সংশয়বাদ থেকে রক্ষা করেছেন। আমাদের প্রকৃতিগত মনোভাব ও দৈনন্দিন বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এ সংশয়বাদ ক্ষমতাহীন। এভাবে তাঁর সংশয়বাদ হয়ে উঠেছে জীবনোপযোগী, গঠনমূলক ও বিচারমূলক।

অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যাগত ধারায় হিউম আধুনিক যুগে তাঁর মতবাদ দ্বারা যেসব প্রশ্নের উত্থাপন করেন হিউমের পরবর্তী দার্শনিক ধারার উপর এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে। তাঁর পরবর্তীকালে গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিকদের কেউই তাঁকে অবজ্ঞা করে তাঁদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন নি। পরবর্তী দার্শনিকদের মধ্যে কোন কোন দার্শনিক তাঁকে খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন, কেউ কেউ তাঁকে আংশিকভাবে গ্রহণ ও আংশিকভাবে বর্জন করেছেন, আবার কেউ কেউ তাঁর মতবাদকে প্রাধান্য দিয়েই নিজ মতবাদ প্রদান করেছেন। বস্তুতপক্ষে, হিউমের মতবাদ ছিল পরবর্তী দার্শনিকদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাঁর পরবর্তী অধ্যাত্মবাদী আলোচনায় তাঁর মতবাদকে খণ্ডনের প্রবল অথচ অনেকাংশে ব্যর্থ প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়া আধুনিক ও সাম্প্রতিককালের গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক মতবাদসমূহে, যেমন, বিচারবাদ, উনিশ ও বিশ শতকের অভিজ্ঞতাবাদ, প্রয়োগবাদ, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ, উপযোগবাদ, রূপতত্ত্ব বা অবভাসবাদ এবং বিশ্লেষণী দর্শনের উপর হিউমের গভীর এবং অনুপেক্ষণীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[১৬৭] এ প্রভাব দর্শনের ইতিহাসে আরও বিশেষভাবে বললে, জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে হিউমকে একটি মাইল ফলক হিসাবে চিহ্নিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী

১। F. Thilly : *A History of Philosophy*, Allahabad, Central Book Depot, 1978, পৃ ৩৬৯

২। পরবর্তীতে এ দুই গ্রন্থের নাম সংক্ষেপে যথাক্রমে *Treatise*, ও *Enquiry*, বলে উল্লেখ করা হবে।

৩। Norman Kemp Smith : *The Philosophy of David Hume*, New York, St. Martin's Press, 1966, পৃ ১০৫

৪। David Hume : *A Treatise of Human Nature*, ed. by L. A. Selby-Bigge, Oxford, At the Clarendon Press, 1978, পৃ ১ অনূদিত, আবু তাহা হাফিজুর রহমানঃ মানব প্রকৃতির স্বরূপ অন্বেষা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮১, পৃ ৩

৫। C. R. Morris: *Locke, Berkely and Hume*, London, Oxford University Press, 1963, পৃ ১১৬

৬। David Hume: *Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ১, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ৩

৭। পূর্বোক্ত

৮। David Hume: *Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ৮–৯, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ৯–১০, তুলনীয় ঃ Hume : *Enquiry*, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৫

৯। David Hume : *An Inquiry Concerning Human Understanding*, ed. by Antony Flew, in the *Hume On Human Nature and the Understanding*, New York, Collier Books, 1962, পৃ৩৪

১০। N. K. Smith : *The Philosophy of David Hume*, পূর্বোক্ত, পৃ ১০৫

১১। David Hume : *Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ২ এর পাদটীকা। অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ৪ এর পাদটীকা

১২। সাইয়েদ আবদুল হাই ঃ *দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা কোষ*, ১ম খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮, পৃ৩৩৫

১৩। John Locke : *Essay Concerning Human Understanding* , Collected and annotated by A. C. Fraser, Vol. I, New York, Dover Publication, 1959, পৃ৩২

১৪। Barry Stroud : *Hume*, London, Routledge and Kegan Paul, 1977, পৃ১৭

১৫। David Hume : *Enquiry*, পূর্বোক্ত, পৃ৩৩

১৬। পূর্বোক্ত, পৃ৩৪

১৭। David Hume : *Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ২, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ৪

১৮। পূর্বোক্ত, পৃ ৩, অনুবাদ, পূর্বোক্ত

১৯। পূর্বোক্ত

২০। পূর্বোক্ত, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ৫

২১। পূর্বোক্ত

২২। পূর্বোক্ত

২৩। পূর্বোক্ত, পৃ ৬–৭, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ৭–৮

২৪। David Hume : *Enquiry*, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৬–৩৭

২৫। David Hume :*Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ৩, অনুবাদ, পৃ ৫

২৬। David Hume : *Enquiry*, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৫

২৭। পূর্বোক্ত

২৮। David Hume : *Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ৫, অনুবাদ, পৃ ৬

২৯। ব্যতিক্রমটি হল, কোন ব্যক্তির সামনে যদি নীল রং-এর বিভিন্ন মাত্রাকে খুব গভীর থেকে ক্রমশ ফিকে হয়ে আসা ক্রম অনুসারে সাজানো হয় এবং এ ক্রম থেকে এমন একটি মাত্রাকে অনুপস্থিত রাখা হয় যে, মাত্রাটির কোন ইন্দ্রিয়ছাপ ঐ ব্যক্তির কখনও ছিল না তবে এমন অবস্থায়ও সে ব্যক্তি অনুপস্থিত মাত্রাটির ফাঁকটি বুঝতে সক্ষম হবেন। এবং কল্পনায় সে ফাঁকটি পূরণের জন্য নীল রং-এর অনুপস্থিত মাত্রাটিরও ধারণা করতে পারবেন এ ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ছাপ ছাড়াই ধারণা উৎপন্ন হওয়ার উদাহরণ পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৩০। David Hume : *Enquiry*, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৬

৩১। David Hume : *Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ৬-৭, অনুবাদ, পৃ ৭-৮

৩২। D. G. C. Macnabb : *David Hume : His Theory of Knowledge and Morality*, London, Hutchinson Houses, 1951, পৃ ২৯-৩০

৩৩। David Hume : *Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ৫, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ৬

৩৪। David Hume : *Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ২৭৫

৩৫। পূর্বোক্ত, পৃ ৭, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ৮

৩৬। পূর্বোক্ত, পৃ ২৭৫

৩৭। পূর্বোক্ত, পৃ ২৭৫-২৭৬

৩৮। পূর্বোক্ত, পৃ ২৭৫

৩৯। পূর্বোক্ত, পৃ ৭-৮, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ৮-৯

৪০। আমিনুল ইসলাম : আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৮৪, পৃ ২১৭

৪১। David Hume : *Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ২৭৬

৪২। পূর্বোক্ত

৪৩। N. K. Smith : *The Philosoplhy of*, পূর্বোক্ত, পৃ ১০৬ এর ছক দ্রষ্টব্য

৪৪। David Hume : *Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ২৭৬-২৭৭

৪৫। পূর্বোক্ত, পৃ ৮-৯

৪৬। পূর্বোক্ত, পৃ ২

৪৭। পূর্বোক্ত, পৃ ২৭৭, ৩২৯

৪৮। পূর্বোক্ত, পৃ ১৩, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ১৪

৪৯। পূর্বোক্ত, পৃ ১, অনুবাদ, পৃ ৩

৫০। পূর্বোক্ত, পৃ ২, অনুবাদ, পৃ ৪

৫১। David Hume : *Enquiry*, পূর্বোক্ত, Sec. II Para, 12.

৫২। পূর্বোক্ত, পৃ ৩২

৫৩। পূর্বোক্ত, পৃ ৩৩

৫৪। David Hume :*Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ৩, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ৫

৫৫। David Hume : *Enquiry*, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৩-৩৪

৫৬। David Hume : *Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ৫, অনুবাদ পৃ ৬

৫৭। Frederick Copleston : *A History of Philosoplhy*, Vol. V, London, Burns and Oates Ltd. 1964, পৃ ২৬৫-২৬৬

৫৮। David Hume : *Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ৪, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ৫

৫৯। পূর্বোক্ত, পৃ ৫, অনুবাদ, পৃ ৬

৬০। পূর্বোক্ত, পৃ ৯, অনুবাদ, পৃ ১০

৬১। পূর্বোক্ত, পৃ ৮৫, অনুবাদ, পৃ ৪৬

৬২। Barry Stroud : *Hume*, পূর্বোক্ত, পৃ ২২

৬৩। David Hume : *Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ৭, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ৮

৬৪। D. G. C. Macnabb : *David Hume*, পূর্বোক্ত, পৃ ৩২

৬৫। David Hume : *Enquiry*, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৭

৬৬। পূর্বোক্ত

৬৭। পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৬৮। B. Russell : *History of Western Philosophy* , London, George Allen and Unwin Ltd., 1965, পৃ ৬৩৪

৬৯। R. Ackermann : *Theories of Knowledge*, Bombay, Tata Mc Graw-Hill Publishing Co. Ltd., 1965, পৃ ১৭৯

৭০। David Hume : *Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ১১, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, ১২ এবং *Enquiry*, পূর্বোক্ত, পৃ৩৮

৭১। David Hume : *Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ, ২৮৩

৭২। পূর্বোক্ত

৭৩। David Hume : *Enquiry*, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৬

৭৪। David Hume : *Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ১০

৭৫। আমিনুল ইসলাম: আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮০, পৃ ২১৯

৭৬। A. N. Basson : *David Hume*, পূর্বোক্ত, পৃ ৫০

৭৭। N. K. Smith : *The Philosophy of*, পূর্বোক্ত, পৃ ২৩৯

৭৮। G. R. Morris : *Locke, Berkeley and Hume*, পূর্বোক্ত, পৃ ১২৩

৭৯। R. Ackermann : *Theories of Knowledge*, পূর্বোক্ত, পৃ ১৮০

৮০। C. R. Morris : *Locke, Berkeley and Hume*, পূর্বোক্ত

৮১। R. Ackermann : *Theories of Knoledge* , পূর্বোক্ত

৮২। C. R. Morries : *Locke, Berkeley and Hume*, পূর্বোক্ত

৮৩। R. Ackermann : *Theories of Knowledge*, পূর্বোক্ত , পৃ ১৮১

৮৪। C. R. Morris : *Locke, Berkeley and Hume*, পূর্বোক্ত, পৃ১২৪

৮৫। Hume : *Treatise*, পূর্বোক্ত, ১২-১৩ অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ১৩

৮৬। পূর্বোক্ত

৮৭। David Hume : *Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ১৬, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ১৭

৮৮। পূর্বোক্ত, পৃ ২৪৩, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ১৮৬

৮৯। পূর্বোক্ত, পৃ ২৫১, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ২০২

৯০। দেখুন, পূর্বোক্ত, পৃ ২৫১-২৫৩, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ২০২-২০৪

৯১। C. D. Broad : *The Mind and it's Place in Nature*, পৃ ২৭৯, উদ্ধৃত, Akhter Imam: *David Hume on the Nature of the Self*, Dhaka, 3 Shegun Bagicha, 1976, পৃ ৪১

৯২। David Hume : *Treatise*, পৃ ২৫৩, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ২০৩-২০৪

৯৩। সূত্র দুটি হল: 1. Whatever is clearly conceiv'd may exist; and whatever is clearly conceive'd, after any manner, may exist after the same manner.

2. ... every thing, which is different, is distinguishable, and every thing which is distinguishable, is separable by the imagination. দ্রষ্টব্য, *Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ২৩৩

৯৪। David Hume: *Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ২৩৩, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ১৮৫-১৮৬

৯৫। পূর্বোক্ত, পৃ ২৫২, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ২০৩

৯৬। পূর্বোক্ত, পৃ ২৫০, অনুবাদ, পূর্বোক্ত পৃ ২০০

৯৭। পূর্বোক্ত, পৃ ২৫২, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ২০৩

৯৮। পূর্বোক্ত

৯৯। B. Russell : *An Outline of Philosophy*, New York, The World Publishing Company, 1967 পৃ ২৯৬

Dhaka University Institutional Repository

১০০। B. Russell : *The Philosophy of Logical Atomism*, in the *Logic and Knowledge : Essays*, ed. by. R. C. March, London, 1956, পৃ ২৯৯

১০১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, কালী প্রসন্ন দাসঃ "আত্ম সম্পর্কে হিউম ও বুদ্ধঃ একটি তুলনামূলক আলোচনা", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অক্টোবর, ১৯৮৮, পৃ ২৪৩-২৪৫

১০২। David Hume : *Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ২৬০, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ২১০

১০৩। Berry Stroud : *Hume*, London, Routledge and Kegan Paul, 1977, পৃ ১২০

১০৪। N. K. Smith : *The Philosophy of David Hume*, পূর্বোক্ত, পৃ ৫০১

১০৫। John Laird: *Hume's Philosophy of Human Nature*, London, Archon Books, 1967 পৃ ২৫৯ ও ২৬০

১০৬। David Hume : *Treatise*, পূর্বোক্ত, ২৬২, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ২১৩

১০৭। পূর্বোক্ত, পৃ ২৬১-২৬২

১০৮। দ্রষ্টব্যঃ H. P. Grice : "Personal Identity", *Mind*, (1951) পৃ ৩৪৬ B. Russell : "On the Nature of Aquaintance", In the *Logic and Knowledge*, পূর্বোক্ত, পৃ ১৩৮, ১৪২, A. J. Ayer : *The Foundation of Empirical Knowledge*, London, 1951, পৃ, ১৪২

১০৯। B. Russell : *History*, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৮৩

১১০। V. C. Chappell (ed.) : *David Hume*, London, Macmillan Publising Co. Ltd., 1968, পৃ ১২৯

১১১। David Hume: *Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ৭৪-৭৫, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৫-৩৬ এবং *Enquiry*, পূর্বোক্ত, পৃ ৭৮

১১২। David Hume : *Enquiry*, পূর্বোক্ত, পৃ ৭৮

১১৩। David Hume : *Enquiry*, পূর্বোক্ত, পৃ ৭৯, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ৪০

১১৪। David Hume : *Enquiry*, পূর্বোক্ত, পৃ ৫৫৭

১১৫। A. J. Ayer : *The Central Questions of Philosophy*, New Delhi, The Macmillan Co. of India Ltd., 1979, পৃ ১৩৮

১১৬। Stephen F. Barker : *The Elements of Logic*, McGraw--Hill International Edition, 1965, 5th ed., পৃ ২৪৮

১১৭। David Hume: *Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ১৬০, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ১১৭

১১৮। উপলব্ধবাদ জ্ঞানের উৎস এবং ঐন্দ্রিক ক্রিয়ায় মন ও বস্তুর সম্পর্ক বিষয়ক মতবাদ। এ মতবাদ অনুসারে মন ও বস্তুর মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। তবে এদের মধ্যে সাময়িক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ সম্পর্ক পূর্ব থেকেই ঐশী শক্তিদ্বারা নির্ধারিত। মধ্যযুগীয় মুসলিম দার্শনিক আল গাজ্জালীও উপলব্ধবাদের কার্যকারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন।

১১৯। David Hume : *Enquiry*, পূর্বোক্ত, পৃ ৮৫-৮৬

১২০। David Hume :*Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ১৬১, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ১১৮

১২১। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, কালী প্রসন্ন দাসঃ "কার্যকারণ প্রসঙ্গে হিউম" *দর্শন ও প্রগতি*, ৫ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, গোবিন্দদেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন-ডিসেম্বর, ১৯৮৯, পৃ ৭০-৭২

১২২। David Hume : *Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ৮৯, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ৫০

১২৩। David Hume : *Enquiry*, পূর্বোক্ত, পৃ ৮৮

১২৪। David Hume : *Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ১৬৫, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ১২১-১২২

১২৫। পূর্বোক্ত, অনুবাদ, পৃ ১২২

১২৬। পূর্বোক্ত

১২৭। David Hume : *Enquiry*, পূর্বোক্ত, পৃ ৬১

১২৮। Barry Stroud : *Hume*, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৯

১২৯। David Hume : *Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ১৯৮, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

১৩০। David Hume : *Enquiry*, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৪

১৩১। F. Copleston : *A History of Philosophy*, Vol. V, পূর্বোক্ত, পৃ ২৭৫-২৭৬

১৩২। David Hume : *Enquiry*, পূর্বোক্ত, পৃ ৫০

১৩৩। B. Russell : *History*, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৩৪

১৩৪। দার্শনিক ও প্রাকৃতিক সম্বন্ধের জন্য দ্রষ্টব্য: যথাক্রমে *Treatise*, ১ম খণ্ড, ১ম অধ্যায়, ৫ম পরিচ্ছেদ এবং *Treatise*, ১ম খণ্ড, ১ম অধ্যায়, ৪র্থ পরিচ্ছেদ

১৩৫। C. R. Morris : *Locke, Berkeley and Hume*, পূর্বোক্ত, পৃ ১২৫

১৩৬। B. Russell : *History*, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৩৪

১৩৭। পূর্বোক্ত, পৃ ৬৪৭ এবং ৪৮১

১৩৮। C. R. Morris : *Locke, Berkeley and Hume*, পূর্বোক্ত, পৃ ২০-২১

১৩৯। David Hume : *Enquiry*, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৭

১৪০। পূর্বোক্ত। উল্লেখ্য যে, জন লকও স্বজ্ঞামূলক, প্রতিপাদনমূলক ও সংবেদনমূলক – এ তিন প্রকার জ্ঞানের কথা বলেন। হিউম অবশ্য তাঁর *Treatise*, গ্রন্থে গণিতের প্রমাণমূলক নিশ্চয়তা যে আছে তা স্বীকার করেন নি এবং এপ্রসঙ্গে লকের মতবাদকে তিনি সমালোচনা করেছেন। যদিও *Enquiry*, গ্রন্থে তিনি গণিতের প্রমাণমূলক নিশ্চয়তার কথা বলেছেন। তুলনীয়, *Teatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ৭০, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ৩১

১৪১। F. Copleston : *History*, পূর্বোক্ত, পৃ ২৭৪

১৪২। হিউম *Treatise*, গ্রন্থে জ্যামিতিকে সঠিকতা ও যথার্থতার দিক থেকে ইন্দ্রিয় ও কল্পনার বিশৃঙ্খল বিচারের চেয়ে উত্তম মনে করলেও এদেরকে একেবারে সঠিক ও নির্ভুল বলেন নি। কারণ এর মৌলিক সূত্রগুলো দর্শিত বস্তুর সাধারণ বাহ্যরূপ থেকে গ্রহণ করতে হয়। আর বাহ্যরূপ কখনও নিশ্চয়তা দিতে পারে না এজন্য যে, এতে চোখ ও কল্পনার সাহায্যে দর্শিত বস্তু বা ধারণাগুলোর মাঝে তুলনা করার যে নির্ভুলতা আছে এর চেয়ে বেশী নির্ভুলতা কখনও পাওয়া যায় না। অর্থাৎ বিমূর্ত ধারণা থেকে যে নিশ্চয়তা আসে তা জ্যামিতিতে নাই। কিন্তু *Enquiry*, গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে হিউম জ্যামিতি সম্পর্কে বলেন যে, সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অবস্থিত বর্গক্ষেত্র ত্রিভুজের ওপর দু'টি বাহুর উপর অবস্থিত বর্গক্ষেত্রের সমান-- এ বচনটি চিত্রগুলোর মধ্যে এক [illegible] করে এবং শুধু চিন্তন প্রক্রিয়ার দ্বারাই অর্থাৎ অভিজ্ঞতার সাহায্য ছাড়াই এসব বচনকে আবিষ্কার করা যায়।

[illegible]৩। Antony Flew : *Hume's Philosophy of* [illegible] London, Routledgde and Kegan Paul, 1961, পৃ ৫৪

১৪৪। N. K. Smith : *The Philosophy of David Hume*, পূর্বোক্ত, পৃ ৯৯ -১০০

১৪৫। D. G. C. Macnabb : *David Hume*, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৬-৪৭

১৪৬। A. Flew : *Hume's Philosophy*, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৬

১৪৭। F. Copleston : *A History of Philosophy*, পূর্বোক্ত, পৃ ২৭৭

১৪৮। D. G. C. Macnabb : *David Hume*, পূর্বোক্ত, পৃ [illegible]

১৪৯। B. Russell : *History*, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৩৭

১৫০। David Hume : *Enquiry*, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৮

১৫১। David Hume : *Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ১৯৮, [illegible] পৃ ১৫৩

১৫২। David Hume : *Enquiry*, পূর্বোক্ত, পৃ [illegible]

১৫৩। T. E. Jessop : "Some Misunderstandings of Hume" in the V. C. Chappell (ed.): *Hume*, London, Macmillan Publishing Co. Ltd. 1968, পৃ ৫২

Dhaka University Institutional Repository

১৫৪। *Enquiry* গ্রন্থে প্রকাশিত হিউমের নিম্নোক্ত বক্তব্যে লকের প্রতীকবাদ ও বার্কলের আত্মগত ভাববাদ, এককথায় বাহ্যবস্তুর বিরামহীন অস্তিত্বের বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়। হিউম বলেনঃ

> কাজেই ইন্দ্রিয় প্রদত্ত প্রমাণ বা বাহ্য অস্তিত্ব সম্পর্কে অভিমতের ব্যাপারে প্রথম দার্শনিক অভিযোগ হল যে, এ ধরনের অভিমত যদি স্বাভাবিক প্রবৃত্তির (natural instinct) উপর নির্ভর করে তবে তা বিচারবুদ্ধির বিরোধী হবে এবং যদি বিচার বুদ্ধিকে এব্যাপারে টেনে আনা হয় তবে তা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরোধী হবে। এবং একই সময়ে কোন নিরপেক্ষ অনুসন্ধানকারীর কাছে এটি কোন বিচারবুদ্ধিসম্মত প্রমাণ বহন করে নিয়ে আসে না। দ্বিতীয় অভিযোগটি আরও কিছুদূর অগ্রসর হয় এবং সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ মনে অবস্থিত বস্তুতে নয়– এটা যদি বিচারবুদ্ধির একটা নীতি হয় তবে তাকে বিচারবুদ্ধির বিরোধী হিসাবে প্রমাণ করে। কারণ জড় বস্তু থেকে সব মুখ্য ও গৌণ গুণ কেড়ে নিলে বস্তুত জড়ের ধ্বংস সাধন করা হবে। জড় তখন শুধু যা থাকবে তা হল অজ্ঞাত অব্যাখ্যাত কিছু, এবং এটাই হবে আমাদের প্রত্যক্ষের কারণ। এই ধারণা এত ত্রুটিপূর্ণ যে, কোন সংশয়বাদী এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক করতে চাইবে না। *Enquiry*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫

এ ছাড়া, *Treatise* গ্রন্থেও (১ম খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়ের সবশেষে) হিউম জড় জগতের স্বাধীন অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে গিয়েবলেছেনঃ

> কার্যকারণ সম্পর্কে আমরা যখন ন্যায় করি তখন আমরা এই সিদ্ধান্ত নেই যে, শব্দ, বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধের কোন বিরামহীন অস্তিত্ব নাই। এসব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণকে আমরা যখন বাদ দেই তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিরামহীন ও স্বাধীন অস্তিত্ব বলতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। *Treatise*, পূর্বোক্ত , পৃ ২৩১, অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ ১৮৪

১৫৫। David Hume : *Enquiry*, পূর্বোক্ত, পৃ ১৫৩

১৫৬। David Hume : *Treatise*, পূর্বোক্ত, পৃ ২১১ অনুবাদ , পূর্বোক্ত পৃ ১৬৫

১৫৭। David Hume : *Enquiry*, পূর্বোক্ত, পৃ ১৫১

১৫৮। David Hume : *Treatise*, পূর্বোক্ত পৃ ১৯৭, অনুবাদ, পূর্বোক্ত পৃ ১৫২

১৫৯। পূর্বোক্ত পৃ ১৮৩

১৬০। David Hume : *Enquiry*, পূর্বোক্ত, পৃ ১৫৮

১৬১। পূর্বোক্ত, পৃ ১৫৯

১৬২। পূর্বোক্ত, পৃ ১৬১

১৬৩। Paul Edwards (ed.) : *Encyclopedia of Philosophy*. Vol. 4, New York, Macmillm Publishing Co. Inc. and Free Press. 1972, পৃ ৭৮

১৬৪। R. Ackermann : *Theories of Knowledge*, পূর্বোক্ত, পৃ ১৩৯

১৬৫। Paul Edwards (ed.) : *Encyclopedia*. পূর্বোক্ত, পৃ ৯৪ এবং D. J. O'Connor (ed.): *A Critical History of Western Philosophy*, London, The Free Press, 1965, পৃ ২৫৮

১৬৬। হিউমের *Enquiry* গ্রন্থের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি নির্দেশিত হয়।

১৬৭। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য উপসংহার দ্রষ্টব্য

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

চার্বাক ও হিউমের জ্ঞানবিদ্যার তুলনামূলক সমীক্ষা

এ অধ্যায়ে আমরা চার্বাক ও হিউমের জ্ঞানবিদ্যার তুলনামূলক সমীক্ষায় প্রয়াসী হব। চার্বাক ও হিউমের জ্ঞানবিদ্যার মধ্যে যেসব বিষয়ে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে তা নির্ণয় করার মাধ্যমেই উভয় জ্ঞানবিদ্যার তুলনামূলক সমীক্ষার চেষ্টা করা হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইতিপূর্বে আমরা প্রথম অধ্যায়ে ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা, তৃতীয় অধ্যায়ে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা এবং চতুর্থ অধ্যায়ে হিউমের জ্ঞানবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করেছি। বর্তমান অধ্যায়ের তুলনামূলক সমীক্ষার ক্ষেত্রে প্রধানত দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনার উপরই নির্ভর করা হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে চার্বাক ও হিউমের জ্ঞানবিদ্যার আলোচনাকালে মূলত তাঁদের প্রমাণতত্ত্ব বা জ্ঞানোৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তবে, তাঁদের প্রমাণতত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় যেমন, দ্রব্য, আত্মা, কার্যকারণ ইত্যাদিও আলোচনায় স্থান পেয়েছে। এ অধ্যায়ে উক্ত আলোচনার প্রাসঙ্গিক অংশের সারসংক্ষেপের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে উভয় জ্ঞানবিদ্যার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যমূলক বিষয়গুলো নির্ণয় করার চেষ্টা করা হবে।

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাস আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, যদিও ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে কালের দিক থেকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসের চেয়ে অনেক প্রাচীন তবুও ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে প্রচলিত নয়টি দার্শনিক সম্প্রদায়ের নিকট জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা একটি সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার গুরুত্ব তেমন লক্ষণীয় নয়। পরবর্তীকালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে আধুনিক যুগ থেকেই পাশ্চাত্যে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব পায় এবং আধুনিক দর্শন বলতে মূলত জ্ঞানবিদ্যাকেন্দ্রিক দর্শনকেই বুঝানো হয়। অন্যদিকে, প্রায় সকল ভারতীয় দার্শনিকই সত্তার প্রকৃতি এবং সত্তার জ্ঞানের সম্ভাব্যতা প্রত্যাদেশিত গ্রন্থের উপর নির্ভর করে বলে মনে করেছেন। সুতরাং তাঁদের কাছে শুধুমাত্র প্রমাণ বা জ্ঞানের উৎস সম্পর্কিত আলোচনাই হয়ে পড়ে জ্ঞানবিদ্যার কাজ। তাই ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় দার্শনিকগণ অন্যান্য বিষয়গুলোর পরিবর্তে প্রমাণ বা জ্ঞানের উৎস সম্পর্কিত আলোচনার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে জ্ঞানের উৎস সম্পর্কিত প্রশ্নটি সকল দার্শনিকের কাছে এতবেশী গুরুত্ব পায় নি।

ভারতীয় দার্শনিকদের সকলেই যদিও জ্ঞানের উৎস সম্পর্কিত মতবাদের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন তবুও পাশ্চাত্য দার্শনিকদের যেমন বুদ্ধিবাদী, অভিজ্ঞতাবাদী, বিচারবাদী ও স্বজ্ঞাবাদী এই চারটি দলে স্পষ্টভাবে বিভক্ত করা যায় ভারতীয় দার্শনিকদের ক্ষেত্রে এটা সেভাবে সম্ভব নয়। কারণ, চার্বাক ব্যতীত অন্য সকল ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ই প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করেছেন। এদিক থেকে বিচার করে জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে ভারতীয় দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে বেশী বিচারমূলক বলে মনে হয়। কেননা, কান্ট তাঁর পূর্ববর্তী বুদ্ধিবাদী ও অভিজ্ঞতবাদী পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসকে যেভাবে বিচারবিযুক্তবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে এরূপ অভিযোগের অবকাশ নেই। তবে চার্বাক দর্শন এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কারণ, ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে একমাত্র চার্বাক দর্শনকেই চরম অভিজ্ঞতাবাদী হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়।

ফলে অন্তত সাতশত খ্রিষ্টপূর্ব অব্দের ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কে যে মতবাদ প্রচার করে গেছেন তার সাথে আঠারো শতকের বৃটিশ দার্শনিক হিউমের জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কিত মতবাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। প্রধানত এ সাদৃশ্যই চার্বাক জ্ঞানবিদ্যার সাথে হিউমের জ্ঞানবিদ্যার তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করে। উভয় জ্ঞানবিদ্যার মধ্যে যেসব বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা যায় সেগুলোর মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণতত্ত্ব গ্রহণ, অনুমান বর্জন, শাশ্বত আত্মার ধারণা খণ্ডন এবং কার্যকারণের মধ্যকার আবশ্যিক সম্পর্ক অস্বীকার প্রভৃতি অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১ প্রত্যক্ষ প্রমাণতত্ত্ব গ্রহণ প্রসঙ্গে

ভারতীয় দর্শনে কোন কোন সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি, ও অনুপলব্ধি এ ছয় প্রকার প্রমাণকে স্বীকার করেছেন। এবং প্রায় সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ই এক বাক্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে প্রমাণ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু চার্বাক দার্শনিকগণ এর ব্যতিক্রম। তাঁরা শুধুমাত্র প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে মনে করেন এবং যে জ্ঞান প্রত্যক্ষর মাধ্যমে পাওয়া যায় না সে জ্ঞানকে অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে, পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা সরাসরি যে জ্ঞান পাওয়া যায় সে জ্ঞানই বৈধ। চার্বাকদের উপরোক্ত মতের সাথে হিউমের যথেষ্ট মিল পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও স্বজ্ঞাকে জ্ঞানোৎপত্তির উপায় হিসাবে নির্দেশ করা হলেও হিউম চার্বাকদের মত শুধুমাত্র প্রত্যক্ষণকেই যথার্থ জ্ঞানোৎপত্তির একমাত্র উপায় বলে নির্দেশ করেন। এজন্য ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় চার্বাক ও পাশ্চাত্য দার্শনিক ডেভিড হিউম উভয়কেই চরম অভিজ্ঞতাবাদী হিসাবে অভিহিত করা যায়। এছাড়া, এ কথাও সম্ভবত বলা যায় যে, পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে জ্ঞানের উৎস হিসাবে যখন অভিজ্ঞাতার কথা বলা হয় চার্বাক দার্শনিকগণ এর বহু পূর্বেই জ্ঞানের উৎস হিসাবে অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, চার্বাক অভিজ্ঞতাবাদী ও পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের দর্শনের প্রেক্ষাপট ভিন্ন ছিল। পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে[১] আমরা দেখেছি যে,পাশ্চাত্যে বিস্ময় বা জিজ্ঞাসা থেকে দর্শনের জন্ম হয়েছে কিন্তু ভারতে তা হয় নি। এখানে বরং মানুষের ঐহিক দুঃখ, দুর্দশা, বেদনা, হতাশা ইত্যাদির উপলব্ধিজনিত বাস্তব প্রয়োজনের চাপ থেকে দর্শনের জন্ম। এই দুঃখ কি করে দূর করা যায় সে প্রশ্নই ভারতবাসীকে সবচেয়ে বেশী বিচলিত করেছে। চার্বাক ও হিউমের জ্ঞানবিদ্যাগত আলোচনার প্রেক্ষাপটের ক্ষেত্রেও এরূপ পার্থক্য লক্ষিত হয়।

এ প্রসঙ্গে চার্বাক ও হিউমের দর্শনের প্রেক্ষাপটের প্রতি নজর দেয়া যাক। পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, যদিও চার্বাকদের সঠিক কাল নির্ণয় সম্ভব নয় তবুও আনুসঙ্গিক পরিবেশ বিচার করে যে আনুমানিক সিদ্ধান্ত নেয়া যায় সে অনুসারে চার্বাক দর্শন ৭০০ খ্রিঃ পূঃ অব্দের পূর্ববর্তী সময়ের।[২] এ সময়ের ভারতীয় বৈদিক সমাজ ছিল বৈদিক ধর্মের নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা। বৈদিক শাস্ত্রাচার ও ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে ভারতের সমাজ তখন বর্ণবৈষম্য, জাতিভেদ প্রথাসহ বিভিন্ন প্রকার দুর্ভোগে আক্রান্ত। ধর্মের নামে কর্মবাদের ভয় দেখিয়ে লোকবঞ্চনা করে জীবীকা নির্বাহ, শ্রেণী শোষণ ইত্যাদি তখন ভারতীয় সমাজে প্রকট। ধর্মের অতীন্দ্রিয় শক্তির দোহাই এ শোষণের মূল ভিত তৈরী করেছিল। চার্বাক মতবাদ এ সামাজিক অবস্থার বিরুদ্ধে একটি আপোষহীন প্রতিবাদরূপে বিকশিত হয়। বস্তুবাদের ভিত্তিতে শোষণ বঞ্চনার উৎস শাস্ত্রবচনকে ধোকাবাজি এবং ব্রাহ্মণদের জীবীকা নির্বাহের পথ হিসাবে ঘোষণা করে চার্বাক দর্শন দেহাতীত আত্মার পরলোক, পরজন্ম এবং এসবের তত্ত্বগত ভিত্তি কর্মবাদকে ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত করে। ফলে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের সবচেয়ে বড় দুর্ভোগ জাতিভেদের বিরুদ্ধে অভিযানের পথ প্রশস্ত হয়। বস্তুবাদী তত্ত্ববিদ্যার ভিত্তি হিসাবে চার্বাকদের জন্য অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানতত্ত্বকে প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করা ছিল একান্ত আবশ্যক। সুতরাং বলা যায়, কেবল একাডেমিক জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রয়োজন নয় বরং তৎকালীন ভারতের বাস্তব আর্থ-সামাজিক অবস্থাই চার্বাক প্রত্যক্ষবাদী জ্ঞানবিদ্যার প্রধান প্রেক্ষাপট হিসাবে কাজ করেছে। তবে, এর উপর প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্র অর্থাৎ আয়ুর্বেদ এবং বৈদিক বস্তুবাদী ধারারও প্রভাবপড়েছে।

পক্ষান্তরে হিউম আঠারো শতকের বৃটিশ দার্শনিক। চৌদ্দ শতকের রেনেসাঁ ও সতেরো শতকের বিজ্ঞান বিপ্লবের ফলে ইউরোপীয় চিন্তাধারা যখন প্রধানত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণমূলক হয়ে উঠে এবং তার ফল হিসাবে বৃটিশ দর্শনে যখন অভিজ্ঞতাবাদের রাজত্ব এমনি এক প্রেক্ষাপটে দর্শনের জগতে হিউমের আবির্ভাব। তাই পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসবেত্তাগণ হিউমের অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যাকে বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনের, তথা জন লক ও জর্জ বার্কলের অভিজ্ঞতাবাদের চরম ও সঙ্গতিপূর্ণ পরিণতি হিসাবে মূল্যায়ন করেন। এছাড়াও হিউমের দর্শনের পেছনে রয়েছে দুই হাজার বছরেরও বেশী সময়ের দর্শন চর্চার ইতিহাস। খ্রিষ্টপূর্ব ছয় শতক থেকে হিউমের কাল পর্যন্ত পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে যে বিবর্তন ও ক্রমবিকাশ সাধিত হয় তাদ্বারা হিউমের প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু চার্বাকগণ যেহেতু খ্রিষ্টপূর্ব সাত শতকের পূর্বের অর্থাৎ পাশ্চাত্য দর্শনের প্রারম্ভিক যুগেরও আগের এবং ভারতীয় দর্শন বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের দর্শন সেহেতু চার্বাক দর্শনের ক্ষেত্রে একাডেমিকভাবে প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ না থাকাই স্বাভাবিক। আর তাই একথা বলা যায় যে, চার্বাক দর্শনের ভিত্তি যত না একাডেমিক তার চেয়ে বেশী প্রায়োগিক বা সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবনভিত্তিক। মূলত এ কারণেই চার্বাক দর্শনকে লোকায়ত দর্শন বলা হয়। অন্যদিকে হিউমের দর্শন যত না প্রায়োগিক তার চেয়ে বেশী একাডেমিক। অবশ্য এ প্রসঙ্গে একথা মনে রাখতে হবে যে, যে কোন দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তির কারণই বিশুদ্ধ একাডেমিক বা তাত্ত্বিক হতে পারে না। বরং বলা যায়, সকল দার্শনিক চিন্তাই কোন এক পরিমাণে সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার ফসল। এদিক থেকে বিচার করলে হিউমের দর্শনে সমসাময়িক যুগের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আর বিজ্ঞানের ও দর্শনের এ উন্নতির মূল উৎস ছিল তৎকালীন ইউরোপের ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা । হিউমের দর্শন ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবেই গড়ে উঠেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

চার্বাক ও হিউমের দর্শনের প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও জ্ঞানের উৎপত্তির দিক থেকে চার্বাক দর্শনে প্রত্যক্ষের যে প্রকারভেদ দেখানো হয়েছে তার সাথে হিউমের প্রত্যক্ষের প্রকারভেদের মিল লক্ষিত হয়। চার্বাকগণ প্রত্যক্ষকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা, বাহ্যিক প্রত্যক্ষ, এবং অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষ। চার্বাক ও হিউমের দর্শনের প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও জ্ঞানের উৎপত্তির দিক থেকে হিউমও অভিজ্ঞতার একমাত্র উৎস প্রত্যক্ষণকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি এর নাম দিয়েছেন, ইন্দ্রিয়ছাপ, এবং ধারণা। বাহ্যিক প্রত্যক্ষ বলতে চার্বাকগণ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষকে বুঝেছেন। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাথে বাহ্যবস্তুর সংযোগের ফলেই বাহ্য প্রত্যক্ষ ঘটে। হিউম তাঁর ইন্দ্রিয়ছাপের প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে একথা বলেন যে, যেসব প্রত্যক্ষণ জীবণ তীব্র ও প্রচণ্ড তাদের নাম দেওয়া যায় ইন্দ্রিয়ছাপ। মনে প্রথম আগত সংবেদন, অতিরাগ ও প্রচণ্ড আবেগকে এ পর্যায়ে ফেলা যায়। তিনি এও বলেন যে, ইন্দ্রিয়ছাপ বলতে আমরা আমাদের সব সজীবতর প্রত্যক্ষণকে বুঝি। যেমন, যখন আমরা শুনি, দেখি, অনুভব করি, কামনা করি, বা সংকল্প করি। অর্থাৎ প্রত্যক্ষকারী সরাসরি প্রত্যক্ষণের সময় বাহ্য বস্তুর সাথে ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে যে বস্তুর সংবেদন পায় তাই ইন্দ্রিয়ছাপ।

অন্যদিকে, বাহ্য প্রত্যক্ষ যেসব উপাদান সরবরাহ করে মন তার উপর ক্রিয়া করে যে প্রত্যক্ষ লাভ করে তাকেই চার্বাকগণ অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষ বলেন। হিউমও ধারণা বলতে চিন্তা ও ন্যায় ক্রিয়ার ইন্দ্রিয়ছাপের ক্ষীণ প্রতিবিম্বকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ সরাসরি প্রত্যক্ষণে যে ইন্দ্রিয়ছাপ পাওয়া যায় তা যখন অনুপস্থিত থাকে তখন প্রত্যক্ষণকারী এসব ইন্দ্রিয়ছাপ নিয়ে যে চিন্তা করে তাই হল ধারণা।

সুতরাং বলা যায়, চার্বাক ও হিউম উভয়ই প্রত্যক্ষের প্রথম ধাপকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও বস্তুর মধ্যকার সংযোগকে যথাক্রমে বাহ্যিক প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়ছাপ বলেছেন। প্রত্যক্ষের পরবর্তী ধাপ অর্থাৎ বাহ্য প্রত্যক্ষ নির্ভর মানসিক প্রত্যক্ষকে তাঁরা যথাক্রমে অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষ ও ধারণা বলেছেন। চার্বাকদের বাহ্য প্রত্যক্ষ এবং হিউমের ইন্দ্রিয়ছাপের উৎপত্তিস্থল ও উৎপত্তি প্রক্রিয়া যেমন অভিন্ন তেমনি অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষ ও ধারণার উৎপত্তিস্থল ও উৎপত্তি প্রক্রিয়াও অভিন্ন। অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষ যেমন বাহ্য প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল এবং সময়ের দিক থেকে পরবর্তী তেমনি হিউমের ধারণাও ইন্দ্রিয়ছাপের উপর নির্ভরশীল এবং সময়ের দিক থেকে পরবর্তী। তবে যে বিষয়টি এখানে লক্ষণীয় তা হল, তথ্যের সীমাবদ্ধতার কারণে চার্বাকগণ প্রত্যক্ষের শ্রেণী বিভাগ অর্থাৎ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছিলেন কি না, করলেও তা কি ছিল তা সুস্পষ্ট বর্ণনা করা সম্ভব হয় নি। তবে, এ ব্যাপারে হিউম যথেষ্ট আলোচনা করেছেন এবং তাঁর বহু সমালোচকও প্রত্যক্ষণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হিউম একথা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, ইন্দ্রিয়ছাপ ছাড়া কোন ধারণার সৃষ্টি হতে পারে না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেছেন।[৩] উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হিউম একথা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, ইন্দ্রিয়ছাপ ছাড়া কোন ধারণার সৃষ্টি হতে পারে না। অন্য কথায়, প্রত্যেক ধারণার অনুরূপ ইন্দ্রিয়ছাপ বিদ্যমান। এটাই তাঁর অভিজ্ঞতাবাদের মূলসূত্র। হিউম নিজে এ সূত্রকে মানব প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রথম সূত্র বলে উল্লেখ করেন। দ্রব্য, আত্মা, ঈশ্বর, কার্যকারণ সম্পর্ক ইত্যাদি দর্শনের প্রচলিত ধারণাবলীর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য হিউম তাঁর অভিজ্ঞতাবাদী এ সূত্রকেই প্রয়োগ করেন। এবং এর মাধ্যমে অর্থাৎ অনুরূপ কোন ইন্দ্রিয়ছাপ পাওয়া যায় না বলেই তিনি এসব বিষয়ের ধারণাও পাওয়া যায় না বলে মনে করেন। এ সূত্র দ্বারা তিনি এটাই ঘোষণা করতে চান যে, ইন্দ্রিয়ছাপই হল অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের একমাত্র প্রাথমিক উপাদান। মূলত এ সূত্রই তাঁর অভিজ্ঞতাবাদ তথা বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদকে সঙ্গতিপূর্ণ পরিণতি দান করার চাবিকাঠি হিসাবে কাজ করে। এর দ্বারাই তিনি মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা প্রমাণ করেন ও কল্পনার বল্গাহীনতার লাগাম টেনে ধরেন। বলা যায়, এসূত্রকে কঠোরভাবে অনুসরণ করতে গিয়েই তাঁর মতবাদ সংশয়বাদে রূপ নেয়। কিন্তু চার্বাক দর্শনে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষ সম্পর্কে এমন কোন বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে যেহেতু চার্বাকগণ প্রত্যক্ষযোগ্য নয় বলে অনুমান ও স্মৃতি জাতীয় অন্যান্য সকল প্রকার প্রমাণ বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন সেহেতু এটা অনুমান করা অসঙ্গত হবে বলে মনে হয় না যে, চার্বাকগণ বাহ্য প্রত্যক্ষকেই অভিজ্ঞতা তথা জ্ঞানের উপাদান সরবরাহের একমাত্র প্রাথমিক উৎস বলে মনে করেছেন। অবশ্য একথা ঠিক যে, হিউম ধারণা বলতে ইন্দ্রিয়ছাপের অবিকল প্রতিকৃতিকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু চার্বাকগণ অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষ বলতে বাহ্য প্রত্যক্ষের অবিকল প্রতিকৃতিকে বুঝিয়েছেন কি না তা স্পষ্ট নয়। তবে চার্বাকগণ অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষের উৎপত্তিস্থল হিসাবে মন-কে গ্রহণ করলেও মন বলতে তাঁরা কোন স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় বা দ্রব্যকে বুঝান নি। বরং তাঁরা একথা বলেছেন যে, মন বাহ্য ইন্দ্রিয় থেকে স্বাধীন নয়। সুতরাং মনে যা উৎপন্ন হয় তা পঞ্চেন্দ্রিয় থেকে যা পাওয়া যায় তার উপর নির্ভরশীল।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববর্তীআলোচনায়[৪] আমরা দেখেছি যে, হিউম ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণাকে উৎপত্তির দিক থেকে সংবেদনজাত ও চিন্তাজাত এবং প্রকৃতির দিক থেকে সরল ও জটিল ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করেছেন। অন্তর্দর্শনজাত ইন্দ্রিয়ছাপকে তিনি আবার শান্ত ও উগ্র এ দু'ভাগে ভাগ করে কিভাবে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে বিভিন্ন রকম ধারণার উৎপত্তি ঘটে তার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এছাড়া, হিউম ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার মধ্যে পার্থক্য নিয়েও বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনা থেকে এটা নির্দেশিত হয়েছে যে, ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার পার্থক্য একমাত্র সজীবতার বা তীব্রতার মাত্রাগত। প্রথমটি দ্বিতীয়টির চেয়ে সবক্ষেত্রেই বেশী সজীব। অর্থাৎ এদের পার্থক্য মাত্রাগত, গুণগত নয়। কিন্তু বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গে এরূপ বিশ্লেষণ চার্বাক দর্শনে লক্ষ্য করা যায় না। অবশ্য এ প্রসঙ্গে যা বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হল, প্রত্যক্ষণ প্রসঙ্গে সকল প্রকার পুঙ্খানুপুঙ্খ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেই মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরবিদ্যাগত জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত। চার্বাকদের সময়ে ভারতবর্ষে ভেষজবিদ্যা বা চিকিৎসাশাস্ত্র ছাড়া মনস্তত্ত্ব ও শারীরবিদ্যার উন্নতির কোন নজির পাওয়া যায় না। অথচ হিউমের সময়ে জ্ঞান বিজ্ঞান অনেক দূর এগিয়ে গেছে। স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে মনস্তত্ত্ব ও শারীরবিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে। সুতরাং, প্রত্যক্ষণের বিভাজনের ব্যাপারে হিউমের ব্যাখ্যা অধিকতর বিশ্লেষণাত্মক ও বৈজ্ঞানিক বলে স্বীকার করে নিলেও একথা বলা ভুল হবে না যে, আদি যুগে ভারতবর্ষে চার্বাক দার্শনিকগণ এরূপ চিন্তার সূচনা করে গেছেন।

প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ হলে সার্বিক জ্ঞান সম্ভব কি না এ প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক ভাবে দেখা দেয়। এর উত্তরে চার্বাক ও হিউম উভয়েই একমত যে, সার্বিক জ্ঞান সম্ভব নয়। তবে সার্বিক জ্ঞানের অসম্ভাব্যতার কারণ সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় চার্বাক ও হিউম ভিন্নমত পোষণ করেন। চার্বাকগণ বাহ্য প্রত্যক্ষকে জ্ঞানের প্রাথমিক উৎস হিসাবে চিহ্নিত করে অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞানকে অস্বীকার করেছেন। এর কারণ হল, অতীত ও ভবিষ্যতের বাহ্য প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। চার্বাকদের বক্তব্য থেকে মনে হয় যে, অসম্ভাব্যতার কারণ হিসাবে তাঁরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাকেই নির্দেশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু হিউমের ব্যাখ্যা ভিন্ন। তিনি এক্ষেত্রে সার্বিক জ্ঞানেরভিত্তি আরোহানুমানের মূলভিত্তি কার্যকারণ সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর মতে, কার্য ও কারণের মধ্যে সম্পর্কের আবশ্যিকতার ধারণার উপর নির্ভর করেই আরোহানুমান সম্ভব হয়। আর আরোহানুমানই সকল সার্বিক জ্ঞানের ভিত্তি। কিন্তু আবশ্যিকতার ধারণাকে তিনি মানসিক প্রবণতা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ, এ ধারণার কোন ইন্দ্রিয়ছাপ নেই এবং কার্য ও কারণ নামক দু'টি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সান্নিধ্যের পুনরাবৃত্তি থেকেই অনুসঙ্গ নিয়মের মাধ্যমে আবশ্যিকতার ভ্রান্ত ধারণা জন্মে। সুতরাং একথাও বলা যায় যে, সার্বিক জ্ঞানের অস্বীকৃতির কারণ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও চার্বাকদের চেয়ে হিউম বেশী বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সার্বিক জ্ঞানেরভিত্তি হিসাবে আরোহানুমানকে চিহ্নিত করেছেন এবং আরোহানুমানের ভিত্তি কার্যকারণকে খণ্ডনের মাধ্যমে সার্বিক জ্ঞান খণ্ডন করেছেন। কার্যকারণ সম্পর্ককে খণ্ডনের ফলে তাঁর হাতে বাস্তব ঘটনা সম্পর্কিত ধারণার সকল প্রকার নিশ্চয়তার ভিত্তি ধ্বংস হয়েছে। এছাড়া, এর ফলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিশ্চয়তার ভিত্তিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু চার্বাকগণ যদিও অন্যত্র ভারতীয় অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত অনুমান-প্রমাণকে খণ্ডন করেছেন তবুও সার্বিক জ্ঞানের সম্ভাব্যতা খণ্ডন করতে গিয়ে তাঁরা অনুমান খণ্ডনের কথা বলেন নি। অর্থাৎ সার্বিক জ্ঞানেরভিত্তি হিসাবে তাঁরা অনুমানকে চিহ্নিত করেন নি বরং অত্যন্ত সরলভাবে অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান প্রত্যক্ষযোগ্য নয় বলে সার্বিক জ্ঞানকে অসম্ভব বলেছেন। সুতরাং দেখা যায়, সার্বিক জ্ঞান খণ্ডনের ব্যাপারে চার্বাকদের ব্যাখ্যার চেয়ে হিউমের ব্যাখ্যা অধিকতর উন্নত, বিশ্লেষণধর্মী ও বৈজ্ঞানিক। তবে একথা ঠিক যে, সার্বিক জ্ঞানের অসম্ভাব্যতা সম্পর্কিত যে মত হিউম পাশ্চাত্যে আঠারো শতকে ঘোষণ করেছেন চার্বাক দার্শনিক সম্প্রদায় এর বহুযুগ পূর্বে ভারতে এ মতবাদেরভিত্তি স্থাপন করে গেছেন এবং সম্ভবত তাঁরাই এ মতবাদের প্রবক্তা।

উল্লেখ্য যে, হিউম লক ও বার্কলের ব্যবহৃত ধারণা শব্দটির অর্থ স্পষ্ট করেছেন এবং দেকার্ত প্রবর্তিত সহজাত বা অন্তর্ধারণা নিয়েও আলোচনা করেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করে এটা দেখাতে প্রয়াসী হয়েছেন যে, কার্তেজীয় অর্থে সহজাত ধারণা একমাত্র ইন্দ্রিছাপকেই বলা যায়। কারণ, একমাত্র ইন্দ্রিয়ছাপই মৌলিক।[৫] কিন্তু চার্বাক দর্শনে সহজাত ধারণা নিয়ে কোন আলোচনা হয় নি। এর কারণ সম্ভবত এই যে, চার্বাকদের সময়ে ভারতীয় দর্শনে সহজাত ধারণা সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না।

প্রত্যক্ষের মাধ্যম বা ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি ও সংখ্যা নিয়েও ভারতীয় দর্শনে মতভেদ দেখা যায়। ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনে তিনটি ভিন্নমত লক্ষিত হয়। প্রথম মতানুসারে ইন্দ্রিয় হল অঙ্গ, দ্বিতীয় মতানুসারে ইন্দ্রিয় অঙ্গের শক্তি এবং তৃতীয় মতানুসারে ইন্দ্রিয় স্বতন্ত্র দ্রব্য যা ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এ চার প্রকার দ্রব্যদ্বারা গঠিত। তাই এসব উপাদান যে বস্তুতে আছে সেসব বস্তুই ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের বিষয়। চার্বাকগণ এ তৃতীয় মতের সমর্থক।

অন্যদিকে, ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা সম্পর্কেও ভারতীয় দর্শনে ভিন্নমত লক্ষিত হয়। কেননা ভারতীয় দর্শনের কোন কোন সম্প্রদায় ছয়টি, কোন কোন সম্প্রদায় তেরোটি, আবার কোন কোন সম্প্রদায় বাইশটি ইন্দ্রিয়কে স্বীকার করেছেন। তবে চার্বাকগণ স্পষ্টভাবে মোট পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের কথা বলেন। সেগুলো হল, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। যেসব দার্শনিক ছয়টি ইন্দ্রিয়ের কথা

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন তারা মনকে একটি স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় বলে স্বীকার করেন। কিন্তু চার্বাকগণ মনকে স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় বলে মেনে নেন নি। তাঁদের মতে, মন হল পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উপবস্তু। উল্লেখ্য যে, চার্বাকদের মন সম্পর্কিত উপবস্তুবাদের সাথে আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য দার্শনিক দেকার্তের মন সম্পর্কিত উপসত্তাবাদ (Epiphenomenalism)-এর মিল পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানী ক্লিফোর্ড (Clifford), হাক্সলী (Huxly), হজ্সন (Hodgson) প্রমুখ মন সম্পর্কে এ মতবাদ দেন। চার্বাক দার্শনিকগণই এ মতবাদেরপ্রবর্তনকরেন।

হিউমের দর্শনে ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি ও সংখ্যা নিয়ে কোন আলোচনা পাওয়া যায় না। এর কারণ সম্ভবত এই যে, ভারতীয় দর্শনে ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি ও সংখ্যা নিয়ে যেরূপ বিতর্ক আছে পাশ্চাত্য দর্শনে সেরূপ বিতর্ক নেই। বিতর্কহীনতার কারণ হল, পাশ্চাত্য দর্শনের উপর মনোবিজ্ঞানের প্রভাব। মনোবিজ্ঞানই ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা ও প্রকৃতি সম্পর্কিত সমস্যার স্থিরীকৃত সমাধান দিয়েছে যা পাশ্চাত্য দর্শন গ্রহণ করেছে। এছাড়া ভারতীয় দর্শনের প্রতিটি সম্প্রদায় তাঁদের ব্যবহৃত বিভিন্ন ধারণাগুলো বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সেই আদি যুগে যেরূপ সচেতন ছিলেন পাশ্চাত্য দর্শনের সকল দার্শনিকের ক্ষেত্রে সেরূপ সচেতনতা খুব কমই লক্ষ্য করা যায়। বরং বলা যায় সাম্প্রতিক কালের পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ক্ষেত্রে অনুরূপ সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। এ সচেতনার ফল হিসাবেই সাম্প্রতিককালে বিশ্লেষণী দর্শনের উদ্ভব। এসব কারণেই পাশ্চাত্য দর্শনে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা ও প্রকৃতি নিয়ে কোন বিতর্ক লক্ষ্য করা যায় না। তাই পাশ্চাত্য দর্শনে সাধারণত ইন্দ্রিয় বলতে ভারতীয় দর্শনের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকই হল ইন্দ্রিয়। মন বা আত্মাকে পাশ্চাত্য দর্শনে কখনই স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় বলে মনে করা হয় নি। উল্লেখ্য যে, পাশ্চাত্য দর্শনে ইন্দ্রিয় বলতে যে পঞ্চেন্দ্রিয়কে বুঝানো হয়েছে চার্বাক দর্শনেই এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে ইন্দ্রিয় সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণার প্রেক্ষাপটে হিউমও চার্বাকদের মতই ইন্দ্রিয়ছাপের উপায় হিসাবে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়কেই স্বীকার করেছেন বলে মনে করা হলে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যার ক্ষেত্রে চার্বাক ও হিউমের মধ্যে মিল লক্ষিত হয়। অবশ্য হিউম সত্যিকার অর্থেই জ্ঞানের উৎস হিসাবে পঞ্চেন্দ্রিয়কে ধরে নিয়েছিলেন কি না এ ব্যাপারে দ্বিমতের অবকাশ থাকতে পারে। কারণ, তিনি প্রত্যক্ষণ কিসের মাধ্যমে হয় তা কোথাও স্পষ্ট করে বলেন নি। যেহেতু ইন্দ্রিয়ছাপই হিউমের প্রত্যক্ষণের প্রথম স্তর সেহেতু আমাদের পক্ষে ইন্দ্রিয়ছাপের প্রকৃতি সম্পর্কে হিউম যা বলেছেন তা থেকে এর উৎস নির্ণয় করাই উত্তম পথ বলে মনে হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ছাপের পরিচয় দিতে গিয়ে *Treatise* গ্রন্থে (১ম পৃষ্ঠায়) তিনি বলেছেন, "মনে প্রথম আগত সংবেদন, অতিরাগ (passion) ও আবেগকে এ পর্যায়ে ফেলা যায়।" *Enquiry* গ্রন্থে তিনি বলেন "ইন্দ্রিয়ছাপ বলতে আমি বুঝি আমাদের সব সজীবতর প্রত্যক্ষণ, যখন আমরা শুনি, দেখি, অনুভব করি, ভালবাসি, ঘৃণা করি, বা ইচ্ছা করি।" এখানে প্রথম বর্ণনায় সংবেদন ছাড়াও 'অতিরাগ' ও 'আবেগকে' অন্তর্ভুক্ত করায় এবং দ্বিতীয় বর্ণনায় শুনি, দেখি, অনুভব করি ছাড়াও 'ভালবাসি', 'ঘৃণা করি' বা 'ইচ্ছা করি' শব্দগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করায় জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। কারণ অতিরাগ, আবেগ, ভালবাসা, ঘৃণা করা, ইচ্ছা করা ইত্যাদি পঞ্চেন্দ্রিয়জাত কি না এনিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। এছাড়া, হিউম অতিরাগ ও আবেগ শব্দদু'টিকে ও (and) দ্বারা সংযুক্ত করায় এগুলোকে সংবেদনের প্রতিশব্দ হিসাবেও ব্যবহার করেছেন বলেও মনে হয় না। মনে হয় এগুলো সংবেদন থেকে স্বতন্ত্র কিছু। কিন্তু এক্ষেত্রে যে বিষয়টি স্মরণ রাখা দরকার তাহল, মনোবিজ্ঞানে সংবেদন বলতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়লব্ধ চেতনাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সংবেদনের মধ্যে প্রতিক্রিয়াও অন্তর্ভুক্ত। এবং মাথাঘোরাও মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এক প্রকার সংবেদন। সুতরাং বলা যায়, হিউম সংবেদন বুঝাতেই অতিরাগ, আবেগ, ভালবাসা, ঘৃণা করা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। সংবেদন শব্দটি ব্যবহার করার পর অন্য শব্দগুলো না ব্যবহার করলেও কোন ক্ষতি হত বলে মনে হয় না। সুতরাং চার্বাকদের বাহ্য প্রত্যক্ষ যেমন পঞ্চ ইন্দ্রিয়জাত হিউমের ইন্দ্রিয়ছাপও তেমনি পঞ্চ ইন্দ্রিয়জাত এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ খুব কম।

হিউমের জ্ঞানবিদ্যায় ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতির কোন ব্যাখ্যা নাই যা চার্বাক দর্শনে পাওয়া যায়। তবে, চার্বাকদের ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি সম্পর্কিত ব্যাখ্যার সাথে হিউমের ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতির সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলো যে জড় দ্রব্যে গঠিত এ বিষয়ে উভয় মতবাদে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। অবশ্য জড় দ্রব্য বলতে চার্বাকগণ যেমন ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ইত্যাদি চতুর্ভূতকে বুঝিয়েছেন হিউম এরকম কোন চতুর্ভূতকে বুঝান কি না তা স্পষ্ট করে কোথাও বলেন নি। সুতরাং বলা যায়, বাহ্য প্রত্যক্ষের মাধ্যম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি ও সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে চার্বাক দর্শন যেমন বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছে হিউমের দর্শনে সেরূপ আলোচনা করা হয় নি। হিউম কেবল ইন্দ্রিয়ছাপের ব্যাখ্যা নিয়েই বিষয়টির আলোচনা শুরু করেছেন। এগুলোর উৎস, তাঁর মতে, অজ্ঞাত। চার্বাকদের আলোচনার বিশ্লেষণধর্মিতা ও পূর্ণাঙ্গতার পেছনে যে কারণটি কাজ করেছে বলে মনে হয় তাহল, চার্বাক দর্শনে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার সাথে গুরুত্বের সাথে তত্ত্ববিদ্যার আলোচনাও করা হয়েছে। এবং প্রত্যক্ষবাদী জ্ঞানবিদ্যার আলোকে অতীন্দ্রিয় তত্ত্ববিদ্যাকে খণ্ডনই ছিল তাঁদের জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু হিউমের আলোচনা ছিল বিশুদ্ধ জ্ঞানতাত্ত্বিক। তাঁর দর্শনে পরমতত্ত্বের স্পষ্ট আলোচনা অনুপস্থিত। এ কারণেই চার্বাকদেরকে স্পষ্টতই বিশুদ্ধ অর্থে বস্তুবাদী এবং সম্ভবত বস্তুবাদের প্রণেতা হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। কিন্তু হিউমকে সুস্পষ্টভাবে বিশুদ্ধ বস্তুবাদী বা ভাববাদী হিসাবে আখ্যায়িত করা কষ্টসাধ্য।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যক্ষের প্রকারভেদ নিয়েও ভারতীয় দর্শনে তিনটি দার্শনিক মতের উদ্ভব হয়েছে। একদল দার্শনিকের মতে, নির্বিকল্পই প্রত্যক্ষের একমাত্র ধরন। দ্বিতীয় মত অনুসারে সবিকল্প ও নির্বিকল্প এ দু'ই প্রকার প্রত্যক্ষ স্বীকৃত হয়েছে এবং তৃতীয় মত অনুসারে কেবল সবিকল্পকে প্রত্যক্ষ স্বীকার করা হয়েছে। চার্বাকগণ তৃতীয় মতের প্রতিনিধি এবং সম্ভবত তাঁরাই এ মতের প্রবক্তা। তাঁরা সবিকল্প প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রত্যক্ষ বলে মনে করেন এবং নির্বিকল্প প্রত্যক্ষের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে বস্তুর জ্ঞান হয় কিন্তু বস্তুর প্রকার ও নাম সম্বন্ধে জ্ঞান হয় না। অর্থাৎ বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান হয় না। কিন্তু সবিকল্প প্রত্যক্ষে বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান হয়। পাশ্চাত্য দর্শনে ভারতীয় দর্শনের মত বিভিন্ন প্রকার প্রত্যক্ষের কথা বলা হয় নি। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যায় প্রত্যক্ষ দ্বারা বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান পাওয়া যায় বলেই মনে করা হয়েছে। এদিক থেকে বিচার করলে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার স্বীকৃত সকল প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে সবিকল্প প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে মনে করা যায়। সুতরাং বলা যায়, ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যায় যাকে সবিকল্প প্রত্যক্ষ বলা হয়েছে হিউম প্রত্যক্ষ বলতে অনুরূপ প্রত্যক্ষকেই বুঝিয়েছেন। যেহেতু চার্বাক দার্শনিকগণ শুধু সবিকল্প প্রত্যক্ষকে স্বীকার করেছেন এবং সম্ভবত তাঁরাই এমতের প্রবর্তনকারী সেহেতু একথা বলা যায় যে, চার্বাকগণ প্রত্যক্ষের ধরন সম্পর্কে যে ধারণার প্রবর্তন করে গেছেন হিউমের দর্শন,এমনকি পাশ্চাত্য দর্শনে প্রত্যক্ষ বলতে সে ধরনের প্রত্যক্ষকেই বুঝানো হয়েছে। প্রত্যক্ষের ধরন সম্পর্কিত ধারণার ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য দর্শন মনোবিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত একথা বলা যায়। অথচ মনোবিজ্ঞানের উন্নতির বহু পূর্বেই ভারতে চার্বাকগণ প্রত্যক্ষের ধরন সম্পর্কিত এ ধারণাটি প্রবর্তন করে গেছেন।

সংক্ষিপ্তসার ঃ উপরের আলোচনারভিত্তিতে প্রত্যক্ষ প্রমাণতত্ত্ব গ্রহণ প্রসঙ্গে চার্বাক ও হিউমের দর্শনের মধ্যে যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলো পাওয়া যায় তা সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

সাদৃশ্য ঃ ১। চার্বাক ও হিউম উভয়ই জ্ঞানবিদ্যাগত দিক থেকে প্রত্যক্ষবাদী তথা অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক। কারণ, তাঁরা উভয়েই প্রত্যক্ষকে জ্ঞানোৎপত্তির একমাত্র উপায় বলে নির্দেশ করেন।

২। উভয় দর্শনের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক বিদ্যমান বলে মনে হয়। চার্বাক দর্শনের সাথে যেমন প্রাচীন ভারতীয় রসায়নবিজ্ঞান তথা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় তেমনি হিউমের দর্শনের সাথেও সতেরো শতকের নিউটনীয় পর্যবেক্ষণমূলক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান।

৩। চার্বাক ও হিউম উভয়েই প্রত্যক্ষণকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করেছেনঃ বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ বা মানসিক। উভয়ের মতেই অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষ বাহ্য প্রত্যক্ষ নির্ভর এবং সে কারণেই সময়ের দিক থেকে দ্বিতীয়টি প্রথমটির পরবর্তী।

৪। চার্বাক ও হিউম উভয়েই অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষকে বাহ্য প্রত্যক্ষ নির্ভর হিসাবে বিবেচনা করে কল্পনার সীমা নির্দেশ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ যার বাহ্য প্রত্যক্ষ নাই তার কল্পনাও করা যায় না।

৫। চার্বাক ও হিউম উভয়ই সার্বিক জ্ঞানের সম্ভাবনাকে নাকচ করেছেন। কারণ কোন সঙ্গতিপূর্ণ অভিজ্ঞতাবাদীই অভিজ্ঞতারভিত্তিতে সার্বিক জ্ঞানে পৌছাতে পারেন না।

৬। উভয়ই প্রত্যক্ষ বলতে সবিকল্প প্রত্যক্ষকে বুঝেছেন অর্থাৎ যে প্রত্যক্ষে বস্তুর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান হয় সে প্রত্যক্ষের কথা বলেছেন। ভারতীয় দর্শনের নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ বলে অন্য যে একটি প্রত্যক্ষ আছে চার্বাক ও হিউম কেউই সে প্রত্যক্ষের কথা বলেন নি।

বৈসাদৃশ্য ঃ ১। সাতশত খ্রিষ্টপূর্ব অব্দেরও পূর্ববর্তী সময়ের দর্শন হিসাবে চার্বাক দর্শন ভারতীয় দর্শনের বিকাশের আদি পর্বের। এ দর্শনে পূর্ববর্তী দর্শনের প্রভাব পড়ার সুযোগ ছিল না। বরং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে এ দর্শন তার উপাদান সংগ্রহ করেছে। চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে, হিউম আঠারো শতকের বৃটিশ দার্শনিক। তাঁর দর্শনের প্রেক্ষাপটে রয়েছে প্রায় দুই হাজার বছরের দর্শনের ইতিহাস। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জ্ঞানবিদ্যার উপরও তাঁর পূর্ববর্তী দর্শনের প্রভাবপড়েছে।

২। চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা চার্বাক বস্তুবাদী তত্ত্ববিদ্যারভিত্তি হিসাবে গড়ে উঠেছে। এর প্রেক্ষাপট ছিল বৈদিক শ্রেণী বৈষম্যমূলক সমাজে শ্রেণী শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। অর্থাৎ এ জ্ঞানবিদ্যা যতটা না একাডেমিক তার চেয়েও বেশী প্রায়োগিক বা বাস্তবতাভিত্তিক, অন্যকথায় লোকায়ত। পক্ষান্তরে রেনেসাঁ প্রভাবিত বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যার সঙ্গতিপূর্ণ পরিণতিই হল হিউমের জ্ঞানবিদ্যা। এর প্রেক্ষাপট যতটা না প্রায়োগিক বা বাস্তবতাপ্রসূত তার চেয়ে বেশী একাডেমিক।

Dhaka University Institutional Repository

৩। চার্বাক জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নাই। এ ছাড়া চার্বাকদের স্বীকৃত বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষের আর কোন শ্রেণী বিভাগ করা হয় নি। এ বিষয়ে চার্বাকদের ব্যাখ্যাও পর্যাপ্ত নয়। ফলে অভিজ্ঞতাবাদী চার্বাকদের জ্ঞানোৎপত্তির পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, হিউম ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার মধ্যে স্পষ্টভাবে পার্থক্য করে বলেছেন যে, এদের পার্থক্য মাত্রাগত। এ ছাড়া তিনি ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণাকে আরও বিভিন্নভাগে ভাগ করেছেন। ফলে হিউমের জ্ঞানবিদ্যায় জ্ঞানোৎপত্তির পদ্ধতি বা জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে মনের ক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর সম্পর্কিত জ্ঞান পাওয়া যায়। হিউম আসলে মনের ক্রিয়ায় বিজ্ঞান নির্মাণ করেছেন যা চার্বাক মতবাদে এত স্পষ্টভাবে উপস্থিত নয়। চার্বাক ও হিউমের প্রত্যক্ষণের বিভাজন ছকের সাহায্যে দেখানো গেলঃ

চার্বাক ও হিউমের প্রত্যক্ষণের বিভাজন ছক

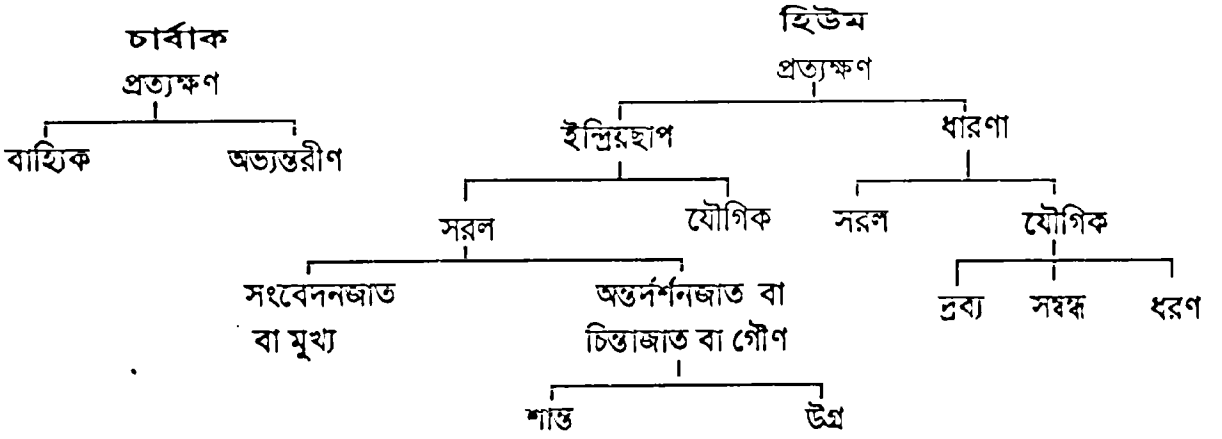

৪। চার্বাক জ্ঞানবিদ্যায় বাহ্য প্রত্যক্ষের উপরই অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষ নির্ভরশীল একথা বলা হয়েছে। ফলে, এতে কল্পনার সীমা নির্দেশিত হয়েছে। কিন্তু এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয় নি। পক্ষান্তরে, হিউমের জ্ঞানবিদ্যায় যার ইন্দ্রিয়ছাপ নাই তাঁর ধারণা থাকতে পারে না এ নীতি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে কল্পনার সীমারেখা নির্দেশ করা হয়েছে। হিউম মূলত এ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অভিজ্ঞতাপূর্ব সকল প্রকার ধারণার জ্ঞানকে অস্বীকার করে দেকার্তের সহজাত ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ঐতিহাসিকভাবে সম্ভবত এটা হিউমের দায়িত্বও ছিল। কিন্তু চার্বাকদের এরকম দায়িত্ব ছিল না।

৫। চার্বাক জ্ঞানবিদ্যায় ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎ পর্যবেক্ষণযোগ্য নয় বলে সার্বিক জ্ঞানকে অসম্ভব বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে, হিউমের দর্শনে কার্যকারণের আবশ্যিকতা তথা অরোহানুমানেরভিত্তি কার্যকারণকে খণ্ডন করার মাধ্যমে সার্বিক জ্ঞানকে অসম্ভব বলা হয়েছে। সুতরাং, সার্বিক জ্ঞান অস্বীকৃতির ব্যাপারে হিউমের ব্যাখ্যা চার্বাকদের ব্যাখ্যার চেয়ে বেশী দার্শনিকসুলভ। এর পেছনেও রয়েছে দর্শনের ইতিহাসের দীর্ঘ আলোচনার প্রভাব।

৬। চার্বাক জ্ঞানবিদ্যায় বাহ্য প্রত্যক্ষের মাধ্যম ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি ও সংখ্যা প্রভৃতি বিষয় প্রসঙ্গে চার্বাকদের ব্যাখ্যা স্পষ্ট ও পর্যাপ্ত। তাঁরা ইন্দ্রিয় বলতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বুঝিয়েছেন। চারিভূত বা চার প্রকার পদার্থ হল এর উপাদান। পক্ষান্তরে হিউমের জ্ঞানবিদ্যায় ইন্দ্রিয়ছাপের মাধ্যম ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি ও সংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে স্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা নাই। তিনি ইন্দ্রিয়ছাপের ব্যাখ্যা নিয়েই আলোচনা শুরু করেছেন। এর পেছনে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি ও সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনায় যান নি। এথেকে মনে হয় যে, তিনি পাশ্চাত্য দর্শনে ও মনোবিদ্যায় ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি ও সংখ্যা সম্পর্কিত প্রচলিত মতকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

৭। চার্বাক দর্শন বস্তুবাদী। তাই, তাঁদের জ্ঞানবিদ্যা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত। পক্ষান্তরে, হিউম আদি সত্তা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু না বলায় তাঁর দর্শন বস্তুবাদী না ভাববাদী তা সুস্পষ্টভাবে বলা কষ্টসাধ্য। তিনি মূলত বিশুদ্ধ জ্ঞানবিদ্যাগত আলোচনার উপরই অধিক মনোযোগ দিয়েছেন। তত্ত্ববিদ্যাগত মত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা করেন নি।

৮। চার্বাক জ্ঞানবিদ্যায় সহজাত ধারণা সম্পর্কিত আলোচনার অনুপস্থিতি লক্ষিত হয়। অবশ্য সে সময় সহজাত ধারণার আলোচনার প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয় নি। পক্ষান্তরে, হিউম সহজাত ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং তিনি কার্তেজীয় সহজাত ধারণাকে খণ্ডন করে বলেছেন যে, একমাত্র ইন্দ্রিয়ছাপকেই মৌলিকতার কারণে সহজাত বলা যায়। দেকার্তের মতবাদকে খণ্ডন করে নিজ মতবাদেরভিত্তি মজবুত করার জন্য হিউমের পক্ষে সহজাত ধারণার আলোচনার প্রয়োজনও ছিল।

চার্বাক ও হিউমের জ্ঞানবিদ্যার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিচার করে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, আঠারো শতকে হিউমের জ্ঞানবিদ্যায় যে চরম অভিজ্ঞতাবাদ, কল্পনার সীমারেখা নির্দেশ এবং সার্বিক জ্ঞানের অসম্ভাব্যতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে সাতশত খ্রিষ্ট পূর্বাব্দের পূর্ববর্তী সময়ের চার্বাক দার্শনিকগণই এসব ধারণার প্রবর্তণ করে গেছেন। উভয়ের মতের মধ্যে যেসব

Dhaka University Institutional Repository

সাতশত খ্রিষ্ট পূর্বাব্দের পূর্ববর্তী সময়ের চার্বাক দার্শনিকগণই এসব ধারণার প্রবর্তণ করে গেছেন। উভয়ের মতের মধ্যে যেসব বৈসাদৃশ্য দেখা যায় তাথেকে এটাই নির্দেশিত হয় যে, এ পার্থক্য প্রধানত ব্যাখ্যার পার্থক্য। চার্বাকগণ এসব ধারণা প্রবর্তন করে গেছেন কিন্তু যথেষ্ট স্পষ্টভাবে এগুলোর ব্যাখ্যা দেন নি। হিউমের জ্ঞানবিদ্যায় এসব ধারণার যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছে এবং এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও প্রদানের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এর কারণ হিসাবে হিউমের দর্শনের উপর জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সুদীর্ঘ প্রভাবের কথা বলা যায়।

৫.২ অনুমান খণ্ডন প্রসঙ্গে

প্রথম অধ্যায়ে ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে, ভারতীয় দর্শনে চার্বাক ছাড়া অন্য সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ই অনুমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করেছেন। ন্যায় জ্ঞানতত্ত্বে অনুমান প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যদিও অনুমানের প্রকার ও অবয়ব নিয়ে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে তবুও এ ব্যাপারে চার্বাক ভিন্ন আর সকলেই একমত যে, অনুমান একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বা বৈধজ্ঞানের উপায়। এছাড়া, যাঁরা অনুমানকে প্রমাণ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁরা সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, সাধ্য পদ ও মধ্য পদের মধ্যকার সার্বিক ও অনিবার্য সংযোগ বা ব্যাপ্তি সম্পর্কই সকল প্রকার অনুমানেরভিত্তি। কিন্তু তাঁদের মতে, ব্যাপ্তি সম্পর্কের জ্ঞান সম্ভব নয় বলেই অনুমান সম্ভব নয়। ন্যায় দার্শনিকদের মতে, হেতুর সাথে সাধ্যের নিয়ত সম্পর্ক প্রত্যক্ষিত হয়। কিন্তু চার্বাকদের মতে, হেতুর সাথে সাধ্যের সম্পর্ক বিশেষ ঘটনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষিত হতে পারে। এ দু'য়ের মধ্যে কোন সার্বিক এবং অনিবার্য সম্পর্ক প্রত্যক্ষিত হয় না। তাই চার্বাকগণ ব্যাপ্তি জ্ঞানের অসম্ভাব্যতা দেখিয়ে অনুমান খণ্ডন করেন।

চার্বাক দার্শনিকগণ ব্যাপ্তি জ্ঞানের অসম্ভাব্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, প্রভৃতি কোন প্রমাণ দ্বারাই ব্যাপ্তি জ্ঞানলাভ করা যায় না। কারণ, তাঁদের মতে, ইন্দ্রিয়ের অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষের ক্ষমতা নাই। প্রত্যক্ষ দ্বারা ব্যাপ্তি জ্ঞানলাভ করা যায় না। অনুমান দ্বারা ব্যাপ্তি জ্ঞান পেতে গেলেও অনবস্থা বা সীমাহীন অনুক্রম ঘটে। কারণ, ব্যাপ্তিকে জানার জন্য যে অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয় সে অনুমানও আবার ব্যাপ্তি নির্ভর। তাই অনুমান দ্বারাও ব্যাপ্তি জ্ঞানলাভ করা যায় না। শব্দ দ্বারাও ব্যাপ্তি জ্ঞানলাভ করা যায় না। কারণ, বৈশেষিকগণ শব্দকেও অনুমান নির্ভর বলে প্রমাণ করেছেন। সুতরাং শব্দ দ্বারা ব্যাপ্তি জ্ঞান পেতে গেলে আবার অনুমান নির্ভর হতে হয়, যাতে অনবস্থা দোষ বা সীমাহীন অনুক্রম দোষ ঘটে। উপমান জ্ঞান বচন ও তার অর্থের নিয়ত সংযোগের জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। এ নিয়ত সংযোগের জ্ঞানই ব্যাপ্তি জ্ঞান। সুতরাং, কোন প্রমাণ দ্বারাই ব্যাপ্তি জ্ঞান সম্ভব নয়। আর ব্যাপ্তি জ্ঞানের অসম্ভাব্যতার কারণে চার্বাকগণ অনুমানকে অসম্ভব বলে মনে করেন।

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, চার্বাক দার্শনিকগণ আরোহাত্মক ও অবরোহাত্মক উভয় প্রকার অনুমান খণ্ডন করেছেন।৬ অবরোহাত্মক অনুমানকে তাঁরা চক্রক দোষে দুষ্ট বলে মনে করেন। কারণ, অবরোহানুমানের সিদ্ধান্তে যা প্রমাণ করা হয় আশ্রয় বাক্যে তাই স্বীকার করা হয়। এবং এটাই চক্রক অনুপত্তি। অন্যদিকে, ব্যাপ্তির অসম্ভাব্যতার কারণে আরোহাত্মক অনুমান সম্ভব নয়।

আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিউমের সাথে চার্বাকদের আরোহানুমান খণ্ডনের ক্ষেত্রে মিল পরিলক্ষিত হয়। হিউম সার্বিক জ্ঞানের অসম্ভাব্যতা দেখাতে গিয়ে এরভিত্তি আরোহানুমানকে খণ্ডন করেন। তাঁর মতে, আমরা যে সার্বিক জ্ঞানের কথা বলি তার ভিত্তি হল বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের নিরীক্ষণ। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলো বিশেষ দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণের মাধ্যমেই কোন বিষয় সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম প্রণয়ন করে। অর্থাৎ সাধারণ নিয়ম প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলোরভিত্তি হল আরোহ। আর হিউমের মতে, আরোহের ভিত্তি হল কার্যকারণের অনিবার্য বা আবশ্যিক সম্পর্ক। কিন্তু, তিনি কার্যকারণের মধ্যকার সম্পর্কের আবশ্যিকতাকে পূর্বতসিদ্ধ বা বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং অভিজ্ঞতালব্ধ বা প্রত্যক্ষণযোগ্য কোনটাই নয় বলে অস্বীকার করেন।৭ তাঁর মতে, বিশেষ দৃষ্টান্তে কার্য ও কারণের সম্পর্ক দৃষ্ট হয় কিন্তু এথেকে বলা যায় না যে, সর্বদা সকল দৃষ্টান্তে এরূপ সম্পর্ক থাকবে। সুতরাং বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে সাধিত আরোহানুমান বৈধ নয়।

এ থেকে দেখা যায় যে, চার্বাকদের মত হিউমও আরোহানুমানের বৈধতাকে খণ্ডন করে অনুমানলব্ধ জ্ঞানকে অস্বীকার করেন। তবে, চার্বাকদের আরোহানুমান খণ্ডনের ভিত্তি হল ব্যাপ্তি সম্পর্ককে অস্বীকার। অন্যদিকে হিউমের আরোহানুমান খণ্ডনের ভিত্তি হল কার্যকারণের মধ্যকার অনিবার্য সম্পর্ককে অস্বীকার। ভারতীয় দার্শনিকগণ অনুমানের ভিত্তি হিসাবে ব্যাপ্তি সম্পর্কের যে ধারণার কথা বলেছেন এরকম কোন ধারণার আলোচনা পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যায় পাওয়া যায় না। অন্যদিকে, হিউমের জ্ঞানবিদ্যায় আরোহানুমানের ভিত্তি হিসাবে কার্যকারণকে নির্দেশ করা হলেও চার্বাক তথা ভারতীয় দর্শনে কার্যকারণ সম্পর্ককে আরোহানুমানের

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তি বলে মনে করা হয় নি। তবে, ব্যাপ্তি সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করলে এর সাথে কার্যকারণ সম্পর্কের ধারণার মিল আছে বলে মনে হয়। সাধ্য ও মধ্য পদের মধ্যে সার্বিক এবং অনিবার্য সম্পর্ককেই ভারতীয় দর্শনে ব্যাপ্তি সম্পর্ক বলা হয়। যেমন, ধূম ও অগ্নির মধ্যকার সম্পর্ক। ভারতীয় দার্শনিকদের মতে, যেখানে ধূম সেখানেই অগ্নি, এটাই ব্যাপ্তির মূল কথা। কিন্তু কিভাবে এ সার্বিক সম্পর্কের জ্ঞান পাওয়া যাবে এটাই চার্বাকদের সমস্যা। আবার কার্যকারণের দিক থেকে বিচার করলে ধূম ও অগ্নির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক বর্তমান। ধূম হল অগ্নির কারণ। এবং কার্যকারণের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ধূম ও অগ্নি অনিবার্য বা আবশ্যিক সম্পর্কে সম্পর্কিত। কিন্তু বিশেষ ঘটনার ক্ষেত্রে এ সম্পর্ক বা সংযোগ লক্ষিত হলেও সকল ঘটনায় তা কিভাবে সম্ভব হবে এটাই হিউমের সমস্যা। এ সমস্যাকেই হিউম আরোহানুমানের সমস্যা বলেছেন। তাই চার্বাক দার্শনিকগণ ব্যাপ্তির যে সমস্যার কথা বলেছেন এবং হিউম আরোহানুমানের সমস্যা বলতে যা বুঝিয়েছেন তার মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। বরং হিউমের আরোহানুমানের সমস্যা চার্বাক নির্দেশিত ব্যাপ্তি জ্ঞান সম্পর্কিত সমস্যারই নতুন উপস্থাপনা বলে মনে হয়। সুতরাং এদিক থেকে বিচার করে ব্যাপ্তি ও কার্যকারণ সম্পর্কের অন্তর্নিহিত মূল ধারণায় তেমন কোন পার্থক্য দেখা যায় না। এতদ্‌সত্ত্বেও একথা ঠিক যে, ভারতীয় দার্শনিকগণ ব্যাপ্তি ও কার্যকারণকে অভিন্ন বলে মনে করেছেন কি না তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। এবং একইভাবে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ কার্যকারণ সম্পর্ক ও ব্যাপ্তি সম্পর্ককে অভিন্ন বলে মনে করেছেন কি না তাও স্পষ্টভাবে বলা যায় না।

উল্লেখ্য যে, হিউম সার্বিক জ্ঞানকে অস্বীকার করতে গিয়েই আরোহানুমান খণ্ডন করেছেন। তিনি চার্বাকদের মত জ্ঞানের স্বতন্ত্র উপায় হিসাবে অনুমান খণ্ডনের বিষয়টি নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করেন নি। অন্যদিকে, চার্বাক দার্শনিকগণ স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে অনুমানের বৈধতা খণ্ডনের জন্য অনুমান খণ্ডন নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেছেন। সম্ভবত এ কারণেই চার্বাক দার্শনিকগণ আরোহানুমান ও অবরোহানুমান উভয় প্রকার অনুমানের বিপক্ষে স্বতন্ত্রভাবে যুক্তি প্রদান করেছেন ও উভয় প্রকার অনুমানকে খণ্ডন করেছেন। কিন্তু হিউম অবরোহানুমান নিয়ে এত স্পষ্ট ও বিস্তারিত আলোচনায় মনোযোগ দেন নি। এর কারণ সম্ভবত ভারতীয় ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসের মধ্যে নিহিত। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে এটা দেখা যায় যে, চার্বাক ব্যতীত সবগুলো ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় একাধারে প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করায় তাঁদেরকে বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদী বা বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতাবাদী হিসাবে আখ্যায়িত করা যায় না। সুতরাং চার্বাকগণই ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে প্রথম চরম অভিজ্ঞতাবাদী। এ হিসাবে চার্বাক দার্শনিকদের প্রত্যক্ষবাদী মত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বুদ্ধিবাদী প্রমাণতত্ত্ব তথা অনুমান-প্রমাণ খণ্ডন করা আবশ্যকীয় ছিল। এছাড়া, একই কারণে অনুমানের মত শব্দ-প্রমাণকেও খণ্ডন করা তাঁদের দায়িত্ব ছিল, যা তাঁরা করেছেন। অন্যদিকে, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যায় বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের দুটি পরস্পর বিরোধী স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ধারা হিউমের পূর্ব থেকেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। হিউম বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদের একজন প্রতিনিধি এবং জন লক ও জর্জ বার্কলের অভিজ্ঞতাবাদের উত্তরসূরী। জন লকই বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদের গোড়াপত্তন করেন। তাই তিনি পূর্ববর্তী কার্তেজীয় বুদ্ধিবাদের মূলভিত্তি সহজাত ধারণা খণ্ডনে প্রয়াসী ছিলেন। সুতরাং হিউমের পক্ষে বুদ্ধিবাদ তথা অনুমান প্রমাণকে স্বতন্ত্রভাবে খণ্ডনের প্রয়োজন ছিল না, যা চার্বাকদের জন্য ঐতিহাসিক কারণেই আবশ্যক ছিল।

সংক্ষিপ্তসার ঃ উপরের অনুমান খণ্ডন প্রসঙ্গে চার্বাক ও হিউমের আলোচনার তুলনা থেকে তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্ত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

সাদৃশ্য ঃ ১। চার্বাকগণ ও হিউম আরোহ অনুমানের প্রামাণ্য খণ্ডন করেছেন। অর্থাৎ বৈধজ্ঞানের উপায় হিসাবে তাঁরা উভয়ই আরোহানুমানের সম্ভাবনা খণ্ডন করেছেন। কেননা তাঁদের মতে, যে ভিত্তির উপর নির্ভর করে আরোহানুমান সম্ভব হয় সে ভিত্তি যথার্থ নয়। চার্বাকদের মতে, ব্যাপ্তি জ্ঞানই আরোহের ভিত্তি। কিন্তু ব্যাপ্তি জ্ঞানকে বৈধ বলে প্রমাণ করা যায় না। হিউমের মতে, কার্যকারণ সম্পর্কের ধারণা আরোহানুমানের ভিত্তি। কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্কের আবশ্যিকতাও প্রমাণ করা যায় না।

বৈসাদৃশ্য ঃ ১। চার্বাক দার্শনিকগণ ব্যাপ্তি জ্ঞানকে আরোহানুমানের ভিত্তি হিসাবে ধরে নিয়েছেন। ব্যাপ্তি হল সাধ্য ও হেতুপদের সার্বিক এবং অনিবার্য সম্পর্ক। তাঁরা অনুমানকে খণ্ডন করতে গিয়ে বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে ব্যাপ্তির ধারণাকে খণ্ডন করেছেন। তাঁদের মতে, প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ইত্যাদি কোন প্রকার প্রমাণ দ্বারাই ব্যাপ্তি জ্ঞান পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, হিউম কার্যকারণ সম্পর্ককে আরোহানুমানের ভিত্তি হিসাবে চিহ্নিত করেন। তিনি আরোহানুমান খণ্ডনের জন্য কার্যকারণ সম্পর্ক খণ্ডনের পক্ষে যুক্তি প্রদান করেন। তাঁর মতে, কার্যকারণের আবশ্যিকতার জ্ঞান বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা কোনটি দ্বারাই পাওয়া যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

২। চার্বাক ছাড়া আর সকল ভারতীয় দার্শনিকই অনুমানকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন বলে চার্বাক অনুমান খণ্ডন একটি স্বতন্ত্র এবং একক তথা ভারতীয় দর্শনে বিপ্লবাত্মক প্রচেষ্টা। সম্ভবত এ কারণেই চার্বাক দর্শনে অনুমান খণ্ডনের বিষয়টি স্বতন্ত্র ও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। তাঁরা শুধু আরোহানুমান নয় অবরোহানুমানকেও চক্রক দোষে দুষ্ট বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। ভারতীয় দর্শনে পাশ্চাত্য দর্শনে মত বুদ্ধিবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী সম্প্রদায় আলাদাভাবে চিহ্নিত নয় বলে চরম অভিজ্ঞতাবাদী হিসাবে ঐতিহাসিক কারণেই চার্বাকদের অনুমানকে স্বতন্ত্রভাবে খণ্ডন করতে হয়েছে।

পক্ষান্তরে, হিউমের জ্ঞানতত্ত্বে সার্বিক জ্ঞান খণ্ডন করতে গিয়ে এর ভিত্তি হিসাবে অনুমান খণ্ডনের বিষয়টি এসেছে। তাই এ আলোচনা স্বতন্ত্র ও বিস্তৃত রূপ পায় নি। এমনকি হিউম শুধু আরোহানুমানের সমস্যাকেই তুলে ধরেছেন। অবরোহানুমান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন নি। এর কারণ সম্ভবত এই যে, পাশ্চাত্য দর্শনে বুদ্ধিবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক গোষ্ঠী হিউমের বহু আগে থেকেই চিহ্নিত এবং হিউম মূলত অভিজ্ঞতাবাদী দলেরই উত্তরসূরী। সুতরাং তাঁর বিপ্লবাত্মক ভূমিকা অভিজ্ঞতাবাদের সঙ্গতিপূর্ণ পরিণতি দানের ক্ষেত্রে, চার্বাকদের মত অভিজ্ঞতাবাদের ভিত্তি রচনার ক্ষেত্রে নয়।

উপরের আলোচনা থেকে একথা বলা যায় যে, হিউম আঠারো শতকে আরোহ অনুমানকে খণ্ডন করেছেন। কিন্তু খ্রিষ্টপূর্ব বহু শতক পূর্বে ভারতীয় দার্শনিক চার্বাক সম্প্রদায়ই অনুমান খণ্ডনের ধারণার প্রবর্তন করেছেন। চার্বাকগণ আরোহ ও অবরোহ উভয় প্রকার অনুমানকে খণ্ডন করেন। পাশ্চাত্য দর্শনে বহুযুগ পরে জন ষ্টুয়ার্ট মিল ও অবরোহ অনুমানের বিরুদ্ধে একইরূপ যুক্তি উথাপন করেন। তাই একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য দর্শনে অনুমান খণ্ডনের যে ধারণা আছে চার্বাক দার্শনিকগণই এর প্রবর্তক।

এছাড়া, যে যুক্তিতে হিউম অনুমানকে খণ্ডন করেছেন চার্বাকদের ব্যবহৃত যুক্তির সাথে এর মৌলিক কোন পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। কারণ, ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যায় আরোহের ভিত্তি ব্যাপ্তি সম্পর্ক এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা, বিশেষত হিউমের জ্ঞানবিদ্যায় আরোহের ভিত্তি কার্যকারণের আবশ্যিকতার সম্পর্ক। চার্বাকগণ যেভাবে ব্যাপ্তি সম্পর্কে জ্ঞানের অসম্ভাব্যতা দেখিয়ে আরোহানুমান খণ্ডন করেছেন ঠিক তেমনি হিউমও কার্যকারণের আবশ্যিক সম্পর্কের জ্ঞানের অসম্ভাব্যতা দেখিয়ে আরোহানুমান খণ্ডন করেছেন। সুতরাং, হিউম যে পদ্ধতিতে অনুমান খণ্ডন করেছেন চার্বাক দার্শনিকদের সে পদ্ধতির প্রবর্তনকারী হিসাবে আখ্যায়িত করা সম্ভবত অযৌক্তিক নয়। ব্যাপ্তি ও কার্যকারণের আবশ্যিক সম্পর্কের মধ্যে যদি কোন পার্থক্য না থাকে তবে একথাও বলা যায় যে, পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্বে আরোহানুমানের ভিত্তি হিসাবে যে ধারণাকে গ্রহণ করা হয়েছে ভারতীয় দার্শনিকগণই এর ভিত্তিস্থাপন করেন। এছাড়া, দর্শনের ইতিহাসে আরোহানুমান ও অবরোহানুমান খণ্ডনের ধারণা, খণ্ডন পদ্ধতি এবং এর জন্য ব্যবহৃত যেসব যুক্তি আছে সে সবের আদি প্রবর্তক হিসাবে চার্বাকদের নামই উল্লেখ করা যায়।

৫.৩ শাশ্বত আত্মার ধারণা খণ্ডন প্রসঙ্গে

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে আত্মার ধারণাটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত সমস্যা। পূর্ববর্তী আলোচনায়[৮] আমরা দেখেছি যে, জ্ঞানসাধনার ইতিহাসে ঋগ্বেদ সংহিতায়ই সর্বপ্রথম আত্মা সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত হয়। পরবর্তীতে উপনিষদ-পূর্ব বৈদিক সাহিত্য এবং গীতা ও উপনিষদে এ ধারণাটি বহুল আলোচিত বিষয় হিসেবে গণ্য হয়। এছাড়া জৈন, ন্যায়, বৈশেষিক মীমাংসা, সাংখ্য ও যোগ দর্শনেও আত্মার আলোচনা প্রাধান্য পায়। এসব আলোচনায় আত্মাকে একটি আধ্যাত্মিক দ্রব্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ভারতীয় দর্শনে মন ও আত্মা দু'টি স্বতন্ত্র ধারণা। অনেক ভারতীয় দার্শনিক মনকে একটি স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় হিসাবে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু তাঁদের মতে, আত্মা জ্ঞাতা, ইন্দ্রিয় নয়। অনেকের মতে, আত্মা জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা। কিন্তু এটি যে একটি আধ্যাত্মিক দ্রব্য এ ব্যাপারে চার্বাক ও বৌদ্ধ দর্শন ব্যতীত আর সকলেই একমত। ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে চার্বাক ও বৌদ্ধ এদু'টি দার্শনিক সম্প্রদায়ই একমাত্র আধ্যাত্মিক দ্রব্য হিসাবে আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। এদিক থেকে চার্বাক দর্শনই প্রাচীনতম ভারতীয় দর্শন যেখানে স্বতন্ত্র দ্রব্য হিসাবে আত্মার ধারণাকে প্রথম অস্বীকার করা হয়।[৯] পরবর্তীতে গৌতম বুদ্ধও শাশ্বত আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। তবে বুদ্ধ ও চার্বাকদের আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকৃতির মধ্যে মূল পার্থক্য হল, চার্বাকগণ আত্মাকে অস্বীকার করেছেন অভিজ্ঞতাবাদের ভিত্তিতে। কিন্তু বুদ্ধ করেছেন অনিত্যবাদ বা সর্বব্যাপক পরিবর্তনবাদের ভিত্তিতে। এছাড়া, চার্বাকগণ আত্মাকে দেহের উপবস্তু বলেছেন যাকে দেহাত্মবাদ নামে অভিহিত করা হয়। এমতবাদ অনুসারে আত্মা দেহ থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয় বরং আত্মা দেহের সাথে অভিন্ন এবং ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এ চার প্রকার জড় দ্রব্য দ্বারা গঠিত। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনে আত্মা চেতনার প্রবাহ। এটি একটি মনোদৈহিক অবয়ব। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ আত্মাকে পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি বলেন। পঞ্চস্কন্ধের একটি স্কন্ধ জড়ীয়, অন্য চারটি মানসিক। এ মতবাদ অনাত্মবাদ নামে খ্যাত।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় দর্শনে আত্মা ও মন আলাদা হলেও পাশ্চাত্য দর্শনে আত্মা ও মন এ শব্দ দু'টি অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। পাশ্চাত্য দর্শনেও আত্মার ধারণা আদি যুগ থেকেই একটি স্বীকৃত ও বিতর্কিত ধারণা। প্রাক-সক্রেটিস যুগে আত্মা বলতে গ্রীক দার্শনিকগণ একটি প্রাণশক্তি বা বাষ্পময় দ্রব্যকে বুঝতেন যা দৈহিক জীবনের জন্য আবশ্যক। কিন্তু এ আত্মা চেতনার অধিষ্ঠান বা কর্মের উৎস নয়। আত্মাই দেহের বাহক ও ধারক। আত্মা ছাড়া দেহ নির্জীব ও সংবেদনহীন। হিরাক্লিটাস আত্মাকে নিয়ত বহিমান দৈব আগুণের অংশ মনে করেন। পিথাগোরীয় দার্শনিকবৃন্দ আত্মাকে দেহের পিঞ্জরে আবদ্ধ দেবতা বলে মনে করতেন। আত্মা বলতে আজ আমরা যা বুঝি সক্রেটিস পাশ্চাত্য দর্শনে সর্বপ্রথম এ ধারণার প্রবর্তন করেন। তিনিই প্রথম আত্মাকে বুদ্ধি সংক্রান্ত নৈতিক শক্তি হিসাবে কল্পনা করেন যা ভাল ও মন্দ আচরণের জন্য দায়ী। পরবর্তীতে প্লেটোর দর্শনে প্রথম আত্মাকে একটি অবিনাশি অনিত্য দ্রব্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে আত্মা সম্পর্কে একটি সুসঙ্গত মতবাদ প্রদান করা হয়। মধ্যযুগেও সব দার্শনিকই আত্মাকে আধ্যাত্মিক দ্রব্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আধুনিক যুগে দেকার্ত, স্পিনোজা, প্রমুখ বুদ্ধিবাদী এবং লক, বার্কলে প্রমুখ অভিজ্ঞতাবাদীও আত্মাকে স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিক দ্রব্য বলে মনে করেন। পাশ্চাত্য আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদী হিউমই প্রথম আত্মার এ প্রচলিত ধারণাকে খণ্ডন করেন। তিনিও চার্বাকদের মত অভিজ্ঞতাবাদ তথা তাঁর ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা মতবাদের ভিত্তিতে আধ্যাত্মিক দ্রব্যরূপ শাশ্বত আত্মার ধারণাকে খণ্ডন করেন।

চার্বাক ও হিউমের আত্মা সম্পর্কিত মতবাদের বিভিন্ন দিক থেকে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। হিউমের আত্মা সম্পর্কিত আলোচনাকে দু'ভাগে বিভক্ত করে প্রথম অংশকে নঞর্থক তথা প্রচলিত আত্মা সম্পর্কিত ধারণা খণ্ডনমূলক এবং পরবর্তী অংশকে সদর্থক বা গঠনমূলক অর্থাৎ আত্মা সম্পর্কে হিউমের নিজস্ব মতের ব্যাখ্যা হিসাবে উল্লেখ করা যায়।[১০] চার্বাকদের আলোচনাকে এভাবে স্পষ্ট দু'ভাগে বিভক্ত করা না গেলেও একথা বলা যায় যে, চার্বাক দার্শনিকগণ আত্মা সম্পর্কিত প্রচলিত আধ্যাত্মিক দ্রব্য মতবাদকে খণ্ডন করে এ সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব মত ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং তারাও প্রচলিত মত খণ্ডন ও নিজস্ব মত প্রদানের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

চার্বাক দার্শনিকগণ যদিও আত্মা সম্পর্কিত মতবাদ দিতে গিয়ে হিউমের মত প্রচলিত মত খণ্ডনের বিষয়ে এত বিস্তারিত আলোচনা করেন নি তবুও এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, তাঁরা প্রত্যক্ষবাদের ভিত্তিতে দেহাতিরিক্ত দ্রব্য হিসাবে আত্মার ধারণাকে অস্বীকার করেছেন।[১১] চার্বাকগণ আত্মাকে দেহাতিরিক্ত কোন সত্তা বলে স্বীকার করেননা। এর কারণ হল, তাঁরা একমাত্র জড়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কেননা জড় ছাড়া অন্যকোন দ্রবের ধারণা প্রত্যক্ষ দ্বারা পাওয়া যায় না। সুতরাং কেবলমাত্র দেহ ছাড়া চিরন্তন বা শাশ্বত আধ্যাত্মিক দ্রব্য বা জ্ঞাতারূপ কোন আত্মার জ্ঞান পাওয়া যায় বলে চার্বাকগণ মনে করেননা। অর্থাৎ তাঁরা অভিজ্ঞতাবাদী ও বস্তুবাদী দিক থেকে দেহাতিরিক্ত শাশ্বত দ্রব্যরূপ আত্মার ধারণাকে অস্বীকার করেন।

হিউমও তাঁর আত্মা সম্পর্কিত মতবাদের নঞর্থক দিক আলোচনায় প্রচলিত আত্মা সম্পর্কিত মতবাদ খণ্ডন অর্থাৎ শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব খণ্ডনের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। এখানে তিনি তাঁর অভিজ্ঞাবাদের মূলসূত্র-যার ইন্দ্রিয়ছাপ নাই তার কোন ধারণাও থাকতে পারে না- প্রয়োগ করে দেখাতে চান যে, শাশ্বত আত্মার কোন ইন্দ্রিয়ছাপ আমরা কোনভাবেই পাইনা। সুতরাং, এর কোন ধারণাও থাকতে পারে না। আত্মার ধারণাকে খণ্ডন করতে গিয়ে হিউম দ্রব্যের ধারণাকে খণ্ডন করেন। তাঁর পূর্বসূরি বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদী লক বস্তুর দৃশ্যযোগ্য মুখ্য ও গৌণ গুণের পেছনে অজ্ঞেয় জড় ও মানসিক দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বার্কলে জড় দ্রব্যকে অজ্ঞেয় বলে অস্বীকার করেন কিন্তু তিনি মানসিক দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। হিউম প্রত্যক্ষণ তথা ইন্দ্রিয়ছাপ দ্বারা পাওয়া যায় না বলে জড়ীয় ও মানসিক উভয় প্রকার দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁর মতে, ইন্দ্রিয়ছাপ ছাড়া কোন কিছুর ধারণা পাওয়া যায় না। আত্মার ধারণা হল অপরিবর্তনীয় স্থির সত্তার ধারণা। এরূপ কোন ইন্দ্রিয়ছাপকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। সবগুলো প্রত্যক্ষণই পরস্পর পৃথক এবং এসব প্রত্যক্ষণের কোন ক্রমিক স্থায়িত্বও নাই। এছাড়া, এসব প্রত্যক্ষণের কোন ধারককেও প্রত্যক্ষ দ্বারা পাওয়া যায় না। সুতরাং শাশ্বত, অবিনশ্বর বা স্থায়ী কোন দ্রব্যরূপ আত্মার অস্তিত্বের ধারণা আমাদের থাকতে পারে না। বরং কেবল প্রত্যক্ষণেরই ধারণা থাকতে পারে। এখানে হিউম প্রত্যক্ষণগুলো থেকে দ্রব্য যে আলাদা তা প্রমাণ করতে গিয়ে প্রভেদকরণ (Distinguishable) ও বিচ্ছিন্নকরণ (Separable)-এর ধারণাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেন। তাঁর মতে, যা কিছু প্রভেদকরণযোগ্য তা বিচ্ছিন্নকরণযোগ্য। উল্লেখ্য যে, এস· এম· বর্লিঙ্গে প্রভেদকরণযোগ্য কোনকিছুকে বিচ্ছিন্নকরণযোগ্য মনে করাকে বাস্তবায়ন (Reification) নামক অবৈধ প্রক্রিয়া বলে মনে করেন।[১২] কারণ, প্রভেদকরণ অমূর্ত ধারণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা স্বাধীন অস্তিত্বশীল বস্তুসমূহ থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু বিচ্ছিন্নকরণ মূর্ত সত্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা দেশ ও কালে অস্তিত্বশীল। কোন কোন চিন্তাবিদ বার্লিঙ্গের এ প্রক্রিয়াকে মূল্য ও তথ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে মূল্য ও তথ্যকে প্রভেদযোগ্য বলেছেন। তবে এরা বিচ্ছিন্নকরণযোগ্য নয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিচ্ছিন্নকরণযোগ্য নয়। সুতরাং বার্লিঙ্গের দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করে হিউমের প্রত্যক্ষণগুলো প্রভেদকরণযোগ্য বলা যায় কিন্তু বিচ্ছিন্নকরণযোগ্য নয়। কারণ, প্রত্যক্ষণগুলো অমূর্ত বা মানসিক। সুতরাং একথা বলা যায় যে, এখানে প্রত্যক্ষণ ও দ্রব্যকে আলাদা করতে গিয়ে হিউম যে যুক্তি দিয়েছেন তাতে বার্লিঙ্গে নির্দেশিত বাস্তবায়ন নামক অবৈধ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এতে কোন সন্দেহ নাই যে, তিনি প্রত্যক্ষণযোগ্য নয় বলেই দ্রব্যের ধারণার স্থান পাওয়া যায় না বলে মত প্রকাশ করেছেন। সুতরাং দেখা যায়, চার্বাক ও হিউম উভয়ই প্রত্যক্ষণ দ্বারা পাওয়া যায় না বলে দেহাতিরিক্ত শাশ্বত সত্তা হিসাবে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন।

এটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চার্বাক ও হিউম প্রচলিত আত্মা সম্পর্কিত মত খণ্ডন করে এ সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব মতও প্রদান করেছেন। চার্বাকগণ আত্মা সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব মত প্রদান করতে গিয়ে আত্মাকে দেহের সাথে অভিন্ন হিসাবে বর্ণনা করেন। তাঁদের মতে, চেতনা সমন্বিত দেহই আত্মা। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ইত্যাদি চতুর্ভূত একটি বিশেষ পরিমাণে সমন্বিত হয়ে যখন মানবদেহ গঠন করে তখন এর মধ্যে চেতনা নামক গুণের উৎপত্তি হয়। সুতরাং আত্মা দেহাতিরিক্ত দ্রব্য নয় বরং দেহের আগন্তুক গুণ। দেহের মৃত্যুর সাথে আত্মারও মৃত্যু ঘটে। আত্মাকে দেহ থেকে আলাদা করা যায় না। এ প্রসঙ্গে চার্বাগণ যে উদাহরণটি ব্যবহার করেন তার উপর প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্রের তথা আয়ুর্বেদশাস্ত্রের প্রভাব লক্ষিত হয়। তাঁরা বলেন, মদ তৈরীর দ্রব্যাদিতে মাদকতা না থাকলেও যেমন এগুলোর সমন্বিত অবস্থায় মদ তৈরী হলে মাদকা শক্তি উৎপন্ন হয় অথবা চুন, পান, সুপারি খয়ের, ইত্যাদিতে লাল রং না থাকলেও যেমন এগুলো সমন্বিত হলে লাল রং এর উৎপত্তি হয় তেমনি চতুর্ভূত বিশেষ পরিমাণে সমন্বিত হয়ে দেহ উৎপন্ন হলে তাতে চেতনাগুণের আবির্ভাব ঘটে। সুতরাং তাঁদের মতে, দেহই আত্মা। আত্মা দেহের অতিরিক্ত দ্রব্য নয়। চেতনা দেহের উন্মেষমূলক গুণ। এজন্য তাঁদের মতবাদকে দেহাত্মবাদ বলে। বার্লিঙ্গের আলোচিত প্রভেদকরণ ও বিচ্ছিন্নকরণ ধারণা দু'টিকে চার্বাকদের দেহ ও আত্মার ধারণার উপর প্রয়োগ করে বলা যায়, চার্বাকদের দেহ ও আত্মা প্রভেদকরণযোগ্য কিন্তু বিচ্ছিন্নকরণযোগ্য নয়। কারণ, দেহের অবস্থান দেশ কালে থাকলেও আত্মা তার গুণ। অর্থাৎ আত্মা অমূর্ত বিষয়। চার্বাক দেহাত্মবাদের সাথে উনিশ শতকের দেহমন সম্পর্কিত উপঘটনাবাদের মিল লক্ষিত হয়। এছাড়া কার্ল মার্ক্সের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে চেতনার উদ্ভবের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয় চার্বাক দেহাত্মবাদেই তার বীজ বপন করা হয়েছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

হিউম তাঁর আত্মা সম্পর্কিত মতবাদের সদর্থক বা গঠনমূলক দিক আলোচনা করতে গিয়ে আত্মাকে প্রবাহমান প্রত্যক্ষণের সমষ্টি হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি যখন আমিত্বকে খুঁজতে যান তখন ঠাণ্ডা-গরম,ভালবাসা-ঘৃণা, আলো-অন্ধকার ইত্যাদি প্রত্যক্ষণ ছাড়া আর কিছুকে খুঁজে পান না। তিনি এও বলেন যে, যখন তিনি ঘুমন্ত থাকেন তখন এসব প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে সচেতন থাকেন না এবং তখন আত্মা বলে তাঁর মধ্যে অন্য কিছুকে তিনি খুঁজে পান না। তাই তাঁর মতে, যখন তিনি প্রত্যক্ষণগুলোকে অনুভব করেন না তখন তিনি যথার্থ অর্থে অস্তিত্বশীল থাকেন না। তাঁর কাছে গোটা মানবজাতি হল ধারণাতীত দ্রুততার সাথে পরস্পরকে অনুসরণ করে এমনসব প্রত্যক্ষণের পুঞ্জ বা সমষ্টি মাত্র। এজন্য হিউমের ব্যাখ্যা থেকে আত্মা সম্পর্কে যে তিনটি মূলসূত্র পাওয়া যায় সেগুলো হল, (ক) আত্মা বিভিন্ন স্বতন্ত্র প্রত্যক্ষণের সমষ্টি বা পুঞ্জ ছাড়া আর কিছুই নয়; (খ) এসব প্রত্যক্ষণ ধারণাতীত দ্রুততার সাথে পরস্পরকে অনুসরণ করে; এবং (গ) প্রত্যক্ষণগুলো সবসময়ই পরিবর্তিত হতে থাকে এবং এরা গতিশীল। এজন্য হিউমের আত্মা সম্পর্কিত মতবাদকে পুঞ্জবাদ নামে আখ্যায়িত করা হয়। সুতরাং দেখা যায়, চার্বাকগণ আত্মাকে দেহের উপবস্তু বা উপঘটনা হিসাবে আখ্যায়িত করে দেহকে আত্মার সাথে অভিন্ন বলেছেন। তাঁদের এ মতবাদ দেহাত্মবাদ বলে পরিচিত। পক্ষান্তরে হিউম আত্মাকে প্রত্যক্ষণের পুঞ্জ হিসাবে আখ্যায়িত করে আত্মা সম্পর্কিত পুঞ্জবাদ প্রদান করেন। চার্বাক প্রদত্ত আত্মার ব্যাখ্যা বস্তুবাদী। কিন্তু হিউম প্রদত্ত আত্মার ব্যাখ্যা জ্ঞানতাত্ত্বিক তথা মনস্তাত্ত্বিক। হিউম প্রদত্ত আত্মার পুঞ্জবাদী মতবাদ দ্বারা হিউমের পরবর্তী পাশ্চাত্য দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল, উইলিয়াম জেমস, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রমুখ দার্শনিক প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে হয়। কারণ, তাঁরা সকলেই দেহাতিরিক্ত দ্রব্য হিসাবে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে অভিজ্ঞতামূলক আত্মার কথা বলেছেন। অন্যকথায়, তাঁরা সকলেই আত্মাকে মানসিক ঘটনা অর্থাৎ প্রত্যক্ষণের পুঞ্জ হিসবে আখ্যায়িত করেছেন।

হিউমের পুঞ্জবাদের সাথে ভারতীয় দার্শনিক গৌতম বুদ্ধের আত্মা সম্পর্কিত মতবাদে তথা অনাত্মাবাদেরও যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। বুদ্ধও দেহাতিরিক্ত দ্রব্য হিসাবে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন এবং অভিজ্ঞতাবাদী দিক থেকে আত্মার ধারণাকে ব্যাখ্যা করে আত্মাকে চেতনার প্রবাহ হিসাবে আখ্যায়িত করেন। তাঁর মতে, চিন্তা, স্মৃতি, সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, চেতনা ইত্যাদি ক্ষণস্থায়ী, গতিশীল ও পরস্পর নির্ভরশীল অবস্থাগুলোর যোগফলই হল আত্মা। এদিক থেকে বিচার করে বুদ্ধের অনাত্মাবাদকে হিউমের পুঞ্জবাদের পথিকৃৎ বলে বিবেচনা করা যায়। কিন্তু হিউমের পুঞ্জবাদের সাথে বুদ্ধের অনাত্মাবাদের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল,

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধ আত্মার একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে একে একটি মনোদৈহিক অবয়ব হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি আত্মাকে পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি হিসাবে আখ্যায়িত করেন। পঞ্চস্কন্ধ পাঁচটি উপাদানে গঠিত। তার মধ্যে একটি জড়ীয়, চারটি মানসিক উপাদান। কিন্তু হিউম আত্মা সম্পর্কে এরকম কোন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন নি। তিনি জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকে প্রচলিত দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করার মাধ্যমে আত্মার বস্তুত্ব ও অবস্তুত্ব সম্পর্কিত বিতর্কটিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য ও অর্থহীন বলে মনে করেছেন। তাঁর কাছে আত্মিক দ্রব্য সম্পর্কিত প্রশ্নটি দুর্বোধ্য। সুতরাং আত্মার কোন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেবার অবকাশ তাঁর মতবাদে নাই। স্মরণ করা যেতে পারে যে, চার্বাকগণ চেতনা বা আত্মাকে দেহের উপবস্তু বলে অভিহিত করে দেহাত্মবাদী মত প্রদান করে না অর্থাৎ বলা যায়, তাত্ত্বিক দিক থেকে চার্বাকগণ আত্মার বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু বুদ্ধের ব্যাখ্যা বস্তুবাদী নয়, বরং সম্ভবত দ্বৈতবাদী। কারণ, বুদ্ধের আত্মা মানসিক ও দৈহিক উভয় উপাদানে গঠিত মনোদৈহিক অবয়ব। তবে চার্বাক ও বৌদ্ধ উভয় দর্শনেই আত্মা সর্ম্পকে একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে একথা বলা যায়। পক্ষান্তরে, হিউমের আত্মা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা জ্ঞানতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক।

উল্লেখ্য যে, হিউম তাঁর আত্মা সম্পর্কিত আলোচনা করার পর আত্মা সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণার উৎপত্তির কারণও নির্দেশ করেন। এছাড়া, তাঁর আত্মার পুঞ্জবাদে যেহেতু প্রচলিত ব্যক্তি অভিন্নতার ব্যাখ্যা অস্বীকৃত হয় সেহেতু তিনি তাঁর মতবাদে ব্যক্তি অভিন্নতা সম্পর্কিত তাঁর নিজস্ব মতও ব্যাখ্যা করেন। বুদ্ধও তাঁর অনাত্মাবাদের আলোচনায় প্রচলিত আত্মা সম্পর্কিত ধারণার কারণ নিয়ে স্পষ্ট আলোচনা করেছেন এবং ব্যক্তি ভিন্নতার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে প্রয়াসী হয়েছেন। তবে চার্বাক দর্শনে এসব বিষয়ে হিউমের বা বুদ্ধের দর্শনের মত কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার প্রয়াস লক্ষিত হয় না। হিউম আত্মা সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণার কারণ হিসাবে অনুসঙ্গ নিয়মের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, আত্মার ধারণা একটি যৌগিক ধারণা। বিভিন্ন সরল ধারণার সমন্বয়ে এর সৃষ্টি। এর সৃষ্টিতে যে সম্বন্ধগুলো কাজ করে সে সম্বন্ধগুলোকে একত্রে তিনি অনুসঙ্গ নিয়ম হিসাবে নামকরণ করেন। অনুসঙ্গ নিয়ম সাদৃশ্য, সান্নিধ্য ও কার্যকারণ এ তিনটি সম্বন্ধের ধারণার মাধ্যমে গঠিত হয়। হিউমের মতে, ধারণাতীত দ্রুততার সাথে অনুক্রমণশীল প্রত্যক্ষণগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য, সান্নিধ্য ও কার্যকারণের সম্বন্ধ থাকায় এদেরকে অভিন্ন বলে মনে করা হয় এবং এভাবেই শাশ্বত বা অপরিবর্তনশীল আত্মা এবং ব্যক্তি অভিন্নতার ধারণাটি গঠিত হয়। লক্ষিত পরিবর্তনের মাঝেও দেহ বা আত্মার অপরিবর্তনের যে ধারণা এটাই অভিন্নতার ধারণা। হিউমের মতে, অভিন্নতা সম্পর্কিত উপরোক্ত যে ধারণা দর্শনে প্রচলিত তা ভ্রান্তিমূলক আরোপিত মানসিক প্রবণতা যা অনুসঙ্গ নিয়মের দ্বারা ঘটে থাকে। অনুসঙ্গ নিয়মের কারণেই পরিবর্তনের মধ্যে অপরিবর্তনের ধারণাটি সৃষ্টি হয়। যোগসূত্রটি কল্পিত। তাই তিনি অভিন্নতা সম্পর্কিত বিতর্ককে বাচনিক (Verbal) হিসাবে চিহ্নিত করেন। অর্থাৎ বিতর্কটি অভিন্নতা শব্দটির দ্বারা কি অর্থ প্রকাশ করা হয় তাকে নিয়ে। বাচনিক সমস্যা হিসাবে তাঁর কাছে অভিন্নতার সমস্যা ব্যাকরণের সমস্যা, দার্শনিক সমস্যা নয়। সুতরং হিউমের মতে, অভিন্নতা মূলত অনুসঙ্গ নিয়মদ্বারা উৎপন্ন কল্পিত মানসিক সম্বন্ধ। বাস্তবে এর অস্তিত্ব নাই। স্মৃতিই অনুসঙ্গ নিয়মের তিনটি সম্বন্ধকে পর্যবেক্ষণ করে। তাই তিনি স্মৃতিকে ব্যক্তি অভিন্নতার উৎস হিসাবে আখ্যায়িত করেন। অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তি অভিন্নতার ব্যাখ্যাও মনস্তাত্ত্বিক। অবশ্য কেবল হিউম নয়, আত্মা সম্পর্কিত পুঞ্জবাদের সমর্থক সকল দার্শনিকই ব্যক্তি অভিন্নতার উৎস হিসাবে স্মৃতিকে দায়ী করেছেন। উল্লেখ্য যে, বুদ্ধ তাঁর অনাত্মাবাদে শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও ব্যক্তি অভিন্নতাকে আরোপিত মানসিক প্রবণতাজনিত ভ্রান্তি বলেন নি। বরং তিনি ব্যক্তি অভিন্নতাকে জীবনের বিভিন্ন অবস্থার পারম্পর্য বা ধারাবাহিক প্রবাহ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর এ ব্যাখ্যার ভিত্তি হল তাঁর সৎকার্যবাদ বা কার্যকারণ সম্পর্ক। এ সম্পর্ক হিউম ও চার্বাকদের কেউই স্বীকার করেন নি।

চার্বাক দার্শনিকগণ ব্যক্তি অভিন্নতার স্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা দিয়েছেন বলে জানা যায় না। প্রশ্ন উঠতে পারে দেহাত্মবাদের সমর্থন করে তাঁদের পক্ষে ব্যক্তি অভিন্নতাকে ব্যাখ্যা করার কোন উপায় ছিল কি না? এর উত্তরে দু'টি সম্ভাবনার কথা বলা যেতে পারে। প্রথমত, বস্তুবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী চার্বাকগণ দৈহিক অভিন্নতা দ্বারা ব্যক্তি অভিন্নতার ব্যাখ্যা দিতে পারেন। কারণ, তাঁরা একটি বিশেষ পরিমাণে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এর মধ্যে যে অভিন্নতা আছে তাদ্বারাই ব্যক্তি অভিন্নতার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে বলে মনে করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে সমস্যা হল, এ চতুর্ভূত অপরিবর্তনশীল কি না। দেহ গঠনকারী উপাদান চতুষ্টয়কে অপরিবর্তনশীল বলে ধরে নিলে মানব দেহের বর্ধন বা পরিবর্তন ব্যাখা চার্বাকদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে বলে মনে হয়। আর দেহ গঠনকারী চতুর্ভূত পরিবর্তনশীল হলে দেহের অভিন্নতা দ্বারা ব্যক্তি অভিন্নতা ব্যাখ্যায় জটিলতা সৃষ্টি হয়। চার্বাকদের ব্যক্তি অভিন্নতার ব্যাখ্যার দ্বিতীয় সম্ভবনা হিসাবে হিউম প্রদত্ত ব্যক্তি অভিন্নতার ব্যাখ্যাটির কথা বলা যায়। এ ব্যাখ্যাটি চার্বাকদের জন্যও বিবেচ্য

Dhaka University Institutional Repository

হতে পারে। অন্তত এতে তাঁদের বস্তুবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী অবস্থান ক্ষুণ হয় না। অর্থাৎ তাঁরা ব্যক্তি অভিন্নতাকে স্মৃতি নামক ক্ষমতার দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারতেন, যদিও এরূপ কোন ব্যাখ্যা তাঁদের মতবাদে লক্ষিত হয় না। বুদ্ধ যেদিক থেকে ব্যক্তি অভিন্নতাকে ব্যাখ্যা করেছেন সে পথ হিউমের মত চার্বাকদের জন্যও খোলা ছিল না। কারণ, তাঁরাও তাঁদের অভিজ্ঞতাবাদী অবস্থানে আপোষহীন থেকে কার্যকারণের আবশ্যিকতাকে অস্বীকার করে একে সম্ভাবনা ও আকস্মিকতা হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

একথা বলা যায় যে, চার্বাকগণ কেবল আত্মা সম্পর্কিত দেহাত্মবাদী মতবাদ দিয়েই তাঁদের দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন। আবশ্য তাঁরা যদি দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসের কারণ নির্ণয় করতে প্রয়াসী হতেন তবে বুদ্ধের মত প্রজ্ঞাজনিত বা হিউমের মত মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার মধ্যে এর কারণ অনুসন্ধান না করে তাঁরা হয়ত বা তৎকালীন সামাজিক অবস্থার মধ্যে এর কারণ খুঁজে পেতেন। তাঁরা হয়ত একথা বলতেন যে, শাশ্বত আত্মার ধারণার সাথে পরজন্মের ধারণা, পরজন্মের ধারণার সাথে পাপের ধারণা, পাপের ধারণার সাথে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করার ধারণা সম্পর্কিত। সুতরাং শাশ্বত আত্মার ধারণা ছিল ভারতের তৎকালীন উচ্চশ্রেণী কর্তৃক স্বকল্পিত একটি আধ্যাত্মিক ধারণা যার মধ্যে নিম্নশ্রেণীকে শোষণের বীজ নিহিত। কিন্তু হিউম মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে আত্মা সম্পর্কিত প্রচলিত মতবাদের কারণ নির্ণয় করেছেন এবং ব্যক্তি অভিন্নতার ব্যাখ্যায়ও প্রয়াসী হয়েছেন। আত্মা সম্পর্কে প্রচলিত মতবাদ খণ্ডনের ক্ষেত্রে এক মতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত মতবাদের উৎপত্তির কারণ নির্ণয়ে ভিন্ন মতাবলম্বন করার কারণ সম্ভবত তাঁদের উভয়ের দর্শনালোচনার উদ্দেশ্যের মধ্যেই নিহিত। চার্বাক দার্শনিক মতবাদ তৎকালীন সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ। তাঁরা তৎকালীন শোষণমূলক তত্ত্বকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে গিয়ে নিজস্ব মতবাদ দিয়েছেন। কিন্তু হিউম মূলত মানব প্রকৃতির স্বরূপ তথা মনস্তাত্ত্বিক নীতিমালা অনুসন্ধান করেছেন। সুতরাং উদ্দেশ্যগত কারণেই চার্বাকগণ এসব প্রচলিত ধারণার পেছনে বর্ণবৈষম্য,শ্রেণীশোষণ প্রভৃতি প্রায়োগিক কারণ নির্দেশ করেছেন আর হিউম এসবের কারণ খুঁজেছেন মানব প্রকৃতির মধ্যে অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক নীতিমালার মধ্যে।

সংক্ষিপ্তসার: শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব খণ্ডন সম্পর্কিত উপরের আলোচনা থেকে চার্বাক ও হিউমের মতের মধ্যে নিম্নোক্ত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যসমূহ পরিলক্ষিত হয়:

সাদৃশ্য : ১। চার্বাক ও হিউম উভয়ই দেহাতিরিক্ত শাশ্বত দ্রব্য হিসাবে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। ভারতীয় দর্শনে আত্মা সম্পর্কিত আধ্যাত্মিক মতবাদকে চার্বাকগণই প্রথম খণ্ডন করেন এবং আধ্যাত্মিক দ্রব্য হিসাবে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। পাশ্চাত্য দর্শনে হিউমও অনুরূপভাবে প্রাচীন যুগ থেকে প্রচলিত আত্মা সম্পর্কিত মতবাদকে খণ্ডন করেন এবং শাশ্বত আধ্যাত্মিক দ্রব্য হিসাবে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন।

২। চার্বাক ও হিউম উভয়ের দর্শনেই অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রচলিত আত্মার ধারণাকে খণ্ডন করা হয়েছে। চার্বাকগণ যেমন প্রত্যক্ষণে বাহ্য প্রত্যক্ষের মাধ্যমে দেহাতিরিক্ত দ্রব্যের কোন ধারণাকে খুঁজে পান নি তেমনি হিউমও নিত্য, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল আধ্যাত্মিক দ্রব্যরূপ কোন আত্মার ধারণা ইন্দ্রিয়ছাপের মধ্যে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হন। সুতরাং বলা যায়, উভয় ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষবাদী জ্ঞানতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রচলিত আত্মার ধারণাকে খণ্ডন করা হয়েছে।

৩। চার্বাকগণ আত্মা ও চেতনাকে স্পষ্টত অভিন্ন বলে স্বীকার করেছেন এবং চেতনার উৎপত্তির ব্যাখ্যা দিয়ে একে দেহের উপবস্তু বলেছেন। হিউম চেতনার উৎপত্তির ব্যাখ্যা দেন নি এবং আত্মা ও চেতনাকে অভিন্ন অর্থে দেখেছেন কি না তাও স্পষ্ট করে বলেন নি। তবে তিনি প্রত্যক্ষণগুলোকেই আত্মা বলে উল্লেখ করেন এবং প্রত্যক্ষণের স্বরূপ বর্ণনায় তিনি এগুলোকে সম্পূর্ণ অবিভাজ্য ও অবিচ্ছিন্ন হিসাবে চিহ্নিত করেন। সুতরাং হিউম নির্দেশিত প্রত্যক্ষণের প্রকৃতি অজড় এবং চেতনার বিষয়। এদিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে, উভয় মতবাদেই আত্মা ও চেতনাকে অভিন্ন অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে, চার্বাকগণ এ ব্যাপারে স্পষ্ট তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা হিউম দেন নি।

বৈসাদৃশ্য : ১। চার্বাক প্রদত্ত আত্মা সম্পর্কিত মতবাদকে দেহাত্মবাদ বলা হয়। চার্বাকগণ দেহ ও আত্মাকে অভিন্ন বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, এ চার প্রকার জড় বস্তু বিশেষ পরিমাণে সমন্বিত হয়ে মানব দেহ গঠন করলে এর উপবস্তু হিসাবে চেতনা বা আত্মার উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ আত্মা দেহের আগন্তুক গুণ। তাই চার্বাকদের মতে, দেহের ধ্বংসে আত্মাও ধ্বংস হয়। পক্ষান্তরে, হিউমের আত্মা সম্পর্কিত মতবাদকে পুঞ্জবাদ বলা হয়। তাঁর মতে, যাকে আত্মা বলা হয় তা মূলত ধারাবাহিকভাবে অনুক্রমণশীল স্বতন্ত্র প্রত্যক্ষণের পুঞ্জ বা সমষ্টি। তাই হিউমের মতে, ঘুমন্ত অবস্থায় প্রত্যক্ষণগুলোকে অনুভব করা যায় না বলে তখন তিনি যথার্থ অর্থে অস্তিত্বশীল থাকেন না বা তখন আত্মাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। হিউম আত্মাকে দেহের আগন্তুক গুণ বলেন নি। বরংপ্রত্যক্ষণের পুঞ্জ বলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

২। চার্বাক দার্শনিকগণ প্রদত্ত আত্মার ব্যাখ্যা বস্তুবাদী। কারণ, তাঁরা আত্মাকে চতুর্ভূতের উপবস্তু বলে মনে করেন যার সাথে আধুনিক বস্তুবাদী মার্ক্সীয় ব্যাখ্যার মিল পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে, হিউম প্রদত্ত আত্মার ব্যাখ্যা জ্ঞানতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক। কারণ, তিনি আত্মাকে প্রত্যক্ষণের সমষ্টি বলে মনে করেন যাকে ইন্দ্রিয়ছাপের মাধ্যমে জানা যায়। তাঁর মতবাদের সাথে পরবর্তী পাশ্চাত্য প্রত্যক্ষবাদী, প্রয়োগবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদের মিল পরিলক্ষিত হয়।

৩। চার্বাক দর্শনে ব্যক্তি অভিন্নতার কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয় নি। সম্ভবত এর কারণ হল এই যে, চার্বাকদের মূল উদ্দেশ্য ছিল আত্মার ধারণার ব্যাখ্যা দেয়া নয় বরং তৎকালীন শ্রেণীবৈষম্যমূলক সমাজে শোষণমুক্তির জন্য শোষণের ভিত প্রস্তুতকারী অধ্যাত্মবাদ খণ্ডন। অবশ্য যদি তারা স্মৃতিকে ধারক হিসাবে গ্রহণ করে ব্যক্তি অভিন্নতাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস নিতেন তবুও সম্ভবত তাঁদের এ ব্যাখ্যা তাঁদের প্রত্যক্ষবাদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হত না। পক্ষান্তরে, হিউমের দর্শনে ব্যক্তি অভিন্নতার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। তিনি ব্যক্তি অভিন্নতাকে একটি আরোপিত মানসিক প্রবণতাজনিত ভ্রান্তি বলে মনে করেন যা অনুসঙ্গ নিয়মের কারণে সম্পাদিত হয়। স্মৃতিই অনুসঙ্গ নিয়মের ধারক হিসাবে কাজ করে ব্যক্তি অভিন্নতার ধারণার ভিত্তি স্থাপন করে। চরম অভিজ্ঞতাবাদী হিসাবে তাঁর এ ব্যাখ্যা তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

৪। চার্বাকগণ আত্মা সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণার উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত আলোচনা করেন নি। তবে এটা মনে করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, এর কারণ নির্ণয় করতে গেলে তাঁরা একে তৎকালীন সমাজের উচ্চশ্রেণীর দ্বারা নিম্নশ্রেণীকে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের জন্য কল্পিত ধারণা বলেই মনে করতেন। কারণ, আত্মা চিরন্তন না হলে পরকালের ধারণা, এবং পরকালের ধারণা না থাকলে ব্রাহ্মণদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পাপের ধারণা ঠিক থাকে না। পক্ষান্তরে, হিউম আত্মা সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণার কারণ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, এর কারণ মনস্তাত্ত্বিক। অনুসঙ্গ নিয়মের কারণে আত্মার ধারণা করা হয়। এবং এ অনুসঙ্গ নিয়মই ব্যক্তি অভিন্নতার ধারণারও কারণ।=

উপরের আলোচনা থেকে একথা বলা যায় যে, অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিকোন থেকে শাশ্বত দ্রব্য হিসাবে আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কিত মতবাদ খণ্ডন করার ক্ষেত্রে হিউম যে ধারণা পোষণ করেন চার্বাক দার্শনিকগণই সে ধারণার পথিকৃৎ। এছাড়া একথাও বলা যায় যে, দর্শনের ইতিহাসে চার্বাকগণ যেমন প্রথম বস্তুবাদী ও প্রথম অভিজ্ঞতাবাদী তেমনি তাঁরা দেহাতিরিক্ত আধ্যাত্মিক দ্রব্য হিসাবে আত্মার অস্তিত্ব খণ্ডনের ধারণারও আদি প্রবর্তক। অবশ্য হিউমের মতবাদে যেভাবে ব্যক্তি অভিন্নতার ধারণার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস নেয়া হয়েছে চার্বাক দর্শনে তা অনুপস্থিত। তবে আত্মা সম্পর্কে দেহাত্মাবাদের যে ধারণা চার্বাকগণ বহুযুগ আগেই প্রবর্তন করে গেছেন সে ধারণাকে চেতনা সম্পর্কে আধুনিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যারও পথিকৃৎ বলে গণ্য করা যায়।

৫.৪ কার্যকারণের আবশ্যিকতা খণ্ডন প্রসঙ্গে

কার্যকারণের ধারণা দর্শন ও বিজ্ঞানে একটি বহুল আলোচিত ও স্বীকৃত ধারণা। এর মূল কথা হল, সকল কার্যেরই কারণ আছে এবং কার্য ও কারণের মধ্যে অনিবার্য বা আবশ্যিক সম্পর্ক বর্তমান। এ তত্ত্বের উপর নির্ভর করেই আধুনিক বিজ্ঞান তার সূত্রসমূহকে প্রমাণ করেছে।

চার্বাক ছাড়া ভারতীয় দর্শনে অন্য সকল সম্প্রদায়ই মুক্তি বা মোক্ষের প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দিয়েছে এবং বন্ধনের কারণ হিসাবে অবিদ্যার কথা বলে অবিদ্যার হাত থেকে মুক্তিকেই মোক্ষের উপায় হিসাবে নির্দেশ করেছে। এতে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে কার্যকারণ তত্ত্বকেই স্বীকার করা হয়েছে। বৌদ্ধদর্শনে কার্যকারণ তত্ত্বটিকে যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ বা কার্যকারণকে একটি দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে স্বীকার করে এসম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, কার্যকারণতত্ত্ব ভারতীয় দর্শনের একটি স্বীকৃত ধারণা।

অন্যদিকে দর্শনের ইতিহাসে আদি যুগে থেলিস এ জগতের কারণ সংক্রান্ত যে প্রশ্ন করেন, যাকে দর্শনের প্রথম প্রশ্ন এবং প্রধানত যেজন্য থেলিসকে দর্শনের জনক হিসাবে মর্যাদা দেয়া হয়, সে প্রশ্নের মধ্যেই কার্যকারণ তত্ত্বের স্বীকৃতি দেখা যায়। অতঃপর এরিস্টটলের *Metaphysics* গ্রন্থে কারণ চতুষ্টয়ের আলোচনার মধ্য দিয়ে কার্যকারণ তত্ত্বটি আত্মপ্রকাশ করে। মধ্যযুগে এ তত্ত্বটিকে স্বীকার করে নিয়ে স্কলাষ্টিক দার্শনিকগণ তাঁদের দর্শনালোচনা করেন। আধুনিক যুগে বেকনের আরোহাত্মক পদ্ধতিতে কার্যকারণ তত্ত্বের স্বীকৃতি লক্ষিত হয়। তৎপরবর্তী বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদেকার্ত, অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকলক ও বার্কলে কার্যকারণ তত্ত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন। ভারতীয় দর্শনে চার্বাক দার্শনিকগণ এবং আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে সম্ভবত হিউমই প্রথম সুস্পষ্টভাবে কার্যকারণ তত্ত্বের স্বীকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং দার্শনিক দৃষ্টিকোন থেকে কার্য ও কারণের মধ্যকার অনিবার্য

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্ককে বিচার করতে প্রয়াসী হন। অবশ্য একথা সত্য যে, পাশ্চাত্য দর্শনে গ্রীক দার্শনিক এনেসিডেমাস (Anesidemas), মধ্যযুগীয় দার্শনিক উইলিয়াম অব ওকাম (William of Occam) প্রমুখ কার্যকারণের অনিবার্য সম্পর্ক প্রসঙ্গে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁদের আলোচনা হিউমের মত সুস্পষ্ট রূপ নেয় নি।

কার্যকারণতত্ত্ব খণ্ডন প্রসঙ্গে চার্বাক ও হিউমের মতের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।[১৩] হিউম তাঁর Enquiry গ্রন্থে কার্যকারণ সম্পর্কিত আলোচনাকে প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ নামে দু'টি অংশে বিভক্ত করেন। প্রথম অংশে তিনি কার্যকারণ সম্পর্কিত প্রচলিত মতবাদের ত্রুটি বিচার করে একে খণ্ডন করেন এবং দ্বিতীয় অংশে তিনি কার্যকারণ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ও নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁর আলোচনার এ দু'টি অংশকে যথাক্রমে নঞর্থক ও সদর্থক দিক নামে অভিহিত করা হয়। যদিও *Treatise* গ্রন্থে তিনি তাঁর কার্যকারণ সম্পর্কিত আলোচনাকে *Enquiry*-র মত দু'টো ভাগে বিভক্ত করেন নি তবু তাঁর আলোচনার মধ্যে উপরোক্ত নঞর্থক ও সদর্থক উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। মূলত *Treatise* গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়কে সহজবোধ্য, সংক্ষিপ্ত ও সুশৃঙ্খল করার জন্যই তাঁর *Enquiry* গ্রন্থের পরিকল্পনা। সুতরাং গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যগত কারণেই *Treatise* গ্রন্থে কার্যকারণ সংক্রান্ত বিশৃঙ্খল আলোচনাকে *Enquiry* গ্রন্থে তিনি নিজেই দু'টি অংশে বিভক্ত করে সুশৃঙ্খল রূপ দিয়েছেন। চার্বাকদের কার্যকারণ সম্পর্কিত আলোচনায় যদিও হিউমের Enquiry গ্রন্থের মত নঞর্থক ও নঞর্থক দিক দু'টি আলাদা করা হয় নি তবুও হিউমের *Treatise* এর আলোচ্য এদু'টি উপাদান চার্বাকদের আলোচনায় উপস্থিত। চার্বাক দার্শনিকগণও যুক্তি সহকারে কার্যকারণ তত্ত্বকে খণ্ডন করেছেন এবং এ সম্পর্কে নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। সুতরাং আলোচনার আঙ্গিক ও পদ্ধতির দিক বিচারে চার্বাক ও হিউমের কার্যকারণ সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যে মিল প্রতীয়মান হয়।

কার্যকারণতত্ত্ব খণ্ডন করতে গিয়ে অর্থাৎ আলোচনার ধ্বংসমূলক অধ্যায়ে চার্বাকগণ মূলত অনুমানকে অস্বীকার করার ভিত্তিতেই কার্যকারণের অনিবার্য সম্পর্কে অস্বীকার করেন। চার্বাকগণ প্রত্যক্ষকেই একমাত্র জ্ঞানোৎপত্তির উপায় বলে স্বীকার করেন। প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার প্রমাণ চার্বাক জ্ঞানতত্ত্বে স্বীকৃত নয়। ব্যাপ্তি সম্পর্ক প্রত্যক্ষযোগ্য নয় বলে চার্বাকগণ একে স্বীকার করেন না। ফলত ব্যাপ্তি নির্ভর অনুমানকেও অস্বীকার করেন। অনুমান অস্বীকার করার ফলে কার্যকারণের মধ্যকার অনিবার্য সম্পর্কও অস্বীকৃত হয়। কেননা, কার্যকারণের অনিবার্য সম্পর্কের অস্তিত্ব স্বীকার করা অর্থাৎ কারণ 'ক' এর সাথে কার্য 'খ' এর অনিবার্য সম্পর্ক আছে একথা বলার অর্থ হল ক ও খ অতীতে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে সম্পর্কযুক্ত একথা বলা। অর্থাৎ স্থান কাল নির্বিশেষে এদের সম্পর্ক স্বীকার করা। কিন্তু চার্বাকাদের স্বীকৃত প্রত্যক্ষ দ্বারা অতীত ও বর্তমানের ক ও খ এর মধ্যে সম্পর্ক জানা যায় কিন্তু ভবিষ্যতের সম্পর্ক জানা যায় না। এজন্য অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। আর অনুমানের উপর নির্ভর করার অর্থ হল ব্যাপ্তি সম্পর্কে স্বীকার করা যা নিজেই প্রত্যক্ষযোগ্য নয় বরং অনুমানলব্ধ। সুতরাং প্রত্যক্ষ দ্বারা শুধু দু'টো ঘটনার অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়। এদের অনিবার্য সম্পর্কের জ্ঞান পাওয়া যায় না।

হিউম যখন তাঁর কার্যকারণ তত্ত্বের ধ্বংসমূলক দিক আলোচনা করেন তখন তাতে চার্বাকদের উপরোক্ত মতের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। হিউম প্রত্যক্ষণকে একমাত্র জ্ঞানের উৎস হিসাবে স্বীকার করে অনিবার্য সম্পর্ককে প্রত্যক্ষণের দ্বারা পাওয়া যায় না বলে একে অস্বীকার করেছেন। হিউম প্রত্যক্ষণকে ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণায় বিভক্ত করে একথা বলেছেন যে, তারই ধারণা সম্ভব যার ইন্দ্রিয়ছাপ পাওয়া যায়। কার্যকারণের ক্ষেত্রে কার্য ও কারণ এদু'টি ঘটনার ইন্দ্রিয়ছাপ আমরা পাই কিন্তু এদের মধ্যে অনিবার্য সম্পর্কের কোন ইন্দ্রিয়ছাপ আমরা পাই না। সুতরাং কার্যকারণের মধ্যকার অনিবার্য সম্পর্কের অস্তিত্ব নাই। অবশ্য হিউম এখানে কার্যকারণের মধ্যকার অনিবার্যতার উৎপত্তিকে শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার দিক থেকে খুঁজে দেখেন নি বরং বুদ্ধির দিক থেকেও খুঁজে দেখেছেন। তিনি এও বলেছেন যে এ সম্পর্ককে অভিজ্ঞতা দ্বারাতো নয়ই, বুদ্ধি দ্বারাও খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ বুদ্ধি দ্বারা তাকেই খুঁজে পাওয়া যায় যা বিশ্লেষক তথা অভিজ্ঞতাপূর্ব। কার্যকারণের অনিবার্য সম্পর্ক বিশ্লেষক বা অভিজ্ঞতাপূর্বও নয়। কারণ, কার্য ও কারণ নামক দু'টি ঘটনার সংলগ্নতার পুনরাবৃত্তির অভিজ্ঞতা ছাড়া এ সম্পর্কের ধারণা হয় না। কিন্তু অভিজ্ঞতা শুধু পুনরাবৃত্তি বা সতত সংযোজনের ধারণা দেয়, আবশ্যিক সংযোজনের ধারণা দেয় না।

সুতরাং অনিবার্য সম্পর্ককে অভিজ্ঞতা বা বুদ্ধি কোন কিছু দ্বারাই খুঁজে পাওয়া যায় না। উল্লেখ্য যে, চার্বাকগণ শুধুমাত্র অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিকোন থেকে কার্যকারণের মধ্যকার অনিবার্য সম্পর্ককে খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু হিউম অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি উভয় দিক থেকে বিচার করেছেন। সম্ভবত এর কারণ হিউমের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিবাদের ইতিহাস। কার্যকারণতত্ত্ব খণ্ডন করতে গিয়ে হিউম অনিবার্যতার উৎসকে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা কোনটি দ্বারই খুঁজে পাওয়া যায় না তা বিচার করেই ক্ষান্ত হন নি বরং

Dhaka University Institutional Repository

তিনি কার্যকারণ তত্ত্বের পক্ষে প্রচলিত সবগুলো যুক্তিও বিচার করে দেখেছেন এবং তা খণ্ডনে প্রয়াসী হয়েছেন। এপ্রসংগে তিনি শক্তিতত্ত্ব, উপলক্ষবাদ ইত্যাদি যুক্তিকে খণ্ডন করেন। এছাড়াও কার্যের জন্য কারণের উপস্থিতির আবশ্যিকতা সংক্রান্ত যুক্তিগুলোও তিনি খণ্ডন করেছেন। কিন্তু চার্বাক দর্শনে এসব আলোচনা দেখা যায় না। এর কারণ সম্ভবত এই যে, হিউমের সময়ে আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা সমর্থিত হয়ে কার্যকারণ তত্ত্ব তার পক্ষে বিভিন্ন দার্শনিক যুক্তি যোগাড় করেছিল যা চার্বাকদের সময়ে হিল অপরিচিত। সুতরাং ঐতিহাসিক কারণেই চার্বাকদের এত বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ ছিল না।

চার্বাকদের মতে যে সব ক্ষেত্রে দু'টি ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক বিদ্যমান বলে আমরা মনে করি সে সব ক্ষেত্রে একটি ঘটনার শুধুমাত্র একটি পূর্বগ এবং অন্য একটি ঘটনার শুধুমাত্র একটি অনুগকে প্রত্যক্ষ করা হয়। কিন্তু ঘটনার অপরিবর্তনীয় পূর্বগ ও অপরিবর্তনীয় অনুগকে প্রত্যক্ষ করা হয় না। এছাড়া অতীতে প্রত্যক্ষিত দু'টি ঘটনার অনুক্রম ভবিষ্যতে পরিবর্তিত পরিবেশে ব্যর্থও হতে পারে। সুতরাং পূর্বগ ও অনুগের মধ্যেকার সম্পর্ক আকস্মিক, অনিবার্য নয়। তাই এ সম্পর্ক অনিশ্চিত সম্পর্ক।

হিউমও কার্য এবং কারণের সম্বন্ধকে অনিবার্য এবং নিশ্চিত না বলে আকস্মিক ও সম্ভাব্য বলেছেন। হিউমের মতে, কার্য ও কারণ নামক দু'টি ঘটনাকে আমরা বার বার একইভাবে ঘটতে দেখে থাকি। অর্থাৎ অভিজ্ঞতা কার্য ও কারণ নামক ঘটনা দুটির মধ্যে পারম্পর্য, সংলগ্নতা ও সতত সংযোজনের জ্ঞান দেয়, আবশ্যিক সংযোজনের নয়। এ সতত সংযোজন অনিবার্য নয়। আকস্মিক। সুতরাং বলা যায়, চার্বাকগণ যেমন কার্য ও কারণের সম্পর্ককে আকস্মিক বা অনিশ্চিত বলেছেন হিউমও তেমনি কার্যকারণের মধ্যকার সম্পর্ককে অনিশ্চিত বলেছেন।

হিউম একথা বলেছেন যে, সতত সংযোজন থেকে অনিবার্য সংযোগের ধারণা করলে যাকে প্রমাণ করতে হবে তাকে আগে থেকেই স্বীকার করে নেয়া জনিত অনুপপত্তি অর্থাৎ চক্রক অনুপপত্তি ঘটে। অর্থাৎ হিউম কার্যকারণ সম্পর্ককে অনিবার্য সম্পর্ক বললে চক্রক অনুপপত্তি ঘটে বলে মনে করেন। চার্বাকগণও একই কথা বলেছেন। তবে পরোক্ষভাবে, প্রত্যক্ষভাবে নয়। কারণ, চার্বাকগণ কার্যকারণের অনিবার্য সম্পর্ককে অনুমান নির্ভর করেছেন। আর অনুমানের জ্ঞান ব্যাপ্তির উপর নির্ভরশীল। চার্বাকদের মতে, ব্যাপ্তি সম্পর্ককে অনিবার্য সম্পর্ক মনে করলে চক্রক অনুপপত্তি ঘটে। সুতরাং বলা যায়, চার্বাকগণও পরোক্ষভাবে একথা স্বীকার করেছেন যে, কার্যকারণের মধ্যকার সম্পর্ককে অনিবার্য মনে করলে চক্রক অনুপপত্তি সম্পাদন করা হয়।

কার্যকারণতত্ত্বের গঠনমূলক আলোচনা করতে গিয়ে চার্বাকগণ কার্যকারণের মধ্যকার অনিবার্য সম্পর্ককে মানসিক প্রত্যাশাজাত বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁদের মতে, অসংখ্য ক্ষেত্রে দু'টি ঘটনার সংযুক্তির পুনরাবৃত্তির প্রত্যক্ষণ থেকে ভবিষ্যতেও এর সংযুক্তির প্রত্যাশা জন্মে যা অনিবার্য সম্বন্ধের ধারণার নির্দেশ দেয়। অর্থাৎ এ সম্বন্ধ বস্তুগত নয়, মনোগত বা জ্ঞাতার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। এজন্যই চার্বাকদের মতে, এ সম্পর্ক নিশ্চিত নয়, বরং আকস্মিক, এজন্য কার্যকারণ তত্ত্বের সদর্থক ব্যাখ্যায় চার্বাকদের আকস্মিকতাবাদী হিসাবে অভিহিত করা হয়। আবশ্যিকতা সম্পর্কিত তাঁদের এ মতবাদকে মানসিক প্রবণতা মতবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়।

হিউমের দর্শনে কার্যকারণতত্ত্বের সদর্থক দিক আলোচনায়ও ঠিক একই দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। হিউমও কার্যকারণের অনিবার্য সম্পককে একাধিক দৃষ্টান্তের সংলগ্নতা, পারম্পর্য ও সতত সংযোজনের অভিজ্ঞতা থেকে মানসিক প্রবণতাজাত বলে আখ্যায়িত করেন। এটা মূলত অভ্যাসজাত সংযুক্তি। অর্থাৎ আবশ্যিকতা বাস্তবে নয়, বরং মনে অবস্থিত। তাই তাঁর মতবাদকেও আবশ্যিকতা সম্পর্কিত মানসিক প্রবণতা মতবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করা যায় যেহেতু আবশ্যিকতা বিষয়গত নয় বরং বিষয়ীগত সেহেতু তা নিশ্চিত নয়, আকস্মিক। কিন্তু এক্ষেত্রে চার্বাক ও হিউমের মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। চার্বাক এসম্পর্ককে আকস্মিক বলে শেষ করলেও হিউম এখানেই থেমে যান নি। তিনি এ ব্যাখ্যাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন যার ফলে তাঁর মতবাদ সংশয়বাদেরূপনিয়েছে।

হিউম জ্ঞানের বিষয়কে দু'ভাগে ভাগ করেন। ধারণার সম্বন্ধ ও তথ্যগত বা বাস্তব বিষয়। ধারণার সম্বন্ধ গুলোকে তিনি নিশ্চিত বলেছেন। অন্যদিকে তথ্যগত বিষয়ের জ্ঞান কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ভর। যেহেতু কার্যকারণ সম্পর্ক নিশ্চিত নয় অর্থাৎ বিষয়ীগত ও আকস্মিক তথা আনশ্চিত ও সম্ভাব্য সেহেতু এর উপর নির্ভরশীল সকল প্রকার তথ্যগত বিষয়ের জ্ঞানও আকস্মিক। অর্থাৎ নিশ্চিত নয়, সম্ভাব্য মাত্র। সুতরাং তথ্যগত বিষয়ে সার্বিক জ্ঞান সম্ভব নয়। এ মতবাদই সংশয়বাদ। এভাবে কার্য ও কারণের মধ্যকার অনিবার্য সম্পর্কের অস্বীকৃতি সম্পর্কিত হিউমের মতবাদের চরম পরিণতি ঘটে সংশয়বাদে।

কার্যকারণ সম্পর্কের সদর্থক দিক আলোচনায় হিউম আরও কিছু বিষয়ের উল্লেখ করেছেন যা চার্বাকদের আলোচনায় পরিলক্ষিত হয় না। হিউম প্রচলিত কার্যকারণের ব্যাখ্যাকে খণ্ডন করে এর মধ্যকার আবশ্যিকতাকে মানসিক প্রবণতা বলে আখ্যায়িত করায় কারণের নতুন সংজ্ঞাদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তাই তিনি কারণের দু'টি নতুন সংজ্ঞা দেন। সংজ্ঞা দু'টিতে কারণ ও কার্যকে যথাক্রমে দার্শনিক সম্বন্ধ ও প্রাকৃতিক সম্বন্ধ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন। তাঁর মতে, প্রচলিত অর্থে কারণ ও কার্য বলে

Dhaka University Institutional Repository

অভিহিত দু'টি ঘটনার মধ্যে আসলে দার্শনিক ও প্রাকৃতিক এদু'টি সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। দার্শনিক সম্পর্ক বলতে তিনি দু'টো ধারণার মধ্যকার তুলনাকে এবং প্রাকৃতিক সম্পর্ক বলতে তিনি দু'টো ধারণার মধ্যে অনুসঙ্গকে অর্থাৎ সান্নিধ্য, সাদৃশ্য ও পারম্পর্যের সম্পর্ককে বুঝিয়েছেন। তাই তাঁর মতে, কার্যকারণের মধ্যকার সম্পর্ককে আবশ্যিক সম্পর্ক না বলে দার্শনিক বা প্রাকৃতিক বা উভয় প্রকার সম্পর্ক হিসাবে বিবেচনা করা সঠিক হবে।

কারণের নূতন সংজ্ঞায়ন থেকে তিনি কতগুলো অনুসিদ্ধান্তও নেন। এসব অনুসিদ্ধান্তের ফলে এরিষ্টটলকৃত চার প্রকার কারণ অর্থাৎ, নিমিত্ত, উপাদান, রূপগত এবং চরম কারণের মধ্যে পার্থক্য রহিত হয় এবং সব কারণই এক রকম কারণে পরিণত হয়। এছাড়া, এতে সব রকম আবশ্যিকতা একই রকম আবশ্যিকতা বলে পরিগণিত হয়, আদি কারণ অস্বীকৃত হয় এবং ধারণা করা যায় না এমন বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয়। কিন্তু চার্বাক দর্শনে কার্যকারণের এসব আলোচনা অনুপস্থিত।

সংক্ষিপ্তসার ঃ উপরের আলোচনা থেকে কার্যকারণতত্ত্ব সম্পর্কে চার্বাক ও হিউমের মতের মধ্যে নিম্নোক্ত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলোপরিলক্ষিতহয়।

সাদৃশ্য ঃ ১। চার্বাক ও হিউম উভয়ের আলোচনায়ই কার্যকারণ সম্পর্কে প্রচলিত মতবাদ খণ্ডন এবং নিজস্ব মতবাদ প্রদান করা হয়েছে অর্থাৎ উভয়ের আলোচনায়ই নঞর্থক ও সদর্থক এদু'টি উপাদান উপস্থিত। সুতরাং আলোচনার আঙ্গিকে ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

২। উভয় মতেই কার্যকারণের মধ্যকার অনিবার্য সম্পর্ককে খণ্ডন করা হয়েছে। উভয় মতেই একথা মনে করা হয়েছে যে, কার্য ও কারণ নামক দু'টি ঘটনাকে অভিজ্ঞতা দিয়েই পাওয়া যায় কিন্তু অনিবার্য সম্বন্ধকে অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না। তাই এসম্বন্ধ বিষয়ীগত, বিষয়গত নয়। অর্থাৎ আকস্মিক, অনিবার্য বা নিশ্চিত নয়। বাস্তবে এ সম্বন্ধের অস্তিত্ব নাই। এর অস্তিত্ব মনে অবস্থিত। এটি একটি মানসিক প্রত্যাশামাত্র। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তির অভিজ্ঞতা থেকে এ প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ সম্বন্ধটির প্রকৃতি মনস্তাত্ত্বিক।

৩। চার্বাক ও হিউম উভয়েই মনে করেন যে, কার্যকারণের মধ্যকার সম্বন্ধকে অনিবার্য সম্বন্ধ বলে মনে করলে চক্রক অনুপপত্তি ঘটে। অবশ্য হিউম একথা প্রত্যক্ষভাবে বললেও চার্বাকগণ পরোক্ষভাবে বলেছেন। হিউম বলেছেন যে, সতত সংযোগ থেকে অনিবার্য সংযোগের ধারণা করলে যাকে প্রমাণ করতে হবে তাকে আগেই স্বীকার করে নেয়া হয়। অর্থাৎ এতে চক্রক অনুপপত্তি ঘটে। অন্যদিকে চার্বাকদের মতে, কার্যকারণের অনিবার্য সম্বন্ধ অনুমান নির্ভর, অনুমান ব্যাপ্তি নির্ভর এবং ব্যাপ্তি সম্পর্ককে অনিবার্য মনে করলে চক্রক অনুপপত্তি ঘটে। অর্থাৎ কার্যকারণকে অনিবার্য সম্পর্কে সম্পর্কিত মনে করলে চক্রক অনুপপত্তি ঘটে একথা চার্বাকগণও পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন।

বৈশাদৃশ্য ঃ ১। চার্বাকগণ কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ দ্বারা পাওয়া যায় না বলে অনিবার্য সম্পর্ককে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা অনিবার্য সম্পর্ককে পাওয়া যায় কি না তা বিচার করে দেখেননি। এর কারণ সম্ভবত এই যে, ভারতীয় দর্শনে পাশ্চাত্য দর্শনের মত বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদ নামক দু'টি জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ স্বতন্ত্র ও পরস্পর বিরোধিতা নিয়ে আবির্ভূত হয় নি। এছাড়া, চার্বাকদের পূর্ববর্তী সময়ে কার্যকারণতত্ত্বের ব্যাপক আলোচনা হয়েছে বলেও মনে হয় না। তাই তাঁরা বুদ্ধি দিয়ে এ সম্পর্ক আবিষ্কারযোগ্য কি না তা বিচার করে দেখতে প্রয়াসী হন নি।

পক্ষান্তরে হিউমের মতে, শুধু অভিজ্ঞতা দ্বারা নয় বুদ্ধি দ্বারাও অনিবার্য সম্বন্ধকে পাওয়া যায় না। এছাড়া, তিনি কারণতত্ত্বের পক্ষে দেয়া বিভিন্ন যুক্তি যেমন শক্তিতত্ত্ব, উপলক্ষবাদ, কার্যের জন্য কারণের আবশ্যিকতা ইত্যাদি খণ্ডন করেছেন। এ আলোচনা চার্বাকদের আলোচনার চেয়ে অধিক বিশ্লেষণধর্মী। চার্বাকদের চেয়ে হিউমের এই অতিরিক্ত বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার কারণ সম্ভবত তার কালিক পরিস্থিতি। হিউমের আগে পাশ্চাত্য দর্শনে গ্রীক, মধ্য ও আধুনিক যুগে কার্যকারণ সম্বন্ধে কমবেশী বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সুতরাং নতুন মতবাদ দেবার জন্য হিউমের সেসব মতবাদ বিচার করে দেখার প্রয়োজন ছিল।

২। কার্যকারণ তত্ত্বের আলোচনায় চার্বাকদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল আকস্মিকতাবাদী। পক্ষান্তরে কার্যকারণ তত্ত্বের আলোচনায় হিউমের সিদ্ধান্ত যদিও আকস্মিকতাবাদী তবুও চরম পরিণতির দিক থেকে তা সংশয়বাদী। তিনি কার্যকারণকে সকল বাস্তব তথ্যের জ্ঞানের ভিত্তি বলে মনে করেন। যেহেতু কার্যকারণ সম্পর্ক আকস্মিক ও অনিশ্চিত সেহেতু তথ্যের জ্ঞান সংশয়মূলক।

Dhaka University Institutional Repository

৩। কার্যকারণ তত্ত্বের সদর্থক আলোচনায় চার্বাকগণ শুধু আকস্মিকতাবাদী মতবাদ প্রদান করে এবং কার্যকারণকে মানসিক প্রত্যাশা বলেই সমাপ্তি টেনেছেন। এদের আলোচনায় কারণতত্ত্বের কোন নতুন বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তাঁরা কারণের কোন অভিজ্ঞতাবাদী সংজ্ঞায়নও করেন নি। পক্ষান্তরে, হিউম কার্যকারণতত্ত্বের সদর্থক আলোচনায় কার্যকারণকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা দেবার জন্য কারণের দু'টি নতুন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন যাতে কার্যকারণকে আবশ্যিক না বলে দার্শনিক ও প্রাকৃতিক সম্পর্ক হিসাবে দেখানো হয়েছে। এছাড়া, তাঁর সংজ্ঞা থেকে কতগুলো নতুন অনুসিদ্ধান্তও টানা হয়েছে যাতে কারণ, আবশ্যিকতা ইত্যাদির নতুনতর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, প্রচলিত কার্যকারণ সম্পর্কিত ধারণাকে খণ্ডন করে নতুন ব্যাখ্যা দেবার ক্ষেত্রে চার্বাকদের চেয়ে হিউমের আলোচনা নিঃসন্দেহে অধিকতর বিস্তৃত ও বিশ্লেষণধর্মী। হিউম এই অভিজ্ঞতাবাদী তথা আকস্মিকতাবাদী ধারাকে বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখা করে এর চরম পরিণতি হিসাবে কার্যকারণ নির্ভর জ্ঞানের ক্ষেত্রে সংশয়বাদকে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাই রাসেলের সাথে সুর মিলিয়ে যথার্থ অর্থেই একথা বলা যায় যে, অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিকোন থেকে কার্যকারণের ব্যাখা হিউমের হাতে চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কার্যকারণতত্ত্বকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হিউম যে ধারণার চরম পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন চর্বাকগণই সে ধারণার পথিকৃৎ। দর্শনের ইতিহাসে চর্বাকগণ যেমন প্রথম বস্তুবাদী, প্রথম অভিজ্ঞতবাদী, প্রথম দেহাত্মবাদী তেমনি কার্যকারণের ব্যাখ্যায় চার্বাকগণই প্রথম আকস্মিকতাবাদী বা আকস্মিকতাবাদের প্রবক্তা। তাই একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, বহুযুগ পূর্বে চার্বাক নামক ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় কার্যকারণ সম্পর্কে আকস্মিকতাবাদী ব্যাখ্যার যে ধারা প্রবর্তন করে গেছেন আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য দার্শনিক ডেভিড হিউম সে ধারাকেই বজায় রেখে তার উন্নততর চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, পদার্থ বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদী কার্যকারণ তত্ত্বেও চার্বাক ও হিউমের আকস্মিকতাবাদী মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়।

উপরে চার্বাক ও হিউমের জ্ঞানবিদ্যার তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে আমরা মূলত চারটি বিষয়ে চার্বাক ও হিউমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করেছি। এ চারটি বিষয় হল, (১) প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, (২) অনুমান খণ্ডন, (৩) শাশ্বত আত্মার ধারণা খণ্ডন এবং (৪) কার্যকারণের আবশ্যিকতা খণ্ডন। এ বিষয়গুলোর আলোচনায় উভয় জ্ঞানবিদ্যার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে তা থেকে যে দার্শনিক দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় তাই এখানে আমাদের আলোচ্য।

১। **প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ** বিষয়ে চার্বাক ও হিউমের মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্যগুলো পরিলক্ষিত হয়েছে তা থেকে বলা যায় যে, হিউম তাঁর জ্ঞানবিদ্যায় প্রত্যক্ষ প্রমাণতত্ত্বের ভিত্তিতে যেভাবে চরম অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদের মাধ্যমে কল্পনার সীমারেখা নির্দেশ করে সার্বিক জ্ঞানের অসম্ভাব্যতার কথা ঘোষণা করেছেন তাতে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে অভিজ্ঞতাবাদ একটি চরম ও যৌক্তিক পরিণতি লাভ করেছে। চার্বাক জ্ঞানবিদ্যায়ও আমরা ঠিক একই বিষয় লক্ষ্য করি। চার্বাকগণও প্রত্যক্ষ প্রমাণতত্ত্বের ভিত্তিতে চরম অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কল্পনার সীমারেখা নির্ণয় করে সার্বিক জ্ঞানের অসম্ভাব্যতার কথা বলেছেন। এথেকে বলা যায়, হিউম প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণ হিসাবে আখ্যায়িত করে যে মতবাদ দিয়েছেন চার্বাক দর্শনেই সে মতবাদের গোড়াপত্তন হয়েছে।

অন্যদিকে, উপরোক্ত বিষয়ে চার্বাক ও হিউমের মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য তা কেবলমাত্র ব্যাখ্যা পার্থক্য। যেমন,হিউম প্রত্যক্ষের প্রকারভেদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন, ধারণা ও সহজাত ধারণাকে বিশ্লেষণ করে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, এছাড়া ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে ধারণার উৎপত্তির বিষয়টিও অধিকতর গুরুত্ব সহকারে ও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যা চার্বাক দর্শনে দেখা যায় না। সুতরাং বলা যায়, চার্বাকদের হাতে যে চরম অভিজ্ঞাবাদী মতবাদ প্রবর্তিত হয়েছে হিউমের হাতে সে মতবাদই আরও বৈজ্ঞানিক, বিশ্লেষণাত্মক, সুদৃঢ় ভিত্তি ও উন্নত রূপ লাভ করেছে।

২। **অনুমান খণ্ডন** বিষয়ে চার্বাক ও হিউমের মধ্যে যে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়েছে তা থেকে বলা যায়, উভয় জ্ঞানবিদ্যায়ই জ্ঞানোৎপত্তির যথার্থ উৎস হিসাবে আরোহের বৈধতাকে খণ্ডন করা হয়েছে। উভয় জ্ঞানবিদ্যার আরোহানুমান খণ্ডনের পদ্ধতিও প্রায় অভিন্ন। কারণ, উভয় ক্ষেত্রেই আরোহের ভিত্তির বৈধতা খণ্ডনের মাধ্যমে আরোহকে খণ্ডন করা হয়েছে।

অন্যদিকে, শুধুমাত্র আরোহের ভিত্তি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চার্বাক ও হিউমের মধ্যে বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। চার্বাকগণ আরোহের ভিত্তিকে বলেছেন ব্যাপ্তি সম্পর্ক, হিউমের মতে এসম্পর্ক কার্যকারণ। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে ব্যাপ্তি ও কার্যকারণ এদু'টি সম্পর্কের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। কার্যকারণ যেন ভারতীয় দর্শনের ব্যাপ্তি সম্পর্কেরই বৈজ্ঞানিক নাম। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও পার্থক্য শুধুমাত্র ব্যাখ্যাগত।

Dhaka University Institutional Repository

৩। **শাশ্বত আত্মার ধারণা খণ্ডন** বিষয়েও হিউম ও চার্বাক জ্ঞানবিদ্যার অভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। উভয় জ্ঞানবিদ্যায়ই প্রত্যক্ষবাদী দৃষ্টিকোন থেকে শাশ্বত দেহাতিরিক্ত দ্রব্যরূপ আত্মার ধারণাকে অস্বীকার করা হয়েছে। তবে হিউম ও চার্বাকের মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয় তা থেকে বলা যায়, হিউমের আত্মা সম্পর্কিত পুঞ্জবাদ জ্ঞানবিদ্যাগত কিন্তু চার্বাকদের দেহাত্মবাদী মতবাদ জড়বাদী এবং তত্ত্বগত। এছাড়া হিউম ব্যক্তি অভিন্নতার ব্যাখ্যা দিলেও চার্বাক দর্শনে তা অনুপস্থিত। আত্মার প্রচলিত ধারণার উৎপত্তি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হিউমের ব্যাখ্যা মনস্তাত্ত্বিক, কিন্তু চার্বাক ব্যাখ্যা সমাজতাত্ত্বিক এবং বস্তুবাদী।

সুতরাং বলা যায়, চার্বাকগণ শাশ্বত আত্মা খণ্ডন বিষয়ে যে ধারণার বীজবপন করে গেছেন হিউম যেন সে ধারণারই উত্তরসূরী। পার্থক্য কেবল স্থান, কাল ও আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটের। চার্বাকদের আত্মা সম্পর্কিত দেহাত্মবাদ ও প্রচলিত আত্মার ধারণার উৎপত্তি সম্পর্কিত সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় যেমন সে সময়ের আর্থ সামাজিক অবস্থা তথা শ্রেণী শোষণের বিরুদ্ধে চার্বাকদের অবস্থানের প্রমাণ পাওয়া যায়, হিউমের পুঞ্জবাদ ও প্রচলিত আত্মার ধারণার উৎপত্তি সংক্রান্ত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় তেমনি ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও বিজ্ঞান বিপ্লবের যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সামাজিক প্রেক্ষাপটের প্রমাণ পাওয়া যায়।

৪। **কার্যকারণের** আবশ্যিকতা খণ্ডন বিষয়ে হিউম যেমন প্রত্যক্ষবাদকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন চার্বাকগণও হিউমের বহুপূর্বে ঠিক একই অস্ত্রকে ব্যবহার করেছেন। এছাড়া, উভয় জ্ঞানবিদ্যায়ই একথা মনে করা হয়েছে যে, এ সম্পর্ক বিষয়ীগত তথা জ্ঞাতার মানসিক প্রবণতাজাত, সর্বজনীন বা বিষয়গত নয়। এর ফলে উভয় জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ আকস্মিকতাবাদে রূপ নিয়েছে।

এ বিষয়ে হিউম ও চার্বাকদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। যেমন, হিউম বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা উভয় উৎস থেকে কার্যকারণের ধারণাকে বিচার করে এর অসম্ভাব্যতা নিরূপণ করেছেন। আকস্মিকতাবাদ থেকে এগিয়ে গিয়ে কার্যকারণ নির্ভর জ্ঞান সম্পর্কে সংশয়বাদ প্রচার করেছেন এবং কার্যকারণকে নতুন ভাবে অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিকোন থেকে সংজ্ঞায়িত করেছেন, যার ফলে কার্য ও কারণ নামক ঘটনাদ্বয় তাদের আবশ্যিক সম্পর্ককে হারিয়ে দর্শনিক ও প্রাকৃতিক তথা পূর্ববর্তীতা ও সংলগ্নতার সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়েছে। এসব ব্যাখ্যা চার্বাকদের কাছে পাওয়া যায় না

সুতরাং এক্ষেত্রেও যে কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয় তাহল, চার্বাক দার্শনিকগণই সম্ভবত কার্যকারণের আবশ্যিকতা খণ্ডনের ধারণার পথিকৃৎ। কিন্তু তাঁদের ব্যাখ্যায় অনেক কিছুই অব্যাখ্যাত থেকে গেছে। পরবর্তীকালে হিউম যেন একই ধারণাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে যুক্তিগ্রাহ্য , উন্নত ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাদানে প্রয়াসী হয়েছেন।

উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণতত্ত্ব তথা চরম অভিজ্ঞতাবাদ, সার্বিক ও অনিবার্য জ্ঞানের উৎস হিসাবে আরোহের বৈধত খণ্ডন, শাশ্বত আত্মার ধারণা খণ্ডন ও কার্যকারণের আবশ্যিকতা খণ্ডনের ক্ষেত্রে দর্শনের ইতিহাসে যে ধারাটি লক্ষিত হয় সে ধারাটি অত্যন্ত প্রাচীন। এ ধারার সাথে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সম্পর্কও অত্যন্ত গভীর। সাত শত খ্রিষ্টপূর্ব অব্দেরও পূর্ববর্তীকালে প্রাচীন ভারতে ভেষজবিজ্ঞান তথা রসায়নশাস্ত্রের উন্নতির প্রাথমিক যুগে চার্বাক নামক দার্শনিক গোষ্ঠির হাতে উপরোক্ত দার্শনিক ধারাটির সূচনা। আধুনিক বিজ্ঞান বিপ্লবের পরবর্তী কালের দার্শনিক হিউম সে ধারারই আঠারো শতকের প্রতিনিধি। একটি অতিপ্রাচীন দার্শনিক ধারার প্রতিনিধি হিসাবে যুগ, কাল ও সামাজিক ঐতিহাসিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে হিউমের উপর যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব বর্তেছে তা তিনি অত্যন্ত শ্রম, নিষ্ঠা, যৌক্তিকতা ও সততার সাথে পালন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এ প্রচেষ্টার ফল হিসাবেই তিনি চার্বাক প্রতিষ্ঠিত প্রত্যক্ষবাদের উন্নততর এবং বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা দিয়ে বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোন থেকে মানব প্রকৃতির স্বরূপ অন্বেষণের মাধ্যমে মানুষের চিন্তার মৌলিক সূত্রাবলী আবিষ্কার করেন এবং এর মাধ্যমেই জ্ঞানোৎপত্তির উপায় হিসাবে অভিজ্ঞতাবাদকে একটি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে প্রয়াসী হন। ফলত, চার্বাকদের অনুমানের ভিত্তি ব্যাপ্তি সম্পর্ক হিউমের মতবাদে কার্যকারণ সম্পর্ক হিসাবে প্রতিস্থাপিত হয়। চার্বাকদের আত্মার ধারণা খণ্ডনের ক্ষেত্রে অব্যাখ্যাত ব্যক্তি অভিন্নতা তাঁর দ্বারা যেমন ব্যাখ্যাত হয় তেমনি চার্বাকদের আত্মা সম্পর্কিত বস্তুবাদ ভিত্তিক দোহাত্মবাদী মতবাদ, মনস্তত্ত্ব নির্ভর পুঞ্জবাদী মতবাদ হিসাবে উপস্থাপিত হয়। এছাড়া, কার্যকারণের আবশ্যিকতা খণ্ডন বিষয়ে চার্বাক প্রবর্তিত ধারণা উন্নত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ লাভ করে এবং কার্যকারণ অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিকোন থেকে সংজ্ঞাত হয়। ফলে, চার্বাক প্রবর্তিত আকস্মিকতাবাদ সংশয়বাদ পর্যন্ত এগিয়ে যায়। অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিকোন থেকে হিউম যেন এসব বিষয়ে চার্বাক প্রবর্তিত, অনেক ক্ষেত্রে আংশিক ব্যাখ্যাত, অপরিপক্ক, অপূর্ণাঙ্গ ধারণাগুলোকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে পূর্ণতার দিকে, বলা যায়, চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

হিউম চার্বাক দর্শনের সাথে পরিচিত ছিলেন কি না তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কিন্তু স্থান কালের দূরত্ব ভুলে গিয়ে দু'টি জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদকে পাশাপাশি বিচার করলে মনে হয় যেন হিউমের জ্ঞানবিদ্যাগত আলোচনা চার্বাকদের চিন্তা চেতনারই উন্নততর বিশ্লেষণ। এথেকে যে বিষয়টি অনুসারিত হয় তা হল, ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সংস্কৃতির বিস্তৃতির ধারায় চার্বাকদের চিন্তা দেশ কালের উর্ধ্বে উঠে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের গণ্ডী অতিক্রম করে বিভিন্ন দেশের ও কালের দার্শনিকদের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে, প্রবাহিত হয়েছে স্থান থেকে স্থানান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে। এভাবেই হিউম হয়ে উঠেছেন চার্বাকদের সার্থক উত্তরসূরী। তাই সতেরো শতকের হিউমের জ্ঞানবিদ্যা যেন খ্রিষ্টপূর্ব যুগের চার্বাকদের চিন্তারই সময়োপযোগী ফসল, যা প্রমাণ করে দার্শনিক চিন্তা তথা জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন মতবাদ একটি নিত্য চলমান প্রক্রিয়া। মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতি যেমন এসব মতবাদ থেকে তার দিক নির্দেশনা পায় তেমনি এসব মতবাদও সভ্যতা সংস্কৃতি থেকে গ্রহণ করে তার উপাদান। দেশ কালের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করেই এ প্রক্রিয়াটি থাকে চলমান।

তথ্যপঞ্জী

১। তৃতীয় অধ্যায়, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা দ্রষ্টব্য

২। দ্বিতীয় অধ্যায়, ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যায় চার্বাকদের অবস্থান দ্রষ্টব্য

৩। চতুর্থ অধ্যায়, ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণাতত্ত্ব দ্রষ্টব্য

৪। পূর্বোক্ত

৫। পূর্বোক্ত

৬। দ্বিতীয় অধ্যায়, অনুমান প্রমাণের বৈধতা খণ্ডন দ্রষ্টব্য

৭। চতুর্থ অধ্যায়, হিউমের জ্ঞানবিদ্যা ও কার্যকারণের আবশ্যিকতা খণ্ডন দ্রষ্টব্য

৮। দ্বিতীয় অধ্যায়, চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা ও শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব খণ্ডন দ্রষ্টব্য

৯। পূর্বোক্ত

১০। চতুর্থ অধ্যায়, ডিউসের জ্ঞানবিদ্যা ও শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব খণ্ডন দ্রষ্টব্য

১১। দ্বিতীয় অধ্যায়, চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা ও শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব খণ্ডন দ্রষ্টব্য

১২। প্রদীপ কুমার রায় : "মূল্য ও তথ্যের মূল্যায়ন", *দর্শন*, বাংলাদেশ দর্শন সমিতির মুখপত্র, ৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৮৩, পৃ: ৪৩-৪৪

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

আমরা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ অধ্যায়ে যথাক্রমে ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যা, চার্বাক জ্ঞানবিদ্যা, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা ও হিউমের জ্ঞানবিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। এ ছাড়া, পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা চার্বাক ও হিউমের জ্ঞানবিদ্যার তুলনামূলক আলোচনা করেছি। প্রথম অধ্যায়ে ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যা, বিশেষ করে, প্রমাণতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে গিয়ে এটা দেখেছি যে, মীমাংসা, বেদান্ত, ন্যায়, সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, বৌদ্ধ ও জৈন এ আটটি সম্প্রদায়ই তাঁদের জ্ঞানবিদ্যায় প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। যার ফলে এসব দার্শনিক সম্প্রদায়কে জ্ঞানোৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদের দিক থেকে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মত বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদী বা বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করা কঠিন বলে মনে হয়। কিন্তু, দ্বিতীয় অধ্যায়ে চার্বাক জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় এটা দেখা যায় যে, চার্বাক দার্শনিকগণ জ্ঞানবিদ্যার দিক থেকে উল্লিখিত আটটি সম্প্রদায় থেকে ভিন্নধর্মী এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি ধারার সূচনা করেছেন। তাঁরা জ্ঞানোৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ হিসাবে বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতার কথা আপোষহীনভাবে ঘোষণা করে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ হিসাবে অভিহিত করেন। শুধু জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে নয়, অন্যবিদ্যার দিক থেকেও তাঁরা বিশুদ্ধ জড়বাদ, আত্মা সম্পর্কিত মতবাদের ক্ষেত্রে দেহাত্মবাদ, বস্তু ও চেতনার উৎপত্তি সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় স্বভাববাদ বা প্রকৃতিবাদ, কার্যকারণের ব্যাখ্যায় আকস্মিকতাবাদ, মোক্ষের ক্ষেত্রে ইহলোকবাদ বা জাগতিকতাবাদ এবং নীতিবিদ্যার দিক থেকে দৃঢ়ভাবে সুখবাদকে সমর্থন করেছেন। দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের অনুসারিত তত্ত্বে প্রত্যক্ষবাদী জ্ঞানবিদ্যারই সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায়। মূলত ভারতীয় অন্য আটটি দার্শনিক সম্পদায়ের অধ্যাত্মবাদের প্রতি যে সমর্থন পরিলক্ষিত হয় চার্বাক দর্শন এর একক ব্যতিক্রম। সাম্প্রতিক কালের দার্শনিক চিন্তার বিচার বিশ্লেষণে তাঁদের অভিজ্ঞতাবাদ ত্রুটিমুক্ত ও সন্তোষজনক মতবাদ হিসেবে গৃহীত না হলেও সম্ভবত একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, চার্বাক দার্শনিকগণ, দর্শনের ইতিহাসে অভিজ্ঞতাবাদী ধারার প্রবর্তক। শুধু তাই নয়, চার্বাকগণ তাঁদের অন্যান্য দার্শনিক মতবাদের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাবাদের সাথে সঙ্গতি রক্ষার যে প্রয়াস পেয়েছেন তা অনেক পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতাবাদী চিন্তায়ও অনুপস্থিত।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসের আলোচনায় প্রধানত দু'টি জ্ঞানবিদ্যাগত ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। সেগুলো হল অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদ। অভিজ্ঞতাবাদী ধারাটি প্রধানত সোফিষ্টদের হাতে জন্মলাভ করে এবং মূলত সোফিষ্টদের হাতে অভিজ্ঞতাবাদী আলোচনার মধ্য দিয়েই পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা শুরু হয়। পরবর্তীকালে এপিকিউরিস-জেনো-একুইনাস-বেকন-লক-বার্কলে প্রমুখের দার্শনিক আলোচনার মধ্য দিয়ে এ অভিজ্ঞতাবাদী ধারাটি হিউমের দর্শনে বিশেষ স্থান লাভ করে। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার এ ধারাটিতে ভিন্ন আঙ্গিক ও প্রেক্ষাপটে চার্বাক দার্শনিকদের অভিজ্ঞতাবাদেরই অনুরণন শ্রুত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়ে হিউমের জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, তিনি উপরোক্ত পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতাবাদী ধারারই প্রতিনিধিত্ব করেন এবং বিভিন্ন দিক থেকে বৃহত্তর পরিসরে একে ত্রুটিমুক্ত, সংশোধিত ও উন্নত করে পূর্ণাঙ্গ ও সঙ্গতিপূর্ণ রূপ দিতে প্রয়াসী হন। তাঁর এ প্রয়াসের ফলে পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতাবাদ তাঁর হাতে সুসঙ্গত রূপ লাভ করে। তাঁর পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাবাদী লক ও বার্কলে স্বীকৃত দ্রব্যের ধারণা তাঁর দ্বারা অস্বীকৃত হয়। আত্মা সম্পর্কিত শাশ্বত ধারণা মতবাদ তাঁর অভিজ্ঞতাবাদী ব্যাখ্যায় পুঞ্জবাদে রূপ নেয়, কার্যকারণের আবশ্যিক সম্পর্কের ধারণার স্থলে আকস্মিক বা সম্ভাব্য সম্পর্কের ধারণা প্রতিস্থাপিত হয় এবং অভিজ্ঞতাবাদের চরম পরিণতি হিসাবে সংশয়বাদের উদ্ভব হয়। এভাবেই হিউম তাঁর ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞতাবাদের সর্বশেষ গন্তব্য নির্ধারণের চেষ্টা করেন।

চার্বাক ও হিউমের অভিজ্ঞতাবাদের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে চার্বাক ও হিউমের জ্ঞানবিদ্যার তুলনামূলক সমীক্ষায়। এখানে উভয় অভিজ্ঞতাবাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিচার করতে গিয়ে চার্বাক অভিজ্ঞতাবাদের সাথে হিউমের অভিজ্ঞতাবাদের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে সকল সাদৃশ্য এবং ব্যাখ্য, ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে বৈসাদৃশ্যগুলো দেখা যায় তা থেকে মনে হয়, হিউম যেন চার্বাক প্রতিষ্ঠিত অভিজ্ঞতাবাদেরই আধুনিক রূপকার। সমসাময়িক আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের আলোকে এ মতবাদ থেকে অসঙ্গতিপূর্ণ উপাদানগুলোকে বর্জন করে অভিজ্ঞতাবাদকে সঙ্গতিপূর্ণ পরিণতি দানের প্রয়াস নিয়ে হিউম যেন তাঁর উপর ইতিহাসের অর্পিত দায়িত্বই পালন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

হিউম প্রত্যক্ষভাবে চার্বাক দর্শনের সাথে পরিচিত ছিলেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কারণ, তিনি তাঁর লেখায় কোথাও চার্বাকদের কথা উল্লেখ করেন নি। তবে তিনি যে চার্বাক প্রতিষ্ঠিত অভিজ্ঞতাবাদী ধারারই আধুনিক যুগের একজন প্রতিনিধি পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয়েছে। এ ছাড়া, এ আলোচনা থেকে আমরা এটাও দেখতে পেয়েছি যে, অভিজ্ঞতাবাদের সাথে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতির একটা প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে।

এ অভিসন্দর্ভে সন্নিবেসিত পাঁচটি অধ্যায়ের উপরোক্ত সারসংক্ষেপ থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, দর্শনের ইতিহাসে অভিজ্ঞতাবাদী ধারা একটি শক্তিশালী জ্ঞানবিদ্যাগত ধারা। খ্রিষ্টপূর্ব সাতশত অব্দেরও আগে প্রাচ্য দর্শনের ইতিহাসে চার্বাক দার্শনিকগণ যে ধারাটির সূচনা করে ছিলেন জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আঠারো শতকের বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক লক–বার্কলে এবং শেষ পর্যন্ত হিউমের দর্শনে এসে সে ধারাটিই চরম রূপ লাভ করে। হিউমের দর্শনে অভিজ্ঞতাবাদের চরম বিকাশ একদিকে যেমন জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করেছে অন্যদিকে তা একটি শক্তিশালী ধারা হিসাবে পরবর্তী দার্শনিক মতবাদগুলোকেও প্রভাবিত করেছে। হিউম পরবর্তীকালেও এ ধারার প্রভাব দর্শনের ইতিহাসে প্রবাহমান থাকে এবং এর প্রভাবে অনেক নতুন দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব হয়। বিশ শতক পর্যন্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক মতবাদই হিউমের দর্শনকে সরাসরি উপেক্ষা করে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কোন কোন মতবাদ হিউমের দর্শন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তাঁদের দার্শনিক চিন্তাকে সমৃদ্ধ করেছে, আবার কোন কোন মতবাদে হিউমের মতবাদকে খণ্ডনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর *History of Western Philosophy* গ্রন্থের সপ্তদশ অধ্যায়ে হিউম সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন যে, হিউম পরবর্তী অধিবিদদের প্রিয় অবসর বিনোদন ছিল হিউমকে খণ্ডন করা, যদিও তাঁদের এ খণ্ডন কখনই সন্তোষজনক ছিল না।

হিউম পরবর্তী উল্লেখযোগ্য দার্শনিক ধারার ক্ষেত্রে বিচারবাদ, উপযোগবাদ, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ, প্রয়োগবাদ, রূপতত্ত্ব বা অবভাসবাদ এবং বিশ্লেষণী দার্শনিক মতবাদ অন্যতম। এসব মতবাদের উপর হিউমের দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান।

জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট হিউম পরবর্তী অন্যতম উল্লেখযোগ্য দার্শনিক ধারার মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে হিউমের অবদান কান্টের দর্শনে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। কান্টের *Critique of Pure Reason* ১৭৮১ সালে অর্থাৎ হিউমের মৃত্যুর মাত্র পাঁচ বছর পর প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থকে রাসেল কান্টের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বলেছেন। এ গ্রন্থে কান্ট তাঁর পূর্ববর্তী বুদ্ধিবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যাগত মতবাদের সমন্বয় সাধন করে বিচারবাদী মতবাদ দেন। কান্ট প্রথম জীবনে ভলফ ও লাইবনিজের বুদ্ধিবাদী মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। হিউমের রচনা থেকে তিনি বুদ্ধিবাদের বিচারবিযুক্তবাদিতা সম্পর্কে সচেতন হন। তাই তিনি নিজেই একথা স্বীকার করেছেন যে, হিউম তাঁকে বুদ্ধিবাদের বিচারবিযুক্তবাদী নিদ্রা থেকে জাগিয়েছেন।[১] জ্ঞানের উপাদান যে অভিজ্ঞতাজাত তা তিনি হিউমের কাছ থেকেই অবগত হন। তিনি তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থের শুরুতেই একথা স্বীকার করেন যে, আমাদের সকল জ্ঞানই অভিজ্ঞতা থেকে শুরু হয়, এক্ষেত্রে কোন সন্দেহ নাই।[২] এখানেই তাঁর উপর হিউমের প্রভাব লক্ষণীয়। কিন্তু তিনি হিউমকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করেন নি। বরং তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য ছিল একথা প্রমাণ করা যে, যদিও আমাদের কোন জ্ঞানই অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করতে পারে না তবুও এর একটি অংশ অভিজ্ঞতাপূর্ব। এ অংশটিকে অভিজ্ঞতা থেকে আরোহাত্মকভাবে পাওয়া যায় না।[৩] জ্ঞানের এ অংশটিই আকারগত অর্থাৎ বুদ্ধিলব্ধ এবং এর জন্যই জ্ঞান সার্বিক ও অনিবার্য হতে পারে। সুতরাং কান্ট বুদ্ধিবাদের বিচারবিযুক্ততা থেকে মুক্ত হয়ে হিউমের অভিজ্ঞতাবাদের জ্ঞানোৎপত্তি সংক্রান্ত অংশটুকু গ্রহণ করেন। কিন্তু সংশয়বাদকে বর্জন করে জ্ঞানের নিশ্চয়তা ও অনিবার্যতা প্রত্যয়নে প্রয়াসী হন।

শুধু জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার গুরুত্বের স্বীকৃতিই নয়, আরও কিছু বিষয়ে কান্ট হিউমের মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। হিউম জ্ঞানের বিষয়কে ধারণার সম্বন্ধ ও বাস্তব বিষয় এদু'টি ভাগে ভাগ করেন। কান্টও অবধারণকে বিশ্লেষণী ও সংশ্লেষণী এ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। এদু'প্রকার অবধারণ ছাড়াও কান্ট অবধারণকে অভিজ্ঞতাজাত এবং অভিজ্ঞতাপূর্ব এ দু'ভাগে বিভক্তকরেন।[৪] অবধারণের এই বিভক্তিকরণে কান্টের উপর হিউমের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে বলে মনে হয়। কান্টের ভাষায় হিউমের অবস্থাটি ছিল এরকম–সব অবধারণ হয় অভিজ্ঞতাজাত সংশ্লেষক হবে, যাকে হিউম তথ্যগত বিষয় বলেছেন না হয় অভিজ্ঞতাপূর্ব বিশ্লেষক হবে, যাকে হিউম ধারণার সম্বন্ধ বলেছেন। কিন্তু কান্টের মতে, এ ছাড়াও তৃতীয় আরেক প্রকার অবধারণ রয়েছে, যাদের মধ্যে হিউম বর্ণিত উভয় প্রকার অবধারণের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এর নাম অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক অবধারণ।[৫] এরূপ অবধারণকে স্বীকার করেই কান্ট সার্বিক ও অনিবার্য জ্ঞান সম্ভব করে তোলেন। কিন্তু হিউম এসব অবধারণকে স্বীকার করেন নি। এভাবেই কান্ট হিউমের অভিজ্ঞতাবাদের প্রাথমিক উপাদান অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করে এবং তাঁর জ্ঞানবিদ্যার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সংশয়বাদকে বর্জন করে অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞানকে সার্বিক ও অনিবার্যতার স্তরে পৌছে দিয়ে বিচারবাদী মতবাদ দেন। তাঁর বিচারবাদ যদিও হিউমের প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

চ্যালেঞ্জ তবুও তা হিউমের অভিজ্ঞতাবাদকে উপেক্ষা করতে পারে নি। বরং এথেকে প্রাথমিক উপাদান সংগ্রহ করেছে। অনেক দার্শনিক একথা মনে করেন যে, হিউম জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে যে সমস্যা রেখে যান কান্ট তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে সে সমস্যার সমাধান দিতে পেরেছেন। কিন্তু রাসেল এমতের সাথে একমত নন। তাঁর মতে, জার্মান দার্শনিক ধারায়, বিশেষত কান্ট ও হেগেলের দর্শনে হিউম-পূর্ব বুদ্ধিবাদী ধারারই প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, যাকে হিউমের যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করা যায়।[৬]

হিউম পরবর্তী একটি অন্যতম দার্শনিক ধারা হল উপযোগবাদ। আধুনিক বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে উনিশ শতকে এ ধারাটি গড়ে উঠে। উপযোগবাদের অন্যতম প্রবক্তা বেনথাম নীতিদর্শনের একজন সংস্কারক। নীতিদর্শনের ক্ষেত্রে তিনিই দৃঢ়ভাবে অভিজ্ঞতাবাদী ও বিশ্লেষণী ধারার প্রবর্তন করেন। তাঁর দার্শনিক মতবাদের প্রেক্ষাপট জুড়ে আছে হিউমের দার্শনিক মতবাদ। বেনথাম হিউমকে তাঁর একজন শিক্ষক হিসাবে গণ্য করেন। কারণ, নীতিদর্শনের ক্ষেত্রে উপযোগনীতি কথাটি সর্বপ্রথম হিউমই ব্যবহার করেন। এজন্য বেনথাম তাঁর *The Fragmentson Government* নামক প্রথম গ্রন্থে হিউমকে প্রশংসা করেছেন।[৭] একথাও বলা হয়ে থাকে যে, ইংল্যাণ্ডে হিউমের *Enquiry* গ্রন্থই ছিল উপযোগবাদী শতাব্দীর সূচনা।[৮] বেনথাম বিভিন্ন দিক থেকে হিউমের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।[৯] তিনি নিজেই একথা বলেছেন যে, হিউমের *Treatise* যেনতাঁকেনীতিদর্শনের ক্ষেত্রে প্রতারিত ব্যক্তিকে প্রকৃত অবস্থা অনুধাবনে সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করেছে।[১০] বেনথামের অনুসারী প্রখ্যাত উপযোগবাদী জেমস মিলও হিউমের মতই অভিজ্ঞতার ভূমিকা স্বীকার করে অতীন্দ্রিয় 'আমি'র অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তিনিও হিউমের সাথে এবিষয়ে একমত যে, অবধারণ ক্রিয়া ও প্রত্যক্ষণ ক্রিয়া থেকে পৃথক করার মত স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্বশীল কোন আমিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এ ছাড়া তিনিও হিউমের মতই জ্ঞানাকে প্রত্যক্ষণ ক্রিয়া বা জ্ঞান ক্রিয়া থেকে আলাদা কিছু বলে মনে করেন না। তবে এক্ষেত্রে জেমস মিল হিউমের ব্যাখ্যা থেকে এগিয়ে গিয়ে আত্মসত্তাকে অভিজ্ঞতায় অনুভূত একটি গুণ হিসাবে আখ্যায়িত করেন, যেখানে হিউম একে শুধু প্রত্যক্ষণের সমষ্টি বলেছিলেন।

বেনথামের ছাত্র ও জেমস মিলের পুত্র জন ষ্টুয়ার্ট মিল জ্ঞানোৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ, বহির্জগত সম্পর্কিত ধারণা এবং অনুসঙ্গবাদী ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হিউমকে অনুসরণ করেন।[১১] হিউমের মতই তিনি অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র সংবেদনের অনুক্রম হিসাবে আখ্যায়িত করেন। মিলের মতে, স্থায়ী আত্মার ধারণা হল অনুভূতির একটি স্থায়ী সম্ভাবনায় বিশ্বাস। এ বিশ্বাস স্মৃতি ও কল্পনা থেকে অনুসঙ্গ নিয়মের সাহায্যে গঠিত হয়। বহির্জগত সম্পর্কেও একই কথা সত্য। কারণ, কোন প্রত্যক্ষ প্রতীতি স্বজ্ঞার মাধ্যমে আমরা বহির্জগত সম্পর্কিত জ্ঞান পাই না। যাকে আমরা বাহ্যজগতের জ্ঞান বলি তা মূলত অনুসঙ্গ নিয়ম-নির্ভর একটি বিশ্বাস যা সংবেদনের স্থায়ী সম্ভাবনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এক কথায়, তিনি হিউমের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে অনুসরণ করেই বাহ্যজগৎকে সংবেদনের স্থায়ী সম্ভাবনা হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। তবে, আরোহানুমান সম্পর্কিত প্রশ্নে মিল হিউমকে অনুসরণ করেন নি। মিল আরোহ অনুমানের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন। তিনি গাণিতিক সত্যকে অভিজ্ঞতার অত্যন্ত উচ্চস্তরের নিশ্চিত সাধারণীকরণ হিসাবে আখ্যায়িত করে একে আরোহের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তাই তাঁর কাছে হিউম স্বীকৃত ধারণার সম্বন্ধের কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ, তিনি যৌক্তিক ও গাণিতিক আবশ্যিকতাকে মনস্তাত্ত্বিক বলে মনে করতেন।

হিউম পরবর্তী অভিজ্ঞতাবাদী ধারার উপরও হিউমের প্রভাব সুস্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ। উনিশ শতকের অভিজ্ঞতাবাদী ও উপযোগবাদী দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মিলের উপর হিউমের প্রভাব ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তিনি সরাসরি হিউমের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেন।[১২] বিশ শতকের অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণও হিউম নির্দেশিত গণিত ও যুক্তিবিদ্যার আবশ্যিক সত্য এবং বাস্তব ঘটনার পর্যবেক্ষণগত সত্যের ব্যবধানকে সাধারণভাবে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তাঁরা মিলকে প্রত্যাখ্যান ও হিউমকে গ্রহণ করেন।[১৩] তাঁরা সকলেই একথা মনে করেন যে, আবশ্যিকতা শুধুমাত্র যুক্তিবিদ্যা ও গণিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ ছাড়া আর সব কিছুই সম্ভাব্য। এসব অভিজ্ঞতাবাদীদের মধ্যে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা অন্যতম।

হিউম পরবর্তী দর্শনে অধিবিদ্যাগত প্রশ্নকে কেন্দ্র করে দু'টি দার্শনিক ধারার অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। একটি ধারা হিউম প্রত্যাখ্যাত অধিবিদ্যাকে পুনপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয় এবং হিউমকে খণ্ডন করার চেষ্টা করে। অন্য ধারাটি সরাসরি হিউমের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তাঁর অভিজ্ঞতাবাদকে গ্রহণ করে এবং অধিবিদ্যার প্রশ্নে হিউমের অবস্থানেরই প্রতিনিধিত্ব করে। এই শেষোক্ত ধারায় গড়ে উঠা অন্যতম দার্শনিক মতবাদ যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ, যার উপর হিউমের অভিজ্ঞতাবাদের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। মূলত ১৯২৮ সালের দিকে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা ভিয়েনা-চক্র নামক দার্শনিক গোষ্ঠিই যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের প্রবক্তা। পাশ্চাত্য দর্শনের কোন কোন ঐতিহাসিক যেমন বেকন, হবস, লক, বার্কলে, হিউম, ম্যাক, রাসেল, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকগণ এবং কোঁতেকে একই ধারার চিন্তাবিদ হিসাবে আখ্যায়িত করেন।[১৪] ঐতিহাসিক স্যামুয়েল

Dhaka University Institutional Repository

ষ্টাফ- এর মতে, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীগণ যে মতবাদকে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ বলেছেন সে মতবাদে নতুন যুক্তিবিদ্যাগত কৌশল এবং হিউমের অভিজ্ঞতাবাদী মনোভাবের সমন্বয় ঘটেছে মাত্র।[১৫] বি. আর. গ্রসও যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের উপর হিউমের প্রভাবকে স্বীকার করেন। তবে, তাঁর মতে, হিউমের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা যৌক্তিক বিশ্লেষণ যোগ করেছেন।[১৬] হিউমের প্রখ্যাত ভাষ্যকার এন্টনী ফ্লু হিউমকে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের ভাবগত পিতা হিসাবে আখ্যায়িত করেন।[১৭] বিশ্লেষণী দার্শনিক আর্মসনও যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের উপর হিউমের স্পষ্ট প্রভাব নির্দেশ করেছেন।[১৮] তাঁর মতে, হিউমের ধারণা সম্পর্কিত মতবাদ অর্থ সংক্রান্ত প্রদর্শী সংজ্ঞার (Ostensive definition, একটি শব্দ যে অর্থ নির্দেশ করে তা প্রদর্শনের মাধ্যমে সে শব্দের অর্থ জানা) মাধ্যমে শব্দের অর্থ জানার প্রতি ইঙ্গিত করে। কারণ, এতে ধারণার অর্থ ইন্দ্রিয়ছাপের মাধ্যমে জানতে হয়। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের যাচাইনীতি হিউমের জ্ঞানবিদ্যাগত প্রদর্শী সংজ্ঞারই অনুরূপ পুনর্বিন্যাস। এ প্রসঙ্গে আর্মসনের বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তিনি হিউম ও যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের সাদৃশ্য দেখানোর জন্য তাঁর বক্তব্যকে নিম্নরূপে উপস্থাপিত করেনঃ

হিউমঃ পুরাতন অভিজ্ঞতাবাদী, অধিবিদ্যাগত মত ঃ সকল বস্তুই ইন্দ্রিয়প্রদত্ত।

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী ঃ নতুন অভিজ্ঞতাবাদী, অধিবিদ্যাগত মত ঃ সকল তথ্যই ইন্দ্রিয়প্রদত্ত

পুরাতন অভিজ্ঞতাবাদী ঃ জ্ঞানবিদ্যাগত মত ঃ সকল অর্থপূর্ণ শব্দই হল ইন্দ্রিয়প্রদত্ত বস্তুর নাম।

নতুন অভিজ্ঞতাবাদী ঃ জ্ঞানবিদ্যাগত মত ঃ সকল অর্থপূর্ণ বাক্যই হল ইন্দ্রিয়জাত তথ্যের বর্ণনা।

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীগণ অর্থপূর্ণ বচনকে সংশ্লেষক বা অভিজ্ঞতাজাত ও বিশ্লেষক বা অভিজ্ঞতাপূর্ব বা পুনরুক্তিমূলক এ দু'ভাগে ভাগ করেন। তাঁদের মতে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বচন এবং নিত্যব্যবহার্য তথ্যগত বচনই প্রথম শ্রেণীর বচন অর্থাৎ অভিজ্ঞতাজাত বচন। অন্যদিকে, গণিতের বচন অভিজ্ঞতাপূর্ব বা বিশ্লেষণাত্মক। তাঁদের এই বিভাজনের সাথে হিউমের ধারণার সম্বন্ধ ও তথ্যগত বিষয়ের অনুরূপতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত, হিউম পরবর্তীকালে অভিজ্ঞতাজাত ও অভিজ্ঞতাপূর্ব জ্ঞানের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজনের যে ধারাটি লক্ষিত হয় হিউমের হাতেই এ ধারার সূচনা- একথা অস্বীকার করার উপায় নাই।

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীগণ কেবল হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ নয় বরং তাঁর অধিবিদ্যা সংক্রান্ত মত দ্বারাও গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তবে এ সম্পর্কে তাঁরা হিউমের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যৌক্তিক বিশ্লেষণকে আরোপ করেন। হিউম ধারণার সম্বন্ধ ও তথ্যগত বিষয় এ দু'প্রকার বচনের বাইরে যেসব বচন আছে সেগুলোকে কুটতর্ক এবং অধ্যাস বলেছেন। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরাও প্রায় একই কথা বলেন। তবে তাঁরা কূটতর্ক এবং অধ্যাস-এর স্থলে অর্থহীন কথাটি ব্যবহার করেন।[১৯]

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ শেষ পর্যন্ত দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়। একটির প্রতিনিধিত্ব করেন রুডলফ কারনাপ, অন্যটির প্রতিনিধিত্ব করেন এ· জে এয়ার। কারনাপের হাতে প্রত্যক্ষবাদ প্রত্যক্ষ সম্পর্কে বস্তুবাদী ও মন সম্পর্কে শারীরবৃত্তীয় ধারণার দিকে অগ্রসর হয়। এয়ারের ধারাটি প্রত্যক্ষ ও মন উভয় ক্ষেত্রেই বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদকে অনুসরণ করে। তবে, কারনাপ ও এয়ার নির্দেশিত এ উভয় ধারাই সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য ও ভ্রান্তির ঝুকি থেকে মুক্ত অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানের সম্ভাবনাকে প্রত্যাখান করে। অর্থাৎ, উভয় মতবাদের ক্ষেত্রেই হিউমের সংশয়বাদের স্বীকৃতি দেখা যায়।[২০]

এয়ার নিজেই হিউমের মতবাদের সাথে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের সাদৃশ্য নির্ণয় করেছেন। হিউম পরিমাণ বা সংখ্যা সম্পর্কিত বিমূর্ত চিন্তন এবং বাস্তব বিষয় বা অস্তিত্ব সম্পর্কিত পরীক্ষণমূলক চিন্তন- এ দুই শ্রেণীর গ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য সকল গ্রন্থকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে পরামর্শ দেন। কারণ, এগুলো কুটতর্ক ও ভ্রান্তিমূলক ছাড়া আর কিছুই নয়।[২১] এয়ার তাঁর *Language,Truth and Logic* গ্রন্থে হিউমের এ উক্তিকে উদ্ধৃত করেন। তাঁর মতে, হিউমের এই উক্তি যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের পরখনীতির, অর্থাৎ যে বাক্য আকারগতভাবে সত্য বচন প্রকাশ করে না বা কোন অভিজ্ঞতাপূর্ব প্রকম প্রকাশ করে না সে বাক্য অর্থহীন--এ নীতির অলংকারপূর্ণ প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।[২২]

বিশ শতকের দার্শনিক আন্দোলনের অতি পরিচিত নাম যৌক্তিক বিশ্লেষণী দর্শন বা যৌক্তিক পরমাণুবাদের অন্যতম প্রতিনিধি বৃটিশ দার্শনিক লুডভিগ ভিটগেনষ্টাইন। তাঁর রচনা থেকেই যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ তাঁর কেন্দ্রীয় উপকরণ লাভ করে। ভিটগেনষ্টাইনের দর্শনের উপরও হিউমের দর্শনের যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি তাঁর *Tractatus Logico Philosophicus* গ্রন্থে অর্থপূর্ণ বচনকে মৌলিক ও যৌক্তিক এ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। মৌলিক বচন জগৎ সংক্রান্ত এবং যৌক্তিকবচনপুনরুক্তিমূলক।[২৩] এ দু'শ্রেণীর বচন ছাড়া অন্য কোন বচন অর্থপূর্ণ নয় বলেই তিনি অধিবিদ্যক বচনকে অর্থপূর্ণ নয় বলে মন্তব্য করেন। তিনি অধিবিদ্যক বচনকে ভাষার অপব্যবহার বলেন। ভিটগেনষ্টাইনের মৌলিক ও যৌক্তিক বচন হিউমের

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যবিষয়ক ও ধারণার সম্বন্ধমূলক বিষয়ের অনুরূপ। এ ছাড়া, হিউম যে মানদণ্ডে অধিবিদ্যক বচনকে কুটতর্ক ও অধ্যাসমূলক বলেছেন ভিটগেনস্টাইন একই মানদণ্ডে এইসব বচনকে ভাষার অপব্যবহার বলেন। ভিটগেনস্টাইন তাঁর *Tractatus*- এর উপসংহারে বলেন, যেসব বিষয়ে আমাদের বলার কিছু নেই সেসব বিষয়ে আমাদের নীরব থাকাই শ্রেয়। তাঁর বক্তব্য একদিকে যেমন ভাষার সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে অন্যদিকে তা অধিবিদ্যা সংক্রান্ত আলোচনার অসারতাকেই নির্দেশ করে। কিন্তু হিউম যখন এপ্রসঙ্গে বলেন, যে গ্রন্থ বিমূর্ত ধারণা বা তথ্যগত বিষয় সম্পর্কিত পরীক্ষামূলক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে না তাকে আগুনে ছুড়ে ফেল, কারণ তা কুটতর্ক ও অধ্যাসমূলক, তখন তাঁকে ভিটগেনস্টাইনের চেয়ে অনেক বেশী কঠোর নীতির ধারক বলে মনে হয়। ভিয়েনা সার্কেল বিশ শতকে হিউমের এই অভিজ্ঞতাবাদী নীতিরই উত্তরাধিকার বহন করে।[২৪] ভিটগেনস্টাইনের মতে, একমাত্র গানিতিক সমীকরণ বা পুনরুক্তিতেই অনিবার্যতা পাওয়া যায়। কিন্তু গাণিতিক সমীকরণ বা পুনরুক্তি জগৎ সম্পর্কে কিছু বলে না। সুতরাং জগতে অনিবার্যতা নাই। যুক্তিবিদ্যা ছাড়া সবকিছুই আকস্মিক।[২৫] জগৎ সম্পর্কিত তাঁর এই আকস্মিকতাবাদে হিউমের সংশয়বাদের প্রভাব স্পষ্ট।

ভিটগেনস্টাইন যে মৌলিক বচনের কথা বলেন তাঁর সাথে হিউমের সরল ইন্দ্রিয়ছাপের মিল দেখা যায়। মৌলিক বচন হল সরলতম, অবিশ্লেষণযোগ্য সেসব বচন যার অর্থ জগতের সাথে তাদের সম্পর্কের মধ্যে নিহিত থাকে। আর সকল যথার্থ বচনই মৌলিক বচনের সত্যাপেক্ষক। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা এই যথার্থ বচনকেই অভিজ্ঞতায় যাচাইযোগ্য বলেছেন। ভিটনেস্টাইন ও যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের যথার্থ বচনের মানদণ্ডকে হিউমের -- প্রতিটি যথার্থ ধারণাই অনুরূপ ইন্দ্রিয়ছাপের অনুলিপি-- এ নীতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ বলে মনে হয়। আর্মসনও এ বিষয়টিকে সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে, অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু বা চরম বিশেষ হিসাবে হিউমের ইন্দ্রিয়ছাপকে যদি তাঁর অধিবিদ্যাগত মত বলে গণ্য করা হয় তবে হিউমের ইন্দ্রিয় প্রদত্ত তথ্য এর স্থলে ইন্দ্রিয় প্রদত্ত বিশেষকে প্রতিস্থাপিত করে যৌক্তিক পরমাণুবাদী ভিটগেনস্টাইন হিউমের মতেরই ভাষ্যদান করেছেন।[২৬] আর্মসন এ কথা স্পষ্টতই বলেছেন যে, একদিক থেকে বিচার করলে যৌক্তিক পরমাণুবাদ নতুন কিছু নয়। হিউমের সূত্রের সাথে যৌক্তিক পরমাণুবাদীদের খুব একটা পার্থক্য নাই।[২৭]

ভিটগেনস্টাইনের দর্শনের ভাষ্যকার ও বিশেষজ্ঞ জর্জ পিচার হিউম ও ভিটগেনস্টাইনের দর্শনের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। তাঁর মতে, ভিটগেনস্টাইন তাঁর দার্শনিক মতবাদে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেন যার উদ্দেশ্য হল জটিল বিষয়কে সরলীকৃত করা। হিউম তাঁর *Enquiry* গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে একথা বলেন যে, যখন আমরা আমাদের চিন্তা বা ধারণাকে বিশ্লেষণ করি, তা যতই জটিল হোক না কেন, সব সময়ই এগুলো সেসব সরল ধারণায় বিশ্লিষ্ট হয় যেসব সরল ধারণা পূর্ববর্তী অনুভূতি বা মনোভাবের অনুলিপি। হিউমের ধারণা সম্পর্কিত এ বক্তব্যে জটিল বিষয়কে সরলীকরণের ব্যাপারটিই লক্ষিত হয়।[২৮]

অহমবাদ সম্পর্কে যে সাধারণ দ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা দর্শনে প্রচলিত আছে তা হল অনুভবকারী বা আত্মা এবং অনুভূত বস্তুর দ্বৈতবাদ। ভিটগেনস্টাইন এ ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মতে, আমরা কেবল অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুকে পাই, এর ধারক কোন আত্মাকে পাই না।[২৯] যদিও তিনি নিজে এ ধারণাটি শোপেনহাওয়ারের কাছ থেকে নিয়েছেন বলে মনে করেন তবুও আধুনিক যুগে হিউমই এ ধারণার প্রবক্তা।[৩০] ভিটগেনস্টাইন শব্দের অর্থ সম্পর্কিত ব্যবহার মতবাদের (Use Theory) কথা বলেছেন। গিলবার্ট রাইলের মতে, এমতবাদের ব্যবহার হিউমের কারণের ব্যাখ্যায় দেখা যায়। হিউম যখন কারণকে ব্যাখ্যা করেছেন তখন তিনি কারণ শব্দটি সম্পর্কে প্রশ্ন করেন নি বরং প্রশ্ন করেছেন কারণ শব্দটির ব্যবহার বা প্রয়োগ সম্পর্কে।[৩১]

ভিটগেনস্টাইনের *Tractatus* ও *Philosophical Investigation* এর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও যেসব বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতা এবং বৌদ্ধিকভাবে কি বলা যেতে পারে এবং কি বলা যায় না সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অন্যতম। এ কাজ করতে গিয়ে ভিটগেনস্টাইন মূলত তাঁর নিজস্ব ধরনে আধুনিক বৃটিশ দার্শনিক লক, বার্কলে, হিউমের চিন্তারই প্রতিনিধিত্ব করেছেন।[৩২] এ ছাড়াও একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, হিউমের অভিজ্ঞতাবাদের প্রয়োজনীয়তা যৌক্তিক পরমাণুবাদী দার্শনিকগণ বারবার অনুভব করেন। কারণ, ভিটগেনস্টাইনের মতে, যৌক্তিক পরমাণুবাদ অনুসারে একটি বচন তখনই অর্থপূর্ণ হয় যদি এবং কেবল যদি বচনটি পরমাণুগত তথ্যের অনুরূপ হয়। পরমাণুগত তথ্যের এই অনুরূপতা পরীক্ষার উপায় হল হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ। কারণ, হিউমের মতে, আমাদের ইন্দ্রিয় কেবল বিশেষ বস্তুরই অভিজ্ঞতা পায়।[৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান শতকে আমেরিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা একটি অন্যতম দার্শনিক আন্দোলন প্রয়োগবাদ। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ ও অস্তিত্ববাদকে যেমন ইউরোপের দার্শনিক মত হিসাবে গণ্য করা হয় প্রয়োগবাদ তেমনি আমেরিকার নিজস্ব মৌলিক দার্শনিক মতবাদ। এ মতবাদের মাধ্যমেই মার্কিন দার্শনিক চিন্তা প্রথমবারের মত পরিপক্কতা লাভ করে এবং চিন্তার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের প্রভাবমুক্ত বলে দাবী করতে পারে।[৩৪] কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, উইলিয়াম জেমস, চার্লস সেণ্ডার্স পার্স এবং জন ডিউই – প্রয়োগবাদের এ তিনজন অন্যতম প্রবক্তা হিউমের দর্শন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন এবং হিউমের দর্শন থেকে তাঁরা তাঁদের চিন্তার উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন।

প্রয়োগবাদীদের মধ্যে জেমসকেই হিউমের কাছে সবচেয়ে বেশী ঋণী বলা যায়। জেমস প্রশ্নাতীতভাবেই লক প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক গোষ্ঠীর অনুসারী ছিলেন। তিনি কান্টীয় দর্শনের বিচারবাদী ও ভাববাদী ধারার বিরোধিতা করে হিউমের জ্ঞানবিদ্যাগত ধারাকে গ্রহণ করেন। তাঁর মতে, হিউমের অভিজ্ঞতাবাদী সূত্র যথার্থভাবে প্রয়োগ করেই হিউমের দর্শনের ত্রুটি নিরসন করা যায়। এর জন্য কান্টীয় পদ্ধতি গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন। তাই জেমস মৌলিক অভিজ্ঞতাবাদের মাধ্যমে হিউমের অভিজ্ঞতাবাদের ত্রুটি নিরসন করেন।[৩৫] জেমস এ কথা স্বীকার করেন যে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষাণাত্মক পদ্ধতির ব্যবহারই হিউমের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। এটাই তাঁর বন্ধুদের কাছে তাঁর সার্থকতা ও শত্রুদের কাছে তাঁর ব্যর্থতার চাবিকাঠি।[৩৬]

জেমস হিউমের মতই ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকে তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তিনি হিউমের সাথে এ বিষয়েও একমত যে, কেবল বিশেষ বস্তুরই অভিজ্ঞতা হয়। তবে তিনি হিউমের সমালোচক টি· এইচ· গ্রীনের[৩৭] সাথে একমত হয়ে বলেন যে, এ সব বিশিষ্ট বস্তু যদি একটি সংযুক্ত পদ্ধতিতে পরস্পর বিজড়িত না হয় তবে অস্তিত্বের কোন জ্ঞান থাকবে না। এখানেই হিউমের ব্যর্থতা। একারণেই জেমস বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদীদের মত অভিজ্ঞতার আধেয়কে আণবিক স্বভাবের মনে করেন না। তাঁর মতে, অভিজ্ঞতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন আনবিক উপাদান নয় বরং একটি প্রবাহমান নিরবচ্ছিন্ন ব্যাপার যার মধ্যে কোন ফাঁক নেই। এখানেই হিউমের সাথে জেমস-এর পার্থক্য। লক, বার্কলে ও হিউম প্রত্যেকেই অভিজ্ঞতার আধেয়কে অভিজ্ঞতা বা ক্রিয়া থেকে আলাদা করে অস্তিত্বের জ্ঞান সম্পর্কিত সমস্যা সৃষ্টি করেছেন। জেমস্ তাঁর মৌলিক অভিজ্ঞতাবাদে অভিজ্ঞতার আধেয়কে অভিজ্ঞতা প্রক্রিয়া থেকে পৃথক না করে এ সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করেন। তাঁর মতে, আধেয় ক্রিয়া দ্বারা আবৃত্ত।[৩৮] জেমস এ কথা মনে করেন যে, কান্ট ও তাঁর অনুসারী গ্রীন হিউমের উপরোক্ত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে গ্রীন হিউমের সাথে একমত যে, অনুভূতি তাঁদের নিজেদের সম্পর্ককে বহন করে না। তাই কান্ট ও গ্রীনের মতে একাজ বুদ্ধির। কিন্তু জেমস এবিষয়ে কান্ট ও গ্রীনের মতানুসারী নন। বরং তিনি অভিজ্ঞতার প্রতি হিউমের আস্থাকে সমর্থন করেন এবং অনুভূতি ও সম্বন্ধের দ্বন্দ্বকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করেন।[৩৯] তাঁর মতে, অনুভূতিই এ সম্বন্ধকে বহন করে। জেমস তাঁর মৌলিক অভিজ্ঞতাবাদে তথ্যবিষয়ক কোন সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করেন না, যার উপর হিউমের সংশয়বাদের প্রভাব স্পষ্ট বলে মনে হয়। এ ছাড়া তিনি যখন জড়, আত্মা, দেহ, মন, বিষয়, বিষয়ী প্রভৃতি বিমূর্ত ধারাণাকে মৌলিক অভিজ্ঞতার সাহায্যে বোঝা বা প্রতিপাদন করা অসম্ভব বলে মত প্রকাশ করেন তখন তাঁর উপর হিউমের চরম অভিজ্ঞতাবাদের প্রভাব লক্ষিত হয়। সর্বোপরি, জেমস হিউমের মতবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, অনবধানতা জনিত ত্রুটি, কোন কোন বিষয়কে বাদ দেয়া এবং অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও হিউমের মতবাদ অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ।[৪০] তাঁর এ স্বীকৃতিসূচক মন্তব্য থেকে তাঁর কাছে হিউমের গ্রহণযোগ্যতাই প্রতীয়মান হয়।

জেমসের মত অন্য দু'জন আমেরিকান প্রয়োগবাদী দার্শনিক সি· এস· পার্স ও জন ডিউই-এর মতবাদের উপরও হিউমের অভিজ্ঞতাবাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কান্টের ছাত্র হিসাবেই পার্স দর্শনের জগতে প্রবেশ করেন এবং কান্টের কাছ থেকে তিনি দর্শনের পরিকল্পিত কাঠামো মতবাদ (Architectonic Theory) অর্জন করেন যা জ্ঞানকে যুক্তিবিদ্যা ও অন্যান্য জ্ঞান- এ দু'টি ভাগে বিভক্ত করে।[৪১] এ বিভাজনের উপর হিউমের প্রভাব লক্ষিত হয়। এ ছাড়া হিউমের মত পার্সও মনে করেন যে, বাস্তব বিষয় সম্পর্কে প্রতিপাদনমূলক কোন জ্ঞান থাকতে পারে না।[৪২] পার্সও হিউমের মত প্রত্যক্ষকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে সচেতনতার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গ্রহণ করেন, যদিও তিনি প্রত্যক্ষকেই জ্ঞান বলেননি।

ডিউই র প্রয়োগবাদী মতবাদকে করণবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর করণবাদের মূলভিত্তি অভিজ্ঞতা। তিনি জীবনকে অভিজ্ঞতার অনুক্রম হিসাবে বিচার করেন এবং ব্যক্তির স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতাকে জীবনের প্রাথমিক ঐক্য হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁর এই মতবাদেও হিউমের প্রভাব লক্ষিত হয়।[৪৩] হিউমের মতই ডিউই বলেন যে, অভিজ্ঞতার বাইরে চিন্তার নিজস্ব কোন সত্তা নেই। অভিজ্ঞতার অন্তরালে কোন স্বাধীন ও অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ সত্তা থাকতে পারে একথা হিউমের মত ডিউইও অস্বীকার করেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ শতকে রূপতত্ত্ব বা অবভাসবিদ্যা নামে যে দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠালাভ করে তার উপরও হিউমের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। এমতবাদের মূল প্রবক্তা হিসাবে জার্মান দার্শনিক এডমণ্ড হুসের্ল-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তবে ফ্রেঞ্চ ব্রেন্টানো এবং এলেক্সিয়াস মেইনঙ-এর দর্শনেও অবভাসবিদ্যার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মেইনঙ-এর শিক্ষক ব্রেন্টানো হিউমের *Treatise* গ্রন্থের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তিনি তাঁর *Psychology From an Empirical Standpoint* (১৮৭৮) নামক গ্রন্থে হিউমের মত মনোবিজ্ঞানকে সকল বিজ্ঞানের প্রথম বিজ্ঞান হিসাবে গণ্য করেন।[৪৪] ব্রেন্টানোর ছাত্র অভিজ্ঞতাবাদী মেইনঙও হিউমের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তিনি নিজেকে হিউমের শিষ্য বলে মনে করতেন।[৪৫] ব্রেন্টানোই তাঁকে এ পথ দেখিয়েছেন। মেইনঙ হিউমের বিমূর্ত ধারণা ও সম্বন্ধের বিশ্লেষণের উপর বিশেষ মনোযোগ দেন। হিউম যে অর্থে মনোবিজ্ঞানী ছিলেন মেইনঙকেও ঠিক সেই অর্থে মনোবিজ্ঞানী বলা যায়। হিউমের মতই তিনি সম্বন্ধ ও সার্বিকতাকে মনের ক্রিয়া বলে মনে করেন।

হুসের্ল ১৮৮৪ থেকে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশেষত হিউম ও জন স্টুয়ার্ট মিলের উপর ব্রেন্টানোর বক্তৃতা শুনেন।[৪৬] হুসের্ল *Ideas for a Pure Phenomenology and Phenomenological Philosophy* গ্রন্থে যে অবভাসবাদী মতবাদ প্রদান করেন তাঁর উপর হিউমের প্রভাব স্পষ্ট। হুসের্ল নিজেই একথা স্বীকার করেছেন যে, হিউমের দর্শনে রূপতত্ত্বের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে।[৪৭] হুসের্ল-এর অবভাসবাদ অনুসারে প্রকৃতপক্ষে বস্তুর যতটুকু দেখা যায় তার বেশী কখনও দেখার বা উপলব্ধির চেষ্টা করা হয় না। হিউমও বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের প্রাথমিক উপাদান ইন্দ্রিয়ছাপের বাইরে যেতে রাজী নন। হুসের্ল নিজেই হিউমের মতের মধ্যে অবভাসবাদের বীজ খুঁজে পান। তাঁর মতে, প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষণের সময় সারসত্তাকে বা ধারণাকেই দেখে, বিশেষ বস্তুকে নয়। অভিজ্ঞতাবাদীদের – মানুষ বিশেষ বস্তুকে দেখে – এ ধারণাকে হুসের্ল খণ্ডন করেন এবং একে স্পষ্ট অনুমান হিসাবে আখ্যায়ত করেন। তিনি মনে করেন যে, হিউম যখন প্রত্যক্ষণ ক্রিয়ার কথা বলেন তখন তা মূলত সারধর্মকেই নির্দেশ করে।[৪৮] কারণ, হিউম যখন দেখা, স্মরণ করা, কল্পনা করা, ইত্যাদি মানসিক ক্রিয়ার কথা বলেন তখন তিনি কোন অস্তিত্বশীল বা অনস্তিত্বশীল বিশেষ প্রাকৃতিক বস্তুকে নির্দেশ করেন নি। তিনি প্রত্যক্ষকে ইন্দ্রিয়ছাপ হিসাবে বর্ণনা করেন, জড়বস্তুর গুণাবলীর পর্যবেক্ষণ হিসাবে নয়। এভাবে হিউম এমন একটি পদ্ধতিতে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব বলে দেখাতে চান যা প্রতিটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের চেয়ে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। হুসের্লের মতে, হিউম আসলে এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষণক্রিয়ার সারধর্মের প্রতিই মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তিনি অভিজ্ঞতাবাদী মনোস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে এগিয়ে গিয়ে কেইসহিস্ট্রি বা তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ বা অন্তর্দর্শনের কথা বলেন নি বরং তাঁর লক্ষ্য ছিল প্রত্যক্ষণক্রিয়ার সারধর্মকে উপলব্ধি করা। এর বেশী বা কম কিছু নয়। আর এটিই অবভাসবাদের মূল কথা।[৪৯]

বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রধানত বৃটিশ দার্শনিকদের চিন্তাকে ভিত্তিকরে বিশ্লেষণী দর্শন বা ভাষাগত দর্শন নামে যে দার্শনিক আন্দোলন অধিকতর পরিচিতি লাভ করে তাও হিউমের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। এ ঋণ কেবল ধরন বা পদ্ধতির ক্ষেত্রে নয় বরং দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও।[৫০] প্রাচীন কালে প্লেটো, সক্রেটিস যেমন সাহস, দয়া, ন্যায়পরতা, ইত্যাদি সম্পর্কিত উক্তি বিশ্লেষণ করেছেন আধুনিক যুগে হিউমও তেমনি কারণ সম্পর্কিত উক্তিকে বিশ্লেষণ করেন।[৫১] বিশ্লেষণী দার্শনিকগণ বিশ শতকে শব্দ ও ধারণাবলীর অর্থ স্পষ্টায়নের জন্য ভাষার যৌক্তিক বিশ্লেষণের কথাই বলেছেন যা হিউমের বিশ্লেষণ থেকে পৃথক কিছু নয়। হিউম কারণ, আত্মা ইত্যাদি শব্দের বিশ্লেষণ করে মূলত এসব ধারণার অর্থ স্পষ্টায়নের কাজই করেছেন।

বিশ্লেষণী দার্শনিক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা বৃটিশ দার্শনিক মূর এবং রাসেলের দার্শনিক মতবাদেও হিউমের দর্শনের প্রভাব লক্ষিত হয়। মূর জ্ঞানবিদ্যাগত দিক থেকে অভিজ্ঞতাবাদের সমর্থক ছিলেন। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সকল জ্ঞানকেই তিনি পর্যবেক্ষণ নির্ভর বলে মনে করেন। যদিও তিনি হিউম প্রমুখ অভিজ্ঞতাবাদীদের সাথে সম্পূর্ণ একমত হতে পারেন নি তবুও তাঁর Four Forms of Scepticism শীর্ষক বক্তৃতায় একথা বলেন যে, আমরা সাদৃশ্যমূলক বা আরোহাত্মক কোন যুক্তিতেই বস্তুর অস্তিত্বশীলতাকে বিশ্বাসযোগ্য বা যুক্তিগ্রাহ্য বলে জানতে পারি না।[৫২] তাঁর এ বক্তব্যের ক্ষেত্রে তিনি হিউমের বাহ্য জগৎ সম্পর্কিত মতকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

ভাষা বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব দেয়ায় বর্তমান শতকের দর্শনকে বিপ্লবাত্মক দর্শন হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু জে. জি. ওয়ারনকের মতে, রাসেল ও মূর কোন নতুন বিপ্লবাত্মক পথ আবিষ্কার করেন নি এবং তাঁরা পুরাতন পথেরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাঁর মতে, তাঁদের দর্শনের সাথে হিউম এবং মিলের দর্শনের যথেষ্ট সম্পর্ক আছে। এ ছাড়া ওয়ারনক একথা মনে করেন যে, অধিবিদ্যাগত বাকপটুতার অনুপস্থিতির জন্য কোন কৃতিত্ব থাকলে তা আজকের বিশ্লেষণী দর্শনের নয় বরং দেড়শত বছর আগের বৃটিশ দার্শনিক হিউমের।[৫৩]

Dhaka University Institutional Repository

বিশ শতকের দার্শনিক রাসেল এবং মূর বাহ্যজগতের জ্ঞান প্রসঙ্গে ইন্দ্রিয় উপাত্তের কথা বলেছেন। বিশ্লেষণী দর্শনের প্রখ্যাত ভাষ্যকারবি. আর. গ্রসের মতে, রাসেল ও মূর–এর ব্যবহৃত ইন্দ্রিয় উপাত্ত কথাটি নতুন হলেও চিন্তায় এ ধারাটি নতুন নয়, বরং বহু পুরাতন। সতেরো ও আঠারো শতকে লক, বার্কলে ও হিউমের দর্শনে এরূপ চিন্তা দেখতে পাওয়া যায়, যদিও তাঁরা ইন্দ্রিয় উপাত্তকে অন্য নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, বার্কলে ও হিউম ইন্দ্রিয় উপাত্ত সম্পর্কিত যে সমস্যার সৃষ্টি করেছিলেন মূর তাঁদের অবস্থান পরিহার করার মাধ্যমে এ সমস্যারই সমাধান দিতে সচেষ্ট হয়েছেন।[৫৪]

রাসেল হিউমের মত কঠোর অভিজ্ঞতাবাদী ছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ, তিনি একথা বলেছেন যে, অভিজ্ঞতাতিরিক্ত জ্ঞান কিভাবে অর্জন করা যায় তা ব্যাখ্যা করার যথেষ্ট জটিলতা থাকলেও যে মতবাদ এ ধরনের জ্ঞানকে অস্বীকার করে সে মতবাদ সম্পূর্ণঅযৌক্তিক।[৫৫] কিন্তু রাসেল যখন একথা বলেন যে, পৃথিবীতে যা অস্তিত্বশীল তার সকল জ্ঞান, যদি তা প্রত্যক্ষণ বা স্মৃতির মাধ্যমে জ্ঞাত ঘটনাবলীকে সরাসরি প্রতিপাদন না করে তবে, সে সব আশ্রয়বাক্য থেকে অনুনিত হবে যার একটি আশ্রয়বাক্য অন্ততপক্ষে প্রত্যক্ষণ বা স্মৃতির মাধ্যমে জ্ঞাত,[৫৬] তখন তাঁর উপর হিউমের অভিজ্ঞতাবাদের প্রভাব লক্ষিত হয়। এ ছাড়া রাসেল কোন বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞতাপূর্ব কোন পদ্ধতি আছে বলে মনে করেন না এবং তিনিও মনে করেন যে, যুক্তিবিদ্যা ও গণিতের ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য মতবাদের সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা নেই।[৫৭] তাঁর এ চিন্তায় যথাক্রমে হিউমের ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা মতবাদ এবং সংশয়বাদের প্রভাব দেখা যায়। হিউম অর্থের মানদণ্ড প্রণয়ন করতে গিয়ে বলেন যে, কোন ধারণা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলে কোন ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে এ ধারণার উৎপত্তি তা খুঁজে বের করতে হবে। ধারণার অনুরূপ ইন্দ্রিয়ছাপ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হলে এ ধারণাকে অর্থহীন মনে করতে হবে। রাসেল তাঁর *The Problems of Philosophy* গ্রন্থে যে সূত্র প্রণয়ন করেন তার সাথে হিউমের উপরোক্ত সূত্রের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। রাসেল বলেন, যে সব বচন আমাদের বোধগম্য হয় সেগুলোর প্রত্যেকটি এমন সব উপাদান দ্বারা গঠিত যে সব উপাদানের সাথে আমরা পরিচিত।[৫৮] জন পাসমোরের মতে, রাসেল, লক ও বার্কলে স্বীকৃত দ্রব্যের ধারণাকে বর্জন করে বিরামহীন বস্তুর কথা বলেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর লক্ষ্য ছিল বৈজ্ঞানিক অনুমানকে সম্ভব করার জন্য গ্রহণযোগ্য সূত্রাবলী প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নেয়া, যার সাথে হিউমের দর্শনের সাধারণ নিয়মাবলীর যথেষ্ট মিল দেখা যায়।[৫৯] এ ছাড়া পাসমোর এও বলেন যে, দর্শনের সারসত্তা হল মনোস্তাত্ত্বিক– এই বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদী ধারণাকে রাসেল প্রথমদিকে যদিও পরিত্যাগ করেছেন তবুও তাঁর শেষের দিকের রচনায় মনতত্ত্বকে পুণর্গঠিত করার একটি প্রবণতা দেখা যায়। এ প্রবণতার মধ্যে হিউমের কাছে প্রত্যাগমনের মনোভাব লক্ষিত হয়।[৬০]

শুধু দর্শনের ক্ষেত্রেই নয় বিশ শতকের বিজ্ঞানও হিউমের কাছ থেকে তাঁর উপাদান সংগ্রহ করেছে বলে মনে হয়। প্রখ্যাত আপেক্ষিকতাবাদী আইনস্টাইন এ কথা স্বীকার করেন যে, হিউমের রচনা দ্বারা জ্ঞানতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন।[৬১] আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদী কার্যকারণতত্ত্বকে হিউমের আকস্মিকতাবাদী কার্যকারণেরই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলে মনে করা যায়। এ ছাড়া, বিশ শতকের বিজ্ঞানের দার্শনিক পটভূমি নির্মাণের ক্ষেত্রেও হিউমের অভিজ্ঞতাবাদী দর্শন যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে।[৬২]

হিউম পরবর্তী দার্শনিক ধারাগুলোর মধ্যে হিউমকে গ্রহণ বর্জন ও তাঁর প্রভাব এ সবকিছু মিলিয়ে একথা সুস্পষ্ট যে, চার্বাক অভিজ্ঞতাবাদের আধুনিক রূপকার ডেভিড হিউম পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে একটি প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসাবে অভিজ্ঞতাবাদকে নবরূপ দান করেন। তাঁর অবদানের কারণেই তাঁর দর্শনের, আরও ব্যাপক অর্থে বলা যায়, চার্বাক প্রতিষ্ঠিত অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যাগত ধারার সুদূর প্রসারী প্রভাব দর্শনের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত দেখা যায়।

সুতরাং বলা যায়, খ্রিষ্টপূর্ব সাত শতকের আগে প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক চার্বাকদের হাতে যে অভিজ্ঞতাবাদী চিন্তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় সে চিন্তারধারাই যেন প্রাচ্য–পাশ্চাত্য ও দেশ–কালের সীমা অতিক্রম করে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দেশের দার্শনিকদের চিন্তাধারাকে আশ্রয় করে ইতিহাসের গতির সাথে তাল মিলিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। এ প্রবাহের ক্ষেত্রে সমসাময়িক দেশ–কাল, জ্ঞান–বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি এবং আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব এ ধারাটিকে প্রভাবিত করে। তাই এর গতি সব সময় উর্দ্ধগামী সরলরেখার মত ছিল না বরং ছিল উঁচুনীচু। এমনকি কখনও কখনও (যেমন মধ্যযুগে) এ প্রবাহে ছেদ পড়তেও দেখা যায়। সমসাময়িক আর্থ সামাজিক অবস্থাই এর কারণ। আঠারো শতক মূলত পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির যুগ। এ সময়ের বৃটিশ দার্শনিক হিউম চার্বাক প্রতিষ্ঠিত অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানবিদ্যাগত ধারারই প্রতিনিধিত্ব করেন। চার্বাকদের মতবাদেরই সময়োপযোগী উন্নতি সাধন করে তিনি যেন ইতিহাস নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিজ্ঞানের প্রভাবে অভিজ্ঞতাবাদের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তথা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার করেন। এ ছাড়া, তিনি অভিজ্ঞতাবাদ থেকে যাবতীয় অসঙ্গতি নিরসনেও প্রয়াসী

Dhaka University Institutional Repository

হন। এর ফলে তাঁর হাতে আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদ চরম পরিণতি লাভ করে। হিউমই একথা প্রমাণ করেন যে, চার্বাকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং প্রাচীন–মধ্য–আধুনিক যুগের দার্শনিকদের চিন্তাস্রোতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অভিজ্ঞতাবাদের চরম পরিণতি হল সংশয়বাদ। তাঁর এ অবদানের জন্যই পরবর্তীকালের দার্শনিকদের কাছে তাঁর দ্বারা উদ্ভূত জ্ঞানবিদ্যাগত প্রশ্ন একটি কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হিসাবে বিবেচিত হয়। হিউম পরবর্তী দার্শনিকগণ তাঁদের জ্ঞানবিদ্যাগত আলোচনায় হিউম নির্দেশিত সংশয়বাদেরই একটি সঙ্গতিপূর্ণ সমাধান খুঁজে পেতে চেষ্টা করেন। উনিশ ও বিশ শতকের অভিজ্ঞতাবাদ, বিচারবাদ, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ, প্রয়োগবাদ, রূপতত্ত্ব বা অবভাসবাদ, বিশ্লেষণী দর্শন, এমনকি বিশ শতকের আপেক্ষিকতাবাদী বৈজ্ঞানিক মতবাদও হিউমের দ্বারা উত্থাপিত জ্ঞানবিদ্যাগত প্রশ্নকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে সক্ষম হয় নি।

এ থেকে এ কথা বলা যায় যে, জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত সমস্যার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা অর্থাৎ দর্শনের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। এক বিশেষ আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষের চিন্তা চেতনার বিকাশের এক বিশেষ পর্যায়ে দর্শনের ইতিহাসের সূচনা হয়। অতপর দেশ, কাল, জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, ইত্যাদির গণ্ডীকে অতিক্রম করে জগৎ জীবন সম্পর্কিত সমস্যার দার্শনিক ব্যাখ্যা ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এগিয়ে চলে। দার্শনিক চিন্তার এই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার কারণেই প্রাচ্যের চার্বাক দার্শনিকদের উত্থাপিত জ্ঞানবিদ্যাগত সমস্যার আলোচনায় মনোযোগী হয়েছেন আড়াই হাজার বছর পরবর্তী পাশ্চাত্য দার্শনিক হিউম। একই দার্শনিক সমস্যার চার্বাক ও হিউম প্রদত্ত দু'টি ব্যাখ্যায় যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে তার মূল নিহিত রয়েছে তাঁদের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির মধ্যে।

তাই দার্শনিক সমস্যা ও তার সমাধান প্রচেষ্টাকে কোন ভৌগলিক সীমারেখা দ্বারা দৃঢ়ভাবে সীমাবদ্ধ করা সঙ্গত বলে মনে হয় না। বরং এ অর্থে ভারতীয় দার্শনিক, পাশ্চাত্য দার্শনিক ইত্যাদি নামে ভৌগলিকভাবে দার্শনিক গোষ্ঠীকে চিহ্নিত ও সীমাবদ্ধ করা গেলেও তাঁদের আলোচিত সমস্যা ও তার সমাধান প্রচেষ্টাকে তথা দার্শনিক মতবাদকে দেশ কালের সীমারেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যাবে না। বরং এর উপর দেশ–কাল ও ভৌগলিক গণ্ডীভেদে পূর্ববর্তী সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক চিন্তার ইতিহাস ও তাঁদের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষপটের প্রভাব খুঁজে পাওয়া যাবে। কোন স্থানিক ও কালিক গণ্ডীর মধ্যে এ প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকে না। এখানেই দর্শনের ইতিহাসের বিশেষত্ব। তাই কোন দার্শনিক মতবাদকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন করতে হলে ভৌগলিক গণ্ডী তথা স্থান কালের সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে উঠে সে মতবাদকে ও তার প্রেক্ষাপটকে বিচার করাই হবে যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি। চার্বাক ও হিউমের জ্ঞানবিদ্যার তুলনামূলক সমীক্ষায় থেকে এ বিষয়টিই প্রমাণিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী

১। কান্ট বলেনঃ I readily confess, the reminder of David Hume was what many years ago first broke my dogmatic slumber, and gave my researches in the field of speculative philosophy quite a different direction. দ্রষ্টব্যঃ Immanual Kant: Kant's *Prolegomena*, Introduction, in the *Prolegomena and Metaphysical Foundations of Natural Science*, Tr. by Ernest Belfort Bax, London, George Bell and Sons, 1883, পৃ 8

২। Immanual Kant: *Critique of Pure Reason*, Tr. by J. M. D. Mieklejohn, London, Everyman's Library, 1943, পৃ ২৫। কান্ট বলেছেন, But though all our knowledge begins with experience, it by no means follows, that all arises out of experience.

৩। B. Russell: *History of Western Philosophy*, London, George Allen & Unwin Ltd., 1965, পৃ ৬৭৯

৪। অভিজ্ঞতাপূর্ব ও অভিজ্ঞতাজাত এবং সংশ্লেষণী ও বিশ্লেষণী অবধারণের জন্য কান্টের *Critique*, পূর্বোক্ত, এর যথাক্রমে পৃ ২৫-২৬ এবং পৃ ৩০-৩২ দ্রষ্টব্য

৫। আমিনুল ইসলামঃ *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৪, পৃ ৩১৭-১৮

৬। B. Russell: *History*. পূর্বোক্ত, পৃ ৬৪৬

৭। Elie Halevy: *The Growth of Philosophic Radicalism*, Boston, The Beacon Press, 1960, পৃ ১১

৮। পূর্বোক্ত, পৃ ৫

৯। বেনথামের উপর হিউমের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য পূর্বোক্ত গ্রন্থের, বিশেষত, পৃ ৪৬, ৪৭, ৭৪, ৮৮ ও ১৬২ দ্রষ্টব্য

১০। Samual Enoch Stumpf: *Socrates to Sartre*, New York, McGrow-Hill Book Co., 1975, পৃ ৩৫২

১১। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আমিনুল ইসলামঃ *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ ১২৫-১৩৩

১২। Paul Edwards (ed.): *Encyclopedia of Philosophy*, Vol. 2. New York, Macmillan Publishing Co., 1972, পৃ ৫০৩

১৩। পূর্বোক্ত

১৪। Samual Enoch Stumpf: *Socrates to Sartre*, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৪৯। তুলনীয়, D. M. Datta: *The Chief Current of Contemporary Philosophy*, Third ed., Calcutta, Calcutta University, 1970, পৃ ৪৬৪

১৫। Samual Enoch Stumpf, Socrates to Sartre, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৩৬-৩৭

১৬। Barry R. Gross: *Analytic Philosophy*, New Delni, Oxford and IBH Publishing Co., 1981, পৃ ১০৮

১৭। Antony Flew: *Hume's Philosophy of Belief*, London, Routledge and Kegan Paul Ltd., 1961, পৃ ১৫, দৃষ্টান্তের জন্য A. J. Ayer, *Language, Truth and Logic*, 2nd Ed. London, Victor Gollancz Ltd., 1946, পৃ ৫৪-৫৫ দ্রষ্টব্য

১৮। J. O. Urmson: *Philosophical Analysis*, London, Oxford University Press, 1976, পৃ ১০৮

১৯। Barry R. Gross: *Analytic Philosophy*, পূর্বোক্ত, পৃ ১০৯

২০। John Passmore: *A Hundred Years of Philosophy*, New York, Penguin Books Ltd., 1978, পৃ ৩৯৩

২১। David Hume: *Enquiry*. পূর্বোক্ত, অধ্যায় বাদশ, অংশ তিন দ্রষ্টব্য

২২। A. J. Ayer : *Language, Truth and Logic*, 2nd ed. পূর্বোক্ত, পৃ ৫৪

২৩। L. Wittgenstein : *Tractatus Logico Philosophicus*, Tr. by C. K. Ogden, London, Routledge and Kegan Paul, 1922, 8, ২১ ও 8, ৪৬

২৪। Samuel Enoch Stumpf : *Socrates to Sartre*, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৩৩

২৫। L. Wittgenstein : *Tractatus*, পূর্বোক্ত, ৬, ৩

২৬। J. O. Urmson : *Philosophical Analysis*, পূর্বোক্ত, পৃ ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

২৭। পূর্বোক্ত, পৃ· ৯৮
২৮। George Pitcher: *The Philosophy of Wittgenstein*, New Delhi, Prentice-Hall of Indian Private Limited, 1972, পৃ· ৪২-৪৩
২৯। L. Wittgenstein: *Tractatus*, পূর্বোক্ত, ৫, ৬৩ (৯)
৩০। George Pitcher: *The Philosophy of Wittgenstein*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৪৭
৩১। G. Ryle: "Ordinary Language", *Philosophical Review*, 1953, পৃ· ১৭১, উদ্ধৃত, B. R. Gross: *Analytic Philosophy*, পূর্বোক্ত, পৃ· ২২৭
৩২। George Pitcher: *The Philosophy of Wittgenstein*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৩২৬
৩৩। Samuel Enoch Stumpf: *Socrates to Sartre* , পূর্বোক্ত, পৃ· ৪৩৬
৩৪। আমিনুল ইসলাম: *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন*, পূর্বোক্ত, পৃ· ২২৯
৩৫। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, R. B. Perry: *The Thought and Character of William James*, Vol. I, London, Oxford University Press, 1935, পৃ· ৫৪৩-৫৭০
৩৬। পূর্বোক্ত, পৃ· ৫৫০
৩৭। T. H. Green এবং T. H. Gross , *A Treatise of Human Nature etc.* 1874, এর ভূমিকায় গ্রীন হিউমের সমালোচনাকরেন।
৩৮। R. B. Perry : *The Thought and Character*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৫৬৯-৭০
৩৯। পূর্বোক্ত, পৃ· ৫৬৮
৪০। পূর্বোক্ত, পৃ· ৫৫২
৪১। Paul Edwards (ed.): *Encyclopedia of Philosophy*, Vol. 5, পূর্বোক্ত, পৃ· ৭৫
৪২। D. M. Datta : *The Chief Current of Contemporary Philosophy*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৩৯৭
৪৩। পূর্বোক্ত, পৃ· ৩৮১
৪৪। John Passmore : *A Hundred Years of Philosophy*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৭৮
৪৫। Marie-Luise Schubert Kalsi: *Meinong's Theory of Knowledge*, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, পৃ· ৩, তুলণীয়, পৃ· ১৬
৪৬। Samual Enoch Stumpf: Socrates to Sartre, পূর্বোক্ত, পৃ· ৪৬৮
৪৭। Edmund Husserl: *Formal and Transcendental Logic*, by Dorion Cairns,The Hague, Martinus Nijhoff of, 1969, পৃ· ১০০
৪৮। John Passmore: *A Hundred Years of Philosophy*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৮৮
৪৯। পূর্বোক্ত, পৃ· ১৮৯
৫০। Barry R. Gross: *Analytic Philosophy*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১০
৫১। J. O. Urmson: *Philosophical Analysis*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৪১
৫২। Paul Edward (ed.): *Encyclopedia of Philosophy*, Vol. 5, পূর্বোক্ত, পৃ· ৭৯
৫৩। G. J. Warnock: *English Philosophy Since 1900*, Oxford University Press, 1969, পৃ· ১১-১২
৫৪। Barry R. Gross: *Analytic Philosophy*, পূর্বোক্ত, পৃ· ২৫-২৬
৫৫। বার্ট্রাণ্ড রাসেল: *আমার দার্শনিক চিন্তার ক্রমবিকাশ*, রশীদুল আলম অনূদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯০, পৃ· ১৯২
৫৬। পূর্বোক্ত, পৃ· ১১৩
৫৭। পূর্বোক্ত
৫৮। B. Russell: *The Problems of Philosophy*, 16th imp., London, Oxford University Press, 1936, পৃ· ৯১
৫৯। John Passmore: *A Hundred Years of Philosophy*, পূর্বোক্ত, পৃ· ২৩৯
৬০। পূর্বোক্ত, পৃ· ২১৪
৬১। John Passmore: *A Hundred Years of Philosophy*, পূর্বোক্ত, পৃ· ৩৩১
৬২। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, এ· এম· হারুন অর রশীদ: *বিজ্ঞান ও দর্শন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

অন্নংভট্ট : *তর্কসংগ্রহ,* শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী (অনূদিত), কলিকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৯০ বাংলা

আন্তোনভা, কো, এবং অন্যান্য : *ভারতের ইতিহাস,* মস্কো, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৬

ইসলাম, আমিনুল : *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন ,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪

ইসলাম, আমিনুল : *প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শন,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮১

ইসলাম, আমিনুল : *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন,* ১ম সংস্করণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২

ঈশ্বরকৃষ্ণ : *সাংখ্যকারিকা,* স্বামী দিবাকরানন্দ অনূদিত, কলিকাতা, মডার্ন আর্ট প্রেস, ১৯৮২

কমলশীল : *তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা,* বরোদা, গায়কোয়াড ওরিয়েন্টাল সিরিজ, ১৮৮৩

করিম, সরদার ফজলুল : *দর্শন কোষ,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩

করিম, সরদার ফজলুল (অনূদিত) : *প্লেটোর রিপাবলিক,* ঢাকা, বর্ণমিছিল, ১৯৭৪

কুমারিল : *শ্লোকবার্তিক,* বেনারস, চৌখম্ব সংস্কৃত সিরিজ, ১৮৯৮–৯৯

কেশবমিশ্র : *তর্কভাষা,* দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ও পণ্ডিত কেদারনাথ সাহিত্য ভূষণ (সম্পাদিত), ১ম সংস্করণ, বোম্বে, সংস্কৃত ও প্রাকৃত সিরিজ, ১৯৩৭

গৌতম : *ন্যায়সূত্র,* কলিকাতা, জীবানন্দ, ১৯১৯

গৌতম : *ন্যায়সূত্র,* বিনায়ক গনেশ আপ্টে (সম্পাদিত), আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, ৯১ সংখ্যা, ১৯২২

ঘোষ, জগদীশ চন্দ্র (সম্পাদিত) : *শ্রীমদ্ভগবদগীতা,* কলিকাতা, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৩৮৪ বাংলা

ঘোষ, রমেন্দ্রনাথ : *ভারতীয় দর্শন,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩

চক্রবর্তী, নীরোদবরণ : *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস,* কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮

চক্রবর্তী, শ্রীনিকেতন : *আয়ুর্বেদশাস্ত্রের ইতিহাস,* ঢাকা, আয়ুর্বেদ নিকেতন, ১৯৯০

চক্রবর্তী, সুবোধ কুমার (সংকলিত) : *বিষ্ণুপুরাণ,* কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত, কলিকাতা, এ· মুখার্জী, ১৯৮১

চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ : *ভারতীয় দর্শন* (প্রথম খণ্ড), কলিকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা· লি· ১৯৬০

চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ : *লোকায়ত দর্শন* (অখন্ড), কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬৩ বাংলা

চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ : *লোকায়ত দর্শন,* (প্রথম খণ্ড) ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৭৫ বাংলা

চট্টোপাধ্যায়, লতিকা : *চার্বাক দর্শন,* কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা· লি· ১৯৮৪

চাকমা, নীরুকুমার : *বুদ্ধঃ তাঁর ধর্ম ও দর্শন,* ঢাকা, ১১/এইচ ফুলার রোড, ১৯৯০

ঠাকুর, উদয় : *ন্যায় বার্ত্তিক,* কলিকাতা, বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা, ১৮৮৭

দত্ত, রাসবিহারী : *ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ খণ্ডন,* কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯

দেব, হরিনারায়ণ : *মহাভারত,* মুনীন্দ্র কুমার ঘোষ (সঞ্জয়, সম্পাদিত), কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯

ধর্মোত্তর : *ন্যায় বিন্দুটিকা,* বেনারস, কাশী সংস্কৃত সিরিজ, ১৯২৪

ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র : *বেদান্ত পরিভাষা,* (১ম খণ্ড), শ্রীশরচন্দ্র ঘোষাল (অনূদিত), কলিকাতা, কলেজ স্কোয়ার, ১৩২২ বাংলা

বাৎসায়ন : *ন্যায়ভাষ্য,* ফনি ভূষণ তর্কবাগীশ (অনূদিত), কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির, ১৩২৪ বাংলা

বাল্মীকি : *রামায়ণ,* মন্মথ নাথ দত্ত, (অনূদিত), কলিকাতা, ১৮৯৩

বাল্মীকি : *রামায়ণ ,* মাদ্রাজ, রামরত্নম প্রকাশিত সংস্করণ, ১৯৫৮

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞান ভিক্ষু : *সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যঃ* রিচার্ড গার্বে (সম্পাদিত), লণ্ডন, গিন এণ্ড কোম্পানী, ১৮৯৫

বিশ্বরূপানন্দ, স্বামী (অনূদিত) : *বেদান্ত দর্শন,* কলিকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮৯

বিশ্বনাথ : *সিদ্ধান্তমুক্তাবলী,* বোম্বে, নির্ণয় সাগর প্রেস, ১৯১৬

ভট্ট, জয়ন্ত : *ন্যায় মঞ্জরী,* বেনারস, বিজিওনগ্রম সংস্কৃত সিরিজ, ১৮৯৫

ভট্ট, জয়ন্ত : *ন্যায় মঞ্জরী,* মহামহোপাধ্যায় গঙ্গাধর শাস্ত্রী তৈলঙ্গ (সম্পাদিত), ৩য় খণ্ড, ২য় অংশ, বেনারস, ই, জে, লাজারুস এণ্ড কোং, ১৮৯৫

ভট্টাচার্য, সুকুমারী : *ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য,* কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১

ভৌমিক, দুলাল (অনূদিত) : *শতপথ ব্রাহ্মণঃ শুক্ল যজুর্বেদীয় মাধ্যান্দিন শাখা,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯০

মতিন, আবদুল (অনূদিত) : *দর্শনের রূপরেখা,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮১

মাধবাচার্য : *সর্বদর্শন সংগ্রহ* (১ম খণ্ড), মহামহোপাধ্যায় বাসুদেব শাস্ত্রী (সম্পাদিত), পুনা, ভাণ্ডারকার অরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯২৪

মানিক্যনন্দি : *পরীক্ষামুখসূত্র,* এস, সি, বিদ্যাভূষণ (সম্পাদিত), কলিকাতা, বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা, ১৯০৫

মিশ্র, পার্থসারথী : *শাস্ত্রদীপিকা,* বোম্বে, নির্ণয় সাগর প্রেস, ১৯১৫

মিশ্র, বাচস্পতি : *ন্যায়বার্তিক তাৎপর্যটীকা,* বেনারস, বিজিওনগ্রম সংস্কৃত সিরিজ, ১৮৯৮

রশীদ, মোঃ আবদুর (অনূদিত) : *জ্ঞানবিদ্যা,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯

রশীদ, এম, এ, হারুন-অর : *বিজ্ঞান ও দর্শন,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১

রহমান, আবু তাহা হাফিজুর (অনূদিত) : *মানব প্রকৃতির স্বরূপ অন্বেষা,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮১

রাসেল, বার্টাণ্ড : *আমার দার্শনিক চিন্তার ক্রমবিকাশ,* রশীদুল আলম (অনূদিত), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯০

শরীফ, আহমদ : *বাঙালীর চিন্তাচেতনার বিবর্তন ধারা,* ঢাকা, ইউনিভারসিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৭

শান্তরক্ষিত : *তত্ত্বসংগ্রহ,* খণ্ড ১ ও খণ্ড ২, (খণ্ড ১, পৃ ২০৮৪, খণ্ড ২, পৃ ২০৮৫-৩৬৪৬) বরোদা, সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, ১৮৬৪

শালিকানাথ : *প্রকরণ পঞ্জিকা,* পণ্ডিত মুকুন্দ শাস্ত্রী (সম্পাদিত), বেনারস, চৌখম্ব সংস্কৃত সিরিজ, ১৯০৩

শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জণ : *চার্বাক দর্শন,* কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮২

শাস্ত্রী, আশুতোষ ভট্টাচার্য : *বেদান্ত দর্শনঃ অদ্বৈত বেদান্ত,* কলিকাতাবিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯

সেন, অতুল চন্দ্র ও সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রমুখ (অনূদিত ও সম্পাদিত) : *উপনিষদ,* (অখণ্ড), কলিকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৮০

সেনশাস্ত্রী, স্বামী শ্রীমুরারি মোহন (সম্পাদিত) : *মনুসংহিতা,* কলিকাতা, দীপালী বুক হাউস, ১৯৮৫

সূরী, গুণরত্ন : *তর্করহস্য দীপিকা,* কলিকাতা, বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা, ১৯১৪

সূরী, হরিভদ্র : *ষড়দর্শন সমুচ্চয়,* বেনারস, চৌখম্ব সংস্কৃত সিরিজ নং ৯৫

হাই, সাইয়েদ আবদুল : *দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা কোষ* (১ম খণ্ড), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮

হাই, সাইয়েদ আবদুল : *দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা কোষ* (২য় খণ্ড), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬

হারুন, শরীফ (অনূদিত) : *দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ পরিচিতি,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫

Acharya, Madhava : *Sarva-Darsana-Samgraha,* Tr. By Cowell, E. B. and Gough, A. G. London, Kegan Paul Trench, Trubner and Co. Ltd., 3rd ed., 1908

Dhaka University Institutional Repository

Ackermann, Robert : *Theories of Knowledge*, Bombay, Tata Mcgraw Hill Publishing Co. Ltd., 1965

Afanasyev, V. G. : *Marxist Philosophy*, Moscow, Progress Publishers, 1980

Ayer, A. J. : *Hume*, Oxford, Oxford University Press, 1980

Ayer, A. J. : *Language, Truth and Logic*. 2nd ed., London, Victor Gollancez, 1967

Ayer, A. J. : *The Central Questions of Philosophy*, New Delhi, The Macmillan Co. of India Ltd., 1979

Ayer, A. J. : *The Foundation of Empirical Knowledge*, London Macmillan Co. Ltd., 1951

Ayer, A. J. : *The Problem of Knowledge*, London, Macmillan and Co. Ltd., 1956

Barker, Stephen, F. : *The Elements of Logic*, 5th ed., McGraw-Hill International Edition, 1965

Bary, W. M.
Theodore de (ed.) : *Source of Indian Tradition*, Vol.1, New York, Columbia, U. P., 1966

Bax, Earnest Belfort (Tr.) : *Kant's Prolegomena and Metaphysical Foundations of Natural Science*, London, George Bell and Sons, 1883.

Berkeley, George : *Principles of Human Knowledge*, London, Everyman's Library, 1910

Bhartiya, Mahesh Chandra : *Causation in Indian Philosophy*, Ghaziabad, Vimal Prakashan, 1973

Bhattacharya, K. C. : *Studies in Vedantism*, Calcutta, Calcutta University, 1909

Bhatta, Jayrashi : *Tattapllabasingha*, Tr. by Shastri, S. N., and Saksena, S. K., ed. by Pandit Sanghavi, S. and Parikh, R.C., Baroda Oriental Institute, 1940

Bijalwan, C. D. : *Indian Theory of Knowledge*, New Delhi, Heritage Publishers, 1977

Broad, C. D. : *The Mind and it's Place in Nature*, London, 1925.

Chappell, V. C. (ed.) : *David Hume*, London, Macmillan, 1968

Chattopadhay, Deviprasad : *What is Living and What is dead in Indian Philosopy*, New Delhi, People's Publishing House, 1976

Chisholm, R. M. : *Theories of Knowledge*, 2nd ed. New Jersey, Prentice Hall, 1977

Copleston, F. : *A History of Philosophy*, Vol. V, London, Burns and Oates Ltd., 1964

Das Gupta, S. N. : *A History of Indian Philosophy*, Vol. I, New York, Cambridge University Press, 1969

Das Gupta, S. N. : *A History of Indian Philosophy*, Vol. II, New York, Cambridge University Press, 1968

Dhaka University Institutional Repository

Datta, D. M. : *The Chief Current of Contemporary Philosophy*, Third ed., Calcutta, Calcutta University, 1970

Datta, D. M. : *Six Ways of Knowing*, Calcutta, University of Calcutta, 1972

Durant, Will : *The Pleasure of Philosophy*, New York, Simon and Sclinsler, 1953

Edwards, Paul (ed.) : *The Encyclopedia of Philosophy*, New York, Macmillan Publishing Co. Inc. and Free Press, 1972

Edwards, Paul and Pap, Arthur (ed.) : *A Modern Introduction to Philosophy*, (3rd ed.), New York, The Free Press, 1973

Flew, Antony : *Hume's Philosophy of Belief*, London, Routledge and Kegan Paul, 1961

Frolov, I. (ed.) : *Dictionary of Philosophy*, Moscow, Progress Publishers, 1984

Gautama : *Nyaya-Sutra with Vatsyana's Commentrary*, Tr. by Gangopadhyaya, Mrinalkanti, Calcutta, Indian Studies, 1982

Ghose, Kamendra Nath : *The Dialectics of Nagarjuna*, Allahabad, Vohra Publishers and Distributors, India, 1989

Gross. Barry R. : *Analytic Philosophy*, New Delhi, Oxford and IBH Publishing Co. 1981

Halevy, Elie : *The Growth of Philosophic Radicalism*, Boston, The Beacon Press, 1960

Hawkins, D. J. B. : *Being and Becoming*, London, Sheed and Ward, 1954

Hiriyanna, M. : *Indian Philosophy*, London, George Allen and Unwin, Ltd., 1958

Hiriyanna, M. : *The Essentials of Indian Philosophy*, London, George Allan and Unwin, 1969

Hume, David : *An Inquiry Concerning Human Understanding*, New York, Collier Books, 1962

Hume, David : *A Treatise of Human Nature*, ed. by Selby-Bigge, L. A., 2nd ed., London, Everyman's Library, 1968

Husserl, Edmund : *Formal and Transcendental Logic*, Tr. by Cairns, Dorion, . The Hague, Martinus Nijhof, 1969

Imam, Akhter : *David Hume on the Nature of the Self*, Dhaka, 3 Shegun Bagicha, 1976

Islam, Azizun Nahar : *The Nature of Self, Suffering and Salvation*, Allahabad, Vohra Publishers and Distributors, 1987

Islam, Kazi Nurul : A Critique of Sankara's Philosophy of Appearence, Allahabad, Vohra Publishers & Distributors, India, 1988

Jha, Ganga Nath : *Indian Thought*, Allahabad, 1911

Johnston, G. A. : *Development of Berkeley's Philosophy*, New York, Macmillan Publishing Co. Inc. and The Free Press, 1923

Dhaka University Institutional Repository

Junanakr, N. S. : *Gautama: The Nyaya Philosophy*, Delhi, Motilal Banarsidass, 1978

Kalsi, Marie-Luise Schubert : *Meinong's Theory of Knowledge*, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1987

Karl, H. Potter (ed.) : *Encyclopedia of Indian Philosophy*, Delhi, Motilal Banarsidass, 1981

Kant, Immanuel : *Critique of Pure Reason*, Tr. by Meiklejohn, J. M. D., London, Everyman's Librabry, 1959

Laird, John : *Hume's Philosophy of Human Nature*, London, Archon Books, 1967

Locke, John : *An Essay Concerning Human Understanding*, ed. by Pattison, A. Seth Pringle, Oxford, 1924

Locke, John : *An Essay Concerning Human Understanding*, Collected and annotated by, Fraser, A. C., Vol.I, New York, Dover Publication, 1959

Macnabb, D. G. C. : *David Hume: His Theory of Knowledge and Morality*, London, Hutchinson Houses, 1957

Marx, Karl : *Selected Works*, Vol. I, Moscow, Progress Publishers, 1946

Marx, Karl and Engels, Frederick : *Collected Works*, Vol. IV, Moscow, Progress Publishers, 1975.

Maxmuller, F. (ed.) : *Sacred Books of the East (Jaina Sutras)*, Part-II, Delhi, Motilal Banarsidass, 1973

Misra, Vachspati : *Samkhytatta Kaumudi*, Tr. by Ganganath Jha, Bombay, Tookaram Tatya F.T.C., 1896

Misra, Krishna : *Prabodha Chandroday*, Tr. by Taylor. J, Bombay, 1811

Morice, G. P. (ed.) : *David Hume*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1977

Morris, C. R. : *Locke, Barkeley and Hume*, London, Oxford University Press, 1963

Mossner, Ernest Campbell : *The Life of David Hume*, Edinburgh, Thomas Nelson and Sons, Ltd., 1954

Nehru, Jawaharlal : *The Discovery of India*, New Delhi, Jawharlal Memorial Fund, 1981

Passmore, John : *A Hundred Years of Philosophy*, New York, Penguin Books Ltd., 1978

Pears, D. F. (ed.) : *David Hume: A Symposium*, New York. St. Martin's Press, 1965

Perry, R. B. : *The Thought and Character of William James*, Vol. I, London, Oxford University Press, 1935

Dhaka University Institutional Repository

Pitcher, George : *The Philosophy of Wittgenstein*, New Delhi, Prentice- Hall of Indian Private Ltd., 1972

Radhakrishnan, S. (ed.) : *History of Philosophy: Eastern and Western*, Vol. I, London, George Allen and Unwin Ltd., 1952

Radhakrisnan, S. and Moore, C. A. (ed.) : *A Sourcebook in Indian Philosophy*, New Jersey, Princeton, 1967

Russell, B. : *An Outline of Philosophy*, London, Unwin Paperbacks, 1983

Russell, B. : *History of Western Philosophy*, London, George Allen and Unwin Ltd., 1961

Russell, B. : *Human Knowledge: It's Scope and Limit*, New York, Simson and Schuster, 1948

Russell, B. : *Logic and Knowledge: Essays*, ed. by March R. C., London, 1956

Russell, B. : *The Problems of Philosophy*, London, Oxford University Press Paperbacks, 1973

Ryle, Gilbert : *The Concept of Mind*, London, Hutchinson and Co. Publisihing Ltd., 1949

Samkara : *Sarbasidhantasamagra*, Tr. by Prem Sundar Bose, Calcutta, 1929

Sharma, C. D. : *A Critical Survey of Indian Philosophy*, Delhi, Motilal Banarshidass, 1987

Sinha, J. N. : *A History of Indian Philosophy*, Vol. I, Calcutta, Sinha Publishing House, 1956

Sinha, J. N. : *Introduction to Indian Philosophy*, Agra, 1949

Smith, N. K. : *The Philosophy of David Hume*, New York, St. Martin's Press, 1966

Stroud, Berry : *Hume*, London, Routledge and Kegan Paul, 1977

Stumpf, Samuel Enoch : *Socrates to Sartre*, New York, McGraw-Hill Book Co., 1975

Thilly, Frank : *A Histroy of Philosophy, Allahabad*, Central Book Depot., 1978

Urmson, J. O. : *Philosophical Analysis*, London, Oxford University Press, 1976

Warnock, G. J : *English Philosophy Since 1900*, London, Oxford University Press, 1969

Whewell, W. : *Philosophy of the Inductive Sciences Founded Upon Their History*, London, J. W. Parker and Son, 1840

Windelband, Wilhelm : *A History of Philosophy*, Vol. II, New York, Harper and Row, Publishers, 1958

Winternitz, M. : *A History of Indian Literature*, Vol. I, 2nd ed. New Delhi, Oriental Books Reprint Corporation, 1972

Dhaka University Institutional Repository

Wittgenstein. L. : *Tractatus Logico Philosophicus*,. Tr. by Ogden. C. K., London, Routledge and Kegan Paul, 1922

Wright, W. K. : *A History of Modern Philosophy*, New York, The Macmillan Co , 1965

Woolhouse, R. S. : *The Empiricists*, Oxford, Oxford University Press, 1988

প্রবন্ধাবলী

ইসলাম, সিরাজুল : "লোকায়ত দর্শন" *কপুলা*, দর্শন বিভাগ, সাভার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ১৯৮৫ এবং জুন ১৮৮৬

দাস, কালী প্রসন্ন : "আত্মা সম্পর্কে হিউম ও বুদ্ধ : একটি তুলনামূলক আলোচনা," *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা ৩২, অক্টোবর ১৯৮৯

দাস, কালী প্রসন্ন : "কার্যকারণ প্রসঙ্গে হিউম", *দর্শন ও প্রগতি*, গোবিন্দদেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৮৯

রশীদ, এ. এম. হারুণ অর : "কার্যকারণতত্ত্ব : পদার্থবিজ্ঞানে, দর্শনে" *দর্শন*, বাংলাদেশ দর্শন সমিতি, ঢাকা, ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুন ১৯৮৫

রায়, প্রদীপ কুমার : "মূল্য ও তথ্যের মূল্যায়ণ", *দর্শন*, ৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৮৩

Abbott, F. E. : "Scientific Philosophy: A Theory of Human Knowledge", *Mind*, Vol. VII, 1882

Bain, A. : "The Empiricist Position", *Mind*, Vol. XIV, 1889

Braithwaite, R. B. : "The Idea of Necessary Connexion", *Mind*, Vol. XXXI, 1927 and Vol. XXXVII, 1928

Green, T. H. : "Can there be Natural Science of Man?" *Mind*, Vol. VII, 1982

Hartnack, Justus : "Some Remark On Causality", *The Journal of Philosophy* Vol. L, No. 15, 1953

Hobart, R. E. : "Hume Without Scepticism", *Mind*, Vol. XXXIX, 1930

Hodgson, S. H. : "On Causation", *Mind*, Vol. IV, 1979

Knox, H. V. : "Green's Refutation of Empiricism", *Mind*, Vol. IX, 1900

Kroy, Mashe : "Scepticism, Knowledge and Belief", *Indian Philosophical Quarterly*, Vol. X, 1982

Mace, C. A. : "Hume's Doctrine of Causality", *Proceedings of the Aristotolean Society*, Vol. XXXII, 1983-32

Miah, Sajahan : "Hume's Critique of the the Design Argument", *Philosophy and Progress*, Dev Centre for Philosophical Studies, Dhaka, Dhaka University, Vol. VI. 1987

Sharp, F. C. : "Hume's Ethical Theory and it's Critique", *Mind*, Vol. XXX, 1921

Stirling, J. H. : "Kant has not Answered Hume", *Mind*, Vol. IX, 1984 and Vol. X, 1985

Thomson, J. F. : "The Argument from Analogy and Our Knowledge of other Minds", *Mind*, Vol. LX, 1951